বাংলা ওয়েবসাইট সৃষ্টিসন্ধান www.srishtisandhan.com বাংলা সাহিত্য ও শিল্প গ্রন্থনার একটি প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারত এমনকি দেশের বাইরেও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিয়মিত অথবা অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয় অগণীত বাংলা পত্রিকা। সুপরিচিত পত্রিকা গুলো ছাড়াও অনেক পত্রিকাতেই ধরা থাকে হয়ত বা অনেক ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে, দুর্মূল্য সাহিত্য উপাদান। অর্থ সমস্যা, প্রচার সমস্যা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে অনেক ক্ষেত্রে এরা থেকে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সময়ের সঙ্গে এরা হারিয়ে যায়, হয়ত কিছু লাইব্রেরীতে একটা সংখ্যা সংগৃহীত হয়ে থাকে অজ্ঞাতে।

সেখান থেকেই নির্বাচিত কিছু প্রবন্ধ নিয়ে এই সংকলন। প্রবন্ধগুলির মধ্যদিয়ে বাংলার মুক্ত চিন্তা-জগতের একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর ইন্টারনেটের বেড়াজাল অতিক্রম করে এই দুর্মূল্য সাহিত্য ভাণ্ডারকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে আরও কিছু মানুষের কাছে।

সৃষ্টি সন্ধান

নাড়ুয়া বারোমন্দিরতলা, চন্দননগর, হুগলী ৭১২১৩৬
www.srishtisandhan.com

সেরা সৃষ্টি প্রবন্ধ সংকলন

সেরা সৃষ্টি

প্রবন্ধ সংকলন

সৃষ্টিসন্ধানের বিগত পাঁচ বছরের সংগ্রহ থেকে
সংকলিত প্রবন্ধ সমূহ

সীমান্তের হাটখোলা জীবন - শান্তি নাথ
বিবর্তন, চেতনা ও নীতিবোধ - অমিতাভ চক্রবর্তী
মানবিকতা, সর্বজনীন সংস্কৃতির দর্শন - অম্লান দত্ত
বাঙালি মধ্যবিত্ত, আত্মকেন্দ্রিকতা ও বিপর্যয়ের ভূমিকা - শিবনারায়ণ রায়
সম্পর্কহীনতার কথা ঃ কিছু উদ্বেগ - সৌমিত্র বসু
সময়ের জ্বর সময়ের স্বর - হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
ট্যাবলয়েড সংবাদপত্র ও আজকের সাংবাদিকতা - স্বাতী ভট্টাচার্য
রাজ্য সরকারের নয়া কৃষিনীতি - শঙ্কর ঘোষ
ভূমি ব্যবহারের কোনও নীতিই নেই - দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
বিশ্বায়ন ঃ বামপন্থীদল ও এনজিও - প্রদীপ বসু
অ-রাজনীতিকরণের রাজনীতি - জয়ন্ত কুমার ঘোষাল
গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ - অরুন্ধতী রায়
গণতন্ত্রই সমাজের কাম্য পরিবেশ - শিবনারায়ণ রায়
সংস্কৃতির ভূমিকা - অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিবেশ হইতে সাবধান - মোহিত রায়
বৃহৎ ব্যবসায় ও অপবিজ্ঞানের সংযোগে অস্তিত্বের সঙ্কট - শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ
পশ্চিমবঙ্গের নদী : ফিরে দেখা - কল্যাণ রুদ্র
নদীসংযোগের সর্বনাশা প্যান - শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ
সেকুলারিজ্‌ম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা - দেবী প্রসাদ রায়
ধর্ম, সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ - বিজয় দত্ত
স্বরূপের বিবর্তনঃ অসাম্প্রদায়িকতা থেকেধর্মীয় জাতীয়তা - গোলাম মুশরিদ
ঐতিহ্যের সংঘাত - সালাহ্‌উদ্দিন আহ্‌মেদ
সন্ত্রাসের শিকড় সন্ধান ও প্রতিকার - অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা - অনুরাধা দে
ওরে ভীরু, তোমার হাতে - সুধীর চক্রবর্তী

সীমান্তের হাটখোলা জীবন

শান্তি নাথ

পাকিস্তানের এক বধু, সীমান্তের পারেই তাদের বাড়ি, স্বামী আছে, শাশুড়ি আছে, বাড়িতে মুরগি আছে তারা ডিম পাড়ে আবার ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। কিন্তু সেই বউ কোনো বাচ্চা দিতে পারে না তার স্বামীকে, শাশুড়িকে--- সেই বাচ্চাকে আদর করার জন্য। এই জন্য তার উপর চলে প্রতি নিয়ত অত্যাচার। স্বামীর মার তাকে খেতে হয়, এটা নিত্যদিনের ব্যাপার। শাশুড়ির গালাগালি আর মাঝে মাঝে গরম খুনতির ছেঁকা খেতে হয়। রাগ হয় কিন্তু তার কোনো প্রকাশ থাকতে নেই। দুঃখ হয়, নিঃশব্দে তার সারা শরীর কাঁদ। কিন্তু অন্তরের চোখের জল মুছিয়ে দেবার কোনো পরিবেশই ছিল না তাদের বাড়িতে। সামান্য মুরগি বাচ্চা দিতে পারে আর একটা দামড়া মেয়ে বাচ্চা দিতে পারে না---- স্বামী তাকে তালাক দেবে, আর একটা বিয়ে করবে। আর একটা বউ আসবে, আর স হবে দু'নম্বরি বউ, এটা তার সহ্য হয়নি; আঘাত পাওয়া সহ্য হয়েছিল, গরম খুনতির ছেঁকা সহ্য হয়েছিল কিন্তু বাচ্চা না-দিতে পারা দু'নম্বরি বউ, এটা হতে ইচ্ছা করেনি।

আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনো পথ তার কাছে খোলা ছিল না। নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল। ঝাঁপ দেবার সময় তার জানা ছিল না --- সীমান্ত বলে একটা জটিল ব্যাপার আছে, মানুষের জন্য আছে বিষাক্ত কাঁটা তারের বেড়া। তা তার স্বামীর চেয়ে নিষ্ঠুর এবং তা অসহ্য তার শাশুড়ির অকথ্য ভাষণের চেয়েও। তার বিচার পদ্ধতি আরো অমানবিক।

কিন্তু নদীর তো কোনো দেশ নেই, সে পৃথিবীর সম্পদ, মানুষ এখনো পৃথিবীর সম্পদ নয়, সে শুধু একটা সীমাবদ্ধ দেশের সম্পদ। বউটা ডুবেও মরল না, হতভাগীদের তাই হয়। মৃত্যুও নেই আবার শান্ত জীবনযাপন করার কোনো প্রকরণ নেই। নদী তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এসে তুলল ভারত সীমান্তে। নদীর কান্না দেখা যায় না, শুধু জোয়ার আসে তার বুকে, তাই নদী স্তম্ভিত হয়ে দেখেছিল---নদীর পারেই সেই নারীর ধর্ষিতা হওয়া --- এক ভারতীয় সেপাই দ্বারা। সুন্দরী যুবতী, এছাড়া তার গতি কী আছে! কতবার ধর্ষিতা হয়েছিল এটা তার জানা ছিল না। এই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে কিছু মানুষ যাদের কাছে সীমানা কিংবা ভিনদেশ ইত্যাদি শব্দগুলো থাকে না তারা সেবা করেছিল কিন্তু আরো গাঢ়তর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল সেই কন্যা। হাসপাতালে ভর্তি হলে তার দরকার হল একটা পরিচয়। সে বলেছিল, তার বাড়ি পাকিস্তানে। পাকিস্তান, ভিন্ন দেশের নাগরিক --- এই শব্দে দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। তার স্থান হয় কয়েদখানায়। সেখানেও সে আবার ধর্ষিতা হয়। তার নারীত্বের প্রতি এই বঞ্চনা তাকে বড়ো যন্ত্রণা দিয়েছিল। তাই বিচারকের কাছে সব কথা খুলে বলেছিল। বিচারক খুঁজে বার করতে বলেছিলেন, সেই ধর্ষক কে? ইতিমধ্যে ঘটেছিল সময়ের অনেক ব্যবধান ----- ধরা এবং জেলে থাকা, বিচার পদ্ধতির ভিতর আসা, তার ভিতর এসে যায় এই ডাক্তারি রিপোর্ট যে --- সে গর্ভবতী। পরে ধরাও পড়েছিল সেই ধর্ষক। 'গর্ভবতী' এই শব্দ তাকে শতছিন্ন শরীরের ভিতর আনন্দ এনে দিয়েছিল, যেন শুনতে পেয়েছিল বহু আকাঙ্খিত শিশুর মৃদু হাস্য কলরোল ধর্ষিতা হবার চেয়েও তাকে বড়ো আনন্দ দিয়েছিল। নারীত্বের জয় ঘোষিত হয়েছিল।

তার বার বার মনে হয়েছিল --- আসলে তার স্বামীই ছিল শক্তিহীন, নপুংসক। স্বামীর মুখটা মনে পড়ছিল আর তার প্রতি ঘৃণাবোধ জাগছিল। ওদিকে তার সামনেই দাঁড়িয়েছিল সেই ধর্ষক সেপাই।

---- বাবু, আমরা ঘর করতে পারি না? এই সেপাইবাবু আমাকে বিয়ে করতে পারে না।

---- না, তা হয় না। বিচারকের উত্তর ছিল। তুমি এ দেশের নাগরিক নও, তোমার পাসপোর্ট নেই, ভিসা নেই। তুমি নিষিদ্ধ এদেশে।

অবশেষে তার জেল হয়। ধর্ষকেরও জেল হয়। দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না । ধর্ষণ আছে কিন্তু ভ্রূণহত্যা নিষিদ্ধ, সেই নিয়মকে মানার জন্য অবশেষে জন্মায় তার কন্যা সন্তান। বাচ্চা সমেত তার জেল হয় সাত বছর। মুক্তির সময় আগত --- তার বাচ্চার বয়স এখন সাত, এবার তাকে যেতে হবে ভিন্ন কয়েদখানায় কারণ তার অভিভাবক নেই কিংবা চলে যেতে হবে নিজের দেশে। সে তারপর আবেদন করেছিল --- অন্য দেশে পাঠিয়ে দাও কিন্তু তার মেয়েকে তার সঙ্গে দিতে হবে।

বাচ্চা এদেশের নাগরিক, তার ধর্ষক এদেশের কিন্তু গর্ভ ভিন দেশের, সে পাকি স্তানের। পাকিস্তানের গর্ভ থেকে ভারতীয় সন্তান! মা পাকি স্তানের, সন্তান ভারতীয় ---- মাঝে কাঁটা তারের বেড়া! এই কেস এখনো ঝুলছে, সিদ্ধান্তহীন উত্তর। এর থেকে সংজ্ঞা টা না যেতে পারে, দুই দেশের বিভাজন রেখা অর্থাৎ কাঁটাতারের লৌকিক - অলৌকিক সংজ্ঞা।

কিন্তু সংজ্ঞা এত তাড়াতাড়ি বেড়া দিয়ে বেঁধে দিলে তা হবে আরো একটা শুষ্ক হৃদয়হীন অস্তিত্ব। সচল থাকবে না। কিন্তু কাঁটাতারে র বেড়া চলমান জীবন্ত। একে ঘিরেই বহু জীবন নির্ধারিত হয়।

আসা যাক আর একটা ঘটনায়---

স্থান অজ্ঞাত থাক তবে কাঁটাতার এবার ভারত আর বাংলাদেশের হৃদয় ভেদ করে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করা অবস্থায় স্থাপিত এবং অ নড়। একে না মানা অপরাধ। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ডাকাত হয়ে সহজেই বেড়া ভেদ করে মানুষেরা আসতে পারে। এই বেড়ার দৈ র্ঘ্য চার হাজার কিলোমিটার, মেঘালয় থেকে লালগোলা পর্যন্ত। বাংলাদেশ বেড়া দেয়নি, বেড়া দিয়েছি আমরা। শক্ত, নির্ভুল বেড় া। নিশ্চয় নির্ভুল--- এই বর্ণনায় আসা যাক আর এক গ্রামের কথা, গ্রামের নাম ধরা যাক হালদারপাড়া। ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা 'ি ততাস একটি নদীর নাম' --এ শেষ দৃশ্য ছিল জেলেদের মাছের আড়ত, মাছের সিন্দুক হল নদী, সেই নদী সরে গিয়ে চড়া দেখা দি য়ছিল, সেই চড়াতে একটা বালক বাঁশি বাজাচ্ছিল, তার বাঁশির শব্দে ধান গাছ বাড়ছিল --- অনিশ্চিত দোটানার জীবন জেলেজীব ন থেকে স্থায়ী চাষি জীবনে এল, জেলে হল চাষি। কিন্তু এই হালদারগ্রাম নিয়ে কখনও সিনেমা হবেনা, হয়না। কারণ এই হালদারে দর বাড়ি ভারতে, গ্রাম ভারতে কিন্তু মাছের সিন্দুক ভারতে থাকলেও শূন্য লাইন ঠিক রাখার জন্য উভয়ের মাঝে যে কাঁটাতারের বেড়া, একে লঙঘন করা যাবে না।

কাঁটাতারের ওপাশে আধ মাইলের বেশি জায়গা ভারতের। তাদের নিজেদের দেশের তবুও সেখানে যেতে গেলে তাদের উপার্জনে র জায়গায় যেতে গেলে সেপাইদের কাছ থেকে ঠিক সকাল ৭টায় গেট পাস নিতে হয়, তারপর ঢুকতে পারবে কাঁটাতারের বেড়া ভেদ করে নিজের দেশে কিন্তু তা অন্য দেশের মতো যেন ভিন্ন দেশ, চোর হয়ে ঢুকতে হয়, তাই প্রত্যহ জোটে প্রত্যেকের পাছায় এ কটা করে লাথি --- শুধু নিজের দেশে ঢুকতে, তাদের নিজস্ব পুকুরে মাছ ধরতে। শুধু একথা মনে করিয়ে দিতে তুমি আমাদের কা ছ পরাধীন, তোমাদের কোনো স্বাধীনতা নেই, নিজেদের দেশেও নিজেদের উপার্জনের জায়গায় যেতে। এর জন্য তোমাদের চোর হতে হবে, অপরাধী হতে হবে এই ভঙ্গিমায় আসা ও যাওয়া করতে হবে। লাথি বগলে নিয়ে ঢোকা হল; এবার মাছ ধরা --- মাছ ধ রা যখন শেষ হবার মুখে ওদেশ থেকে এবার সত্যই ভিন্ন দেশ বাংলাদেশ থেকে চ.ড্ড.ত্ম- রা আসবে--- খিস্তি দিয়ে সব দেখতে চাই বে, সেই মাছের অর্ধেক ভাগ ওদের, এই পুকুরের অর্ধেক ভাগ তাদেরও। শুধু মাছ দিলেই হবে না সেই সঙ্গে খেতে হবে পশ্চাদ্দে শ একটা করে চওড়া ভারি বুটের লাথি --- ওদের বয়স গোনা যায় ওদের লাথি খাবার এই সংখ্যা গুণে।

এই হল সীমানা, শূন্যরেখা --- না, এইভাবেও কাঁটাতার সীমানাকে সংজ্ঞায় আনলে ভুল হয়ে যাবে। এবার তবে আর একটা ঘটনা । যদিও এই সব ঘটনার কোনো হিসেব থাকে না।

ডাকাত আসে অনায়াসে সেই বেড়ার গর্ত দিয়ে এপারে, লক্ষ্য একমাত্র গরু চুরি করা নয় যাবার সময় বেশ কিছু বাড়িতে ডাকাতি করা --- সব বন্দোবস্ত করে দেয় দু'পারের সেপাইরা। একশোটা গরু পার করে দিতে পারলে প্রত্যেকের পাওনা পঞ্চাশ টাকা, বাি ক মোট টাকার অর্ধেক করে পাওনা দু'দেশের রক্ষী সেপাইদের, এতে ওদের আয় মাথা পিছু পঞ্চাশ টাকার বেশি হয়। তাই ডাকাি ত হতে দেওয়া বাড়তি রোজগারের ভিতর পড়ে, এটা হতে দেওয়া নিজস্ব আইনের ভিতর পড়ে, অবশ্য দুই দেশেরই একই আইন। তাই ডাকাতি করা আইন যতক্ষণ তুমি না মরো, মরলেই, হত্যা হয়ে গেলে অনেক হ্যাপা তখন জটিল আইন অজগর সাপের মতো গিলে খেতে আসবে, কেননা তখন তুমি অনুপ্রবেশকারী।

গরু পার করার সময় ডাকাতি হয় এটা আইনসিদ্ধ। তাই এপারের মানুষেরা সজাগ থাকে। ধনী যারা তাদের বন্দুক থাকে, গরু চো রদেরও বন্দুক থাকে। গুলি বিনিময় সাধারণ ঘটনা। সেদিনও তাই ঘটেছিল। কিন্তু এপারের কর্তার কিছুটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। ে ক্ষাভে ও বীরত্বে একাই ছাদে উঠে গিয়েছিল আর ভুল করে টর্চটা হাতের চাপে জ্বলে উঠেছিল, সেই আলোতে দু'পক্ষের গুলি--দু টো গুলির শব্দ, একটা এপারের অন্যটা ওপারের। সব শান্ত হয়ে গেলে ছেলেরা ছাদে উঠে দেখে, বাবা মৃত, হাতে নেভানো টর্চটা আর বুক দিয়ে একটু ঘন রক্ত বার হচ্ছে, ব্যক্তি মৃত অথচ রক্ত তাজা।

পরের দিন যখন কর্তার দাহ কার্য শেষ করে এসে বাড়ির লোক বিমর্ষ, সেই বাড়ির ছেলেরা হঠাৎ দেখে --- তিনজন, এক বুড়ি, এক বউ আর একটা বালক কী যেন খুঁজছে। তাদের ধরা হয়, গাছে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। বউয়ের বয়স সতেরো, বুড়ির বয়স ষাটের বেশি, বালকের বয়স বালক। শোক আছে, পিতা মারা গেছে, শোক বেশিক্ষণ থাকে না। বুড়িকে দু-একটা থাপ্পড়, বউটার গায়ে হাত দিতেই ওরা হাউমাউ করে কেঁদে বলেছিল মেরো না বাবা, আর ইজ্জত কী নেবে? এসবের কোনো দাম আছে? রোজই দিতে হয়, ওর স্বামী ডাকাত তাই দিতে হয়। শরীরকে হরির লুঠ না করে দিলে স্বামীর ডাকাতি করা সহজ হয় না। ওরা আর বাকি যা বলছিল তার সংক্ষিপ্ত রূপ এরকম

ওর স্বামী কাল ডাকাতি করতে এসে গুলি খেয়েছে, লাশ পেতেও অনেক হ্যাঁপা। এদেশের পুলিশ কেস দেবে, তারপর লাশ ফেরত যাবে ওদেশে, তাও আবার ওদের সেপাই ফেরত দিতে চাইবে না। কারণ এটা হত্যা --- এইসব রিপোর্ট লিখতে হয়, তাতে দুদেশের ভিতর যেমন সম্পর্ক খারাপ হয়, বেড়া তখন বন্ধ হয়ে যায়। তাই বাবুরা বলে দিয়েছে, এই বাগানের ভিতর ধানের গোলার নীচে বিচুলি চাপা আছে ওর স্বামীর লাশ। 'বাবু সেই লাশটা শুধু নিতে দিন, তারপর ওদেশে চলে যাবো।' ওরা খুঁজে দেখে সত্যই লাশ সেই ডাকাতের। রেখে গেছে বিচুলি দিয়ে। লাশ পাওয়া গেল, কিন্তু ওপারে ভিন্ন রাজ্য থেকে এমনকি সার্কাস থেকে বেচে দেওয়া হাতি বেড়া ডিঙিয়ে ধীর পায়ে এদেশ থেকে ওদেশ চলে যেতে পারে, কিন্তু লাশ যেতে পারে না। হাতি চালান যাচ্ছে এদেশ থেকে ওদেশ----দুই দেশের সেপাই তাকে গার্ড অব অনার দিচ্ছে, সার্কাসের মালিক দুইদেশের সেপাইয়ের জন্যে খানাপিনার ব্যবস্থা বেশ মজাদার করে রেখেছে। এইসব স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু লাশ যাবে কীভাবে? অনেক ভেবেচিন্তে এ বাড়ির ছেলেরাই সেই লাশকে কবর দিয়েছিল এদেশে। ভিন্ন দেশের পরিবার অথচ তার লাশ কবর এদেশে, এছাড়া কোনো পথ নেই। এই হল সীমান্ত, এই হল কাঁটাতারের বেড়া--- না এখনো সংজ্ঞা টানা ঠিক হবে না। ওপার থেকে আসে সোনা, আমরা পাঠাই চাল, গম, চিনি, প্রত্যহ প্রায় একশো টন। তবেই ওপার থেকে আসে ইলেকট্রনিক যন্ত্র, সেলফোন, আমরা পাঠাই সার্কাসের জন্য হাতি আর হত্যা করা বাঘের চামড়াসমেত তার সব হাড়গোড়, এমনকি তার ছোট্ট সুন্দরপানা কানটা পর্যন্ত। ওরা পাঠায় দামি মেশিন, হেরোইন আর মেয়ে---- তারা চালান যায় বেশ্যাখানায়। আমরা পাঠাই আপেল, আঙুর, আম, টমেটো আর ভালো সন্দেশ যা বড়োলোকদের খাদ্য। আর ওদেশ থেকে আসে বিক্ষোভ আর সন্ত্রাস বাঁচিয়ে রাখার উপকরণ। হাতি যাবার দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়, এক রাজা যেন অন্য রাজাকে উপঢৌকন পাঠাচ্ছেন, সীমান্তে সেদিন কী উল্লাস, কিন্তু তার থেকে বেশ কিছুটা দূরে পড়ে আছে সতেজ যুবক, বেড়া ডিঙোতে গিয়ে বুলেট বিদ্ধ হয়েছে, তাই লাশ ---- ছোটোলোকের বাড়। বন্দোবস্ত না করেই যাতায়াতের চেষ্টা ---- তাই লাশ।

আর কী মজাদার দৃশ্য --- ছোট্ট নৌকা করে ওপার থেকে আসছে দামি মেশিন আর কিছু হেরোইন, ওদের অবৈধ পাসপোর্ট ছিল না, তাই খবর হয়ে গিয়েছিল, এপারের সেপাইয়ের সুনির্দিষ্ট গুলি ছুটে যায় নৌকার দিকে, মারা যায় তিনজনই--- নৌকাটা একা চুপ করে থাকা বহু আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে নদীতে ঘুরপাক খেতে থাকে--- এই ঘুরপাক খাওয়া অবস্থান এখানে। ফলে সংজ্ঞা টানা খুব সহজ নয় আরো অপেক্ষার প্রয়োজন।

রমলা এসে গেছে খুচরো কাজ শেষ করে, ওর কাছ থেকে শুনতে হবে আরো অনেক কথা, তারই জন্য আমার এখানে আসা, জীবন হাতে নিয়ে আসা, যে কোনো মুহূর্তে আমার দিকে ছুটে আসতে পারে সেপাইদের গুলি, তখনই আমি হয়ে যাব কোন সন্ত্রাসবাদীর লাশ, এটাই এখানকার নিয়ম, স্বয়ং বিচারপতিদেরও তা জানা নেই। এই রমলাকে চিনি আমি কুড়ি বছর ধরে, তাই ভয়টা এখন একটু কম। সাহস করে বলেছি আমি কী জানতে চাই, লজ্জা পাচ্ছে, ভয় পাচ্ছে, সংকোচ যাচ্ছে না কিছুতেই। অবশেষে বললাম, কিছুই বলতে হবে না, আমি জানতে চাইব না কিছুই, তুমি শুধু বলে যাবে তোমার জীবনের কথা। সে বসে আছে, মুখ নিচু করে, বলতে ইচ্ছা হলে তবে বলো --- জানো তোমার এই লজ্জা-লজ্জা ভাব কত নকল, তা আমি জানি। তুমি সেপাইদের বশ করতে পারো, গর্ভে সন্তানের বদলে দশভরি সোনা নিয়ে যেতে পারো এক মহাজন থেকে আর এক মহাজনের কাছে। লজ্জা কীসের! আমি জানি পথে থাকে অনেক সেপাই তাদের তুষ্ট করতে হয়, দিতে হয় আনন্দ, শরীর দেওয়া এসব তো সাধারণ ব্যাপার। পাঁচ মাইলের ভিতর কাজ করলে, তার জন্য পাও পঞ্চাশ টাকা, এইরকম পাঁচবার কাজ করতে পারো একই দিনে। অবশ্য তিন সপ্তাহ অন্তর অন্তর এই কাজ জোটে। তবুও তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই।

আপনি তো সবই জানেন, কিন্তু এসব তো বাইরের ঘটনা, ঘরের ভিতর অন্য ঘটনা।

সেই ঘরের ঘটনা তোমার মনের ঘটনা তা আমি জানি না।

কোনো বিপদ হবে না তো?

বিপদ হলে আমার হবে তোমার হবে না, বলো -----

কাহিনিতে প্রবেশ

কাহিনি শুরু করা খুব কঠিন কাজ, কোথায় মূল কাহিনি লুকিয়ে থাকে তা জানা আরো কঠিন, এইটুকু জানি যে এই বিষয়ে অনেক শাখা প্রশাখা থাকে। তাই এই বোনের নাম দেওয়া যাক রমলা। সেকথা বলে শুরু করতেই ওর বড়ো দিদি এসে মাটির উঠানে বস ল। ওর এক পাশে রান্না হয়, অন্য পাশে ছাগল থাকে, ছাগলের গন্ধ চারিদিকে, দিদি (সুন্দরী) এসে বসতেই সেই গন্ধ আরো বেড়ে গেল। জামাইয়ের মুখে তোমার কথা অনেক শুনেছি , রমলাও বলে, কিন্তু এতো দিন পরে তুমি এলে? খিদে পেলে সব পাখি ডা ল ডালে ঘোরে। একটা শুয়োর আজ বেচে দিলাম, দাম পেলাম দু হাজার টাকা, শালাকে আজ কেটে কুটে বিক্রি করে দেবে, জানে া এই শালার মতো আমিও কেটে কুটে বিক্রি হয়ে গেছি কত দিন আগে, কিন্তু কিনল কে তা বুঝতে পারি না। এদের মতো আমি অ তো বোকাসোকা নই, শহরে যাই মাল নিয়ে --- কাঁচা মাল নিয়ে। তুমি বলবে শুধু কাঁচা মাল নিয়ে --- মালের নীচে এই মাগিদের মতো অতো সোনা নিয়ে যাই না, সত্যি বলতে অল্প সোনা নিয়ে যাই। আমার শরীরের আর কোনো দাম নেই । জানো গত মাসে শরীর থেকে একটা অঙ্গ বাদ গেল, অঙ্গই বটে। ডাক্তারের কাছে গেলাম বললাম আর মাসিক হচ্ছে না, এই বয়সে আবার বাচ্চা এল নাকি! যার স্বামী কুড়ি বছরের উপর ফেরার, বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, আর ফেরত এল না-- তার বাচ্চা! লোকলজ্জা, বলবে চ চারাকারবারীদের আবার লোকলজ্জা--- হ্যাঁ গো লোকলজ্জা আছে সবটা যায়নি, কিন্তু সেপাই মিনসে গুলো লজ্জা রাখতে দেয় না। কর্তা চলে গেল...(বলে থামল, বেশ সময় নিল, একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে ধরাল) আবার বলতে লাগল শালা শুয়োরদের এ তো ভালবাসতাম আজ বিক্রী করে দিলাম, অল্প মদ খেয়েছি , সামান্য নেশা হয়েছে কিছু মনে করো না। জীবনে বাঁচার জন্য নেশা র দরকার আছে, স্বামী নেই অথচ বাচ্চা হয়, এই সব জীবনের জন্য নেশার দরকার আছে। কী নিয়ে বাঁচব? ও চলে গেল, রেখে গ গল তিনটে বাচ্চা। একটা বিয়ে দিলাম শান্তিপুরে, শালা জামাই সোনার কাজ করে তারপর সেই মাল আমার হাত দিয়ে পাঠায় ম হাজনের কাছে। ওদেশ থেকে সোনা আসে কাঁচা কিন্তু ও দেশে কারিগর নেই, ওদেশে যে কী আছে তাও জানি না, সবই তো এদে শ থেকে যায়। সোনার বালা নকশা করা হার আর কত গয়না তৈরী হয়ে ফেরত যায় ওদেশে। শালা জামাইয়ের কাছেও আমি চো রাচালানকারী, জামাইও আমার কাছে চোরাচালানকারী ---- কোনো দিন জামাইও আমায় চেয়ে বসবে। রাত্রে বড্ড ভয় লাগে, শু য়োরগুলো আরও ভয় পাইয়ে দেয়, কোথাও গুলির শব্দ হল শুয়োরগুলো ভয়ে এমন চিৎকার করে আর কাঁদে, ওদের চোখে আমি তখন জল দেখি --- গুলি মানে কী জানো, কেউ মরল --- সকালে এই গ্রামের একজনকে আর পাওয়া যাবে না, গরু হারিয়ে যা বার মতো সেও হারিয়ে গেল, সপ্তাহে একটা দুটো করে হারিয়ে যায়। নেশায় অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করে, তাই তোমাকে বলি ছ এসব কথা কে শোনে? আমার ওটা হয়ত এভাবেই শেষ হয়েছে , কেউ খবর পায়নি তাই মাথাতে এখনো সিঁদুর পরি, আর ভাবি একদিন ঠিক ফেরত আসবে।

মেজ মেয়েটার বিয়ে দিলাম রানাঘাটে। কাঁচামালের দোকান ছিল জামাইয়ের। মেয়েটার হল টিবি, আর ওর আছে দুটো বাচ্চা, আমি বলি ওদুটো কালো কেন্নো। জামাই একদিন চলে গেল , এদের মুখে এখন ভাত তুলে দেবে কে? এই আমি, আজ দুপুরেই আ বার মাল নিয়ে যেতে হবে নৈহাটিতে। অনেক রাত হবে কাজ শেষ হতে --- ট্রেন চলে যায়, স্টেশনেই থাকি বাকি রাতে । আর পি এফগুলো ভালো, ওদের সঙ্গে আলাপ আছে , মাসি বলে ডাকে, এখনো জানো রাতে কত লোক আসে, বলো এই শরীরে কী আছে ? গায়ে শুয়োরের গন্ধ, পেটে কত চর্বি জমে গেছে , গতরে নেই বল আর এদুটো লাউ হয়ে গেছে , তবুও পুরুষ মানুষের লোভ, ছ াড়ে না। অবশ্য দু পয়সা আয় হয়, টিবি মেয়েটার জন্য ফল হয়।

পাপ করছি বলতে পারো, তোমাদের অনেক টাকা তোমাদের কাছে সব আছে , তোমরা সব ভদ্দরলোক। আমি ভদ্দরলোক নই , গ্রামে থাকি, চাষির বউ নই , জমি নেই, মালোর বউ নই, বাজারে মাছ বিক্রী করব, তাও হয় না-- তাই সবজির নীচে কখনো কখনে না সোনার বিস্কুট নিয়ে যাই, এতে আয়টা ভালো হয়--- কতগুলো পেট, তাতেও ভরে না। এসব দুঃখের কথা, এসব তোমার নিশ্চয় ভালো লাগছে না, নেশাটা একটু কাটছে , জানো ডাক্তারের কথা শুনে বেশ কষ্ট হল---ডাক্তার বলল, বাচ্চা আসেনি, তোমার এ কটা অঙ্গ গেল। মাসিক হওয়া মেয়েদের একটা অঙ্গ , সেটা আমার চলে গেল। স্বামী চলে যাবার পর যে কষ্ট হয়েছিল মনে, একথা শুনে একইরকম কষ্ট হল। অঙ্গ চলে গেল--কী বল বেশ ভালোই , হাতুড়ে মাসিকে আর টাকা দিতে হবে না। আর টাকা লাগবে না । এখনো এসব করি কি না--করি। তবে জানো কিছুই ভালো লাগে না, মেয়েটার কথা বড় মনে হয়, রান্না করতে গিয়ে হয়ত মাথা

ঘুরে উনুনের আঁচে পড়ে যাবে, পুড়ে মরবে মেয়েটা। দেখো পেটে কত চর্বি হয়েছে , পেটে হাত দাও লজ্জার কী আছে , বাড়িতে ব সে লজ্জা পাচ্ছো, অন্য জায়গা হলে নিয়েই যেতে।

উপকথা

উপকথায় ঢুকে গেল বড়ো বোনের কথা। মোটা, এখনো শরীরের বাঁধুনি ভালো, শরীরের বাঁধুনি ছাড়া এসব কাজ হয় না। এবং রসের কথা বলতে হয়, না হলে একাজ হয় না। এরা জানে না এই কাজ এদের চরিত্রগুলোকে কীভাবে পাল্টে পাল্টে দেয়। তবুও মে য়ে এ কথাটা ভোলে না, ফলে অঙ্গ হারানোতে তাই কষ্ট পায়। কিন্তু এত সব নিজস্ব কষ্টের ভিতর কষ্ট পায় টিবি হওয়া কন্যার দুটে া বাচ্চার জন্য। একটার বয়স সাত, স্কুলে যায় না, অন্যটার বয়স এগারো এদের জন্য স্কুল নেই। গ্রামে একটা স্কুল আছে, সীমান্ত থেকে তা বেশ দূরে, এদের বাড়ি সীমান্তবর্তী অঞ্চলে, অত দূরে গিয়ে পড়া অসম্ভব, তাছাড়া এদের কাজ করতে হয়, শুয়োর দেখাশে ানা করার সব কাজ এদের করতে হয়, যার ওজন এদের ওজনের প্রায় দশগুণ। বড়োটির চোখ অপুর মতো সরল কিন্তু জীবনে এর পরিণতি কী? দিদার মতো ট্রেনে করে মাল নিয়ে যাওয়া, তার তলায় থাকবে সোনার বিস্কুট কিম্বা এরা হবে এই গ্রামের মস্তান, ম হাজন তাদের রক্ষাকর্তা। এই গ্রামে তিন ধরনের মহাজন আছে। একজন শুধু টাকা দিয়ে কাঁটাতার কেনে অর্থাৎ একঘন্টা কিম্বা অ াধন্টার জন্য কিনল, এতে সপ্তাহে তাকে দিতে হয় তিন থেকে চারলক্ষ টাকা। এর কাজ এইটুকু। ও এবার সময় বিক্রি করবে অন্যে র কাছে----কাউকে দশ মিনিটের জন্য, কেউ কিনবে আরও বেশি সময়, এই সময় কেনে বাইরের লোকেরা, তারা এ গ্রামে থাকে না। সময় যারা কিনল তারা সময়ের বাইরে যাতে কাজ না করতে পারে তার জন্য রাখা হয় এই মস্তান, এবং এই মস্তানদের কাজ অন্যরা যারা টাকা দেয়নি তাদের কাজে বাধা দেওয়া। আর একদল আছে যারা শুধু মাল কিনবে, এরা বাইরের লোক, মালকে ব র্ডার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়াও এদের কাজ। এছাড়া চতুর্থ মহাজন, এদের কাজ হল মালটাকে এদেশ থেকে ওদেশে ক্যারিয়ারের সাহ ায্যে পৌঁছে দেওয়া। এবং পঞ্চম মহাজন হল সর্বশক্তিমান --- এদের কাজ হুন্ডির মাধ্যমে টাকা লেনদেন করা এবং মাল রাখার জন্য গোডাউনের ব্যবস্থা করা। যারা গ্রামের মহাজন এবং তাদের কিছু ক্যারিয়ার থাকে, সুন্দরী সেইরকম একজন ক্যারিয়ার ‘রমলা’। রমলা’র কথা শোনার আগে শুনে নিই কাস্টমস অফিসারের কথা।

অফিসার উবাচ

ওখানে অফিসে বসে কথা বলা যাবে না, কারণ তাতে সন্দেহ বাড়বে। এমনিতেই আমার উপর বি এস এফ-এর সন্দেহ আছে। জা নন তো প্রায় দশলক্ষ টাকার সোনা ধরা পড়েছে, সে নিয়ে বিশাল ব্যাপার, অবশ্য খবর ছিল তাই ধরা সম্ভব হয়েছে। আমাদের কা জ তো এখন সাধারণ। বাংলাদেশে এখন ওয়াগানে করে মাল যায়, এটা দু’ দেশের চুক্তি, যাতে চোরাচালান বন্ধ করা যায়। এই ব্য াপারে দুই দেশের নজর এখন তীক্ষ্ণ। আমাদের কাজ ওয়াগানে মাল ঠিকমতো আছে কিনা এটা দেখা অর্থাৎ সিল খোলা আছে না অটুট আছে --- খোলা না থাকলে সব ঠিক হ্যায়, এটা লিখে দিতে হয়। আর অন্য কথা নিশ্চয় বলবেন, এতে ফাঁকি থেকে যায় কিন া? হ্যাঁ, নিশ্চয় যায় --- ওয়াগন কোথাও খুলে তাতে অন্য মাল পুরে দিলে এবং সিলটা যথাযথ বন্ধ অবস্থায় থাকলে আমাদের কিছু করার থাকে না। এই মাল দেখার দায়িত্ব আর পি. এফ ও বি এস. এফ, এরা পাহারায় থাকে।

এছাড়াও আর একটা কাজ আমাদের থাকে, সেটা হল কেস্‌টাকে ঠিকমত আইন মাফিক লেখা। বি এস এফ এই দায়িত্বে থাকে, ওব া কাউকে ধরলে ওরা নোট্‌ দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয় আমরা সেই কেস্‌টাকে আইন মাফিক লিখে কোর্টে প্রোডিউস করি । এবং ভারত সরকারের হয়ে তার বিরুদ্ধে কেস্‌ চালাই। একদিন দেখি আসামি হিসেবে এসেছে তিনজন --- মা, মেয়ে ও আর এ কটা বাচ্চা ছেলে, ওরা হেরোইন পাচারকারি। মা’র মতো যে সে আমার পা চেপে ধরল, বাবু ছেড়ে দেন, সত্যিই হেরোইন আনি ন, এ প্যাকেটটা হাতে ধরিয়ে দিয়েছে বড়োবাবুরা, তারপর যা মেরেছে বলে চিহ্নগুলো দেখাতে থাকল। মেয়েটা লজ্জার বাঁধ ভে ঙে বলল, বাবু রাতের বেলা ওদের কাছে পাঠাবেন না, কেননা ওরা অন্য ধরনের অত্যাচার করে। ছেলেটি ছোটো। দেখলাম যেটুক ু হেরোইন দেখানো হয়েছে তাতে কেস্‌ খুবই হালকা হবে। তাই বি এস এফ - দের অনুরোধ করলাম, এদের ছেড়ে দেওয়া যায় না ? এসব অনেক কেস আছে, এইসব কেসের ইন্‌ভেস্টিগেসনে যেতে হয় আমাদের। গরিবদের আর এক জগৎ ওখানে, দেশের অস্তি ত্ব বোঝা যায়। গ্রামগুলো হতদরিদ্র, চাষ নেই, মানুষের কাজ নেই, মাটি থেকে জল তোলার ব্যবস্থা নেই, বললে অবাক হবেন --- কোনো বাড়িতে রেডিও পর্যন্ত নেই, বসার চেয়ারও নেই। ওদের পরিচিতজন হয়ে গেছি, তাই একটা ভাঙা চেয়ার নিয়ে আসে আ মার জন্য। ওই গ্রামে দেখি একজন মহিলা সর্বদা সেজেগুজে থাকে, ওদের পক্ষে যতটা থাকা যায়। কাপড়টা পরিষ্কার, মুখটা মাটি মেখে পরিষ্কার, মাটি মেখে ধুয়ে নিলে জানেন অদ্ভুত আলো মুখ থেকে বের হয়। কপালে টিপ, মাথায় সিঁদুর। গ্রামের বুড়ো একজ নকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম --- কী ব্যাপার বলতো?

জেনেছিলাম, বর্ডারে গুলি চলেছিল, এর স্বামীর বুকে গুলি লেগেছিল, সেটা ওপারে বাংলাদেশে হয়েছিল। বডি বিনিময় যুদ্ধ ছাড়

া করা হয় না। ফলে বডি পাওয়া যায়নি। এই মহিলার ধারণা, ওর স্বামী বাইরে কাজ করতে গেছে, যে-কোনো সময় এসে পড়তে পারে, তাই তার জন্য সেজেগুজে প্রস্তুত হয়ে থাকে। অপেক্ষা করে করে ওর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। গ্রামে এই ধরনের পাগল বেশ কিছু থাকে। আর কিছু যুবকের সংবাদ পাওয়া যায় নি, এরা ভালো সোনার কাজ জানত, গুজরাটে গিয়েছিল, এ তল্লাটের বাইরে কাজে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক দালাল থাকে, দালালদের সঙ্গে হয়ত চুক্তিও থাকে। ওরা হয়ত ভূমিকম্পে মারা গেছে, ওদের কোনো খবর নেই। এদের সংখ্যা, সেই সংখ্যা সরকারের খাতাতেও নেই। শুধু এদের পরিবারের মনে থাকে। গ্রামে গিয়ে কী বিচার করব, কোন্ জিনিস অনুসন্ধান করব, এসব গ্রামে কিছুই নেই । নলকূপে নেই শুদ্ধ জল। এসব চাকরি আর ভালো লাগে না।

এবার তবে রমলার কথা

লজ্জা বাদ দিয়েই বলি, যখন শুনতে চাইছো দাদা, মেয়েদের মাসিক হলে যে ভাবে ন্যাকড়া বাঁধে, সেই রকম ন্যাকড়ায় আমরা ব্যাগ তৈরি করি। ব্যাগে তিনটে পকেট, প্রথম পকেটে থাকে তিন ভরি সোনা, পরেরটায় থাকে এক ভরি সোনা, শেষের পকেটে থাকে আবার তিন ভরি সোনা, এগুলো বিস্কুট। সেই ব্যাগে এগুলো ভরে এর মধ্যে ন্যাকড়ার কুচি ভরে দিয়ে তারপর সেলাই করে নেওয়া হয়। আমরা তা বাঁধি মাসিকের ন্যাকড়ার মতো। ওরা সব রাস্তা পরিষ্কার করে রাখে, আমি প্রথমে যেতাম এখান থেকে ট্রেনে চেপে তিন স্টেশন দূরে। জায়গা চেনানো থাকত ওখানে দিয়ে আসতাম। একবার করলে পঞ্চাশ টাকা; দিনে তিন থেকে চারবার এটা করতাম, ট্রেন বেশি থাকে না, তাই কাজ কম হয় আর কাজ রোজ পাওয়াও যায় না। বলবে প্রথমদিনের কথা বলতে, কী ভাবে এলাম। তুমি তো জানো সব। ওই যে জমিটা দেখতে পাচ্ছ বেড়া দিয়ে ঘেরা তিন বিঘে, ওটা ছিল আমাদের। বাবা আমারই বিয়ে দিতে ওটা বেচে দেয়। ওর থেকে আধ মাইলের মতো গেলে বর্ডার পাবে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে এক সেপাই। জমি বেচে দিয়ে বিয়ে হল, স্বামী কাজ করত গ্রামে, টিউকল বসানোর কাজ। তখন তো তুমি আমাদের বাড়িতে যেতে জামাইবাবুর সঙ্গে। বাড়িও তুলেছিলাম ব্রিজের তলায়, ওখানে জলা জমি ছিল, হাঁস পুষেছিলাম। ডিম বিক্রি করতাম আমি, ও টিউকল বসাত, ভালোই ছিলাম, সিঁদুরের দাম ছিল। তারপর একদিন শুনলাম---- স্বামীকে কারা খুন করে সেই পুকুরের কাছে ফেলে গেছে, তখন ছেলে দুটো বড়ো হয়ে গেছে, স্বামী একটু মদও ধরেছিল। দেখতে গেলাম ছেলে দুটোকে নিয়ে। হাঁ করে পড়ে আছে জলা জমির কাছে, যেখানে আমার হাঁসগুলো চরতো সেই জায়গায় রক্ত ছিটিয়ে ও শুয়ে আছে। চিৎকার করে কাঁদব ছেলে দুটো সঙ্গে রয়েছে। বুঝতে পারলাম সব, এবার ফিরে যেতে হবে গ্রামে। গ্রাম কাউকে পূর্ণ থাকতে দেয় না, ভেবেছিলাম ফাঁকি দিয়ে ভালো থাকব তা আর হল না, গ্রাম আমাদের মতো লোককে পূর্ণ থাকতে দেয় না, ডানা কাটা হয়, ডানা কাটা না হলে মহাজনদের চলে না, কিন্তু কোন মহাজনের নাম করব, আমি তখন চিনি না কাউকে। এক পুলিশ এসে বলে, এ তোমার স্বামী? বলি, হ্যাঁ। সন্দেহ হয় কাউকে? বলিল জানি না? কেস হল কিন্তু আসামি ধরা পড়ল না। পরে বুঝেছিলাম আসামি কে, কিন্তু তার নাম বলা যাবে না। কী করব তাই গ্রামে চলে এলাম। বড়দির সংসার চলে না, আমাদেরও খাওয়া হয় না, দিনের পর দিন উপোস দেওয়া যায় না। প্রেমনগরে গেলে কিছু পয়সা পাওয়া যায়, কিন্তু ওখানে শরীর দিতে হয়। প্রেমনগরে চুপি চুপি গিয়েওছিলাম, না ওটা ঠিক বেশ্যাখানা নয়, ওখানে লাইন হয় সেপাইদের সঙ্গে মেয়েদের, তাই ভাব-ভালোবাসা, খানাপিনা এসব চলে, তবে লাইন খোলে। আমি পালিয়ে এসেছিলাম। ওটা একটা ফাঁদ, কেউ পার পায় না, আমিও পেলাম না। ছেলেগুলো খেতে পায় না, শালা জলেও গুগলি থাকে না এখানে, থাকে সোনা পোঁতা, মাঠেও কোনো ছোলা থাকে না, এখানে চাষ করার দিকে কারুর মনই নেই, ফলে চাষ হয় না। এখন বুঝি চাষ করে পোষায় না। তখন একদিন পাড়ার মাসি এল। বলল লাইনে নামতে, তোর বুদ্ধি আছে, তোর শরীর আছে, একাজ ভালো পারবি। সোনা বাঁধা শিখিয়ে দিল। ওর সঙ্গে একদিন বের হয়ে পড়লাম, খুব কেঁদেছিলাম, পরে বুঝেছি এসব কাঁদা - টাদা কোন দাম নেই, স্বামীর মৃত্যুতেও এভাবে কাঁদিনি দাদা, নিজের-নীচে - পড়া - নিজে - দেখার-জন্য- কান্না, এর থেকে মৃত্যুও ছোটো। গ্রামে এলাম ভালো থাকব বলে। ঘরের বউরা যে ভাবে বাঁচে সে ভাবে স্বপ্ন দেখা, এছাড়া অন্য কিছু ছিল না। সেদিন বুঝিনি, গরিব মানুষদের কোনো ইচ্ছে থাকতে নেই। অনেক ঘাটে জল খেলাম, এখন আমি সেয়ানা একাজে । আজ দেখছ সাধারণ পোষাকে, কিন্তু যখন বাইরে কাজে যাই তখন একটা কাপড় আছে, দামি সিল্কের, মালিক দিয়েছে। তোমরা এমন না এই পুরুষগুলো, মালিকের তিনটে বউ জানো। তাতেও তার হয় না। তিন মাস মাসির সঙ্গে কাজ হয়ে যাওয়ার পর মালিক বলল, চল কলকাতা পর্যন্ত কাজ করা শিখিয়ে দিই। মালিক থাকবে সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু চেনা দেবে না, পাখি পড়ানোরমত এসব শিখিয়েছিল, ধরা পড়বি না আর বলেছিল, সত্যি কথা বলছি যদি শরীর দিয়েও ছেড়ে দেয় তাই করবি আর কখনো মালিকের নাম বলবি না। শিয়ালদায় নেমে সোজা হেঁটে যাব তাকে দেখে দেখে, তারপর মালিক যে গাড়িতে উঠবে, আমিও সেই গাড়িতে উঠব। গাড়িতে উঠলাম দেখলাম ষাঁড়ের মতো একজন বসে আছে, পরে জনেছিলাম সে কত্তাবাবুদের রক্ষাকর্তা। গাড়ি গেল মোল্লাদের পাড়ায়। ওরা মদ নিয়ে বসল। মালিক চোখ টিপে বলেছিল কাছে আসতে। লজ্জা করেছিল, তারপর কেমন একটা জেদ চাপে না, যা হতে চাইনি, তাই হতে হবে --- মেয়েরা সব বোঝে --- এ মা ভাত পড়ে যাচ্ছে, দাঁড়াও রান্না সারি তারপর কথা হবে --- মুরগি মারব? আমার আজ শনিপুজো, নিরামিষ, উপোসও করি বড়ো ছেলেটার জন্য, সোনার কাজ করবে বলে একজন তাকে নিয়ে গেল গুজরাটে। এক বছর হয়ে গেল, এখনো তার কোন খবর নেই। ভাবলাম এখানে থাকলে আমার মতো হবে, না হয় মস্তান হবে তাই দূরে পাঠিয়ে দিলাম -- জানো দাদা, এখানকার ছেলেরা বেশি

দন বাঁচে না, খুন হয়ে যায়, না হলে সেপাইয়ের হাতে মরে, কেন মরে জানো? আমি অনেক ভেবেছি কিন্তু কোনো উত্তর খুঁজে পাহ
নি। তুমি চান করে নাও, চলো জল টিপে দিচ্ছি।

কিছু ভাবনা

ক্রিমিনাল কথাটা ইংরাজি অভিধানে খুবই প্রাচীন, ১৩৮৯ সাল থেকে চালু। ইংল্যান্ডের শহরগুলিতে তখন দারুণ প্লেগ দেখা দেয়, বিশেষ করে শ্রমিকপ্রধান অঞ্চলগুলিতে। ডিনার গ্রহণ করে সাহেবরা আর উঠতে পারল না ভেদবমিতে মৃত্যু, বল নাচে কোমর দে লাতে গিয়ে পুরোপুরি পারে না সাহেব মেমেরা, অনেকেই ভেদবমিতে শেষ, হাস্যকৌতুক নৃত্যে নাচ শেষ করতে পারত না কোনো সাহেব অভিনেতা তার আগেই ভেদবমিতে শেষ, এটা ছিল অভিজাত অঞ্চলে, আর শ্রমিকপ্রধান অঞ্চলগুলিতে অবস্থা ছিল আরও কঠিন, কাজ করতে করতে দলবদ্ধভাবে শ্রমিকরা ভেদবমিতে শেষ হয়ে যেত --- শেষ হয়ে গেল অর্ধেকের বেশি শ্রমিক, তারপর ত ারা ভয় পেয়ে পুনরায় জমিতে ফিরতে চাইল, চাষের কাজে নিযুক্ত হতে চাইল, কিন্তু চাইলেই তো পারা যায় না ---- ওরা তখন য াবার জন্যে দলবদ্ধ হয়ে কাজের জায়গা থেকে দূরে সরে যেত, কাজ করতে অনিচ্ছুক । তখন তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল ক্রিমিনা ল, তখন চালু হল একটা প্রবাদ unemployed person of sound mind & body Was made of
crime তারপর এই শব্দের অর্থের দ্বার খুলল, আরো অনেক পরে সেই এল পুলিশ শব্দটি। ষোড়শ শতকে অর্থের জোয়ার আসে ইংল্যান্ডে লুটের পয়সায় ভিন্ন দেশ থেকে আসে কাঁচা মাল --- একে বলা হয় আধুনিক সভ্যতার সূচনা, এই সভ্যতা শব্দের নীচে কালো মেঘের মতো অন্ধকার দিয়ে একটা শব্দ তৈরি হল, তা হল পুলিশ। ধনীর সম্পদ যেমন বাড়তে লাগল, তেমনি বাড়তে লাগ ল ওদের ভিতর লোভ, এই লোভকে সুরক্ষিত করল পুলিশ বাহিনী। ফলে উন্নত ব্যবস্থাপনায় এল ক্রিমিনাল শব্দের ভিন্নতর অর্থ Clear the street of suspicious and undesirable
person। কিন্তু এখন সমাজবিজ্ঞনীরা বিষটিকে নিয়ে নানাভাবে ভাবছেন। ১৯৬৫ সালে আমেরিকার শহরগুলিতে সমীক্ষা চালিে য় পাওয়া গেছে খুন এবং ধর্ষণ করার একটা হিসাব -----
খুন ধর্ষণ

গোটা আমেরিকাতে ৫.১ ১১.৬

১. উচ্চ আয়যুক্ত শহর ৫.৪ ১৩.৭
২. মধ্য আয়যুক্ত শহর ৩.৫ ৫.৪
৩. অনুন্নত অঞ্চল ৫.১ ৮.৩

উচ্চ আয়যুক্ত অঞ্চলগুলিতে গড় খুনের থেকে খুন হয় বেশি এবং ধর্ষণও হয় বেশি। মধ্য অঞ্চলগুলিতে খুন গড় ধর্ষণের চেয়ে কম কিন্তু একদম নিম্ন আয়যুক্ত অঞ্চলগুলিতে খুন গড় খুনের সমান এবং ধর্ষণ গড় ধর্ষণের চেয়ে কম।

মোটামুটি যে কোনো দেশের চেহারার সঙ্গে এটি মিলে যায়, মাঝারি আয়ের লোকেরা অর্থাৎ মধ্যপন্থা নিয়ে থাকা লোকেরা সবি কছু একটা সীমার মধ্যে রাখে। কিন্তু বিষয়টিকে যদি মনস্তত্ত্ব ও ক্রাইম অর্থাৎ সমাজচিন্তার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে ভাবি তবে চেহারা ে বশ অন্যরকম। যেমন ধনী দেশগুলিতে ক্রাইম -- এর মধ্যে পড়ে Rape, Abortion, Homeosexuality, Drug addiction, Killing, Theft (Motor car, Motor cycle).
Abortion কেমন করে এই প্রশ্নের সমীক্ষার তখন দেখা গিয়েছিল। মহিলারা ভাবতেন এটা হয়েছে ধর্ষণজনিত কারণে। ঘৃণায় এট া ঘটানো হত। ক্রাইমের সঙ্গে সমাজতত্ত্ব যোগ করলেই বিষয়ের চেহারা আলাদা হয়ে যায় তাই পরে Abortion বৈধ হয়। এসব সাধারণ ঘটনা, কিন্তু এর সঙ্গে আধুনিক যুগের আরো নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হয়েছে ---- গা ঘিন ঘিন করা ঘটনা --- এটা ঘটে আ মাদের দেশে, চোখ বুজে মেনেও নিই এবং ক্রমশ তা বাড়ছে --- নারী বিক্রি, বিশেষত সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে। বর্ডার আজ ক্রা ইমগুলোকে একটা বিধিবদ্ধ ব্যবস্থাপনার ভিতর এনে দিয়েছে, তার বিবরণ পরে ভাবা যাবে। আগে স্নান সারতে সারতে কিছু কথা শোনা যাক।

আবার রমলার অরমণীয় কথা
মালিক আমাদের চেনাজানা। ওর পাকা বাড়ি আছে। বাড়িতে টিভি আছে। জানো, আর আছে ওর তিনটে বউ, একটা এখানে থাে ক, একটা তোমাদের ওদিকে থাকে আর একটা কলকাতায়। মালিক সব খুলে বলে, আর বলে, দেখ, টাকা যেমন আছে তার খরচা

ও আছে, এই তিনটে বউ পোষা, এছাড়াও ওর জন্যে আমাদের থাকতে হয়। ভাব ভালোবাসা হয়ে গেছে, এক ঘরে কখনো কখনো থাকতে হয়, অত ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলা যায় না। আমি ভাবি অন্য কথা, পরে জেনেছিলাম আমি ছিলাম দেখতে ভালো -- ভেজা হাঁসের মতো। তাই আমার স্বামীকে খুন হতেই হবে, এটা বুঝতে বেশ সময় লেগেছে। ওকে না মারলে আমাকে পাবে না এ লাইনে, কঁাটাতার আছে অথচ চোরাচালান নেই যেমন হয় না, তেমনি সক্ষম স্বামী আছে, ভাব ভালোবাসার লোক আছে আবার সে -এ কাজ করবে তাও হয় না, তাই তাকে খুন হতে হল। ভাবলে কষ্ট হয় কিন্তু এসব জেনেই বা কী লাভ --- বলা যায় এসব বুঝছি অভিজ্ঞতা থেকে। আমার বাঁচার কোনো পথ নেই, বাঁচতে গেলে প্রেমনগরে যেতেই হবে আর সেই সমস্ত কাজ করতেই হবে।

তোমাকে প্রেমনগরের কথা বলা হয়নি এটা জানা দরকার। সেপাইগুলোর জন্যই এই ব্যবস্থা। এখন রেল গাড়িতে মাল যায় । এদিকে বর্ডারে এসে গাড়ি দাঁড়ায়, সব তেরটেক হয়। তারপর গাড়ি ছাড়ে কিন্তু কিছুটা গিয়ে থেমে যাবে --- ওখানে এবার অন্য কাজ, সব ছেলেমেয়েরা চাল, চিনি, কেরোসিন, তেল, নিয়ে যেতে হবে একমনি বস্তাগুলো, রেললাইনের দুধারে টিনগুলো দাদা পচে গেছে, এমন নরম কতজন পড়ে যায়, হাতও ভাঙে। কি এসে যায় এতে কার! গাড়ি তো ওখানে দাঁড়ানোর কথা নয়, দাঁড়ায় আমাদের জন্যে। এবার গাড়ির তলায় তলায় মালগুলো ভরা হয়, ভরা শেষ হলে গার্ডবাবু বাঁশি বাজাবে। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দুই সীমানাব . মাঝে। এদেশের সেপাই আছে আবার ওদেশের সেপাইও আছে --- ওদের সাহায্য নিতে হয়। একটু এদিক ওদিক হলেই গুলি, ওখানে খুন হয়ে যাবার মানে বেবাক কেউ দায়িত্ব নেয় না। নালায় পচে মরে, তাই প্রেমনগরে যাবার দরকার হয়। যাতে গুলি না চল তার জন্যই এই প্রেমনগর তৈরি হয়েছে। ওখানে আমাকেও যেতে হয়, স্পেশাল সেপাই এলে ওদের খাতির করতে হয়। ওদের খাতির কি নিশ্চয় জানতে ইচ্ছা করছে। এই আমরা সেজেগুজে ভালোবেসে গেলাম, ওরাও এল, মদ মাংস এল, এটা মালিক ব্যবস্থা করে, বেশ্যারাও থাকে ওখানে কিন্তু ওদের থেকে আমাদেরই কাজটা হয় বেশি, ভাব ভালোবাসার করার দরকার হয় --- তবুও দাদা সাবধানের মার মেই, তাই যখন কাজে যাই তখন আমাদের শাড়ি পরার কায়দা কিন্তু আলাদা --- আধখানা কাপড় জুড়ে বাঁধা থাকে জিনিসপত্র, আর বাকি আধখানা কাপড় পরনে থাকে, কিন্তু পরা হয় বিশেষ কায়দায়। যেমন এ কাপড়ের যে কোনো দিক ধরে টানলেই ফস করে কাপড়টা খুলে যাবে, উলঙ্গকালী তখন আমরা, সেপাইগুলো সেই কালীরূপে গুলিতে নিশানা হারিয়ে ফেলে , তাই বেঁচেও যাই এই কাপড়ের জন্যে, এটা পরা শিখতে হয়। অন্ধকার --- তোমাদের মতো আলো জ্বলা শহর নয় এটা। বিকেলের দিকেই বসে এই আসর। ভালো থাকব আর স্বামী নেব না এই ভেবে গ্রামে এলাম, আজ কত স্বামীকে নিতে হয়। জানতে চাইবে কী ভাবি তখন, ভাবি না কিছুই, ভাবি এটাই আমার এখনকার কাজ। তাই ভালো করে কাজটা করার চেষ্টা করি। এবার শোনো সে মোল্লাদের কথা, আমি কিছুতেই সেই মোল্লাদের কাছে থাকব না, কিন্তু মালিক বোঝায় তুই না থাকলে টাকা পুরো পাওয়া যাবে না, আমি আছি পাশের ঘরে। কোনো চিন্তা নেই থেকে গেলাম ওদের কাজ করেও টাকা পাওয়া যায় না, তাই মালিকের এই ছল ছিল। আর কী শুনবে, হ্যাঁ কোথায় কোথায় যাই, সে সব খেতে খেতে কথা হবে। তোমার পিঠটা মুছিয়ে দেব, কতদিন পরে এলে দাদা তুমি। দাদা আমি মাল বওয়ার কাজ খুব কম করেছি, আবার ও কাজ না করলেও মালিক বড়ো কাজ দেবে না।

ভাবনা

চোরাই মাল নিয়ে যায়, ঠিক জায়গায় দিয়ে আসে, পয়সা বুঝে নেয় ট্রেনে বাসে চড়ে, কত ধরনের লোক থাকে, কেউ এর মধ্যে থেকে লাভ তোলার চেষ্টা করে, এদের কত চতুর হতে হয়, তীক্ষ্ণ সজাগ থাকতে হয়। জটিল এদের মন --- স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া উচিত সকলের, কিন্তু 'দাদা তুমি এলে' --- এই শব্দে যে আন্তরিকতা আছে তার তুলনা চলে শরৎকালের সঙ্গে, তার তুলনা চলে ধানের পবিত্র গন্ধের সঙ্গে। আমি এখন তার দাদা --- এই ঘটনা আমাকে অন্য এক ঘটনার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। মনে পড়ে যায় দু বছর আগে কোচবিহার থেকে বাসে করে ফিরে আসছিলাম, হঠাৎ দেখি বাসে উঠলোএক মহিলা, বয়স ত্রিশের নীচে, এসে বসল ড্রাইভারের পাশে। বাসে যেন গন্ধ, আমার পাশে বসা লোকটা কেমন নড়েচড়ে উঠল। মেয়েটি চোখের ভাষায় তাকে কাছে ডেকে নিল, আমি তারপর একা। যা দেখলাম তা বর্ণনা করা এখন ঠিক হবে না, ইঙ্গিতে বুঝে নেওয়া যেতে পারে, মেয়েটির উধর্বাঙ্গে হাত উঠে গেল সেই লোকটির, এতে কোনো আড়াল নেই। ঘন্টা দেড়েক পরে, লোকটা নেমে গেল এবার তাকে আমি ডাকলাম, আমার পাশে বসতে। বসল --- অনেক কথা জানার পর ওর মুখ থেকে একই ধরনের 'দাদা' শব্দ শুনলাম।

অচেনা কথা চেনা চেহারায়

দাদা আমি পাচারকারি, একটু আগে যে আমার কাছে বলেছিল সে পুলিশের লোক, আমাকে বুঝে গিয়েছিল, ধরে পুরে দিত কয়েদ খানায়, তিন মাস জেল হতই। আমার কাছে আছে জাপানি সেলপোন (তখনও এদেশে তো আসেনি)। কোমরে হাত দাও বুঝতে পারবে। আর ব্লাউজের মধ্যে আছে নানান পার্টস আমিও ঠিক জানি না, আমি শুধু পৌঁছনোর জন্য পাব দুশো টাকা, মোট হবে পাঁচশ টাকা। মাসে তিনবার কাজ পাই। বেশি এলে ধরা পড়ে যাব। বাড়ি কোথায় নাইবা জানলে। অসুস্থ স্বামী, না এসব বলে দয়া চাই না, কিছুই চাই না শুধু দুটো খেতে চাই তার জন্য এই কাজ। একটা ছেলে আর মেয়ে আছে, তারা পড়াশোনা করে --- যদি পড়ে

ত পারে তাই ছুটে আসি এই কাজে। ভয় আছে, ঝুঁকি আছে, আবার বাড়তি টাকাও আছে। কিন্তু কার মাল কোথায় যাবে এইসব ি জজ্ঞসা করবে না দাদা, আমি সত্যি জানি না। তোমরা বলো অন্ধকারের জগৎ আমিও সেই অন্ধকারে থাকি, জানার ইচ্ছাও করে ন া --- আলোটা কোথায়? আর পথে এই ভাবে আচরণ করলে বেশ্যা ছাড়া অন্য কিছু ভাবে না কেউ, এতে আমাদের লাভ, তাই এ ই আচরণ করি। কী ভাবে নামলাম, ফাঁদ পাতা থাকে, জড়িয়ে গেলাম, আর, আর কিছু জানতে চেয়ো না। দাদা তোমার বাড়ি আি ম জানি। তোমাদের বাড়ির থেকে কিছুটা দূরে দেখবে সবাই রূপোর গহনা পরে, এতো রূপো আসে কোথা থেকে আর যায় কোথ ায়? জানো আমি কিছুদিন এ কাজও করেছিলাম। কত গহনা পরতাম সারা শরীরে, বগলের নীচেও গহনার পুঁটলি বাঁধা থাকত। ে কন করি --- অভাব বললে সবটা বলা হবে না, ফাঁদ আছে জড়িয়ে যাই। আর কোনো পথ খোলা নেই। এই ভাবেই একদিন মরে যাব। মালিক বলেছে বেশী টাকা দেবে ছোটো দামি মেশিন যদি এবার নিয়ে, ও সব ব্যবস্থা করে রাখ্যব, আমি শুধু নিয়ে আসব --- জানো পিস্তল --- কী করি দাদা বল তো।

জগার কথা

দাদা প্রায় চার বছর পর তোমার সঙ্গে দেখা। এখন আমি পঙ্গু। পা-টা ভাল হল না। চল্লিশ হাজার টাকা পেলাম না, পা-ও ভাল হ ল না। আগে একশো কেজি চালের বস্তা তিনটে বাঁশি বাজলেই সাইকেল ছুটিয়ে এদেশ থেকে ওদেশে নিয়ে যেতাম। একবার পেত াম তিরিশ টাকা, দিনে দশবার করতাম। সেই টাকায় জুয়ো খেলতাম, মদ খেতাম, প্রেমনগর গিয়ে খরচ করতাম। তারপর ধরলাম মেশিন আনা, ওপারে চাল দিতে যেতাম আর নিয়ে আসতাম। পিস্তল কিন্তু পিস্তল। যতই ভাব ভালোবাসা থাকুক, আনা সহজ ছিল না। প্যান্টের ভিতর কত পকেট থাকত, চারটে করে নিয়ে আসতাম। আরও পয়সা এল। এসব কাজ তো রাতের বেলা, দিনে ছুটি -- তাই সারা দিন জুয়ো খেলতাম, আর মাঠে কাজ করলে সারা দিনে পাব তিরিশ টাকা, এতো পরিশ্রম সয় না --- দাদা তুমি আজ হঠাৎ ---- অসুখের খবর নিতে এসেছো? দাদা তুমি স্কান করে দিলে, মাথায় আমার হাড় ঢুকে বসে আছে, যেমন এখন আমি আর কাজ পারি না, বাইরে বসে থাকি, দেখনা হাত পা আরো বেঁকে গেছে, মাথা ঘোরে , চোখে অন্ধকার। আমি বাইরে আর আমার ব উ অনেক সময় সেপাই নিয়ে ঘরের ভিতর থাকে --- ও এখন ব্যবসা করে। আমি করি না -- যখন সেপাই ঢোকে, আমি জঙ্গলে গি য়ে গাছ কাটি, রাগ হয়, কষ্ট হয়, হাত পা আরো বেঁকে যায় --- কাকে বলব এসব কথা? ভালো করে চলতে পারি না এই রোগের জন্যে, না দাদা ঠিক বলছি আমি জানি বউয়ের সঙ্গে ব্যবসার জন্যে অন্য লোক ঢুকলে আমাকে বাইরে থাকতে হবে --- এছাড়া প থ নেই, মাইরি বলছি, মদ না হলে তখন চলে না। এই মদ খেলে মাথার ভিতর যন্ত্রণা করে, যেন ঝড় ওঠে, ঝড়ের মতো শব্দও হয়। তখন ঠিক থাকতে পারি না। একটা দাপাদাপির ভিতর না থাকলে যন্ত্রণা কমে না। আগে কত চল্লিশ হাজার টাকা আমার কোমরে গোঁজা থাকত, শালা জুয়ো, আর মেয়ে মানুষ। দাদা এই জায়গাটা অদ্ভুত না, তোমাদের সঙ্গে ঠিক মেলে না, অথচ তুমি তো আমা র বন্ধু বোসো, আসন পেতে দিই। বউ কাজে গেছে, এসে পড়বে। তোমায় দেখলে ওর খুব ভালো লাগবে। শালা ওর বড়ো ছাগল টা আজ আমি বেচে দিয়েছি, ভালো দাম পেলাম না--- মদ খেলাম, তুমি কিছু খেয়েছ তো? আমার ঘরে আজ ভাত নেই।

জগার না জানার হিসেবের কথা

রাতের অন্ধকারে জগা চারটে পিস্তল নিয়ে এ পারে আসতেই, সীমান্তের কাছে যে খাল মতো আছে, ওখানে তিচনজন এগিয়ে এসে ওর মাথায় হেঁসো দিয়ে কোপ মেরেছিল। মাথার ভিতর জ্বলতে থাকা কাঠ যেন ঢুকে গিয়েছিল, ও পড়ে যায় খালের ভিতর, ওর পাকেট থেকে তিনটে পিস্তল নিয়ে অন্যরা ভেগে যায়। ওর পা ওর শরীর ডুবে থাকে জলের ভিতর, মাথা থাকে জলের উপর। সক ালে ওর দুজন বন্ধু এটা দেখে ভাবে মরে গেছে। বাড়িতে এসে খবর দেয়। খবর পেয়ে গ্রামের লোক ছোটে, না মরে যায়নি। হাসপ াতালে আনা হয়। ওর এক অঙ্গ বেঁকে যায়। পা একটা বেঁকে যায়, হাতও একটা বেঁকে যায়, মুখটাও বাঁকা। হাসপাতালে চিকিৎসা নেই। পুলিস কেস হয় কিন্তু আসামি থাকে না এ হত্যা প্রচেষ্টায়। পরে অন্য বাইরের ডাক্তার দেখানো হয়। বলে স্কান করতে হবে মাথায়, তখন শহরগুলোতে এতো স্কান করার যন্ত্র ছিল না, দমদম থেকে স্কান করে দেখা যায় ওরই খুলির টুকরো অংশ ওর ব্রেনে র ভিতর ট্রাফিক পুলিশের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার নির্লিপ্ত মুখে বলেছিলেন এর অপোরেশন প্রয়োজন, তার জন্য লাগবে চি ল্লিশ হাজার টাকা। এর মাথা কপাল থেকে খুলে নিয়ে তারপর ব্রেনের ভিতর কতটা ঢুকে গেছে সেই হাড়, তা বুঝে তা বার করতে হবে --- কঠিন চিকিৎসা।

খুলির টুকরো কতটা পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত

সার্কাসের হাতি দুলকি চালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বর্ডার পেরিয়ে চলে যায় বাংলাদেশে, ওদেশের সার্কাসে এখনো জীবজন্তুর খেলা নি ষিদ্ধ হয়নি। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হত্যা করে তার সমস্ত দেহাংশ বাংলাদেশে চলে যায়। বর্ডার আছে ৮,০৯৬ কিলোমিটার, তার মধ্যে অর্ধেক অসংরক্ষিত। এই অসংরক্ষিত অংশ কখনো নিষিদ্ধ কাজে ব্যবহার হয় না, সংরক্ষিত অংশগুলোই নিষিদ্ধ কাজের আখ ড়া। নেপালের অগণন কন্যা যাদের বয়স দশ থেকে চৌদ্দ-এর মধ্যে তারা বর্ডার পেরিয়ে বোম্বে এসে বেশ্যা হয়। ওরা কোন দে

শর সে প্রশ্নই ওঠে না। বাংলাদেশের চিনির কারখানা বন্যায় ধবংস হয়ে যায়, চিনি নেই লবণ নেই ওদেশে, এদেশে এর জন্যে লব ণের যেমন অবৈধ কল আছে, সেইরকম চিনিরও অবৈধ কাল আছে, সেই কল থেকে চিনি ও লবণ প্রত্যহ যায়। এই জন্যে সীমান্তব র্তী শহরগুলো সম্পূর্ণ অন্য চেহারায় তৈরি --- সামনে দেখা যাবে দোকানঘরগুলো ছোটো, কিন্তু ভিতরে ঢুকলে দেখা যাবে সরু ফ ালি পথ পেরুলেই মোটা হয়ে যেন অজগরের পেটে ছাগল, সেই আকৃতিতে বেড়ে গেছে --- ওখানে জিনিসে বোঝাই। সীমান্ত ছাড়িয়ে এই শহরগুলিতে দুনম্বরি কাজ করা হয়, এর জন্য নিযুক্ত বহু ব্যবসায়ী, এই কাজে সাহায্য করে বেকার যুবকেরা দু'নম্বরি ব্য বসায় মানুষের বৈভব --- এরা ধরা পড়ে না। এর থেকেই বোঝা যায় এদেশের সমাজ পদ্ধতির ভিতর এই ধরনের কাজের শিকড় কতটা বিস্তৃত। এই ব্যবসায় নিযুক্ত থাকে বহু মস্তান। কাঁটাতারের বেড়া কত হাজার মস্তান তৈরি করে সেন্সাস রিপোর্টে কোনদিন পাওয়া যাবে না। আর কোনো দিন পাওয়া যাবে না এই তথ্য যে প্রত্যহ চারশো কোটি টাকার মাল এদেশ থেকে ওদেশে যায়। সে ন্সাসে পাওয়া যায় --- এখানে বাস করে মাত্র দু কোটি লোক ! ভিন্ন রিপোর্ট বলে দু কোটি নয় কুড়ি কোটি লোক বাস করে ---- এদের মধ্যে কমবেশি সবাই এই কাজের ভিতর, এই পদ্ধতির ভিতর জগার হাড়ের মতো ঢুকে বসে আছে।

বাংলাদেশ থেকে আসে চিনা বন্দুক থেকে আফগানিস্থানের হেরোইন পর্যন্ত । বাংলাদেশ থেকে বহু কন্যা এদেশে বিক্রি হয়ে আসে আর চলে যায় বেশ্যাখানায়। আর চাল? সে এক অদ্ভুত কৌশল। ভারতে দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে প্রায় শতকরা চল্লিশজন, ও দের সপ্তাহে কুড়ি কেজি চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তিন টাকা কেজি। কিন্তু ওদের টাকা নেই এক সঙ্গে কুড়ি কেজি চাল ে কনার, ফলে দরিদ্র মানুষেরা রেশন দোকান থেকে চাল নেয় না, চালের বদলে তারা পায় চল্লিশ টাকা, আর সেই চাল যায় বাংলাে দেশে, দাম দশ টাকা কেজি, সরকারি যে চাল আমদানি করে বাংলাদেশ তার চেয়ে কেজিতে দু টাকা কম। গরিবদের চাল এই ভাবে চলে যায় বাংলাদেশে। এর জন্যে বাংলাদেশে আর্থিক মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এক শতাংশ। অথচ নির্ভর করে পুরোপুরি এই অবৈধ লেনদে নের উপর। এ কথা জগার জানা নেই। জগা একটা অবস্থার শিকার, ওদের খুন হতে থাকার ভেতর একটা পরিকল্পনা থাকে সেটা ও জানে না। জগার মত যুবকেরা খুন হলে কিম্বা অর্ধ খুন না হয়ে থাকলে ওদের বউরা এই কাজে আসবে না। এই জন্যই খুন হয়ে ছিল রমলার স্বামী। এ লাইনে পুরুষের থেকে মেয়েদের কদর বেশি এবং ওরা দক্ষ হয় এই কাজে।

বাবলুর সাক্ষ্য

বহরমপুরের একদল যুবক তারা সোনার আড়তদার, অবশ্যই সোনার বিস্কুট কিন্তু বিক্রি করতে হবে। ওরা কেনে কিন্তু মাত্র দেড় হ াজার টাকায়,বাজার দর এদেশে পাঁচ হাজার পাঁচশ টাকা, ওরা বিক্রি করে দুহাজার পাঁচশ টাকায়, সরকারি রেটের অর্ধেক দামে। ওরা কাজে বহু লোককে নিযুক্ত করে, বাবলু ওদের একজন যুবককে দিয়েছিল। সে পাঁচ ভরি সোনা নিয়ে এসে ওদের পয়সা ফে রত না দিয়ে বোম্বে ঘুরে আসে। অবশেষে তাকে ধরা হয় এবং বহরমপুরে তুলে নিয়ে গিয়ে অর্ধমৃত করে রাখা হয়। যুবক নিযুক্ত করলে এই ধরনের ঘটনা ঘটে বেশী। কিন্তু মেয়েরা বিশ্বাসী, তারা পালায় না তাদের শরীর এ কাজে হেল্পফুল। খুন হওয়া, খুন কর ান এই ব্যবসার একটা অঙ্গ। জগা তার উদাহরণ মাত্র। সামাজিক পদ্ধতির মধ্যে ঢুকে গেছে এই ব্যবসা।

বুদ্ধিজীবী ফেরিওয়ালা

এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে প্রায় দু'কোটি কিম্বা তার অধিক লোক বাস করে। অধিকাংশ লোক গরিব, তাদের মধ্যে বেশ কিছু কৃষিজীবী বাকি সবাই এ কাজে যুক্ত, আর কিছু আছে আমাদের মতো লোক। আমরা সীমান্ত পর্যন্ত যাই না, আমরা মাল সংগ্রহ ক রে এনে সীমানা পর্যন্ত পাঠাই, মহাজন থেকে মহাজনের মাঝে থাকি আমরা। যেমন আম পাঠাতে হবে, তাই মহাজন কিছু টাকা দি ল, আমরা মালদহের চারটা আমের বাগান ছয় লক্ষ টাকায় কিনে নিলাম, পরে আম হলে বারো লক্ষ টাকায় সেটা মহাজনের হা ত গিয়ে পড়ল, মাঝে থাকে বহু ক্যারিয়ার, এই মাল তারা ট্রেন পথে নৌকা পথে সীমান্তে মহাজনের কাছে পৌঁছে দেয়, আমি থাকি দায়িত্বে, আমি শুধু পুলিশের কাছে বন্দোবস্ত করি। ভারতে পারেন বাংলাদেশের টাকায় এদেশে আমের চাষ হয়, এমন কি সবজির চাষ পর্যন্ত ওদেশের টাকায় হয়। এবারই তো বার বিঘা জমিতে টমেটো লাগানো হয়েছিল, টাকা এসেছে ওপার থেকে, ওপারে ট মেটো পাওয়া যায় না অথচ তা ওদেশে বড়োলোকদের বিশেষ খাদ্য, তাই টমেটো পাঠাতেই হবে, ওদেশের চোরাই টাকা শুধু জমি তে কেন এই এদেশে যত পুজো হয় তাতেও লাগে --- সীমান্তে কোনো সাম্প্রদায়িকতা নেই। ওদের ঈদে শুধু আমরা ভাল খাদ্যদ্রব ্য পাঠাই না, ঈদের জন্য টাকাও দান করি, আর ওরা এদেশের পুজোগুলোতেও চাঁদা দেয় --- মাঝখান থেকে অতিরিক্ত লাভের জ ন্য। কিছু টমেটো নাসিক পাঠিয়ে দিলাম, ওরা দিল আপেল, আঙুর, সেগুলো চলে গেল বাংলাদেশে---- ওদেশের বড়োলোকেরা এগুলো দারুণ পছন্দ করে। এ কাজে ঝুঁকিও আছে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে নেই, কেন না আমার দু'জন আত্মীয় পুলিশের বড়োবাবু, ফ লে রেল আমার কাছে স্বাধীন যান, রাস্তাগুলো আমার কাছে স্বাধীন রাস্তা, ফলে মাল আনা নেওয়া করতে আমাকে খুব বেশি ঘুষ ি দতে হয় না। লাভটা বেশিই থাকে --- যেমন দাদন দেওয়া থাকে বলে টমেটো পাই আমি চার টাকা কেজি, নাসিক থেকে টমেটো ি বক্রির টাকায় আসে আঙুর, তা তিনগুণ টাকায় বাংলাদেশে বিক্রি হয়। এ কাজে ঝুঁকিও আছে, যতই পুলিশ আমার আত্মীয় থাকুক

, ঝামেলাও আছে --- এই দেখুন না সেদিন মাল আনতে গিয়ে, কতগুলো ছেঁড়া থাকে এই কাজ করার জন্যে, মাল বয়ে আনছিল ি ব্রজের উপর দিয়ে, তক্তা ছিল নরম, তা ভেঙে পড়ে যায়, নীচে ছিল রেলের লোহার রেলিং, তাতে গিঁথে যায় তার তলপেট ---- সংবাদটা শুনলাম কিন্তু দৌড়ে ছুটে যেতে পারলাম না, ট্রেন ছাড়বে মাল তুলে দিতেই হবে, তাই মাল তুলে দিয়েই ছুটে গেলাম ---- না মরেনি!!! এরা মরে না। চিকিৎসা করতে হাজার পঞ্চাশেক টাকা খরচ করলাম, এইসব ঝক্কি ঝামেলা নিয়েই তবে কাজ। আচ ছা আমাকে দেখে কী মনে হচ্ছে যে আমি তিরিশ লক্ষ টাকা মূলধনের কাজ করি --- না মনে হচ্ছে না নিশ্চয়, কেননা আমাকে সর্ব দা ফেরিওয়ালার পোষাক পরতে হয়, ছেড়া জামা, না - ইস্ত্রি করা প্যান্ট --- এবং সামাজিক সম্মানও ঠিক মতো নেই। এর কোনো সহজ রাস্তাও নেই, ছোটোবেলায় লালগোলা থেকে সোনা আনতাম পকেটে করে, দেখলাম ও কাজে ঝামেলা আরো বেশি। তাই ওদেশের দাদনের টাকায় ওদেশে চাষ করে মাল পাঠানো অনেক সহজ --- ওছাড়া বাকি কথা আর নাই বা শুনলেন।

অত্যাচারের পদ্ধতি, জগার কথায়

ড্যাম্বেল বলে আমার মতো এক ছোঁড়া ছিল, সে হেরোইন নিয়ে আসত। তাকে একদিন বি এস এফ -এর লোক ধরল। কিন্তু হেরো বেশি না থাকলে কেস জমে না। ও ছাড়া পেল, ছাড়া পাওয়ার পর বাড়ি আসতেই , বড়োবাবু ওকে ডাক করাল। ওর হাতে বেশি হেরোইন ধরিয়ে দিয়ে কেস দেবেই, অবশেষে পায়ে পড়ে ছাড়া পেল। কিন্তু আদেশ দিয়েছিল রোজ তাকে একবার করে বড়োবাবু কে সেলাম দিতে হবে। একদিন কাজের চাপে যেতে পারেনি, পরেরদিন দেরি হয়ে গেল, ওকে সেপাইরা ধরে নিয়ে গেল।

তারপর কী করেছিল জানো, আমরা মদ খাই, বউ পেটাই, বাজে লোক, আমার সামনে বউ লাইন ধরার জন্য সেপাইদের নিয়ে ঘ র ঢোকে, আমি দেখি সহ্য করি, হেঁসোর ধার পরখ করি আর চুপ করে থাকি। ওই শালা বড়ো সাহেব আমাদের থেকে আরো নিচু --- এক বালতি গরম জল নিয়ে তাতে ড্যাম্বেলের মুখ চুবিয়ে দেয়, গরম জল, তাতে নিশ্বাস নিতে পারে না, যখন মরে যাওয়ার ম তো অবস্থা হয় তখন জল থেকে তার মুখ তোলে। এরকম বারকয়েক করে, তারপর ছেড়ে দেয়। এখন তার সারা মুখে ফোস্কা, তার পর ঘা, কে চিকিৎসা করবে? এই অত্যাচার এরা সকলকে করে। অবশ্য বদলা আমরা নিই না তা নয়, কখনো সখনো হয়। এই সে দিন লাইন পরিস্কার বাঁশি বাজল, মাল নিয়ে ছুটছি, আর ছিল এক লরি চিনি, লরিও আটকে দেয় দুই সেপাই, বর্ডারে বেশিক্ষণ দা ড়িয়ে থাকতে নেই। মালিক তাই বন্দুক তুলে নেয় হাতে, গুলি চালিয়ে দেয়। এক সেপাই -- এর হাতে গুলি লাগে, আর তাকে গা ড়িতে তুলে নেয়, তার চিকিৎসা করতে হবে তো, আর অন্যটার রাইফেল কেড়ে নেওয়া হয়েছিল --- পরে তার কী কান্না, রাইফেল নেই তো চাকরি নট্ পরে রাইফেল তাকে ফেরত দেওয়া হয়েছিল --- এই সব এখানে ঘটতেই থাকে।

মরা কোনো ব্যাপার নয়। যদি ধরবে তো যাওয়ার বাঁশি কেন দিলে, তার শাস্তি তো পেতে হবে।

আমার কথা ভাবছ? ভেবে কোনো লাভ নেই, আমি তো একা নই, আমার মতো কতো আছে, আর দুঃখ পাই না। তবে তুমি আন ন্দ পাবে কিনা জানি না, ও দলের একজনকে খতম করে দেওয়া গেছে। অবশ্য বন্ধুরা করেছে, আর বাকি আছে দু'জন, একদিন ঠিক তাদেরও সরিয়ে দেব। দেখতে যাবে বেড়াটা, আমাদের এইরকম রাখার জন্য এই বেড়া। এর বাড়ি এদিক তো জমি বেড়ার ওপা র, চাষ করতে গেলে, গেট পাস নিতে হবে আর বুলেট লাথি খেতে হবে। এই কি জীবন, জমি আমার, দেশ আমার তবুও লাথি, এ ই কি দেশ রক্ষা। দাদা বড়ো কথা হয়ে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতা কথা বলায়, নেশা অনেক কিছু ভাবতে শেখায়। ছাগলটা বিক্রি করে আ জ মদ খেয়েছি, জুয়াও খেলেছি। জিততে পারিনি, জেতা নেই, বউ এসে যাবে। আমি দাদা কাজও পারি না, বউ -- এর পয়সায় খা ই, বাড়ির বড়দা ভিন্ন করে দিল। সেপাই --- এর লাথি খাই, এপারে ওপার দুপারের সেপাই --এর লাথি খাই --- লাথি আলাদা ন য় সবই একই, বোসো ও এসে যাবে ----

সময়ের সঙ্গে চিন্তা

জিরো লাইন, চার হাজার কিলোমিটার এই লাইন চলে গেছে। মানুষকে সুস্থ করেনি এই লাইন, ভালো হতে দেয়নি। মানুষকে চু র করতে শিক্ষা দিয়েছে। মানুষকে লাথি হজম করতে শিক্ষা দিয়েছে, আর মেয়েদের শিক্ষা দিয়েছে তাদের নারীত্ব, লাবণ্য ইত্যাদি ক মূলধন করে সোনার বিস্কুটের কারবার করতে। কীসের সুরক্ষার জন্য এই লাইন? কত টাকা লাগে --- এই টাকা দিয়ে গ্রামীণ প রিকল্পনা করা যেত না? না হবে না ---- চুরি বজায় রাখতে হবে সেই জন্যই এই লাইন। দু'কোটি মানুষ সুস্থ নেই, সেই সংখ্যা আ রো বেড়ে কুড়ি কোটি, তারা সুস্থ নেই। তাদের বিধিবদ্ধভাবে অমানুষ করে দিয়েছে এই জিরো লাইন --- হ্যাঁ সত্যি মনুষ্যত্বকে জি রো করে দেয় এই জিরো লাইন --- কোন্ ঈশ্বরের লাইন কে জানে !

পঞ্চায়েত প্রধান ও আমি

নমস্কার, আপনার কাছে কিছু জানার ছিল। আপনি অতি সজ্জন তাই জিজ্ঞাসা, চাষের কাজে যারা জন দেয় তাদের মজুরি কত এখানে?

তিরিশ চল্লিশ।

কেন এত কম ? সরকারি হিসাব বাষট্টি টাকা।

কাজ কোথায়, কে দেবে? কাজের আগেই টাকা ধার করে বসে থাকে, সুদ দিতে হয় শতকরা দশ ভাগ মাসে। তাই সমিতি গড়ার চেষ্টা করছি। এখান থেকে ঋণ দিয়ে হাঁস মুরগির চাষ করিয়ে মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তুলতে চাই। একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, ছাত্র ভালো, পড়াশুনার চল আছে। বড়ো ইস্কুল আছে ওখানেও ছাত্র অনেক।

বলতে ইচ্ছা হল কোন আয়ের ছাত্ররা ওখানে পড়ে? বলতে পারলাম না, কারণ ভয় আছে, যে কাজ করতে এসেছি, ও খবর পেয়ে গেছে, সেপাই দিয়ে ধরিয়ে দিতে পারে, ওর ঘরেই টিভি আছে, গ্রামে ওরই জমি বেশি তাই ও গরিব জন খাটায় বত্রিশ টাকায় নমস্কার বলে চলে আসতেই দাঁড়াতে হল --- শুনুন, এর হাত কাটা গেল কেন জানেন?

না জানি না।

এখানে ডাকাতি হয় বেশি। গরু চুরি করতে ওদেশ থেকে লোক আসে, যাওয়ার সময় ডাকাতি করে। তাদের বোমাতে এর হাত উড়ে গেছে।

সেপাইরা কী করে?

এত বড়ো এলাকা, সেপাইদের পক্ষে দেখা অসম্ভব।

নমস্কার বলে চলে এলাম। মনে মনে বললাম ---- খবর দেননি তো এখনো? সেপাইরা মানবাধিকার মানে না, ওদের এসব মানতে হয় না। মুখে কথা কম বলে, হাত চলে থাপ্পড় আগে পড়বে, তাতেই আধমরা, তারপর শুনবে কথা।

অফিসার উবাচ
সেপাইরা অত্যাচার করে, আমি মানি,কিন্তু কী করবে বলতে পারেন? দিনে আট ঘন্টার পরিবর্তে চোদ্দ ঘন্টা ডিউটি। মাথায় ছাউনি নেই। রোদ-জল-বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে হাতে বন্দুক নিয়ে। কথা বলার লোক নেই, কোনো আলোচনা নেই। কোথায় পরিবার আর এরা কোথায় পাহারায় --- মেজাজ ঠিক থাকে না, তাই মদ খেতে হয় আর অত্যাচার করে নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে হয়। মেয়েছেলের রোগ, তা একটু থাকে, ওদেরও তো জীবন আছে, ফলে এসব থাকবেই।

ছোট্ট জিজ্ঞাসা
সীমান্ত বনাম সমাজ জিজ্ঞাসা --- মানুষ চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তার কারণ এই বেড়া। অপরাধী হলে তা হবে এই ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় কাঁটাতার বসাতে হচ্ছে, অবিবেচক পদ্ধতিতে সেই হবে অপরাধী। এই ব্যবস্থাকে অন্যভাবে ভাবার দরকার আছে। কুড়ি কোটি মানুষকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে গেলে চোরাচালান বন্ধের চেয়ে জরুরি হল বেড়ার সঠিক নির্ণয়ের ভূমি তৈরি করা। কে দেবে এর উত্তর? সীমান্ত রক্ষার নামে এক দল মানুষকে ভিন্ন জীবনে আনতে বাধ্য করানো --- এটাই পদ্ধতি, এরই নাম সুরক্ষা। মানব সম্পদ সুরক্ষা না করে কাকে সুরক্ষা করা হবে --- অবৈধ লেনদেন করে কে? অবৈধ লেনদেনই এখানে সীমানাকে নির্ণায়ক ভূমিকায় এনেছে, উত্তর দেবার মতো পরিকাঠামোই নেই আমাদের দেশে।

আবার রমলার কথা
ছাগল পুষছি পনেরোটা, ঐ ছোটো ছেলে চরাতে যায়, তার ভেতরে একটা পাঁঠা আছে। আগেই একটা পাঁঠা পুষেছিলাম। বেশ বড়ো হয়েছিল। মানত করেছিলাম, ছেলে ফিরে এলে ঠাকুরকে দেব। লাইন বন্ধ থাকল প্রায় দু'মাস, সবাই ভাবতে পারে লাইনে কা

জ বোধহয় রোজ থাকে। না না রোজ থাকে না। রোজ যদি আমি পাঁচশ টাকা আয় করি, মাসে কত টাকা হয় --- পনেরো হাজার, আমি তখন বড়োলোক --- আর কাজ করব, না না দারুণ হিসাব থাকে এ কাজে, আমি মাসে লাইন থাকলে কাজ করতে পারি দু'হা জার টাকার। তার বেশি হয় না, লাইন থাকলেও হবে না, হতে দেবে না। অভাব না রাখলে কাজ করব কেন? আবার বড়োলোক, রোজ খেতে পারছি এই অবস্থা হলে ওদের সব কথা শুনব কেন? এসব আমি জানি। সেবার দাদা, লাইন বন্ধ, হাতে পয়সা নেই, ক ার কাছে আর ধার করব, মহাজনের কাছে পাঁচশো টাকা পর্যন্ত ধার পাওয়া যায়। বড়ো ছেলে এল না, সেই মানত করা পাঁঠাটা ি বক্রি করে চাল কিনলাম, একমাস মতো চলল। এটাও বড়ো হচ্ছে, লাইন দাদা এখন ঢিমেতালে চলছে, রোজ চলে না, হয়তো এবা রও ছেলে আসবে না, মানত রাখতে পারব না, বিক্রি করে দিতে হবে। জানতে চাই যে এই ছোট ছেলে পড়ে কিনা? না বয়স পনে রো, পড়ে না। ছাগল চরায়। ওর কী হবে? এখানে থাকলে লাইন ছাড়া অন্য পথ নেই। মদ ধরবে, হয়ত 'জগা' হয়ে যাবে। আমি ও র দিকে তাকাই আর ভাবি --- জগা ছাড়া কী হবে?

দাদা ঘেন্না ধরে গেছে এই লাইনের কাজে। কোথাও আয়ার কাজ করে দিতে পারো না, লাইন ছেড়ে দেব, ছেলেটাকে বাঁচাতে হ বে। এর জন্য অন্য একটা ব্যবস্থা করতে পারো না --- যেখানে তাকে এই 'জগা' হতে হবে না। আমি শেষ, ও একটু অন্যভাবে বাঁচুক । খেতে কষ্ট হচ্ছে দাদা, বোনের বাড়ি আর কিছু নেই, আর কষ্ট হলেও বোনের কিছু করার নেই। জানেন এইরকম অভাবী রেখে ই আমাদের দিয়ে এরা কাজ করিয়ে নেবে। আমি বাঁদি, কার --- না, এই কাঁটাতারের। শুধুই অত্যাচারিত হতে হয় যদি সেপাইরা চুক্তি ছাড়া মদ খেয়ে এখানে হল্লা করতে আসে, মেয়েদের শরীর নিতে চায়, আমরাও তাকে ঘিরি, তারপর কিল চড় দি। যেদিন কি ল চড় দিতে পারি, সেদিন খুব আনন্দ হয়, জীবনের একটা মানে খুঁজে পাই --- এখানকার বউরাও বেশিদিন বাঁচতে চায় না। জানি না --- সবাই আত্মহত্যা করে। বিষ খেয়েই বেশি করে। কেন মরে বলতে পারো? আমার মনে হয়েছে --- প্রথম প্রথম বাধ্য হয়ে ক াজটা করলেও এটা অত্যাচার স্বামী পেটাবে, সেপাই পেটাবে, মালিক এসে শরীর নেবে, সেপাই এসেও নেবে, দাদা শরীর দিতেই হ বে একাজে, সেপাই এদেশের হোক কিম্বা ওদেশের হোক ---- একইরকম, আলাদা নয়। সহ্য হয় না। তাই মরে। আমি মরিনি, এই ছেলের মুখ চেয়ে বেঁচে থাকি। আর কী করতে পারি? আনন্দ পাওয়ার মতো আর কিচ্ছু নেই। আগে এখানে যাত্রা আসত। দেখে ত যেতাম, সেবার কী হল দাদা জানো --- মানুষ এখানে জন্তুর বাড়া, কুত্তার চেয়েও লোভী, যাত্রা চলছে হঠাৎ তাঁবু খুলে পড়ে গেল, মেয়েরাও আটক পড়ে গেল, তার পর সব অন্ধকার করে দেওয়া হল। মেয়েদের ধরে নিয়ে গেল জঙ্গলে যার যা করার করল, কোনো পুলিশ সেখানে নেই। সন্ধে হলেই শুয়ে পড়ি, প্রথম রাতে একটু ঘুমিয়ে নিই। তারপর চেতন থাকি, যদি ডাকাত আসে, বাি ড়তে ছাগল আছে, ওরা গরু, ছাগল চুরি করতে আসে। তারাগুলো মাথার উপর থেকে নেমে গেলে ভালো করে ঘুমাতে থাকি। ে ভারের দিকে ডাকাতি হয় না। ঘুমেও শান্তি নেই। গুলির শব্দ শুনি --- তার মানে কেউ গেল। গ্রাম থেকে কেউ হারিয়ে গেল। আ র ভালো লাগে না, দাদা অনেক দুঃখের কথা বললাম আর বলব না। ভাত ক'টা খেয়ে নাও, পড়ে থাকলে খারাপ লাগে। ছেলেটার জন্য একটু খোঁজ এনে দেবে? তোমার অনেক জানাশোনা লোক আছে, তুমি চেষ্টা করলে তার খোঁজ নিশ্চয় পাবে।

তুমি কিন্তু অনেকক্ষণ এখানে আছ, এটা কিন্তু খবর হয়ে গেছে, আর থেক না, ট্রেনে যাবে না, চলো বাসে দিয়ে আসি।

আমি উত্তর দিতে পারিনি, চুপ করে ছিলাম। আর কী করতে পারি, ডাক্তারকে বলব যদি একটা আয়ার কাজ পাওয়া যায়, যাবে না জানি --- বাসে উঠলাম। সমীক্ষা সংক্ষিপ্ত হল, এই সমীক্ষায় আরো গভীরে ঢুকলে বিপদ আছে, এটাও জানা হয়ে গেছে। বাস ছে ড়ে দিল, আমার বোন, যার ধর্ষিতা হওয়া পেশা সে হাত নাড়ছে।

বিবর্তন, চেতনা ও নীতিবোধ

অমিতাভ চক্রবর্তী

গৌরচন্দ্রিকা ঃ

যুক্তরাষ্ট্রে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি গবেষণা কেন্দ্র— নিউরোলজিক্যাল ল্যাবরেটরি। একটি অন্ধকার করা ঘরে এক গবেষক, Michael J. Baime
ধ্যানরত! তিনি তিববতী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘকাল আগ্রহ, অধ্যবসায় সহকারে অভ্যাস করে (বলা যাক সাধনা করে) এক বিশেষ স্তরে চেতনা স্থায়ী করায় সক্ষম। তবে এই অবস্থার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাঁর চিত্তে বাধা, বিতৃষ্ণা নেই। তাঁর সহকর্মী A ndrew Newberg
পরীক্ষা করছেন ধ্যানরতের মস্তিষ্কের কোন্ অংশ অতি সক্রিয় ও কোন্‌টি অস্বাভাবিক রূপে নিষ্ক্রিয়। এই ক্ষেত্রে অধুনা আশ্চর্য অগ্র গতি সম্ভব হয়েছে PET, SPECT, functional nuclear magnetic resonance প্রমূখ পদ্ধতি মাধ্যমে।

এদের বিবরণ যতদুর জানি তাও দেবার অভিসন্ধি নেই। শুধু বলি স্বল্পকাল স্থায়ী স্ক্যানারের সাহায্যে, মস্তিষ্কের অংশের বা দেহের ে কাথাও টিউমারের বিষয় সংবাদ দেয় Positron Emission Tomography (PET) মাধ্যমে। New berg
ব্যবহার করছিলেন Single Photon Emission Computerized Tomography (SPECT)।

প্রবন্ধটি পাঠকালে আমার সন্দেহ হচ্ছিল, এই ভাবে যন্ত্রপাতি সাঁটা 'গিনিপিগ' অবস্থায় কি ধ্যানস্থ হওয়া সম্ভব? যাই হোক, পর্যবে ক্ষণে দেখা গেল M.B. -র মস্তিষ্কের frontal lobe গভীর মনঃসযোগের সাক্ষ্য স্বরূপ অতি সক্রিয় (intense neural activity), কিন্তু মাঝামাঝি অবস্থিত parietal lobe
ক্রমশ নিদ্রিত, নিষ্ক্রিয়। এই অবস্থায় মাইকেলের নিজস্ব অনুভূতি কী? তিনি তাঁর দৈনন্দিন 'আমিত্বের' গন্ডী ভেদ করে সর্বভূতের, বি শ্বের সাথে একাত্ম।

এর থেকে কতদুর, কী বোঝা সম্ভব? আরম্ভ করা যাক homeostatic
শব্দটি থেকে। জীবিত থাকতে হলে দেহকে তাপমাত্রা, অক্সিজেন, বিভিন্ন রাসায়নিক অনুর উপস্থিতির পরিমাণ এইরূপ বিবিধ বিষয়ে য় কম / বেশির নিদির্ষ্ট সীমা অতিক্রম না করায় সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়। মানুষের দেহ বা একটি জীবিত সেলের দেহ— যাই হোক । দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (internal milieu)
নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে সংবাদ গ্রহণ ও নির্দেশ প্রেরণে রত। চেতনা সম্বলিত প্রাণীর চেতনা এই ক্ষেত্রে সাধারণত ব্য বহৃত নয়। এই বিষয়ে, চরম অবস্থা ব্যতীত অন্য সময়েও, প্রতি মুহূর্তে সচেতন থাকতে হলে অন্য কোনো বিষয়ে মন দেবার সময় থ াকে না। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্কের কয়েকটি অংশ কোনো কোনো বিষয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের (regulating centre
-এর) কাজ করে । বিশেয়ত পারিয়েটাল লোব দেহের সীমানা সম্পর্কে খবর রাখে— যথা, এইখানে আমার মাথা শেষ (হয়ে হা ওয়া) বা হাত শেষ (হয়ে টেবিল)। এই সীমানার অভ্যন্তরে বা ঠিক প্রান্তে কোনো প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি তৎক্ষণাৎ প্রতিকারের প্র য়াস আনে। সচেতনভাবে চিন্তা করার আগেই আগুন থেকে হাত সরে যায়। পারিয়েটাল লোব যখন নিষ্ক্রিয় তখন পারিপার্শ্বিক ও আমি এই দুই-এর পার্থক্যবোধ স্তিমিত, ঝাপসা। অতএব দেহের গন্ডী অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপ্তি-অনুভূতি অতি সক্রিয় ফ্রন্টাল লোে ব সৃজনের অনুকূল অবস্থা আসে। একটি ''আধ্যাত্মিক'' অনুভুতির neurological basis -এ এইভাবে উপনীত হতে পারি।

এর বাইরে এই অনুভুতির অন্য তাৎপর্য নেই তা কি এখনি বলা যায়? অবশ্যই না । মূল কারণ তূরীয় (transcendental)
ও মস্তিষ্কের পর্যবেক্ষিত অবস্থা লক্ষণ (symptom)
মাত্র— এই দাবীর কোনো বিরুদ্ধ ''প্রমাণ'' বিজ্ঞান দিতে অক্ষম। বিজ্ঞানের প্রভাব প্রসারিত হয় অন্য পন্থায়।

বস্তুজগতের আবিষ্কৃত আইন সমূহ (laws)
অনুসারে স্পষ্ট, নিরবচ্ছিন্ন কার্য- কারণ সম্পর্কের ঠাস বুনন যতদূর বিস্তৃত তার যথেষ্ট অভ্যন্তরে (সর্বদা সম্ভব হলেও) অতিপ্রাকৃত শক্তির লীলা অন্বেষণে অভ্যাস, উদ্যম ধীরে ধীরে কমে আসে। শুধু অপর পারে নয়, এই সীমানার অভ্যন্তরেও, কাছাকাছি অঞ্চলে,

এই বিষয়ে উৎসাহ সজীব থাকতে পারে।

বপাত ঈশ্বরের কোপের প্রকাশ নয় তা ''প্রমাণ'' সম্ভব নয়। তবে বায়ুমন্ডল ও ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফীল্ড সম্পর্কে অনেক কিছু জা না। সব বৈজ্ঞানিক নিয়ম কানুন আপাতভাবে অক্ষুন্ন রেখে কোনো অলৌকিক শক্তি এই স্থানে, এই মুহূর্তে বজ্রপাত ঘটাল—এই প্র মাণে বিতর্ক-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে সম্ভবত কেউ ব্যগ্র নয় ।

মনুষ্যের মস্তিষ্ক ও চেতনা সম্পর্কে অবস্থা পৃথক। অনেক কিছু জানা, বোঝা গেছে। অনেক এখনও রহস্যাবৃত। মানবমস্তিষ্ক অপেক্ষা জটিলতর কিছু নেই। মগজে সব রকম সম্ভব synaptic connections
- এর (নিউরন সমূহের পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগের উপায়) হিসাব করতে বসলে যে অবিশ্বাস্য সংখ্যা পাওয়া যায় তার তু লনায় বিশ্বের পরমানু-সংখ্যা তুচ্ছ। করটেক্সে কার্যত স্থাপিত কনেকশন সংখ্যাও গড়ে মিলিয়ন্ বিলিয়ন্ অর্থাৎ দশ কোটি কোটি। ম স্তিষ্ক তো তবু ''বস্তু'' যার উপর সরাসরি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব। চেতনা (consciousness),
বিশেষত আত্ম-চেতনা (consciousness of self)
কীভাবে সৃষ্ট, মস্তিষ্কের সহিত এদের সম্পর্ক কী? এসব আরও রহস্যময়। এই ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হয়েছে, হচ্ছে। তবে বোধ অসম্পূর্ণ , আংশিক।

যে সব সীমান্তে এখন গবেষকরা খোঁজ খবরে ব্যস্ত তার একটি উদাহরণ দিয়ে আরম্ভ করেছি। এই ক্ষেত্রের, অর্থাৎ Newberg ও সহকর্মীদের বিশেষ গবেষণা-ক্ষেত্রের, একটি যুৎসই নামকরণ হয়েছে— “neurotheology”!
এঁরা কতদুর অগ্রসর হতে পারবেন বলা কঠিন। কিন্তু যদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ভ্রান্ত প্রমাণ সম্ভব (falsifiable)
পন্থায়, তদ্রুপ হাইপতেসিস অনুসরণে, তথাকথিত আধ্যাত্মিক অনুভুতি সমূহের বস্তুভিত্তিক (মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিবর্তন মাধ্যমে) ব্যাখ্যা ক্রমশ সুসংবদ্ধ হয়, তাহলে প্রতি স্তরে অলৌকিক শক্তির হস্তক্ষেপের দাবী ক্রমশ কম হবে । বিজ্ঞানের এতদূর অগ্র গতিও নিশ্চিত নয়। তবে এর অধিক সম্ভব নয়, কারণ অলৌকিক ও তূরীয়ের অনুপস্থিতি ''হাতে-নাতে '' প্রমাণ অসম্ভব।

যা ভ্রান্ত প্রমাণ সম্ভব নয় (non-falsifiable)
তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অন্তঃসারহীন। [এ আলোচনা আমি জিজ্ঞাসা-য় প্রকাশিত ''পদার্থবিজ্ঞানীর পারমিতা স্বপ্ন....'' প্রবন্ধে করেছি ।] এখানে বলে রাখি বৈজ্ঞানিক মূল্যহীন হলেও তার অন্য উপযোগিতা থাকা সম্ভব—যথা মানসিক শান্তিলাভে সাহায্য। এই প্রসঙ্গ ফিরে আসব। প্রথমে মানব মস্তিষ্ক ও চেতনার বিবর্তনের বিষয়ে কিছু আলোচনা সঙ্গত।

বিবর্তন ঃ

ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ কিছুটা জ্ঞাত ধরে নিয়ে ডারউইন-মেন্ডেল সমন্বয় বা নব-ডারউইনীয় (Neo-Darwinian)
বিবর্তনবাদ সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে (ও অসম্পূর্ণভাবে) কিছু বলি।

ডারউইনের natural selection ও মেন্ডেলের genetics
এই দুই বৈপ্লবিক ও আপাত- বিরোধী আবিষ্কারের সমন্বয়ে (বলা যায় মোটামুটি ১৯৪০ থেকে আরম্ভে) Neo-Darwinism প্রতিষ্ঠা লাভ করে R.A.Fisher, J.B.S.Haldane, Sewall Wright প্রমুখ বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টায়।

আমাদের দেহের প্রতিটি সেলের কেন্দ্রীয় অংশে (cell
nucleus - এ) ক্রোমোসোমে DNA অনু রূপে গচ্ছিত পিতা ও মাতা প্রদত্ত দুই সেট genome-
এর কপি। এরা আমাদের জীনেটিক উত্তরাধিকার নির্ধারণ করে । প্রতি সেটের তেইশটি ক্রোমোসোমে ষাট থেকে আশি হাজার জীন। এক শ্রেণীর RNA অণুর মারফতে এদের ''কপি'' সেল থেকে নির্গত হয়ে (ribosome অণুর সাহায্যে) শরীরের প্রয়োজনী য় বিভিন্ন প্রোটিন (protein) সৃষ্টি করে। রিবোসোমগুলি মাইক্রোসকপিক মেশিন রূপে messenger
RNA গুলিকে যেন ''অনুবাদ'' করে। দেহের অভ্যন্তরে সর্বত্র সর্বকর্মে প্রয়োজনীয় প্রোটিন সমূহ ফলত, এই অর্থে, জীন থেকে ''অ নূদিত'' (translated).

RNA মাধ্যমে জীন সমূহের ক্রমাগত এই replication প্রতি ক্ষেত্রে নিখুঁত,ত্রুটিহীন হয় না। থেকে থেকে ''ভূল'' হয় কপি করতে। এই হল মিউটেশন (mutation) যার ফল প্রায়শ অল্পবিস্তর মন্দ, কিন্তু মাঝে মাঝে ভালও হতে পারে। ভুল কপি ব্যতীত মিউটেশনের অন্য কারণ সম্ভব, যথা এক্স- রে। কিন্তু অধিকাংশই ''কপির ভুল''। সন্তান পিতা ও মাতা প্রদত্ত ক্রোমোসোমদ্বয়ে সঞ্চিত মিউটেশনগুলির উত্তরাধিকারী। জীনোটিক মূলধন এই ভাবে প্রতি প্রজন্মে, সাধারণতক সামান্য, পরিবর্তিত হয় । গড়ে প্রতি প্রজন্মে শ'খানেক মিউটেশন জমে উঠতে পারে। সংখ্যায় এটি সমগ্র জীনোমের ক্ষুদ্র অংশ হয়ে ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচনের (natural selection- এর) পথ উন্মুক্ত করে। পুঞ্জিত মিউটেশন সমূহ যদি গড়পড়তায় উত্তরাধিকারীদের জীবিত থাকতে,প্রাপ্ত বয়স্ক হতে, সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালনে সফলতর, দক্ষতর করে তবে প্রজন্মের পর প্রজন্মে জীনোমের এই পরিবর্তিত অংশের উত্তরাধিকারী-বৃন্দ ক্রমশ সংখ্যাগুরু ও প্রভাবশালী হয়ে উঠবে। পরিবর্তিত পরিবেশ এই অগ্রগতি রোধ, এমন কি পতনের সূচনা করতে পারে। এই হল নব- ডারউইনীয় বিবর্তনের মূল সূত্র। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রাণীদের বা মানবপ্রজাতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির (individuals- এর) জন্ম, জীবনযাপন ও মৃত্যুর মাধ্যমে কার্যকরী হলেও গভীরতর স্তরে এর অর্থ বিভিন্ন জীনোমের প্রসার, স্থায়িত্ব বা বিলোপ। আমরা সচরাচর যাকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলি শুধু তার প্রভাব নয়, সেই পরিবেশে প্রাণধারী সর্বজীবের, তথা মনুষ্যগণের সমবেত প্রভাব এই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত Natural selection শব্দটির কারণ হিসাবে গণ্য।

প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে, প্রতি প্রজন্মে সামান্য সংখ্যক জীনের এই র‍্যান্ডম মিউটেশন কি এলোমেলো ভাবে না ছড়িয়ে ধীরে ধীরে সুসংবদ্ধ জটিলতা (complexity) সৃষ্টি করতে সক্ষম? এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত, বিশদ, বহু উদাহরণ সম্বলিত আলোচনা লভ্য Richard Dawkins লিখিত Climbing Mount Improbable গ্রন্থে। সংক্ষেপে তাঁর জানীতে, "Mutation may be random, but selection definitely is not" । তাই এই নির্বাচনের প্রভাব ক্রমপুঞ্জিত (cumulative)
হয়ে আশ্চর্য জটিলতায়, এমনকি মানব মস্তিষ্কে উপনীত হতে সক্ষম। বিভিন্ন প্রাণীর চোখের কথা ভেবেই অবাক হতে হয়। তবে কমপ্লেক্সিটির চরম উদাহরণ মানব মস্তিষ্ক (human brain) ।
পৃথিবীর জীবনের আবির্ভাব সম্ভবত প্রায় চার বিলিয়ন্ (চার শত কোটি) বৎসর পূর্বে। আমাদের প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষ Australopithecus Africanas -এর আবির্ভাবেরর প্রথম চিহ্ন থেকে ক্রমে আবির্ভূত Homo Habilis, Homo Erectus ও শেষে Homo Sapiens Sapiens
-এ প্রায় চার মিলিয়ন্ (চল্লিশ লক্ষ) বৎসরের ইতিহাস। হাবিলিস্ থেকে সাপিয়েন্স্ দুই মিলিয়ন্ বৎসরও নয়। কিন্তু শেষোক্তদের মস্তিষ্ক প্রথমোক্তদের তুলনায় দুই গুণেরও অধিক বৃহদায়তন । বিবর্তনে সাফল্যে মস্তিষ্কের অবদানের এ সাক্ষ্য। এই মস্তিষ্কের সহিত চেতনা (consciousness) ও বিশেষত আত্ম-চেতনার (consciousness of self)
সম্পর্ক কতদূর বোঝা গেছে, কতদূর বোধ সম্ভব?

চেতনা ঃ

এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক গবেষণার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব প্রধানত Antonio Damasio লিখিত The Feeling of what Happens গ্রন্থটি অবলম্বনে। এটির neurobiological
প্রতিপাদ্য আমার বিশেষ আকর্ষণীয়, বোধ হয় ও গ্রন্থটি অতি সুলিখিত। নোবেল প্রাপ্ত Gerald Edelman -এর মতামত কিছু আলোচনা করব Bright Air, Brilliant Fire : On the Matter of Mind (Edelman) গ্রন্থটি কেন্দ্র করে। (আমার পঠিত ফরাসি অনুবাদ এর রোমান্টিক শিরোনাম স্রেফ Biologic de la Conscience -এ পর্যবসিত।) আরও দুটি সুপরিচিত গ্রন্থ, Descartes' Error (Damasio) এবং How Matter Becomes Conscious (Edelman and tononi) এখনও আমার অপঠিত।

দামাসিও গবেষক ও চিকিৎসক। Alzheimer's
disease সম্পর্কিত তাঁর গবেষণা প্রখ্যাত। কিন্তু শুধু তাই নয়, তিনি চেতনা, বোধ ও প্রকাশ ক্ষমতার উপর বিবিধ প্রকার brain lesion -এর প্রভাব ভুক্তভোগীদের তাঁর আয়েয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা কেন্দ্রে রেখে (ও প্রায়শ তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে) দীর্ঘকালব্যাপী পর্যবেক্ষণে রত। তিনি ও তাঁর সহকর্মীদের আধুনিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি মস্তকের অভ্যন্তরীন অবস্থা সম্পর্কে প্রভুত সংবাদবাহী। পূর্বে উল্লিখিত PET ও SPECT ব্যবহার এর উদাহরণ। ক্রমশ গভীরতর ভাবে বোঝা সম্ভব অভ্যন্তরে কোন্ অংশের কীরূপ ক্ষতি কোন্ বাহ্যিক লক্ষণের সঙ্গে জড়িত। সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সঙ্গতিপূর্ন, সুষ্ঠু ব্যাখ্যার প্রয়াসে দামাসিও আত্মসত্তা (self) ও চেতনা (consciousness)
উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন স্তর উপস্থাপিত করেছেন। মস্তিষ্কের বিবর্তনের সঙ্গে এই স্তর বিভাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রথমে তাদের নামকর

ণ হোক ও তৎপর ব্যাখ্যা।

আত্মসত্তার তিনটি স্তর - আদি (proto-self) , কেন্দ্রীয় বা মূলাধার (core-self) ও আত্মজীবনী সম্বলিত (autobiographical-self) । প্রোটো সত্তার চেতনা অনাবির্ভূত। পরবর্তী দুই স্তরে যথাক্রমে জাগে কেন্দ্রীয় বা মূলাধার চেতনা (core-consciousness) ও বিস্তৃত চেতনা (extended consciousness) ।

প্রথমেই homeostatic - এর উল্লেখ করেছি। কিছু পুনরুল্লেখ করি। দেহের অভ্যন্তরে (internal milieu - তে এবং বহিরাবরণে প্রতি মুহূর্তে যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দে প্রাণ ধারনের উপযুক্ত অবস্থা রাখার ভর মস্তিষ্কের কয়েকটি কেন্দ্রের উপর ন্যস্ত। মানব মস্তিষ্কের বিবর্তনের প্রথমেই, চেতনার উন্মেষের পূর্বেই এরা গঠিত। শরীরের সর্বাংশ থেকে ক্রমাগত সংবাদ আসে ও সর্বত্র নির্দেশ প্রেরিত হয় । এই দ্বিমুখ প্রবাহের বিষয়ে সচেতন থাকতে হলে অন্য কিছু ভাবনার সামান্য সময়ও থাকে না। অতএব বিবর্তন এই স্তরে চেতনা জড়িয়ে দেয় নি। সব প্রাণীর প্রেটোসেল্‌ফ্‌ প্রয়োজন। চেতনার পূর্বে এর আবির্ভাব।

ত্ত্ব যে কোনো ক্ষেত্রে বিবর্তন 'দিয়েছে' বা 'দেয়নি' এই প্রকার শব্দ ব্যবহারের 'অনুবাদ' ঃ যে প্রাণীরা এই বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনুপযোগী জীনোমিক উত্তরাধিকার সঞ্চিত করেছে তারা নব-ডারউইনীয় নির্বাচনে পরাজিত ও ক্রমশ বিলুপ্তির পথে গেছে। অধিকতর উপযোগী জীনোমধারীগণ বিবর্তনে নির্বাচিত ও প্রসার লাভ করেছে। ৰ

প্রোটো-সেল্‌ফ্‌-এর আদিমতার সাক্ষ্যস্বরূপ মস্তিষ্কের সংশ্লিষ্ট অংশগুলি গভীর অভ্যন্তরে ও নিম্ন অঞ্চলে (যথা brain-stem nuclei, hypothalamus, insulaগ্ন । এরা সচেতন মনকে সরাসরি বিব্রত না করে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অত্যাবশ্যক কর্মে রত । কিন্তু চেতনার উন্নততর স্তরে উপনীত হওয়ার জন্য এ যথেষ্ট নয়।

পরবর্তী স্তরের বিবর্তন প্রসঙ্গে দামাসিও উপস্থাপিত "second order mapping" অন্তত সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। দেখা যাক।

প্রোটো-সেল্‌ফ্‌-এর স্তরে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে কার্যকলাপও দেহের অভ্যন্তরীণ ঘটনাস্রোতের অংশ । খবর সংগ্রহ ও নির্দেশ প্রেরণ সম্ভব হয় এই নিয়ন্ত্রন কেন্দ্রগুলির স্বীয় অবস্থা পরিবর্তন (change of state) মাধ্যমে। বিবর্তনের এক পর্যায়ে ক্রমে আবির্ভূত কয়েকটি কেন্দ্র প্রোটো-সেল্‌ফ্‌-এর এই নিরন্তর পরিবর্তনের খবরাখবর রাখার সক্ষমতা অর্জন করল। বিবর্তনের পথে এইরূপ মস্তিষ্কের অধিকারীগণ নবদক্ষতাসম্পন্ন প্রমানিত হল।

আদি সেল্‌ফ্‌-এর স্তরে কার্যনির্বাহ দেহের পরিবর্তনশীল 'মানচিত্র' গঠনের মাধ্যমে। এই ''ম্যাপ''-সৃষ্ঠ পরিবর্তনের ম্যাপ ধৃত হয় নব আবির্ভূত কেন্দ্র সমূহে।

এই ভাবে সৃষ্ট core-self অধিকন্তু আনল core-consciousness, প্রজনিত হল ''আমি''- অনুভুতি। "The biological essence of the core-self is the representation in a second order map of the proto-self being modified." (Damasio). দামাসিওর মতে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে মাঝামাঝি অঞ্চলে অবস্থিত কয়েকটি কেন্দ্র (যথা superior coliiculi, thalamus, cingulateগ্ন এই নব আত্মসত্তা ও চেতনার সৃজক ও ধারক । কারণ এই অংশগুলির ক্ষতি ছlesionগ্ন এই স্তরে চেতনা ব্যাহত ও চরমে লুপ্ত করে। ব্যাপক গবেষনা, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে দামাসিও এই সিদ্ধান্তে উপনীত।

এই চেতনার স্তরে স্মৃতিশক্তিও উদ্ভূত হয় । বর্তমান মুহূর্তের পূর্বে অবস্থা কী ছিল তার স্মৃতি ব্যতীত পরিবর্তনের বোধ সম্ভব নয়। কিন্তু এই স্মৃতি স্বল্পকালব্যাপী পরিসরে কার্যকরী। সীমিত অর্থে 'চেতনা' আবির্ভূত। কিন্তু স্মৃতিশক্তি এখনও সংকীর্ণ। ভাষা এখনও অনুপস্থিত।

বিবর্তনে মস্তিষ্ক আরও পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, শক্তিশালী, বিবিধ আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠল। এই ''আধুনিক'' অংশ neocortex । কালে প্রসারিত স্মৃতিশক্তি ছlong-term

memoryগ্ন,ভাষা সৃষ্টি ও ব্যবহারের সক্ষমতা, উচচস্তরের বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা— সবই ক্রমে বিকশিত। ভাষা অর্জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মস্তিষ্কের দুটি কেন্দ্রের— Broca Ý Wernicke
area । হোমো সাপিয়েন্স্ মঞ্চে আবির্ভূত। এই স্তরে আবির্ভূত autobiographical self ও প্রসারিত চেতনা ছextended consciousnessগ্ন । লব্ধ আত্ম চেতনা ছconsciousness of self) . “If core-consciousness is the indispensable foundation of consciousness, extended consciousnes is its glory.”(Damasio).

প্রতি স্তর পূর্বতন স্তরের উপর একান্ত নির্ভরশীল। প্রোটো-সেল্ফ্-এর ভাবপ্রাপ্ত অংশে যথেষ্ট গুরুতর ক্ষতি শুধু প্রোটো নয় core Ý
autobiographical এই দুই স্তরও বিধবস্ত করে। কোর-স্তরে ক্ষতি প্রোটো-স্তর অক্ষুণ্ণ রেখে প্রসারিত স্মৃতি ও চেতনার বিলুপ্তি সাধনে সক্ষম। ক্ষতিগ্রস্ত neocortex সত্ত্বেও পূর্বতন দুই স্তরে কার্যনির্বাহ সম্ভব। যে স্তর যত আদিম তা তত স্বয়ংসম্পূর্ণ।

প্রসারিত চেতনা নিতান্তই স্মৃতিভিত্তিক। নিদ্রিত বা অচৈতন্য অবস্থা ব্যতীত কোর-চেতনা নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সক্রিয়। বহির্জগতের st imuli
ও প্রোটো - সেল্ফ্-এর নিজকার্যের ফলে মুহুর্মুহু পরিবর্তন ম্যাপিং-এ ব্যাপৃত। এর জন্য বর্তমানের অব্যবহিত পূর্ববর্তী মুহূর্তগুলির স্মৃতি যথেষ্ট।

আশৈশব, দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতিসমূহ সম্ভব করে প্রসারিত চেতনা। Neocortex তাদের neural
network -এ গচ্ছিত রাখায় ও বিভিন্ন কারণে প্রয়োজনমতো সক্রিয় (reactivated) করায় সক্ষম

দামাসিওর সংজ্ঞা— “ Autobiographical self : Based on permanent but dispositional records of core-self experiences. Those records can be activated as neural patterns and turned into explicit images. The records are partially modifiable with further experiences.”

প্রসারিত চেতনা ও উচচস্তরের চিন্তায় ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত বিবর্তনের পথে লব্ধ সম্পদ—ভাষা।

পূর্বেই বলেছি দামাসিও আত্মসত্তা ও চেতনার এই স্তরবিভাগে উপনীত গবেষণাগারে ও চিকিৎসালয়ে বহুবৎসর ব্যাপী-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। বেশ কিছু case
histories বিশদ রূপে বর্ণিত তাঁর গ্রন্থে। এগুলি অতীব শিক্ষাপ্রদ। বিশেষত বিবিধ agnosia -র বিবরণ। কিন্তু এদের সার্থকতা বিস্তৃত বিবরণের উপর নির্ভরশীল—David, Emily, S
এদের ‘‘গল্প’’। কার মস্তিষ্কে কোন বা কোন সব কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত ও দৈনন্দিন জীবনে তার প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ কী প্রকার? এক্ষেত্রে স ংক্ষিপ্তসারের উপযোগীতা দেখি না। কৌতুহলীকে গ্রন্থটি পাঠের অনুরোধ জানাই।

দামাসিও emotion এবং feeling শব্দ দুটির বিশেষ সংজ্ঞা ব্যবহার করেন। এই তত্ত্বের ও সংশ্লিষ্ট somatic marker hypothesis আগ্রহ সহকারে পাঠ সত্ত্বেও অত্র আলোচনায় বিরত হলাম।

এডেলম্যান উপস্থাপিত theory of Darwinian selection of neural groups সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। স্বয়ং Francis Crick (হ্যাঁ, Watson - Crick -এর সেই ক্রিক্) বলেন এই “neural Edelmanism”
অবাস্তব। তবে এডেলম্যান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে চেতনার ভিত্তি হিসাবে “neural groups”
বর্তমান ও তাদের একপ্রকার ডারউইনীয় নির্বাচনের মাধ্যমে বিলোপ বা শক্তি অর্জন হয়—এই তাঁর বক্তব্য। এই থিয়োরির ‘‘মডে ল’’ হিসাবে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা Darwin
III নামে একটি রোবট সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে সম্যক আলোচনায় আমি অপরাগ।

নীতিবোধ ঃ

মস্তিষ্কের বিবর্তনের মাধ্যমে চেতনার, বিশেষত মানব প্রজাতির সমৃদ্ধ আত্ম-চেতনার, এই ব্যাখ্যা, এই neurology of consciousness সকলের সম্পূর্ণ হিসাবে গ্রাহ্য নিশ্চয় নয়। এই শেষ কথা নয়— এরূপ প্রতিক্রিয়া, বলা যায়, স্বাভাবিক। কো

পার্নিকাস ও গালিলেও মানব প্রজাতির বাসস্থান পৃথিবীকে জগতের কেন্দ্রচ্যুত করেছিলেন। এ বিষয়ে প্রবল, হিংস্র প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস সুবিদিত। ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ এই পথে আর এক, অনেকের পক্ষে অতি পীড়াদায়ক, পদক্ষেপ। সেই কেন্দ্রচ্যুত পৃথিবীর অন্য
প্রাণীদের ও মানবপ্রজাতির মধ্যে পার্থক্য ক্রমে সঙ্কীর্ণ। (ডারউইন অবশ্য পুস্তিকা ও ভাষণ মাধ্যমেই আক্রান্ত হয়েছিলেন। জোর্দানো ব্রুনো, এমনকি গালিলেও-র অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়নি।)

নব-ডারউইনীয় বিবর্তনবাদ বলে, আমাদের মস্তিষ্কের ও চেতনার জটিলতা ও আশ্চর্য সমৃদ্ধি natural selection of genome মাধ্যমে উদ্ভুত। অনেকের মনে হবে—না, না, এতদুর যাওয়া উচিত নয়, আমরা আরও কিছু। বিজ্ঞান কিন্তু নিরস্ত হতে রাজি নয়। এই পথে আরও কতদূর অগ্রগতি সম্ভব, আরও কী বোঝা ও বোঝান যায় এই সন্ধানে ব্যাপৃত।

আত্মসচেতন আমি সমশ্রেণীর জন্য চেতনার অস্তিত্ব সম্পর্কেও চেতন। বিভিন্ন চেতনার পারস্পরিক সম্পর্ক, আমাদের সামাজিক আচার - ব্যবহার—সবই নবডারউইনীয় বিবর্তনবাদের গবেষণার সঙ্গত বিষয়রূপে পরিগণিত। পরার্থপরতা, সহনুভূতি, বন্ধু প্রীতি, ন্যায়বিচার-বোধ ছaltruism, sympathy, friendship, sense of fairness and
justiceগ্ন কোনো কিছুর ব্যাখ্যায় পশ্চাৎপদ হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

এই গবেষণাক্ষেত্রের প্রথম নামকরণ ছEdward O. Wilson
-এর উদ্যমে) হয়েছিল Sociobiology । উইলসনের বীজগ্রন্থ উগ্র, অক্লান্ত আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠায় এই ক্ষেত্রে কোনো কোনো গবেষক ‘হ্যাপা এড়াবার’ আশায় কোনো না কোনো অন্য নাম ব্যবহার করেন। কতদূর সফল হন সঠিক বলতে পারি না।

মানব সমাজে হিংসা, আক্রমণ, শঠতার প্রাচুর্য। এই সবের ডারউইনীয় ব্যাখ্যায় অনেকেই বেশ রাজি— struggle for existence, survival of the
fittest ইত্যাদি লব্জ আউড়ে। কিন্তু সহানুভূতি, বন্ধুপ্রীতি, উপচিকীর্ষা এ সবের একই পন্থায় ব্যাখ্যায় উদ্যমে প্রায়শ প্রতিবাদ ওঠে না, না, এ সব মানব চেতনার মহান অংশ, এ সব transcendent.
Altruism - কে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক-বিড়ম্বিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করা যাক।

পারস্পরিক পরার্থ ও জ্ঞাতিভিত্তিক নির্বাচন (Reciprocal altruism and kin selection) ঃ

ডারউইন স্বয়ং মানব-চরিত্র ও সমাজের সব কিছু বিবর্তনের মাধ্যমে বোঝার প্রয়াসে একনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু সমসাময়িক হলেও মেন্ডেলের গবেষনা তাঁর অগোচর ছিল। নব-ডারউইনীয় সমন্বয় ছsynthesisগ্ন আরম্ভ বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে।

আজ ফিরে তাকিয়ে দেখা যায় altruism - এর ব্যাখ্যা থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ ব্যাপকতর ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা ষাট ও সত্তরের দশকে। William D. Hamilton, George Williams, Robert Trivers এবং John Maynard Smith — এঁদের গবেষণা এর ভিত্তি ।
Edward O. Wilson লিখিত Sociobiology (বিশেষত এর মনুষ্য-সমাজ সংক্রান্ত শেষ অধ্যায়) ও Richard Dawkins লিখিত The Selfish
Gene, এই দুটি গ্রন্থ বিশেষজ্ঞমন্ডলীর গন্ডী অতিক্রম করে দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বহু কৌতুহলী সাধারণ পাঠক মহলের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ প্রতিবাদও আরম্ভ হল। উইলসনের এক ভাষণকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের একটি দল শুধু চেঁচামেচি করে ক্ষান্ত না হয়ে বরফ গলা জল ঢেলে দিল। উইলসনের সেই বিখ্যাত (কুখ্যাত?)গ্রন্থে শেষ অধ্যায় ভিন্ন মানব সমাজের আলোচনা কিন্তু প্রায় অনুপস্থিত । হ্যামিলটন প্রমুখ বিজ্ঞানীরাও স্বাভাবিকভাবেই অপেক্ষাকৃত সহজবোধগম্য কীট, পতঙ্গ, পশু, পাখীদের দিকে প্রথমে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। পরোপকার ও আত্মত্যাগ প্রবৃত্তি এই স্তরেও ক্রিয়াশীল, যদিও আত্ম-চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সব শব্দ ব্যবহারের জন্য মানব-সভ্যতার আবির্ভাবের অপেক্ষা করতে হবে। নব-ডারউইনীয় নির্বাচন এই স্তরে কীভাবে সক্রিয় তা পরীক্ষা, পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রথমে বোধগম্য হলে তৎপর চিন্তা করা যেতে পারে মানব-সমাজের ক্ষেত্রে এই লব্ধ জ্ঞান কতদূর প্রযোজ্য। এ বিজ্ঞানের স্বাভাবিক গতিভঙ্গী। পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া যথাসম্ভব সরল ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে বোঝার চেষ্টা হয় প্রথমে। জটিলতর ক্ষেত্রগুলি তখন ভবিষ্যৎ লক্ষ্য । কিন্তু বিশ্বাস, শঠতা, উপকার, ক্ষতিসাধন—এদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া বোঝার উদ্যম প্রাণীজগৎ স্রেফ বর্জন করে একটি সরল ও অতীব শি

ক্ষাপ্রদ Computer program -এর মাধ্যমে আরম্ভ করা যেতে পারে । তাই করি। প্রোগ্রামটির নামও সরল — TIT FOR TAT, যেমন কর্ম তেমনি ফল।

Axelrod আয়োজিত প্রতিযোগিতা বিজেতা "TIT FOR TAT" ঃ

Game Theory -র প্রখ্যাততম mathematical game ''বন্দীর উভয়সঙ্কট'' (Prisoner's— । এর সরলতম উদহরণ two-person এর ক্ষেত্রে দুই বন্দীর একই সমস্যা, অন্য জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, না চুপ করে থাকবে? বিভিন্ন সম্ভাবনা ঃ (ক) দুজনেই অপরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলঃ (খ) একজন সাক্ষ্য দিল, অপরজন চুপ; (গ) দুজনই চুপ। প্রতি ক্ষেত্রে লাভ ক্ষতির (কম বা বেশি জলের মেয়াদ) হিসাব-মাফিক প্রতি বন্দীর পৃথকভাবে (অন্যের সাথে পরামর্শ না করে) তার পক্ষে best possible strategy সন্ধান উভয়সঙ্কটরূপে উপস্থাপিত। বন্দীদের চিন্তামগ্ন রেখে এটিকে একটি Computer game রূপে দেখা যাক। দুই খেলোয়াড় অর্থাৎ দুই প্রোগ্রামের প্রতি মোলাকাতে তাদের (কোনো অর্থে) সহযোগিতা বা অসহযোগিতা করা সম্ভব। আচরণ অনুযায়ী তারা '' পুরস্কার'' কম বা বেশি point হিসাবে অর্জন করে । চার প্রকার সম্ভাবনা। ধরা যাক সহযোগিতা বা বিশ্বাস (বি) ও অসহযোগিতা বা বঞ্চনা(ব) যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয়কে পয়েন্ট হিসাবে দেয়।
(বি,বি):: (বি,ব):: (ব,বি):: (ব,ব)
(৩,৩):: (০,৫):: (৫,০):: (১,১)
সংখ্যাগুলির বিষয়ে কিছু বাধা-নিষেধ আছে, যথা (ব,) যথেষ্ট নিম্নমান হওয়া চাই। তবে উপরের সংখ্যাগুলি অবশ্যব্যবহার্য নয়। এরা Axelrod computer tournament -এ ব্যবহৃত সংখ্যার উদাহরণ । এই round-robin tournament -এ আমন্ত্রিত হন ১৪ জন game (সাধারণত) গণিত ও অর্থনীতিবিদ)। প্রতিটি প্রোগ্রাম স্মৃতি সম্বলিত। পূর্ববর্তী মালাকাৎসমূহে প্রতিযোগীদের ব্যবহার (''বি'' অথবা ''ব'') স্মরণ রাখে।

প্রতি জুড়ির বহুবার (এই প্রতিযোগিতায় ২০০ বার) মুখোমুখি হওয়া চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ (crucial) । এই পন্থায় এই game দলবদ্ধ, গোষ্ঠিবদ্ধ জীবনযাত্রায় দুইজনের বারংবার সংস্পর্শের সম্ভাবনার অনুকারী। মাত্র একটি মোলাকাতের ক্ষেত্রে অসহযোগিতা যুক্তিসঙ্গত (rational) প্রমাণসম্ভব। কিন্তু পৌনঃপুনিক পরিপ্রেক্ষিতে পারস্পরিক সহযোগিতা (reciprocal altruism,mutual aid) লাভজনক হতে পারে। এই প্রতিযোগিতার ফল এর চমকপ্রদ উদাহরণ।

প্রতিযোগিতায় বেশ কিছু জটিল, sophisticated প্রোগ্রাম ছিল।

অন্যের বিশ্বাসের মাত্রা পরিমাপ (estimate) করে যথাসম্ভব ঘন ঘন বঞ্চনায় ৫ পয়েন্ট লাভ করা এদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বিজেতা সরলতম, মাত্র পাঁচ লাইনের, Anatole Rapoport উপস্থাপিত TIT FOR TAT(TFT) । এই প্রোগ্রামের মূল সূত্র, ধর্মগ্রন্থের ভাষা অনুকরণে, বলা যায়— ''First do unto others as you wish them to do unto you, but then do unto them as they have just done unto you.'' –(Robert Trivers) অপেক্ষাকৃত বিশদরূপে বলা যাক এর সাফল্যের মুলে তিনটি সূত্র ঃ

(১) Never be the first to defect — প্রারম্ভে বিশ্বাস কর(বি)।

(২) Retaliate only after the partner has defected— 'ব' - এর উত্তরে পরের দফায় 'ব' । অত্যধিক গোবেচারী ভালমানুষ হয়ো না।
(৩) Be forgiving just after one act of retaliation —একবার 'ব'-এর পর আবার 'বি'-এর ফল কী হয় দেখ। এ বিষয়ে চিরন্তন আশাবাদী হও।

TFT -র এই contingent reciprocity তাকে সর্বোচ্চ গড় সংখ্যা (average score) দিল। প্রতি tournament এক প্রজন্মের প্রাকৃতিক নির্বাচনের (natural selection) -এর অনুরূপ বিবেচনায় Axelrod শ্রেণীবদ্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন। প্রতি ধাপে পূর্বের প্রতিযোগিতায় সাফল্য অনুযায়ী প্রোগ্রামগুলির আনুপাতিক সংখ্যা frequency—

নির্ধারিত হল। এইরূপে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ডারউইনীয় নির্বাচন অনুকৃত । সফল প্রোগ্রামের অনুপাত ক্রমবর্ধমান প্রতি ধাপে। ে দখা গেল TFT অন্যদের সরিয়ে বিস্তারলাভে সক্ষম । নতুন প্রোগ্রাম প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে TFT -কে হটাতে সক্ষম, এরূপ উদাহরণ দেখা গেল না। দুই TFT মুখোমুখি হলে তারা TFT -ই থেকে যায়। প্রতিযোগিতার চাপে রূপান্তরিত হয় না। এই অর্থে , বহু অর্থাৎ কয়েক মিলিয়ন্ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, TFT-র evolutionary stability প্রতিষ্ঠিত।

হ্যামিল্টন-সূত্র (Hamilton's rule) ঃ

বেশ কথা, TFT-র সাফল্য বোঝা গেল। কিন্তু প্রথমেই একটি প্রশ্ন ওঠে। TFT -র প্রোগ্রাম এক ব্যক্তিবিশেষের মস্তিষ্কপ্রসূত। প্রাণ ীজগতে এইরূপ, বা অন্য, প্রোগ্রাম উদ্ভূত ও প্রসারিত হবে কী উপায়ে? হ্যামিলটনের উত্তর ঃ Kiv Selection(KS)
অর্থাৎ জ্ঞাতিভিত্তিক নির্বাচন মাধ্যমে। [Group Selection (GS), Species Selection -এই সব প্রসঙ্গে পরে আসব।

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হ্যামিল্টনের "The Genetical Evolution of Social Behaviour" (parts I,II; Journal of Theoritical Biology) এই ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লিখিত নিবন্ধ (most cited
paper)। ছাত্রাবস্থায় একক প্রচেষ্টায় তাঁর এই গবেষণা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় Ph.D -র অনুপযুক্ত বিবেচিত ও Nature পত্রিকা ক র্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু এই বীজ নিবন্ধ (seminal paper) প্রথমে ধীরে ও অতঃপর দ্রুত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। "This turned out to be the most important advance in evolutionary theory since the work of Charles Darwin and Gregor Mendel." (Robert Trivers)

জীনেটিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু পরিমাণ উপচিকীর্ষা ও আত্মত্যাগ প্রবণতা কীভাবে নির্বাচিত হতে পারে? হ্যামিলটনের উ ত্তর ঃ '' সাময়িক বা ব্যাপক উপযোগিতা'' •inclusive fitness—
ক্রমশ পরিবর্ধন প্রয়াসের মাধ্যমে। এই ''উপযোগিতা'' কী? ক্রমশ বোঝার প্রয়াস প্রয়োজন। তাঁর পেপারের সারাংশ ঘোষিত—
"... a quantity is found the means of which incorporate the masimising property of Darwinian fitness. This quantity is termed 'inclusive fitness'. Species following the model should tend to evolve behaviou such that each organism appears to be attempting to maximise its inclusive fitness. This implies a limited restraint on selfish competitive behaviour and possibility of limited self-sacrifices." (লক্ষণীয় যে শেষে 'limited' শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত।)

Inclusive fitness (i.f.) শব্দটির অর্থ অনুধাবন (Sewall Wright প্রস্তাবিত) অপর এক মূল সংজ্ঞার প্রয়োজন ঃ degree of relatedness(r)
মানব প্রজাতির ক্ষেত্রে সন্তানের জীনোমে পৈতৃক ও মাতৃক অংশ সমান, অর্ধেক। অতএব, পিতা ও মাতা জ্ঞাতি সম্পর্ক-হীন হলে, ি পতা ও সন্তান এবং মাতা ও সন্তান, উভয় ক্ষেত্রে r=১/২ ভ্রাতা ও ভগ্নীদেরও (full Siblings)
r= ১/২ । এই পথে হিসাবে সহজেই দেখা যায় half-
siblings (সৎভাই, সৎবোন) এবং cousins (মামাত, পিসতুত ভাই বোন ইত্যাদি) এই দুই ক্ষেত্রে যথাক্রমে r = ১/৪ ও r = ১/৮। ক্রমশ দূর সম্পর্কে r ক্রমশ কমে।

এইবার আত্মত্যাগে জীনোমের লাভ ও ক্ষতির প্রশ্নে আসা যাক। সম্পূর্ন বংশলোপে ক্ষতি (cost,C)
ধার্য হবে ১। আত্মত্যাগের ফলে বংশের সম্ভাব্য বিস্তার ও স্থায়িত্ব আংশিক ব্যাহত যখন তখন C একটি ভগ্নাংশ । জীনোমের বিস্তারে . কোনো ক্ষতি যখন নেই তখন C শূন্য। অপরদিকে আত্মত্যাগের ফলে যারা উপকৃত হয় তাদের লাভ (benefit, B)
এই একই পদ্ধতিতে নির্ধারিত হবে— তাদের জীনোমের 'কপি' প্রজন্মাবলম্বনে প্রসারের সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে।

যত্র B ও r এর গুণফল C অপেক্ষা অধিক,
Br>C,
তত্র সামগ্রিকভাবে জীনোমের প্রজন্ম পরম্পরা সংখ্যাবৃদ্ধির, অর্থাৎ অধিকতর সংখ্যক কপি সৃষ্ট হওয়া সম্ভব।

Inclusive
fitness এই অর্থে বৃদ্ধিলাভ করতে পারে। এই মূল সূত্র অধূনাপ্রখ্যাত Hamilton's। ব্যক্তিবিশেষের আপাত-আত্মত্যাগ জীনোমে

র স্তরে প্রকৃতপক্ষে এরূপ ক্ষেত্রে লাভজনক।

আত্মত্যাগ ও পরোপকার প্রবণতা -প্রবুদ্ধ কারী যে সব জীন সমষ্টি, তারা ক্রমশ প্রসারিত হবে। ডারউইনীয় নির্বাচনে এই জীনোম ক্রমশ ব্যাপকতর ও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।

জীনোম সচেতন নয়। অভিসন্ধিমূলক ভাবে জীনোম পরিবাহক প্রাণীকে আত্মত্যাগে প্ররোচিত করে না। এই মতানুসারে প্রাণীর আচ রণ জীনোমের অস্তিত্বের ফল। জীনোম দ্বারা চরিত্রের বিবিধ প্রবৃত্তি ও প্রবণতার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ কি বিশ্বাস্য, সম্ভব? মানব প্রজা তির চেতনা ও সামাজ ব্যবস্থার জটিলতার কথা ভেবে অনেকের হয়তো এ কথা স্বীকার করতে মন চাইবে না। তখন প্রশ্ন ওঠে, অত্র কী শক্তি ক্রিয়াশীল?

অলৌকিক, ঐশ্বরী, কোনোপ্রকার তুরীয় transcendent—
শক্তির অস্তিত্ব স্বীকৃতি তখনি আলোচনা সমাপ্ত করে। অন্য কারণ অন্বেষণ নিষ্প্রয়োজন, সব কিছু সরাসরি সম্ভব হয়ে পড়ে। শেষো ক্ত অভিরুচির অবর্তমানে মানব-মস্তিষ্কের যে বিবর্তনের সঙ্গে হোমো সাপিয়েন্সের প্রসারিত চেতনা ও ভাষা ব্যবহারে পটুত্ব জড়িত সেই মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপের neurological ভিত্তির প্রশ্নে ফিরে যেতে হবে। সেই বিষয়ে মন স্থির করা প্রয়োজন। মস্তিষ্কের বিব র্তনের মাধ্যমেই মানব কৃষ্টি ও সমাজের উদ্ভব। অতএব সেই বিবর্তনে জীনোম ও পরিবেশের প্রভাবে কতদূর কী প্রকারে কার্যকরী হওয়া সম্ভব ও তাদের সম্পর্কের বিষয় বিচার ও বিশ্লেষণ সমুচিত? Nature / Nurture বিতর্ক এইভাবে উত্থিত হয়।
Nature/Nurture বিতর্ক সুপরিচিত। এ বিষয়ে পরে কিছু আলোচনা করব। আপাতত দেখা যাক হ্যামিলটনের মডেল আরও ক তদূর কার্যকরী হতে পারে। এর জন্য মনুষ্য প্রজাতি ছেড়ে Hymenoptera (পিপীলিকা, মৌমাছি, বোলতা) প্রসঙ্গে আসা যাক ঃ
“One of Hamilton’s great achievements was the discovery of an underlying genetic reason for the complex female-based societies of Hymenoptera.” (Treivers)
এই সাফল্যের কারণ হাইমেনপ্টেরার haplodiploidy. Unfertized
egg থেকে জন্মপ্রাপ্ত পুরুষ পিঁপড়ে বা মৌমাছি হ্যাপলয়েড্ অর্থাৎ মাত্র এক সেট ক্রোমোসোম সম্বলিত। কিন্তু স্ত্রী পিঁপড়ে বা মৌম াছি, মানব- প্রজাতির মতই, দুই সেট ক্রোমোসোম সম্বলিত ডিপ্লয়েড্। ফলে degree of
relatedness বা জীনেটিক নৈকট্য নির্দেশক জ-এর নূতন সম্ভবনা সমুহ সৃষ্টি হয়। পূর্ণ বিশ্লেষণের পরিবর্তে একটি মাত্র উদাহরণ দিই। মাতা ও কন্যার r=১/২ (মানব প্রজাতির মতোই)। কিন্তু দুই ভগ্নীর r= ৩/৪। ভলে হ্যাপলোডিপ্লয়ডি এই সব প্রজাতির স্ত্রীদে র (পুরুষদের নয়) পরার্থপরতার এমন কিছু বিশেষ সুযোগ প্রবণতা দেয় যা ডিপ্লয়ডি দিতে অক্ষম । যথা স্ত্রী পিঁপড়ে ও মৌমাছিদে র পক্ষে কন্যাসংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষা ভগ্নীসংখ্যা বৃদ্ধি inclusive fitness উন্নততর করে। Queen ant ও queen
bee-র সন্ততিদের প্রতিপালনে স্ত্রী কর্মীদের আচরণে এ অতিশয় দৃষ্টিগোচর। আরও বিবিধ প্রকার পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ সম্ভব। এ র সংক্ষিপ্ত, সহজ পাঠ্য বিবরণ লভ্য Robert Trivers-এর Social Evolution গ্রন্থের Haplodiploidy and the Evolution of the Social Insects শীর্ষক অংশে।

সমষ্টিভিত্তিক নির্বাচন? (Group Selection?)

হ্যামিলটনের বীজ নিবন্ধের মাত্র দুই বৎসর পূর্বে (১৯৬২) প্রকাশিত V.C. Wynne- Edwards-এর গ্রন্থ “Animal Dispersion in Relation to Social Behaviour” । দীর্ঘকালব্যাপী ব্যাপক প্রভাবশালী Group Selection(GS) মতবাদের এটি চরম প্রকাশ বলা যায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে দলের, সমষ্টির সামগ্রিক সাফল্যের ভিত্তিতেই দলের সদস্যদের আচরণ ও গুণাগুণ (পরার্থপরতা, আত্মত্যা গ-প্রবণতা, আক্রমণাত্মক আচরণ সবই) প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠত হয়। এই উপস্থাপনায় বিভিন্ন গুণাবলীর অি ধকারীর ব্যক্তিগত সাফল্য এবং সরাসরি বা নিকটস্থ জ্ঞাতিবর্গ মাধ্যমে জীনোমের প্রসার কেন্দ্রস্থানীয় নয়।

ডারউইন জীন ও জীনোমের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কিন্তু নির্বাচনে ব্যক্তিগত উপযোগিতা () ক্রমবর্ধনে তাঁর আস্থা ি ছল—ব্যক্তিগত লাভ
সমষ্টির পক্ষে সরাসরি লাভজনক না হলেও । অতএব GS তাঁর মতবাদ বলা যায় না ।

ডারউইনের দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্ট ব্যাপক অস্বাচ্ছন্দ্য ও অশান্তি এর প্রভাবরোধে বিবিধ প্রচেষ্টা উদ্ভুত করল। প্রথমত বলা হল বিবর্তন অ
লীক কল্পনা (কট্টর creationist মত) । যাঁরা ডারউইনীয় বিবর্তনের সপক্ষে পুঞ্জীভুত প্রমাণ স্রেফ অগ্রাহ্য করতে পারলো না তাঁে
দর একাংশ বললেন বিবর্তনের সামান্য অংশ natural
selection মাধ্যমে সম্ভব, এ বড়জোর ক্ষুদ্র এক অংশের জন্য দায়ী। তৃতীয় একদল ডারউইন প্রস্তাবিত ব্যাক্তিভিত্তিক নির্বাচন (se
lection acting on the individual) এড়িয়ে GS উপস্থাপনায় স্বস্তি পেলেন। তথাকথিত Social
Darwinist-দের নিষ্করুণ “struggle for existence”
-এর কবলমুক্ত হয়ে (অন্তত) মানব- প্রজাতির চরিত্র, আচরণ ও সমাজ সম্পর্কে ‘‘উন্নততর ’’ ধারণার আশ্রয়লাভ এই পথে সম্ভব
মনে হল অনেকের। হ্যামিলটনের ভাষায়, “ Confronted with common social exhortations, natural selection is easily accused of divisive and reactionary implications unless ‘fittest’ means the fittest species (man) and ‘struggle’ means struggle against natrue (anything but man)”
। এই মতবাদ প্রায় শতবৎসর ব্যাপী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হল।

অধুনা KS(Kin Selection)
মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করা সত্ত্বেও (KS-এর প্রবর্তকদের মধ্যেও) GS সম্পর্কে কিছু মতভেদ লক্ষ করা যায়। সেদিকে একটু নজর ে
দওয়া যাক।

ট্রাভারস্-এর দুটি প্রখ্যাত প্রবন্ধ (The evolution of reciprocal altruism Ý parental investment and sexual selection) ব্যাপক প্রভাবশালী। TFT ট্রাইভারস্-এর পারস্পরিক পরার্থপরতা বিশ্লেষণের computerized
model বলা যায়। এঁর, ছাত্রদের জন্য লিখিত, Social Evolution গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম সরাসরি “The Group Selection Fallacy”
। বিবিধ উদাহরণের দীর্ঘ বিশ্লেষণে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত ঃ প্রতি ক্ষেত্রে KS-ই মূলে ক্রিয়াশীল, GS সম্যক ব্যাখ্যায় অপরাগ। প
রার্থপরতা, আত্মত্যাগ, স্বার্থপর সহিংস আচরণ—সবই তিনি একই দৃষ্টিকোন অবলম্বনে ব্যাখ্যায় প্রয়াসী। এই উদাহরণ সমূহের স
ংক্ষিপ্ত বর্ণনার সার্থকতা দেখি না, একমাত্র বিশদ বিশ্লেষণই কার্যকরী। তবু বলি একটি উদাহরণ বিশেষভাবে ছাপ দেয় (Impress
ive) । এটি Infanticide in Langur Monkeys– Sarah
Hardy প্রমূখ ethologues কর্তৃক ভারতে হনুমান দলে শিশুহত্যা পর্যবেক্ষণ বিবরণ।

হ্যামিল্টন স্বয়ং কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ‘সামগ্রিক উপযোগিতা’ KS- গন্ডীতে সম্পূর্ণ আবদ্ধ রাখা সঙ্গত মনে করেননি। “Innate social aptitudes of man : An approach from evolutionary genetics”
তাঁর এক বিতর্কিত ভাষণ ও নিবন্ধ(১৯৭৫)। অত্র তিনি বলেন—
“Because of the way it was first explained, the approach using inclusive fitness has often been identified with ‘kiv selection’ and presented strictly as an alternative to ‘group selection’ as a way of establishing social behaviour by natural selection.”

তাঁর মতে দুই প্রকার নির্বাচনই সক্রিয় হতে পারে সমষ্টির প্রকৃতি ও সম্ভাব্য স্তর বিভাগ অনুযায়ী। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কয়েকটি দলে
র বৃহত্তর দলে একত্রিত হওয়া অথবা একদল ক্ষুদ্রতর দলে ভেঙ্গে যাওয়া— এই প্রকার বিবিধ সম্ভাবনার ফলাফল বিশ্লেষণ আবশ্য
ক।

এই পথে পদক্ষেপে তিনি যে গণিত ব্যবহার করেছেন তার মূলে George
Price আবিষ্কৃত এক সূত্র। এই গণিত দুরূহ না হলেও স্থানাভাবে বর্জিত হল। (প্রাইস্-এর বিচিত্র ব্যক্তিত্ব ও করুণ জীবন-কাহিনী বর্ণনার প্রলোভনও ক্ষুণ্ণমনে সম্বরণ করলাম।) শুধু বলি এই সুত্রে mean fitness দুই অংশের যোগফল ঃ intergroup (covariance) ও intragroup (expectation)
। প্রথমটি GS ও দ্বিতীয়টি KS নির্ধারন করে। দ্বিতীয়ের গুরত্ব সচরাচর অধিক হলেও প্রথমটি ধর্তব্য হতে পারে অবস্থানুযায়ী। এ
কটি সরল উদাহরন দেখা যাক। এ দলের সদস্যেরা বেশ কায়েমী, সহজে দলত্যাগ ও অন্যদলে বসতি করে না ছ “viscous groups”)
, তারা প্রায় সকলেই কালক্রমে পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে ওঠে সাধারণত। এখানে KS সহজেই প্রভাবশালী। অপরপে
ক্ষ ঘন ঘন স্থান ও দল পরিবর্তন জ্ঞাতিবহুল পরিবেশ গঠনের পরিপন্থী। কিন্তু পারস্পরিক সহযোগিতার সমূহ অভাব এইরূপ এক

সমষ্টিকে ক্রমাগত অভ্যন্তরীণ সংঘাতে অন্যদলের তুলনায় দুর্বল করবে। অতএব এই পরিপেক্ষিতে GS অপেক্ষাকৃত গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা গ্রহণ করতে পারে। এইরূপ বিবিধ সম্ভাবনার বিশ্লেষণ করেছেন হ্যামিলটন। কিন্তু গ্ধ্রপ্পনপ্তুব্ধপ্সু ত্নজ্ঞনন্তুন্দ্ব-এর গণিত গ্রাহ্য হলেও অত্র হ্যামিল্টনের ছxenophobia ও aggression বিষয়ক) কিছু মন্তব্য প্রতিবাদ, এমনকি ক্রুদ্ধ আক্রমণ, প্রজনিত করে ("reductionist, racist and ridiculous", "Fascist paper",...) ।

হ্যামিল অবশ্য GS-কে অযথা গুরুত্ব দিতে অসম্মত। সমুদ্রে মাছ, আকাশে পাখি, স্থলে তৃণভোজী পশু, এদের দলবদ্ধ সঞ্চরণের (herding habits) বিবিধ উদাহরণ সুবিদিত। Wynne-Edwards প্রমুখ 'GS-ওয়ালারা' বলবেন, এই সব দলের বহির্ভাগে স্থান প্রাপ্তেরা শিকারীজীবীদের (Predator-দের) আক্রমনের প্রথম হয়ে সমষ্টির উপকারে প্রাণ দেয় ও এই ভাবে group selection of altruism সম্ভব হয়ে ওঠে। আত্মত্যাগ নয়, স্বার্থপরতাই এই যূথবদ্ধ ব্যবহারের মূল—বললেন হ্যামিল্টন। দলের একেবারে ভিতরে ঢুকে নিজেকে বাঁচানোর প্রয়াসই প্রবল, যারা প্রবেশে সক্ষম হয় না তারাই বহির্ভাগে থেকে ধরা পড়ে এবং এই ঠেলাঠেলি যূথের গঠন ও আকার সৃষ্টি করে। এই প্রমাণের উদ্দেশ্যে হ্যামিলটন কয়েকটি mathematical models প্রস্তাব করলেন। এই পেপারটির শিরোনাম এর মুখরোচক গণিতের আভাষ দেয় ঃ
"Geometry of the Selfish Herd"
এটিও কালক্রমে এক "citation classic" হয়ে ওঠে (একবার প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর)।

বন্ধুত্ব, সহানুভূতি ঃ

এতদূর জীনোম মাধ্যমে উপচিকীর্ষা নির্বাচন আলোচনা করা গেল। এরই সংশ্লিষ্টভাবে নীতিবোধের অন্য কয়েকটি দিক উপস্থাপিত করেছেন ট্রাইভারস্ (Social Evolution) । তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে (কিছু মন্তব্য সহযোগে) পেশ করি।

বন্ধুত্ব (Friendship) ঃ

সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কে পারস্পরিক সহায়তা সহজ, স্বাভাবিক করে এবং এই দেওয়া-নেওয়া বন্ধুত্ব গাঢ়ত্ব করে ("a two-way street)
। অতএব বন্ধত্বস্থাপন ও পরোপকার প্রবণতা একত্রে নির্বাচিত হয়ে পরস্পরকে বলশালী করায় সক্ষম। এবং কোনোভাবে সুপ্রতিষ্ঠত হলে জ্ঞাতি ও ঘনিষ্ঠ পরিচিতগণের গন্ডী অতিক্রম সম্ভব। নিঃসম্পর্ক, অপরিচিতের বর্জন অবশ্যম্ভাবী নাও থাকতে পারে।

ন্যায়পরায়ণতা প্রজনিত আক্রমণাত্মক ক্রোধ (Moralistic aggression)

পরার্থপরতা, আত্মত্যাগ, বন্ধুপ্রীতি, এইরূপ প্রবণতা সমূহ কার্যকরী হওয়ার প্রকৃষ্ট উপায় এদের সহিত ওতপ্রোত বিজড়িত গভীর আবেগ ছemotionগ্ন সৃজন ও অনুভবের উপযোগী কেন্দ্রসমূহের বিবর্তন মাধ্যমে মস্তিষ্কে আবির্ভাব। এইরূপ সংশ্লিষ্ট আবেগসমূহ অন্যের ক্ষতি উপেক্ষা করে লাভবান হওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে জাগ্রত হয়ে শাস্তি বিধানের দাবী করতে পারে। সমাজ, সমষ্টির আত্মরক্ষার পদ্ধতিরূপে এই প্রতিক্রিয়ার নির্বাচন সম্ভব।

এইরূপ বিবিধ উদাহরণ সম্পর্কে Matt Ridly বলেন— "All in all, the human ecotions looked to Trivers like the highly polished tool-kit of a reciprocating social creature." (The Origins of Virtue)

কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতি (Gratitude and Sympathy)
পরেপকারীর ত্যাগের পরিমাপ হিসাবে কৃতজ্ঞতা ও প্রার্থীর প্রয়োজনের পরিমাপ হিসাবে সহানুভূতির পরোপকারের "cost/benefit ratio"
নির্ধারকরূপে কার্যকরী ও ফলত বির্তনে নির্বাচিত হতে পারে। নিখুঁত হিসাবনিকাশের সন্ধান অবশ্য অত্যধিক আকাঙ্খা। কৃতজ্ঞতা ও সহানুভূতি প্রায়শ অত্যধিক, অত্যল্প বা স্রেফ অনুপস্থিত হতে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সর্বক্ষেত্রেই এরূপ সতর্কবাণী (উচচারিত বা অনুচচারিত) প্রযোজ্য। কারণ, জীনোম প্রসারের মাধ্যমে নির্বাচন নিখুঁত যন্ত্রের মতো কাজ করে না। (পরবর্তী ''সতর্কীকরণ'' শীর্ষক অংশে এই প্রসঙ্গে আলোচিত।) উপরন্তু এই ক্ষেত্রে অপর এক কারণে লাভ/ক্ষতি বিচারে সতর্কতা প্রয়োজন। Robert

Wright এক গ্রন্থে (The Moral Animal - Why we are the way we are : The new science of evolutionary psychology) উপস্থাপিত করেছেন এক সংজ্ঞা ঃ non-zero-sumness।
পরোপকারীর ''ঋণাত্মকলাভ''(ক্ষতি, ত্যাগ) ও উপকৃতের ''ধনাত্মক লাভ'', এই দুই-এর যোগফল শূন্য না হলে game theory-র ভাষায় একে বলা হবে "a non-zero-sum game"। বাস্তবে এর উদাহরণ সহজলভ্য। ক্ষুধার্তকে, দুঃস্থকে খাদ্য, অর্থ সাহায্যে দাতার ত্যাগ স্বীকার সামান্য হলেও অবস্থার গুরুত্ব অনুযায়ী উপকৃতের প্রচুর লাভ হতে পারে। সুসময় ফিরে এলে ঋণশোধ (ধরা যাক, কিছু সুদ সহকারে শোধ) কোনো সমস্যা নাহতে পারে। এক্ষেত্রে দুপক্ষই পরিণামে লাভবান এবং সম্ভবত কৃতজ্ঞতা ও বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ। এর বিরীত উদাহরণও দুর্লভ নয়। এতএব অতিরিক্ত সরল হিসাববিকাশের মনোবৃত্তি বর্জনীয়।

অপরাধবোধ (Guilt)
এক পক্ষের প্রতিদানের দায়িত্ব এড়িয়ে শুধু লাভবান হয়ার চেষ্টায় পারস্পরিক সহযোগ অসম্ভব, সামাজিক ভারসাম্য বিপর্যস্ত হয়। স্বার্থপরতা ও প্রতারণার উদাহরণ যে কতই সহজলভ্য তা বলা নিস্প্রয়োজন। তবুও আংশিক প্রতিবন্ধকরূপে নির্বাচিত হওয়া সম্ভব দোষীর অপরাধবোধ ও মূল্য শোধের আকাঙ্খা (reparative altruism)। কারণ, এই প্রবণতার অতিরিক্ত হ্রাসে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ কলহে ও সমসযায়, সমষ্টির বিবর্তনে স্থায়িত্ব (evolitionary stability) ক্ষুণ্ণ ও বিলুপ্তি আসন্ন হওয়া সম্ভব।

ন্যায়বিচারবোধ (Sense of Justice)
মানবসমাজে reciprocal altruism জটিলতর হয়ে ওঠে যখন তা "multi-party"। যখন ত্যাগের প্রতিদান পরোক্ষভাবে বিভিন্ন খাতে ঘুরে পাওয়ার প্রত্যাশা থাকে। (যথা সরকারি দপ্তরে কর দিয়ে সমাজের, রাষ্ট্রের বিবিধ রক্ষাব্যবস্থায় লাভবান হওয়ার প্রত্যাশা।) এই multiparty altfuism (সব সমস্যা, ত্রুটি সত্ত্বেও) কিছুটা কার্যকরী হতে হলে সমষ্টির সদস্যদের ব্যবহারের মান নির্ণয়ের ব্যবস্থা প্রয়োজন (standard against which to judge the behaviour of others গ্ন । এই সূত্রে উদ্ভূত ন্যায় বিচারবোধের দুটি অঙ্গঃ ন্যায়সঙ্গতি বিষয়ক সাধারণভাবে গ্রাহ্য ধারণাসমগ্র (sense of fairnessগ্ন এবং অসঙ্গত ব্যবহারের প্রতিকার প্রয়াস (বিচার ব্যবস্থা)।

ট্রাইভারস্-এর ভাষায় ঃ “Moral philosophers contend that a social arrangement is judged as fair when an individual endorses it without knowledge of which position in the arrangement the individual will occupy”.

John Rawls-এর প্রখ্যাত গ্রন্থে ন্যায়বিচারের মূল সংজ্ঞা fairness এবং “In a just society the liberties of equal citizenship are taken as settled;... (A Theory of Justice) ।

Evolutionary sociobiology এই sense of fairness-কে transcendent ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত না হয়ে নব-ডারউনীয় নির্বাচনে এর উদ্ভব কীভাবে কতদূর বোধগম্য সে বিষয়ে মনোযোগী। ন্যায়বিচার বাস্তবে কেন এত সহজে, এত ব্যাপকরূপে বাধাপ্রাপ্ত, পথভ্রষ্ট তা বোধ ও প্রতিকারের সম্ভাবনা হয়তো বর্ধিত হবে উৎসসন্ধানের ফলস্বরূপ। বৈজ্ঞানিক বোধ সচরাচর দেয় অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন ক্ষমতা । এ ক্ষেত্রে দেবে কি?

যৌন নির্বাচন (Sexual selection) ও মানবমস্তিষ্ক ঃ

আমার এই প্রবন্ধের নানা ত্রুটির মধ্যে হয়তো প্রধানতম হবে যৌন নির্বাচনের সম্যক আলোচনার অভাব। তার মূখ্য কারণ, যে সব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠ ও পাঠান্তে চিন্তা (আমার ''অ্যামেচারি'' কৌতূহলের পক্ষেও) আবশ্যক মনে হয় তা এখনও সম্ভব হয়ে ওঠে নি। হ্যামিলটনের Collected papers-এর দ্বিতীয় খন্ডছNarrow Roads of Gene Land, Vol.2, Geoffrey Miller লিখিত The Mating Mindþ ও Matt Ridley-র The Red Queen — অন্তত এগুলি পাঠের অভিপ্রায় আছে অদুর ভবিষ্যতে। অপর পক্ষে যতটুকু পঠিত তারাও বিশদ আলোচনার স্থানাভাব। এই অবস্থায়ও কিছু মন্তব্য না করে উপায় নেই।

ডারউইন একে এতই গুরুত্ব দিতেন যে natural selection ও sexual selection
পৃথক রূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। অধুনা প্রথমটি সচরাচর বিস্তৃততর অর্থে ব্যবহৃত ও দ্বিতীয়টি তার অংশ হিসাবে গণ্য।

ট্রাইভারস্-এর বীজ নিবন্ধ "Parental Investment and Sexual Selection"
এই ক্ষেত্রে নব-ডারউনীয় চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান প্রবর্তক। Robert Wright তাঁর The Moral
Animal গ্রন্থের প্রথম অংশে ছPart one: Sex, Romance and Love) ডারউইন, ডেসমন্ডমরিস্ ছ The Naked
Ape-এর লেখক), ট্রাইভারস্ প্রমূখের চিন্তার আলোচনা (ও সমালোচনা) করেছেন। এই বিষয়ে সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব ও অপলাপ সম্পর্কে প্রভূত 'theorizing' অবশ্যম্ভাবী, এই বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রবেশ না করে আমি অন্য একটি বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু মন্ত ব্য করব। Miller-এর The Mating Mind সম্পর্ক এক বন্ধুর সঙ্গে কথোপকথনে যা জেনেছি সেইটুকু মাত্র অবলম্বনে।

মানবমস্তিষ্কের আশর্চ্য, অদ্ভূত সমৃদ্ধির মূলে কি? প্রাকৃতিক নির্বাচনে অস্তিত্ব অক্ষুন্ন ও সংখ্যাবৃদ্ধি অব্যাহত থাকা— এই যথেষ্ট জীনে ামের প্রসারের পক্ষে। শুধু এর জন্য মানব মস্তিষ্কের পূর্ণ শক্তি কি একান্ত আবশ্যক? অন্যথায় সেই অতিরিক্ত শক্তির উৎস কী? মি লারের সঘোষিত উত্তরঃ যৌন নির্বাচন। প্রাণীজগতে এই পন্থায় উদ্ভূত আতিশয্যের প্রভূত নিদর্শন সহজলোভ্য। ময়ূরপুচ্ছ স্বচ্ছন্দ ও দ্রুত ওড়ার সহায়ক নয়। ফলে খাদ্যান্বেষণে বা বিপদে পলায়নে সমস্যার কারণ। এ একটি উদাহরণ মাত্র। শতবরণের ভাব-উচ্ছ াস কলাপের মতো বিকাশে সক্ষম মানব মস্তিষ্কও কি sexual parade প্রসূত?

অবশ্যই এ বিষয়ে প্রভূত বিতর্কের অবকাশ। যৌন নির্বাচনে সচরাচর স্ত্রী ও পুরুষদের ক্ষেত্রে স্পষ্টত ভিন্ন ফল হয়। শুধু ময়ূর পেখ ম, ময়ূরী নয়। অথচ মানব প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই মস্তিষ্ক অনুরূপ সমৃদ্ধ। সমতুল্যভাবে বিবর্তিত। ভাষাব্যবহারে সক্ষম মতি স্ক অবশ্যই প্রজাতির প্রজাতির প্রাধান্য ও প্রসারের বিশেষ সহায়ক। ফলিত বিজ্ঞানের বিপজ্জনক অপব্যবহার সম্ভব হলেও বর্তমা ন জনসংখ্যা(অতএব মানব জীনোমের এত সংখ্যক 'কপি') এর উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল। এই বিজ্ঞান মানবমস্তিষ্কের অবদান। হয়তো মিলার এই সব প্রশ্নেরই আলোচনা করেছেন— পরে জানব।

কিন্তু এও সত্য যে মানবমস্তিষ্ক সরল, সহজ, নিশ্চিন্ত অস্তিত্বকে বিড়ম্বিত ক'রে গভীর existential সমস্যাসমূহ সৃষ্টি করে। অস্তিত্বে র পরম কারণ, চরম সার্থকতা অন্বেষণে teleology- তৃষিত মানবমস্তিষ্ক। জীনোমের প্রসার লাভের মহস্ত্ররূপে বিবর্তিত মস্তিষ্ক প্র য়োজনাতিরিক্ত(?) জটিলতা অর্জনান্তে প্রশ্ন তোলে "Why there is something rather than nothing?"
মস্তিষ্ক এবম্বিধ কেন?

Edward O. Wilson-এর ভাষায়, "The essence of humanity's spiritual dilemma is that we evolved genetically to accept one truth and discovered another." (Consilience) ।
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নব-ডারউইনীয় বিবর্তনবাদী বলবেন অস্তিত্বপীড়ার প্রতিকার বা আংশিক উপশমের উপায় হিসাবে নির্বাচিত হতে আরম্ভ করল মস্তিষ্কের mythopoeic (মিথিক্ উপাখ্যান প্রজনন) ক্ষমতা। ঈশ্বর, আত্মা, পরলোকে বিশ্বাস অস্তিত্বপীড়া লাঘব করে। গৌ রচন্দ্রিকায় বর্ণিত Newberg ও সহকর্মীদের 'neurotheological' গবেষণা যে গ্রন্থে উপস্থাপিত তার শিরোনাম, Why God Won't Go
Away জ্ঞঞ্জনা যাওয়ার কারণ, বিবর্তনের পথে অস্তিত্বক্লিষ্টদের জীবনে রুচি রাখার সহায়ক আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও চিন্তা জীনোমে র মাধ্যমে নির্বাচিত ও দৃঢ়মূলে প্রোথিত।
মানবমস্তিষ্কের বিবর্তনের সব রহস্যের চাবিকাঠি হাতের মুঠোয় এই প্রত্যয় না হলেও এই সব চিন্তাধারা, পরিক্ষা ও বিশ্লেষণ আমা র মস্তিষ্কে গভীর কৌতুহল, আগ্হ সৃষ্টি করে। আমার নিজের জীনোম ঠিক কী ধরনের ভাবছি।

জীনোম/পরিবেশ বা সহজার/শিক্ষিত (Nature/Nurture) বিতর্ক ঃ
মানবপ্রজাতি সম্পর্কেই অবশ্য এই ক্ষেত্রে প্রবল মতবিরোধ ও বিতর্ক ব্যাপক। প্রতিজনের আচরণ, মানসিকতা, মানসিকতা, ব্যক্তি ত্ব কতদূর জন্মসূত্রে প্রাপ্ত জীনোম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও কতদূর পরিবেশ, সমাজ, সংস্কৃতি নির্ভর? এই প্রশ্নের আংশিক আলোচনা জীনে ামভিত্তিক সৃষিতকোণ থেকে কিছু করেছি। বিপরীত মতবাদের এক সুবিদিত উপস্থাপনা Steven Rose, R. C.
Lewontin ও Leon J. Kamin লিখিত এক গ্রন্থে। এর বক্তব্য শিরোনামে প্রকট,
Not In our Genes

এই ত্রয়ীর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য E. O. Wilson ও তাঁর গ্রন্থ Sociobiology : The New Synthesis । দুই পক্ষেই অবশ্য আরও অনেক যুযুধান।

এই তিক্ত, উগ্র, অন্তহীন বাদানুবাদের ''সমাজতত্ত্ব'' লভ্য) মনে করেন। আমি এটি 'গেগসে' পড়েছিলাম, কিন্তু, এর বিশদ আলোচনা অত্র অসম্ভব। অধিকন্তু আমার ধারণায় Ullica Segerstrale লিখিত এক গ্রন্থে Defenders of the Truth সমাজতাত্ত্বিক উল্লিকার দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণা সার্থক। তিনি দু'পক্ষেরই অনেকের সঙ্গে সৌজন্য, এমনকি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনান্তে বৎসরের পর বৎসর সাক্ষাৎ ও আলোচনা চালিয়ে গেছেন। সব পুস্তক ও পেপার তাঁর পঠিত। বহু বিতর্কসভা ও কনফারেন্সে তিনি উপস্থিত। এই পরিবেশে বিজ্ঞানীদের গবেষণায় তাঁদের ব্যক্তিগত রুচি ও জীবনদর্শনের প্রভাব এই বৃহদায়তন, গুরুভার গ্রন্থের উপপাদ্য বিষয়। প্রতিজন শুধু নিজেকেই এবং নিজ মতালম্বীদের সত্যসংগমী (defenders of the truth) মনে করেন। আমি এটি 'গেগসে' পড়েছিলাম, কিন্তু, এর বিশদ আলোচনা অত্র অসম্ভব। অধিকন্তু আমার ধারণায় Lewontin প্রমুখ কয়েক গোঁড়া মার্ক্সপন্থীর politically correct হওয়ার অভীপ্সা গবেষণার উপর অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে । নিম্নে বর্ণিত উপস্থাপনা আমার গভীরতর ও চিত্তাকর্ষক বোধ হয় । তার সংক্ষিপ্ত আলোচনাও নিরর্থক হবে না।

সহজাত/শিক্ষিত (instinct/learning) বিরোধ অন্বেষণ না করে কিঞ্চিদধিক শতবৎসর পূর্বে (১৯৮৬) James Mark Baldwin এক গুরভার নিবন্ধে (dense and philosophical) উভয়ের সমন্বয় ও পারস্পরিক পরিপূরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই বিবর্তনবাদীর মতে "Heredity provides for the modification of its own machinery." শতাব্দীব্যাপী অবহেলার পর সম্প্রতি কয়েকজন Computer Scientist এই নিবন্ধকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। কারণ, 'Artificial intelligence' সম্ভাব্য করে তোলায় মানবমস্তিষ্কের উপর এই দৃষ্টিপাত সাহায্য করতে পারে।

কীভাবে এই সমন্বয় কার্যকরী হয়? বিগত প্রচেষ্টা সমূহের স্মৃতি ধরে রাখায় অক্ষমতা নূতন শিক্ষা অসম্ভব করে। এই স্মৃতি ভাণ্ডার গঠনের মাধ্যমে জীনোম পরিবেশের উপযোগী নূতন শিক্ষা অর্জন সম্ভব করে।

গবেষকদের পরম সহায়, রোমান্টিক ল্যাটিন নাম প্রাপ্ত (Drosophila, অর্থাৎ 'প্রভাত - শিশির-প্রেমী') অতি ক্ষুদ্র ফলের মাছিদের ''স্মৃতির জীন'' প্রথম localized হয়। Jonathan Weiner লিখিত Time, Love, Memory গ্রন্থে এই আবিষ্কারের মনোগ্রাহী বিবরণ লভ্য। এখন মানব ক্রোমোসোমে স্মৃতি ও নূতন শিক্ষা অর্জনে প্রয়োজনীয় জীনসমূহ (CREB, CREBBP, alpha-integrin প্রভৃতি) কী পন্থায় কার্যকরী তা ক্রমশ বোধগম্য। প্রতি দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ synaptic connection বা দৃঢ়তররূপে সৃষ্টি ও স্থাপনার অত্যাবশ্যকীয় কর্মে রত এই জীন সমূহ । এরা বা এদের কোনোটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে শিক্ষা-ক্ষমতার হ্রাস বা লুপ্তি সম্ভব।

বল্ড্উন-এর মতে সবই সহজাত (instinctive) হলে পরিবর্তনশীল পরিবেশে প্রয়োজনীয় নূতন শিক্ষা সম্ভব হয় না। অপরপক্ষে সর্বক্ষেত্রে (যথা সহসা বিপদে) ধীরে সুস্থে শিক্ষার্জনের সুযোগ মেলে না। অতএব বিবর্তনে নির্বাসিত সফলতর জীনোম এমন মস্তিষ্ক গড়ে তোলে যা আংশিকভাবে সহজাত ক্ষমতাসম্পন্ন (rigid) ও আংশিকভাবে শিক্ষা অর্জনে পটু (supple)। সংক্ষেপে এইরূপে nature ও nurture মিলে মিশে কর্মরত। আমরা জীনোম দ্বারা কতদূর নিয়ন্ত্রিত তা (যতদূর জ্ঞাত) আশ্চর্যজনক। কিন্তু জীনোমই আবার পরিবেশের প্রভাবে যথোপযুক্ত পরিবর্তন (শিক্ষার মাধ্যমে) সম্ভব করে তোলে। আমাদের সামাজিক ব্যক্তিত্ব জীনোম দ্বারা কতদূর প্রভাবিত, সে বিষয়ে গবেষেণা সক্রিয়। যথোপযুক্ত আলোচনা অত্র সম্ভব নয়।

Matt Ridley -এর ভাষায় ঃ

"The brain is created by genes. It is only as good as its innate design. The very fact that it is a machine designed to be modified by experience is written in the genes. The mystery of how is one of the greatest challenges of modern biology. But that the human brain is the finest monument to the capacities of the genes there is no doubt. it is the mark of a great leader that he knows when to delegate. The gene knew when to delegate."(Genome)

Ridley তাঁর জীনোম গ্রন্থের ‘Free Will’ শীর্ষক অধ্যায়ে উৎকৃষ্ট তুলনামূলক আলোচনা করেছেন কীভাবে দুই পন্থায় determinism হাজির হতে পারে— জীন দ্বাবা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ দ্বারায়িন্ত্রণ। না, জীন নয় পরিবেশই আমাদের গড়ে তোলে—এই বললেই free will অধিষ্ঠিত করা হয় না। একদৃষ্টিকোণ থেকে বরং বলা যায় আমার জীনোম আমার অভ্যন্তরে, আমার নিজস্ব। পরিবেশের প্রভাব অমোঘ বলার অর্থ বহির্জগৎ দ্বারা আমরা নিয়ন্ত্রিত। মানব সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব এই পরিবেশের অংশ—এই অর্থে পরিবেশ শব্দটি ব্যবহৃত।

এ বিষয়ে সম্যক আলোচনা অত্র সম্ভব নয়। তবু একটি বিষয়ে চমকে দেওয়া (ওরে বাবা! তাই নাকি!) খবর উল্লেখযোগ্য। ভ্রূণ মাতৃজঠরে, জরায়ুতে যে পরিবেশপ্রাপ্ত হয় তা প্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ। সেই পরিবেশ গঠনে মাতার X ও পিতার Y ক্রোমোসোমের (Y যখন উপস্থিত) সম্পূর্ণ সহযোগিতার পরিবর্তে কোনো কোনো বিষয়ে রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। একপক্ষ অত্যধিক প্রভাবশালী হয়ে কুফল সৃষ্টি করতে পারে। জীবনের প্রারম্ভেই Nature ও Nurture এই ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। Ridley-র গ্রন্থ ও Hamilton-এর কিছু পেপার ব্যতীত এই সূত্রে (আমার অপঠিত) একটি গ্রন্থের উল্লেখ করি— Evolution : the four billion year war (M.Magerus, B. Amos and g. Hurst)

তিনটি সতর্কীকরণ ঃ

Robert Wright তাঁর The Moral Animal গ্রন্থের পরিশিষ্টে ছAppendix : Frequently Asked Questionsগ্ন জীনোমের প্রসারলাভের বিরোধী (অন্তত আপাতবিরোধী) আচরণ সমূহের আলোচনা করেছেন। জন্ময়িন্ত্রণ, সমকামিতা ও আত্মহত্যা কয়েকটি বাছাই উদাহরণ। এসব ক্ষেত্রে স্পষ্ট মনে হয় জীনোমের প্রসারের তোয়াক্কা না রেখে বিপরীত পথ অনুসৃত। কোনো ক্ষেত্রে নব-ডারউইনীয় ব্যাখ্যা কতদূর সম্ভব তার আভাস উল্লিখিত পরিশিষ্টে লভ্য। পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে জীনোম সম্পর্কে ব্যাপকতররূপে প্রযোজ্য কয়েকটি মন্তব্য করতে চাই।

(ক) ঃ

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের জীনোম বিবিধ আশর্চ্য ক্ষমতার অধিকারি হয়ে উঠলেও সম্যক পর্যবেক্ষনে অদ্ভুতরকম জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানোর মতন গড়ে তোলা মনে হয়। নিখুঁত maximal efficiency দূরের কথা, শতকরা সাতানববই ভাগ(৯৭ক্ষগ্ন ‘‘ আবর্জনা ’’ (junk DNA) আমাদের জীনোম দখল করে বসে আছে! শতকরা মাত্র তিন ভাগ (৩ক্ষ) প্রয়োজনীয় প্রোটিনসমূহ সংশ্লেষণে অংশগ্রাহী। শুধু তাই নয়, ব্যাপার আরও ঘোরাল। Reverse transcriptase এক অস্বস্তিকর উদাহরণ। এই জীন বেশ স্থান প্রমুখ করে আছে মানব জীনোমে এবং এরা না থাকলেই ভাল হত মনে হয়। AIDS প্রমুখ retrovirus-দের ই জীন এক অত্যাবশ্যক অংশ। বিবর্তনের পথে বিবিধ retrovirus মানবপ্রজাতির জীনোমে এই জাতীয় (বর্তমানে সাধারণত নিষ্ক্রিয়) জীন জড় করেছে। Ridley-এর গ্রন্থের ‘Self-Interest’ শীর্ষক অধ্যায় এই বিষয়ে বেশ কিছু ঘাবড়ে-দেওয়া খবর দেয়।

“If you think being descended from apes is bad for your self-esteem, then get used to the idea that you are also descended from viruses.” (Genome)

যে ৩ক্ষ জীন প্রোটিন সংশ্লেষণে রত তাদেরও কর্মপন্থায় ‘the most elegant solution’ অন্বেষণে হতাশ হতে হয়। একটি বিখ্যাত উদাহরণ দিই।

DNA-এর four-letter(A, C, G, T) code কী পন্থায় প্রোটিনের বিংশিত amino acids-এর ‘বিশ-অক্ষর’ কোডে অনূদিত হয় এই বিষয়ে গভীর চিন্তার পর Francis Crick তাঁর ‘comma-free code’ উপস্থাপিত করেন। সম্যক ব্যাখ্যার স্থানাভাবে শুধু বলি এর সুচারু সৌষ্ঠব আগ্রহ সৃষ্টি করলেও ন্দপ্রন্ধান্দজনপ্পন্দব্ধ প্রায় পাঁচ বৎসর পরে বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল। আপশোষ - সহকারে কেউ কেউ বলেন এটি “the greatest wrong theory in history”

ক্ষ প্রাকৃতিক নির্বাচন অন্য এক “less elegant code containing redundancy” প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পদার্থবিদ্যার মূল সূত্র-সমূহের অন্বেষণে mathematical elegance প্রায়শঃ পথপ্রদর্শক। জীনোমের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ভুল - ভ্রান্তি হজম করে কাজ চালিয়ে যায়, এরূপ এক পন্থা আবির্ভুত হয়ে স্থায়িত্ব লাভে সক্ষম। আরও উন্নত পন্থা অন্বেষণের অবকাশ থাকে না।

এই সব কথা ভাবলে জীনোমের সর্বত্র, সর্বদা নিখুঁতভাবে কার্যকরী না-হওয়া আশর্চ্য মনে হয় না।

ত্মএকটি কথা লেখার ইচ্ছা সম্বরণ করব না। এই junk DNA বিজ্ঞানীরা এক অপ্রত্যাশিত কাজে লাগিয়েছেন ঃ ‘genetic fingerprinting’। শরীর ‘functional role’ নেই বললেই এই জাঙ্ক অজস্র প্রকারে এলোমেলোভাবে জড়ো হতে পারে। ফলে দুই ব্যক্তির এই ‘অকেজো’ অংশ অভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। অতএব রেখে যাওয়া এর চিহ্ন (এর সাক্ষ্য) প্রকৃত দোষীকে নির্দেশিত ও নির্দোষীকে অন্যায় বিচারের কবলমুক্ত করার সহায়ক। পশু, পক্ষীর ব্যবহার পর্যবেক্ষণেও এর সাহায্য নেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ৰ

(খ) ঃ

কৃষিকার্য ও জনপদগঠনে রপ্ত হওয়ার পূর্বে অতি দীর্ঘকাল মানব প্রজাতি ছিল ‘huntergatherer’—শিকার ও কুড়ান যাদের জীবনধারণের উপায় । এই ‘নিষাদ’-স্তরে কার্যকরী গুণ ও প্রবণতা সমূহ ক্রমশ বিবর্তনে নির্বাচিত। কিন্তু মস্তিষ্কের (পূর্বালোচিত) ক্রমবর্ধমান শক্তি যে কেবল মাত্র অতি ভিন্ন জীবনযাত্রা ও পরিবেশের সৃষ্টি করেছে তাই নয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগের তুলনায় পরিবেশের পরিবর্তন অতি দ্রুত। জীনোমের স্বাভাবিক বিবর্তন এর সঙ্গে তাল রেখে চলায় অক্ষম। প্রবল এক্স-রে বা ঐ জাতীয়, সাধারণত ক্ষতিকারক, কৃত্রিম কারণ ব্যতীত জীনোমের স্বল্প পরিবর্তন নির্বাচনও বহু প্রজন্মব্যাপী প্রক্রিয়া। অতএব আধুনিক পরিবেশ ও বিবর্তনের পথে নির্বাচিত জীনোমের অসঙ্গতির উদাহরণ দুর্লভ না-হওয়া আশর্চ্য নয়। একটি উদাহরণ দেখা যাক।

অভ্যন্তরীন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কসূত্রে একত্রিত দুই প্রাগৈতিহাসিক নিষাদল সংস্পর্শে এলে সন্দেহ, সংঘাত সম্ভাব্য । এই সংঘাতে সাফল্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিবর্তনে নির্বাচিত আক্রমণাত্মকপরগোষ্ঠিবিদ্বেষ আজও ব্যাপকতর xenophobia রূপে ক্রিয়াশীল। কিন্তু এখন পৃথিবীর সর্বত্র সর্বদা যাতায়াত সম্ভব ও স্বাভাবিক। ফলে একদিকে দুরদেশে, জ্ঞাতি -গোষ্ঠিমন্ডলীর বহু দূরে উপচিকীর্ষার উদাহরণ (যথা, আফ্রিকা, আফগানিস্থানে কর্মরত ‘Medecins du Monde’ বা আমেরিকানদের ভাষায় ‘French Doctors’) ও অপরদিকে ধর্মের নামে দূরদেশে হত্যাকান্ড— সবই সম্ভব। এই সব ক্ষেত্রে জীনোমিক উত্তরাধিকারের ভূমিকার আলোচনা সম্ভব হলেও সহজ নয়।

(গ) ঃ

তৃতীয় হুঁশিয়ারি ভিন্ন প্রকৃতির। নব-ডারউইনীয় বিবর্তন আলোচনায় ভাষায় কোনো কোনো আলঙ্কারিক ব্যবহার, কিছু রূপক ও “teleological shorthand”(Ridley) সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। পুনারাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়ে বলি Ricahard Dawkins-এর প্রখ্যাত গ্রন্থের ততোধিক প্রখ্যাত শিরোনাম ‘The Selfish Gene এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জীন স্বার্থপর নয়। অস্বার্থপরও নয়। চেতনাবিহীন অণুসমষ্টি জীনোম কোনো লক্ষ্য স্থির করে তত্র উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টারত নয়। জীন নির্বাচন করে না। নির্বাচিত হয় নব-ডারউইনীয় বিবর্তনের মাধ্যমে। এ সবই প্রকট সত্য। Dawkins এ বিষয়ে অবশ্যই সম্পূর্ণ সচেতন। ধাক্কা দিয়ে এক বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত তাঁর গ্রন্থের শিরোনাম। বিজ্ঞপ্তি জারী ঃ আমাদের সচেতনরূপে নির্বাচিত কাম্য লক্ষ্যসমূহে পৌঁছে দেবার ভার নেবে না জীনোম। সফলতর জীনোমের আধার ও পরিবাহক প্রাণীদের সংখ্যাবৃদ্ধি হবে। তাদের, বিশেষত মানব প্রজাতির, অন্য লক্ষ্যে উপনীত হবার আর্তি বিবর্তনের মোড় ঘোরাবে না। এই অর্থে জীনোম প্রাণীদের ‘‘ ব্যবহার ’’ করে। এই অর্থে জীন ‘‘স্বার্থপর’’। দৃষ্টি-আকর্ষক ছcatchyগ্ন শিরোনামের উদ্দেশ্য এই।

কোনো কোনো দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিজয়গর্বে ঘোষণা করেণ (একাধিক দৃষ্টান্ত আমার নজরে এসেছে)—‘‘দেখ, এক মূলগত ভ্র

ান্তি ধরিয়ে দিচ্ছি। চেতনাবর্জিত জীন কীভাবে স্বার্থপর হবে!'' এই স্তরে Dawkins-এর শব্দ ব্যবহার বোধগম্য না হওয়া গৌরবজনক নয়। কিছুটা করুণ ।

জীনোম এই জাতীয় ক্ষমতা, প্রবণতা, নির্বচণ করে, এই পথে বিবর্তন ঘটায় — এইরূপ 'teleological shorthand' প্রতিবার ভেঙ্গে বিশদভাবে ব্যাখ্যা ক্লান্তিকর। মনে পড়ে বাল্যে শোনা, ''নাও! হল তো! আবার তরমুজ কেটে ফালি ফালি করো।'' তবে মাঝে মাঝে এই কর্ম প্রয়োজনীয়। অতএব, (গ)।

উপসংহার ঃ
দটি উদ্ধৃতি ঃ

"Now, I say : human being and in general any being endowed with reason, exists as an end in itself, and not simply as a means to be used according to its wish by such or such a will...." (Immanuel Kant, "Metaphysics of Moral I, Foundations... .")

(আমর পঠিত ফরাসি অনুবাদের এই অনুবাদে ত্রুটি সম্ভাব্য।)

"We are survival machines–robot vehicles blindly programmed to preserve the selfish molecules known as genes. This is a truth which still fills me with astonishment. Though I have known it for years, I never seem to get fully used to it." (Richard Dawkins, The Selfish Gene.)

এই জুড়ি অপেক্ষা প্রকটতর thesis/antithesis দুর্লভ । কোথা থেকে কোথায় এসেছি! Dawkins-এর selfish-রূপক ব্যবহার (সতর্কবাণী (গ)), মানবমস্তিষ্কের বিবর্তনপথে অর্জিত অতিরিক্ত শক্তি, বল্ড্উইন উপস্থাপিত সহজাত/শিক্ষিত সমন্বয়— এই সব সম্পর্কে যা সীমিত আলোচনা সম্ভব হয়েছে
তার মধ্যে হয়তো এক () -এর আভাস সন্ধান সম্ভব। জীনোমের ভূমিকা সম্পর্কে যথাসম্ভব জ্ঞানার্জন সম্ভবত, অন্তত আংশিকভাবে, তার প্রভাবের গন্ডী অতিক্রমে সহায়ক হবে।

আরও দুটি উদ্ধৃতি ঃ

"And thus, without doubt, we do not understand the unconditional practical necessity of the moral imperative, but in any case we understand its incomprehensibility.... ."

(Immanuel Kant, Metaphysics of Morals, I, Foundations... .)
"He who understands the baboon would do more tqwards metaphysics than Locke." (Charles Darwin, Notebooks.)

অত্র Locke -এর পরিবর্তে Kant বসানোর প্রস্তাবে ডারউইন আপত্তি করতেন মনে হয় না। নিছক অন্তর্দর্শনের ছintrospectionগ্ন মাধ্যমে মনুষ্যচরিত্রের সর্বসমস্যা-সমাধান-তৎপর প্রতি দার্শনিকের নাম গ্রাহ্য ।

Descarts-এর প্রভাব কাটিয়ে Locke তবু বহির্জগতের প্রতি কিছুমাত্রায় 'empirical' দৃষ্টিপাতে উদ্যোগী। এই হিসাবেই হয়তো তাঁর নাম ডারউইন বেছে নিয়েছিলেন। 'না, এও যথেষ্ঠ নয়', হয়তো উহ্য ছিল তাঁর নোটবুকে।

অপর পক্ষে সব ছেড়ে বেবুনকে বোঝার আর্তি কেন? বোঝা কঠিন নয়। এদের দলগত আচরণে বেশ কিছু সামাজিক বিধানছ social codeগ্ন বিভিন্ন স্তরে পর্যবেক্ষিত। মানবসমাজের পূর্ণ জটিলতা সরাসরি ব্যাখ্যার দুরাশা (সাময়িকভাবে?) একপাশে সরিয়ে রেখে এই অপেক্ষাকৃত সরল সমাজ ব্যবস্থা ও পারস্পরিক সম্পর্কের মূল সূত্রসমূহের যথাসম্ভব সম্পূর্ণ বোধ ও ব্যাখ্যা অগ্রগতির পথে এক পা।

বেবুন, শিম্পাঞ্জী, গরিলা এবং আরও বিবিধ গোষ্টির জীনোম ও আচরণ সম্পর্কে অধুনা অর্জিত জ্ঞান ডারউইনকে আশ্বস্ত করত। হ্যাঁ, পথ এখনও দীর্ঘ, তবে ঠিক পথে পা ফেলছি। এক লম্ফে তূরীয় জ্ঞান বগলদাবা করার তালে না থেকে—'হাঁটি, হাঁটি, পা, পা,। প্রয়োজন অনুযায়ী এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অভিযান চলবে দশকের পর দশক, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, শতাব্দীর পর শতাব্দী...., আরও... ।

শুধু দার্শনিক মহলে নয়, সর্বত্রই বিবর্তনবাদীদের প্রায়শঃ শুনতে হয় ''কই হে! মানব সমাজ সম্পর্কে সব কিছু এক চোটে ব্যাখ্যা ক রতে তো পারছ না। তবে করছটা কী?''— ধৈর্য সহকারে শুনে যেতে হবে।

শুধু ধৈর্য নয়, ভ্রান্তি স্বীকারে, এখনো বুঝিনি বলায় সদ প্রস্তুতি অপরিহার্য। ডারউইন স্বয়ং এ বিষয়ে আদর্শ। প্রয়োজনমতো সরল, স্পষ্টভাবে বলতেন, ''আমি এখনো বুঝিনি, ভবিষ্যতে হয়ত এর ব্যাখ্যা সম্ভব হবে।'' Francis Crick -এর নিজ প্রস্তাবিত এক ''সুন্দর'' মডেল (পূর্বে উল্লিখিত comma-free code) সম্পর্কে স্বচ্ছ, সতর্ক দৃষ্টি উৎককৃষ্ট উদাহরণ ঃ "The argumesnts and assumptions which we have had to employ to deduce this code are too precarious for us to feel much confidence in it on purely theoritical grounds... ."

তাঁর অতীব elegant মডেল শেষে ভ্রান্ত প্রমানিত ও অন্য সমাধান কার্যকরী হল। পরীক্ষামাধ্যমে ভ্রান্তি প্রমাণের সম্ভাব্যতা (যার তোয়াক্কা দার্শনিকদের র াখতে হয় না।) বিজ্ঞানে অপরিহার্য। অন্যথা শব্দসর্বস্ব প্রশ্নের শব্দসর্বস্ব উত্তর পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের বিপুল শক্তির গভীর উৎস এইখানেই— ভ্রান্তি প্রমাণ সম্ভব।

বিংশ শতাব্দীর শেষে E.O.Wilson লিখছেন,

"Had Kant, Moore and Rawls known modern biology and experimental psyshology they might not have reasoned as they did. Yet as this century closes, transcendentalism remains firm in the heart, not of just religious believers but also of countless scholars in social sciences and humanities, who, like Moore and Rawls, have chosen to insulate their thinking from the natural sciences." (Consilience)

উজানে কাল-স্রোত পাড়ি দিয়ে কান্ট-কে পাকড়াও করে বললাম, ''শ্রদ্ধেয় ইম্মানুয়েল বাবু, আইনস্টাইনীয় আপেক্ষিকতাবাদ এসে আপনার space and time নামক categories যা আপনার মতে ছnon-dynamicগ্ন বেধড়ক খারিজ হয়ে গেছে। আর নবডারউইনীয় সন্ধানী আলোকসম্পাতে আপনার Categorical imperatives সম্বলিত নৈতিক বিধান কিরকম যেন পাংশু দেখাচ্ছে। তবে কী জানেন, অস্তিত্বপীড়া লাঘবকারী তুরীয়-তৃষ্ণা মানব চেতনায় এত দৃঢ়মূল যে আপনার শিষ্যবৃন্দ সহজে প্রভাব হারাবে না।''

তিনি আমার কথায় কান দিলেন না।

বাঙালি মধ্যবিত্ত, আত্মকেন্দ্রিকতা ও বিপর্যয়ের ভূমিকা

শিবনারায়ণ রায়

।।:এক:।।

অধিকাংশ বাঙালি কি ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে, এমনতরপ্রশ্ন নিয়ে বিবেচনা করতে গেলে প্রথমেই দুটি মুখ্য-শব্দেরজাতার্থ এবং ব্যক্তার্থ স্পষ্ট করা দরকার। ''অধিকাংশবাঙালি'' বলতে কাদের কথা ভাবছি? কোন কোন মনোভাব তথা আচরণ''আত্মকেন্দ্রকতা''-র নিশ্চিত লক্ষণ?

দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমার ধারণা যে যখন আমরাঅধিকাংশ বাঙালির কথা বলি বা ভাবি বা সে সম্পর্কে লিখি তখন প্রকৃতপক্ষে যারা ''অধিকাংশ'' বাঙালি তাদের কথা আমাদেরমনে থাকে না। চাষী, জেলে, মাঝি, জোলা, কারিগর, মিস্ত্রি, স্কুল-কলেজনা-যাওয়া ঝি-বউ, বস্তি-ঝোপড়া এবং খালের দুধার থেকে যাদের নগর-উন্নয়নেরনামে বারবার উচ্ছেদ করা হচ্ছে তারা, খনির অথবা কলকারখানার মজুর,ফিরিওয়ালা, যৌনকর্মী, অকড়িয়া বা উঞ্ছজীবী বা পাতকুড়ানিস্ত্রীপুরুষ— বাংলা তাদের মাতৃভাষা হলেও এসব আলোচনায় তারা ক্বচিৎ''অধিকাংশ'' বাঙালির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। আসলেআলোচনা যাঁরা করেন অথবা সে বিষয়ে যাঁরা লেখেন এবং তাঁদের সে সবআলোচনা যাঁরা শোনেন বা সে সব লেখা পড়েন, তাঁরা প্রায় সকলেইসমাজের একটা বিশেষ স্তরের অধিবাসী। এঁরা বাবু বা ভদ্রলোক, অধিকাংশইএসেছেন পিতৃপুরুষের সূত্রে ঐতিহ্যস্বীকৃত ''উঁচু জাত''থেকে, সমাজতত্ত্বের ভাষায় এঁরা নিম্নমধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ।(উচচবিত্তদের এঁদের মধ্যে ধরছি না, কারণ এসব আলোচনায় তাঁরা ক্বচিৎকাল ব্যয় করেন)। এঁরা কমবেশি শিক্ষিত, কেউ কেউ খুবইউচ্চশিক্ষিত, কারো কারো দেশবিদেশে গতাগতিও আছে। কিন্তু এঁরানিশ্চয়ই সংখ্যার হিসাবে ''অধিকাংশ'' বাঙালি নন, যদিও অনেকসময়ে এঁদের বিশেষ সমস্যাগুলিকে এঁরা অধিকাংশ বাঙালির সমস্যা বলে অথবাভেবে নিজেদের স্তোক দেন। দেশ স্বাধীন (এবং বঙ্গদেশ বিভক্ত) হবারঅর্ধশতাব্দী পরেও পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা বাস্তবে ''অধিকাংশ'' বাঙালি, ''ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়া'' মোটেই তাঁদেরবিশেষ লক্ষণ বা সমস্যা নয়। টিঁকে থাকাটাই তাঁদের জীবনের প্রথমএবং প্রধান সমস্যা— এবং তারই অবম সর্ত হিসেবে দু'বেলাপেটভরার মতো খাদ্য, মাথার ওপরে নির্ভরযোগ্য ছাউনি, ছেলেমেয়েদেরকিছুটা অন্তত শিক্ষার আঞ্জাম, ব্যাধিতে চিকিৎসা এবং দাওয়াই,নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটানোর একটা নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা, এসবধান্দা নিয়েই তাঁরা বিপর্যস্ত। বিভিন্ন সূত্র থেকে যতটুকু খবর পাই,সারা ভারতে এই দুরবস্থদের সংখ্যা শুধু বাড়ছে না, তাদের সামনে আলোরকোনো চিহ্নও বিশেষ দেখা যাচ্ছে না। এই হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ মোটেই ব্যতিক্রম নয়।বরং অধিকাংশ মানুষ যাঁরা সমকালীন পশ্চিমবঙ্গীয় সমাজের এবংআর্থ-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার নিচের তলার বাসিন্দা, তাঁদেরঅবস্থা ভারতের আরো বেশ কয়েকটি রাজ্যর তুলনায় বর্তমানে আরোদুর্বিষহ। টিঁকে থাকার প্রয়োজনেই তাঁদের দরকার সাঙাতি, সহযোগ,সমাজব্যবস্থার পড়োশিদের সঙ্গে আত্মীয়তা। আত্মকেন্দ্রিকতার বিলাস তাঁদেরক্ষেত্রে প্রায় অকল্পনীয়।

অবশ্য একই সূত্র থেকে এ সংবাদও মেলে যে গত পঞ্চাশ বছরেভারতে মধ্যবিত্তদের আর্থিক অবস্থার লক্ষণীয় রকমের উন্নতি ঘটেছে।পশ্চিমবঙ্গ এ ব্যাপারেও ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানে এই রাজ্যের রাজধানী এবংপ্রধান মফস্বল শহরগুলিতে মধ্যবিত্তদের ঘরে মাত্রাতিরিক্ত বিলাস-সামগ্রী এবংতাদের জীবনযাত্রায় অপ্রমিত বিলাস-ব্যসনের প্রসার লক্ষ না করেউপায় নেই। পশ্চিমের উদ্ভাবিত বেশির ভাগ বিলাস-সামগ্রীই এখন কলকাতারমস্ত মস্ত বাতানুকূল দোকানবাজারে মেলে এবং তাদের জন্যস্থানীয় খরিদ্দারের অভাব হয় না। অর্থাৎ নিচের তলায় অন্ধকার যেমন জমাটবাঁধছে এবং বিস্তৃত হচ্ছে, ওপরদিকে তেমনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীও বিবর্ধমান এবংতাদের জন্য ভোগ্যপণ্যের সরবরাহও প্রাচুর্যে ও বৈচিত্রে চিত্তচমৎকারী।দ্রুত উপচীয়মান সরকারি আমলা এবং ফাটকাবাজ, জমির কারবারি এবংরাজনৈতিক দলনেতা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপক এবং জনপ্রিয়ঔপন্যাসিক বা কথাসাহিত্যিক, সমাজসেবার নামে নানা বেসরকারি উদ্যোগেরকর্মকর্তা, ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কার, খবরের কাগজের মালিক এবং বিভিন্নসংস্থার উঁচু পদের কর্মচারি, উকিল, ডাক্তার, প্রযুক্তিবিদ এবংপ্রাইভেট টিউটর— তালিকা বাড়াবার দরকার নেই— যেমনসমকালীন ভারতবর্ষের অন্যান্য কোনো কোনো রাজ্যে, তেমনইকমিউনিস্ট-শাসিত পশ্চিমবঙ্গে এদের প্রায় নিরঙ্কুশ রবরবা।রাতের বেলা পার্ক স্ট্রিট অঞ্চল ঘুরে এলে মনে হতেই পারে লন্ডন, পারি,বার্লিন বা নিউ ইয়র্কের মতো কলকাতাও এক অঢেল ফুর্তির শহর। এবংযাঁরা নিম্নমধ্যবিত্ত তাঁদের মধ্যে অনেকেরই একান্ত বাসনা— যেটিতাঁদের ছেলেমেয়েদের মনে সঞ্চারিত করে দিতে তাঁরা ব্যাকুল— সেটি হলকোনো না কোনো ভাবে মধ্যবিত্তের ঐ সম্ভোগসম্পন্ন পর্যায়ে যত দ্রুত উঠেযাবার। তার জন্য শক্তিমান এবং বিত্তবানদের চামচাগিরি, ফেরেববাজি ওছল চাতুরি, প্রবঞ্চনা বা শরারতি, সবকিছুই চোখ খুলে কিংবা বুজে মেনেনেওয়া চলে যদি উদ্দিষ্ট উন্নতি করতলগত হয়।

আর এখানেই আমাদের আলোচনায় দ্বিতীয় শব্দটির প্রসঙ্গএসে পড়ে। ''আত্মকেন্দ্রিক'' বলতে কী বোঝায়? এবং যদিঅধিকাংশ বাঙালি আত্মকেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁকে তাহলেই বা এত দুশ্চিন্তাকেন এবং কাদের? আত্মকেন্দ্রিক অর্থ নিশ্চয়ই অহংকারী নয়:;ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অত্যন্ত অহংকারী পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁকেতো কোনোভাবেই আত্মকেন্দ্রিক বলা চলে না। বঙ্গদেশে এমন পরার্থপর মানুষ আরক'জন জন্মেছেন? আলু-পটল বিক্রি করার কথাটি হয়তোকিম্বদন্তী, কিন্তু তাঁর অস্মিতা যেমন কখনো কোনো শক্তিমান

ব্যক্তি বাপ্রতিষ্ঠানের কাছে মাথা নত করে নি, তাঁর হৃদয় এবং কর্মশক্তিতেমনই সর্বদাই অসহায় এবং আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যার্থে ব্যাপৃত ছিল।অপরপক্ষে যাঁরা আত্মজিজ্ঞাসু, আত্মদীপ, এমনকি আত্মমগ্ন তাঁদের সম্পর্কেওআত্মকেন্দ্রিক শব্দটি অপ্রযোজ্য মনে হয়। বিপরীতপক্ষে তাঁরাই যথার্থআত্মকেন্দ্রিক যাঁরা শুধু নিজেদের স্বার্থ, সুখ-সুবিধা, খ্যাতি-প্রতিপত্তিনিয়েই নিত্য ব্যাপৃত ; যাঁরা অপরের সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ,সুবিধা-অসুবিধা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ; যাঁরা অপরকে শুধু নিজেদেরপ্রয়োজন- সাধনের উপায়মাত্র বিবেচনা করেন। কোনো সমাজে এমনস্ত্রীপুরুষের সংখ্যা দ্রুত এবং প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে তা সকলেরপক্ষেই দুশ্চিন্তার বিষয় বটে। বিশেষ করে এই''আত্মকেন্দ্রিক'' ব্যক্তিরা যদি হন সমাজের মাথা এবংপথনির্দেশক।

এখন আত্মা বলে কোনো কিছু থাক বা নাই থাক, প্রতিব্যক্তিই অন্তত শারীরসূত্রে অপর ব্যক্তি থেকে অনিবার্যভাবে স্বতন্ত্র। কিন্তুস্বতন্ত্র হলেও কোনো ব্যক্তিই আত্মসম্পূর্ণ নয়। বস্তুত, স্থূল শারীরিক বিচারেদুই ব্যক্তির সংগম ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তির উদ্ভব অসম্ভব (এমনকি সম্প্রতিবিজ্ঞানের কল্যাণে যারা টিউব বেবি রূপে জগতে প্রবেশ করে, তাদেরক্ষেত্রেও দুজনের সহযোগ আবশ্যিক সর্ত।) আরজন্মের পর প্রতিপালন এবং বিকাশের জন্য ব্যক্তিকে নিয়তই বহুজনেরওপরে নির্ভর করতে হয়। মনুষ্যত্ব বিকাশের যা প্রধান অবলম্বন—ভাষা— তা একটি সমাজের সামূহিক অবদান, কোনো একটি ব্যক্তির—তা সে তিনি যত প্রতিভাবানই হন— নিজস্ব উদ্ভাবন নয়। তাছাড়া শুধুমা-বাবা, পরিবার, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক, সহকর্মী এবং সমাজ নয়,প্রকৃতির বিবিধ দান— আলো, জল, হাওয়া, মাটি, গাছপালা— ছাড়াব্যক্তির অস্তিত্ব এবং বিবর্ধন অকল্পনীয়। ফলত বিশুদ্ধ আত্মকেন্দ্রিকতারচর্চা শুধু মর্তুকামেই পরিণতি পেতে পারে।

কিন্তু যদিও ব্যক্তির অস্তিত্ব অনিবার্যভাবেই অপর-নির্ভর, এবিষয়ে বিবৃদ্ধ এবং কর্মান্বিত চেতনা গড়ে উঠতে সময় লাগে, অনেকেরক্ষেত্রে সে চেতনা সামান্য বিকাশের পর থেমে যায়। শিশু যতদিন শিশু থাকেততদিন সে প্রায় নিশ্চিন্তভাবেই ধরে নেয়, এ জগত তার সুখের জন্যইরচিত। ক্রমে, কিছু আগে কিছু পরে, সে টের পেতে শুরু করে যে, এইবিশ্বজগত, এমনকি তার পারিবারিক-সামাজিক :পরিপার্শ্বও তার তৃপ্তিবিধান বা নিরাপত্তার জন্যই বিশেষভাবেরচিত হয় নি বা পরিচালিত হয় না, এই জগতের নিজস্ব নিয়ম-নির্দেশ আছে,তাকে অগ্রাহ্য করলে বিপদের অথবা শাস্তির আশঙ্কা আছে। কিছুটাঅভিজ্ঞতা, কিছুটা শিক্ষার সূত্রে সে বোঝে যে আমরাসামাজিক-প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে যা পাই তার যোগ্য হবার জন্যপরিবর্তে আমাদেরও কিছু দেবার দায়িত্ব আছে। এই দায়িত্ববোধ মানসিকবয়ঃপ্রাপ্তির প্রথম সোপান। কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য, দেহে বাড়লেওঅনেকের মানসিক বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটে না, অথবা ঘটলেও বেশিদূর এগোয় না। এইদুর্ভাগ্যের নানা কারণ আছে, এখানে তা নিয়ে আলোচনা করব না। তবে এটাসুনিশ্চিত যে-সমাজ অপরিণতবুদ্ধি মানুষদের দ্বারা চালিত তার অবক্ষয়অনিবার্য, কালক্রমে তার বিলোপও ঘটতে পারে।

স্বার্থপরায়ণতার যে অর্থে আত্মকেন্দ্রিক শব্দটির এখানে গ্রহণকরেছি, সেই অর্থে সম্ভবত সব স্ত্রীপুরুষই কিছুটা আত্মকেন্দ্রিক (শৈশব অবস্থায় সবক্ষেত্রেই এটি স্পষ্ট), কিন্তু বিত্তবানদের ক্ষেত্রেএই বৃত্তিটি যত প্রকট এবং প্রবল, দরিদ্রসাধারণের মধ্যে ততটা নয়।যাদের অর্থবল নেই সমাবস্থার স্ত্রীপুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে জড়িতহওয়া তাদের টিঁকে থাকার জন্যই জরুরি। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্তরাউচ্চমধ্যবিত্তের মতো বেপরোয়া নয়। তাঁদের ভিতরে যখন আত্মকেন্দ্রিকতা খুবপ্রবল হয়ে ওঠে, তখন তাঁদের অন্তর্গত কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তির টনকনড়ে। তবে সংকটটা যে শুধু তাঁদের নয়, পুরো সমাজের এই ভাবেই তাঁরাসেটাকে দেখেন এবং দেখাতে চান। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্তপরিবারগুলির মধ্যে এই ধরনের একটা সংকটবোধ সম্প্রতিকালে দেখাদিয়েছে— তার হেতু এবং সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে আলোচনার অবশ্যইপ্রয়োজন আছে।

।।:দুই।।

বাঙালি সমাজ আগাগোড়াই বহুভাগে বিভক্ত ছিল— আঞ্চলিক,ধর্মীয় জাতপাঁতের বিভেদ ইত্যাদি— কিন্তু উনিশ শতকে ইংরেজ শাসনেরসূত্রে এদের ভিতর থেকেই একটি বিশেষ শ্রেণী ক্রমে উদ্ভূত হয়, যাদের বর্তমানেপ্রচলিত সাধারণ নাম মধ্যবিত্ত। ইংরেজি শিক্ষা এবং ইংরেজ শাসন ওইংরেজি ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে সহযোগিতাই ছিল এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের সূত্র।ঐতিহ্যিক প্রাধিকারে যাঁরা বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের উচ্চ বর্ণের তথাজাতির মানুষ মুখ্যত তাঁরাই—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য এবংস্বল্প সংখ্যায় নবশাখের অন্তর্গত কিছু উদ্যোগী ব্যক্তি—এই বিশেষশ্রেণী গড়ে তোলেন। পশ্চিমের বুর্জোয়াদের সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্তের একটা বড়পার্থক্য ছিল। একেবারে গোড়ার দিকের কয়েকজনকে বাদ দিলে ইংরেজ শাসনপ্রতিষ্ঠা হবার পর এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই : ব্যবসাবাণিজ্যে লক্ষ্মীর সন্ধান করেন নি।তার একটা কারণ ঔপনিবেশিক পরিবেশে এদেশী মানুষের পক্ষে ব্যবসাবাণিজ্যেসফল হবার সম্ভাবনা ছিল কম:; কিন্তু অন্য বড় কারণ এঁদের মনেজমিদারির মোহ এবং ব্যবসাবাণিজ্যে গভীর অনীহা। মোদ্দা বাঙালি মধ্যবিত্তর একটাপ্রধান অংশ শহরবাসী জমিদার, চাকুরীজীবি, সরকারি অথবা বেসরকারিবিদেশী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারি। তাছাড়া ইংরেজি-উচ্চশিক্ষানির্ভর কিছু পেশাও এঁদের আকৃষ্ট করে ; অনেকেই ছিলেনশিক্ষক, উকিল, ডাক্তার এবং সাংবাদিক। উনিশ শতকে এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি মধ্যবিত্তদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য।মুসলমান ধর্ম-নেতারা ছিলেন ইংরেজি শিক্ষার বিরোধী:; আরমুসলমানদের মধ্যে যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষ নিজেদের আসরফ বা অভিজাতবিবেচনা করতেন তাঁরাও দীর্ঘদিন অভিমানবশত নবাগত শাসকদের সঙ্গে বিশেষসহযোগ করেন নি। ফলত উনিশ শতকে সারা ভারতে ইংরেজ শাসন বিস্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নবোদ্ভূত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেশ কিছু ব্যক্তি (যাঁরাপ্রায় সকলেই পরম্পরাসূত্রে উচ্চবর্ণের হিন্দু) নতু

ন শাসকদেরতল্পিবাহক হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েন। অবিভক্ত বঙ্গদেশে, বিশেষ করেনতুন রাজধানী কলকাতায়, ইংরেজ রাজ ছত্র এবং ব্যবসাবাণিজ্যের আশ্রয়ে যাঁরা বেশকিছু গুছিয়ে নেন তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন মুখুজ্জে, বাড়ুজ্জে, চাটুজ্জে,ঘোষ, বে াস, মিত্র, দত্ত, সেনগুপ্ত, দাশগুপ্ত ইত্যাদি পদবীধারী হিন্দুউচ্চবর্ণের লোক। এঁদের চরিত্র যে খুব আকর্ষণীয় ছিল না সমকালীন সংব াদপত্র,এবং বিভিন্ন কাহিনীতে এবং নক্সায় তার পরিচয় মেলে।

কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা শুধু দু'পয়সা রোজগারের পথখুলে দেয় নি। যে সব ভাবনাচিন্তার ফলে রেনেসাঁসের সময় থেকে পশ্চিমীসমা জসংস্কৃতি আলোড়িত হচ্ছিল, যাদের ধাক্কায় মধ্যযুগের সংকীর্ণ এবং অন্ধকারচৌহদ্দি ভেঙ্গে ইয়োরোপের এক একটি দেশের উদ্যো গী মানুষরা পৃথিবীরদিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, ইংরেজি শিক্ষার সূত্রে সেই সবভাবনাচিন্তা বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু চিন্তাশ ীল লোকের মনেওআলোড়ন তোলে। এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্যদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেবহুমুখী জ্ঞান চর্চা, বেন্থা মের উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজসংস্কারক বিবিধ কর্মোদ্যম, টম পেইন-এর মানবীয়অধিকারতত্ত্বের বৈপ্লবিক ঘোষণা এবং বু দ্ধির মুক্তি আন্দোলন, জনস্টুয়ার্ট মিলের অভিজ্ঞতানির্ভর আরোহী যুক্তিবাদ এবং নরনারীর সাম্যেরপ্রস্তাব— এ সবের ধাক্কা এসে লাগে বাঙালি তথা ভারতীয় সাবেকিচিন্তার জগতে। আর এই ধাক্কার ফলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর থেকেকিছু মানুষ ধর্মীয় সংস্কার, সামাজিক সংস্কার, ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ,আধুনিক শিক্ষার প্রসার, নারীদের অবস্থার উন্নতি, এইসব নানাউদ্যোগে অ নুপ্রেরিত হন। সংখ্যাল্প হওয়া সত্ত্বেও এঁদেরউদ্যোগ-উদ্যমের ফলে বঙ্গদেশের বিশেষ করে সাংস্কৃতিক জীবনে যা ঘটেতাকেই বলা হ য় বঙ্গীয় রেনেসাঁস। বাঙালিদের মধ্যে এই ঐতিহাসিক নবনির্মাণের প্রথমউদ্যোক্তা রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁরই পাশাপাশি ত রুণ ইউরেশিয়ানশিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। এঁদেরই যথার্থ উত্তর-সাধকঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, র‍্যা ডিক্যাল ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন,বাংলা কবিতার বিপ্লবসাধক মাইকেল মধুসূদন এবং বাংলা গদ্যসাহিত্যেরনির্মাতা ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র, দুঃসাহসী সমাজসংস্কারক দ্বারকানাথগাঙ্গুলী এবং দুর্গামোহন দাস, বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রচারক মহেন্দ্রলাল সরকার,আদর্শবাদী সম্পাদক ও সংবাদসেবী দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের পথপ্রদর্শকশশীপদ বন্দ্যোপাধ্য ায় এবং আরো অনেকে। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সব চাইতে যেটিমূল্যবান এবং স্থায়ী কৃতি সেটি হল মাত্র একশো বছরের মধ্যে বাংলা ভাষা ওসাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ ; মহাপ্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথেররচনাবলীতে রেনেসাঁসের এই দিকটির পরাকাষ্ঠা দেখি। কিন্তু স ঙ্গে সঙ্গেএকথাও স্মরণীয় যে সমাজসংস্কারের যে সব বিবিধ প্রচেষ্টা উনিশশতকে দেখা যায়, কয়েক দশক ধরে যার নেতৃত্বে এসেছি ল মুখ্যত ব্রাহ্ম আন্দোলনথেকে, সেগুলি না ঘটলে সংকীর্ণবুদ্ধি এবং বিলাসপ্রবণ বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দুহুতোমি জগতেই আবদ্ধ থাক ত, তার একটি উল্লেখ্য অংশ বঙ্গ তথা ভারতেরইতিহাসে আধুনিক যুগের নেতৃত্ব দিতে পারত না। আধুনিকতার যে মহামন্ত্রফরাসী বি প্লবের সময়ে ঘোষিত হয়— স্বাধীনতা, সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ব বামৈত্রীর সেই আদর্শ— বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একাংশের মাধ্যমে তাযতটা প্রভাব ফেলেছিল সম্ভবত ভারতের অন্য কোনো অঞ্চলে তেমনপ্রভাব ফেলে নি।

কিন্তু বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মূল ত্রুটিগুলিও কিছুঅপ্রত্যক্ষ নয়। এই আদর্শগুলি বাইরে থেকে আমদানি করা, ভিতরথেকে স্ফূরিত হয়ে ওঠে নি। বিদেশী শাসনের অধীনে থাকার ফলে এ দেশেরনেতারা সম্পূর্ণ ভাবে স্বনির্ভর হতে শেখেন নি ; প্রতিটিসমাজসংস্কারের প্র স্তাবকে আইনসঙ্গত এবং কার্যকরী করবার জন্যতাঁদের বেশিটাই নির্ভর করতে হয়েছে শাসকদের সম্মতি ও সমর্থনেরওপরে। তাছা ড়া এইসব ধ্যানধারণা তাঁদের মননকে উজ্জীবিত করলেও প্রায়ক্ষেত্রেই তাঁদের জীবনচর্যার গভীরে স্থান পায় নি। ফলে আধুনিকজ্ঞা নচর্চার ভিত্তিতে উচ্চ শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে বটে,কিন্তু সমাজের নিচের দিকের প্রধান অংশ প্রাথমিক এবং মাধ্যমিকি শক্ষার সুযোগ এবং অধিকার থেকেও বঞ্চিত থেকে গেছে। উচ্চশিক্ষারসুযোগ তাদের ক্ষেত্রে একান্ত দুরাশা। বিশেষ করে স্ত্রীলোক দেরভিতর শিক্ষার প্রসার খুব ধীর গতিতে এগিয়েছে, এবং ফলে বহুসংস্কারকের পরিবারের বাইরের দিকে যতটা আধুনিক চিন্তারপ্র ভাব দেখা যায়, তার তুলনায় অন্দরমহলে তার আলো খুব সীমাবদ্ধক্ষেত্রেই ছড়িয়েছে। এইসব ত্রুটির ফলে রেনেসাঁসের ভিতর দি য়ে যেব্যাপক এবং সুগভীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব সূচিত হওয়ার কথা তাএদেশে ঘটে নি। সমাজের প্রধান অংশই রয়ে গে ছ অভাব, অসাম্য এবংদৃঢ়প্রোথিত কুসংস্কারের অন্ধকারে। এবং নিম্নস্তরের জীবনেপ্রতিষ্ঠিত সে ব্যাপক অন্ধকার উপরের তলার আ লোকেওস্বপ্রতিষ্ঠ হতে দেয় নি।

তথাপি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেপরবর্তী আশি বছরে অবিভক্ত বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ একটি সামাজিক ত স্তর গড়েউঠেছিল যাদের অভিধা ছিল ভদ্রলোক এবং যাদের রীতিনীতি আচার আচরণেযুক্তিশীলতা, নীতিবোধ, সংযম, জ্ঞানচর্চা, প রহিতৈষিতা, সামাজিক ওপারিবারিক দায়িত্ববোধ ইত্যাদি কিছু গুণ আবশ্যিক চর্চার বিষয় হিসেবেস্বীকৃতি পায়। সম্প্রতিকালে তথা কথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেঅনেকেই এই ভদ্রলোক অভিধাটিকে অশ্রদ্ধেয় করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরাসম্ভবত সচেতনভা বেই বিস্মৃত হন যে বঙ্গদেশীয় সমাজসংস্কারকদের সকলেই যেমন ছিলেন এই ভদ্রলোক গোষ্ঠীরঅন্তর্ভুক্ত, তেমনি পরে বিশ শতকের গোড়ায় যাঁরা স্বদেশী আন্দোলনে এবংসমাজবিপ্লবের প্রচেষ্টায় অত্যন্ত বিপৎসঙ্কুল পথ বেছেনিয়েছিলেন তাঁরাও প্রায় সকলেই এসে ছিলেন এই ভদ্রলোক গোত্রীয় জগতথেকে। শুধু সাহিত্যে, শিল্পে, জ্ঞানচর্চায় এবং আধুনিক শিক্ষা বিস্তারেনয়, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে এবং সমাজের আমূল পরিবর্তনে যাঁরাপ্রাণপাত করেছিলেন তাঁরা বঙ্গীয় রেনেসাঁসেরই সন্তান বাঙালিভদ্রলোক। তাঁরা ে কউ কেউ মধ্যবিত্ত, অধিকাংশই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকেএসেছিলেন ; বিশের দশক থেকে কিছু কিছু শিক্ষিত মুসলমান এবংশি

ক্ষতা নারী যোগ দিলেও এই সব আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা ছিলউচ্চবর্ণের শিক্ষিত হিন্দু পরিবারের আদর্শবাদী যুবকদের। শুধু নিজেরস্বার্থ নয়, শুধু আপন আত্মীয় পরিবারের লাভ-ক্ষতির হিসেব নয়, দেশের এবংদশের স্বার্থ তথা কল্যাণ এঁদের চিন্তার এবং ক্রিয়াকলাপের বিষয় ছিল।এই ভদ্রলোকদের জগতে আত্মপরায়ণ শুভনাস্তিক্য চারিত্রিক দার্ঢ্য এবংআদর্শবাদের অনুপ্রেরণাকে গ্রাস করতে পারে নি।

আমি যে সালে জন্মাই জাতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন তখন তুঙ্গে,এবং আমার শৈশবে এবং বাল্যকালে আমি এমন বেশ কিছু স্ত্রীপুরুষ দেখেছি যাঁরাদেশের স্বাধীনতার জন্য সবকিছু বিসর্জন দিতে এবং প্রাণের ঝুঁকি নিতেপ্রস্তুত। তারপর তারি পাশাপাশি দেখা দিল সাম্যবাদের আদর্শ। বিশেরদশকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের একাগ্রচিত্ত প্রচেষ্টায় এবং অক্লান্তপ্রচারের ফলে শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে কিছু বিবেকবান ব্যক্তিজাতীয় স্বাধীনতা এবং সমাজবিপ্লবের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন হয়েকমিউনিস্টআদর্শ গ্রহণ করেন। কাজী নজরুল ইসলামের বৈপ্লবিক গদ্য এবংপদ্য আমার মতো নিম্নবিত্ত ঘরের বহু ছাত্রছাত্রীকে উদ্দীপিত করেছিল। তাঁরকবিতায় নজরুল সম্মিলন ঘটালেন স্বাধীনতার, সাম্যের, নারীমুক্তির, ধর্মীয়বিভেদের ঊর্ধের্ব মানবিকতার আদর্শের। বিশুদ্ধ শিল্পবিচারে নজরুলের রচনায়কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁর বৈপ্লবিক বিশ্বাসেরদীপ্যমানতা, তাঁর অনুভবের প্রাবল্য এবং প্যাশন, তাঁর দুর্জয় সাহস এবংপ্রাণশক্তি একটি প্রজন্মকে অনুপ্রেরিত করে। সামান্যকিছু পরে কলেজে ছাত্রাবস্থায় যে আদর্শ আমাদের প্রজন্মেরঅনেকের মন জয় করেছিল তা হল একটি শোষণমুক্ত, বিকাশধর্মী, সহযোগনির্ভর,স্বাধীনতা ও সাম্যভিত্তিক বিশ্বব্যাপী মানবসভ্যতার স্বপ্ন। আমারব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্মৃতির ওপরে নির্ভর করে বলতে পারি, বহু ত্রুটিএবং স্ববিরোধ সত্ত্বেও ত্রিশের দশকে বাঙালি শিক্ষিত তরুণ-মনে আদর্শবাদেরবিশেষ স্থান ছিল। নানা ধারা এসে মিশেছিল এই আদর্শবাদে, কিন্তু তার মূল প্রেরণাছিল স্বাধীনতা এবং সাম্য। ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজজীবনে, :শিক্ষাক্ষেত্রে, শিল্প-সাহিত্যে,রাজনীতি এবং ছাত্র আন্দোলনে তার প্রভাব ছড়িয়ে যায়। তাছাড়া আমাদেরসামনে ছিলেন পূর্ববর্তী প্রজন্মের কিছু স্ত্রী-পুরুষ যাঁরা আদর্শেরপ্রতি আনুগত্যে জীবনপণ করেছিলেন— কারাগার, নির্বাসন, মৃত্যুদণ্ডদারিদ্র্য, সাংসারিক জীবনে চরম বিপর্যয় যাঁদের পথভ্রষ্ট করে নি।

।। তিন।।

তারপর ঘটল চল্লিশের দশকে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়।মহাযুদ্ধের প্রথম ধাক্কাতেই বাঙালি ভদ্রসমাজের ভিত নড়বড়ে হয়ে গেল।দু' একটি জাপানী বোমা পড়তেই কলকাতার অর্ধেক :মধ্যবিত্ত শহর ছেড়ে গ্রামে-মফস্বলে পলাতক হল।তারপর এল সেই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। ''ফ্যান দাওগো''-র সেই মর্মভেদী কান্না আজ ষাট বছর পরেওদুঃস্বপ্নে শুনতে পাই। কলকাতার পথে-ঘাটে দিনের পর দিন অনশনে কঙ্কালসারস্ত্রীপুরুষ শিশুদের ইতস্তত পড়ে থাকা মৃতদেহ— মানুষের তৈরিসেই মন্বন্তরে কত জন মারা যায় তার নিশ্চিত হিসেব পাওয়া যায় না—সম্ভবত অবিভক্ত বঙ্গের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী সেই মহাবিপর্যয়েবিলুপ্ত হয়। কিন্তু আরও বাকি ছিল। যুদ্ধ শেষ হতেই ঘটল ''মহাকলকাতা হত্যাকাণ্ড'', হিন্দু-মুসলমান বিরোধের আগুন ছড়িয়েপড়ল সর্বত্র। মানুষের মধ্যে যে সব বৃত্তি ধ্বংসমুখী ভেতরে কিংবা বাইরে তাদেরওপরে আর কোনো শাসন রইল না। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতারা দ্রুতক্ষমতা অর্জনের তাগিদে দেশবিভাগে রাজি হলেন।বিভাগোত্তর কঠিন সমস্যাগুলির মোকাবিলা কীভাবে হবে তার সামান্যতমব্যবস্থা না করে, গান্ধির নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে, জবাহরলাল, প্যাটেল,রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা বড়লাট মাউন্টব্যাটেনের নেতৃত্বমেনে নিলেন। লক্ষ লক্ষ স্ত্রীপুরুষকে ঘর ছাড়া করে প্রতিদ্বন্দ্বী দুইস্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নিল। স্বাধীনতা এবং দেশ বিভাগে সবচাইতে বড়ক্ষতি হয় পশ্চিমবঙ্গের। পূর্বাঞ্চল থেকে অগণিত শরণার্থী প্রায়সর্বস্বান্ত অবস্থায় আশ্রয় নিলেন শিয়ালদা এবং হাওড়া স্টেশনে।নিঃসম্বল মানুষে ছেয়ে গেল কলকাতার পথঘাট ; তারা ক্রমে ছড়িয়ে গেলগ্রামে মফস্বলে। রেনেসাঁসের একশো বছরে যে ভদ্র সমাজ- সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিলএই সব চাপে এক দশকের ভিতরে তা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। একদিকে''এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই'' নীতি অনুসরণ করেগজিয়ে উঠল এক শ্রেণীর হঠাৎ বড়লোক— স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনোঅপকর্মেই যাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ নেই। অন্যদিকে পড়ে রইলেন অসংখ্যদুঃস্থ স্ত্রীপুরুষ স্রেফ টিঁকে থাকবার প্রয়োজনে যাদের মধ্যেঅনেকেই নানা কুপথ অবলম্বনে বাধ্য হলেন। ঘুষ, জবরদস্তি, ধাপ্পাবাজি, অবৈধউপায়ে অর্থ এবং প্রতিপত্তি অর্জনের নানা ফন্দিফিকির মহামারীর মতছড়িয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায়। যে কোনো সমাজের শান্তি,শৃঙ্খলা, বিকাশের যেটি মুখ্য সর্ত— সামাজিক নীতিবোধ বা ন্যায়-অন্যায়পার্থক্যের চেতনা— চল্লিশের দশকের আঘাতের পর আঘাতে কলকাতাতথা পশ্চিমবঙ্গ থেকে সেটি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এই অন্ধকারাচ্ছন্ন চল্লিশের দশকে আমার যুবকাল কেটেছে।সারা জীবনের সঞ্চয় নিয়োগ করে অধ্যাপক পিতৃদেব কলকাতার কাছেই দমদমবিমানবন্দরের পাশে আমাদের পরিবারের জন্য ছোট একটি বাসস্থান নির্মাণকরেছিলেন। যুদ্ধ বাধবার পর সরকার বাড়িটি চবিবশ ঘন্টার নোটিশেঅধিগ্রহণ, বাস্তবে বাজেয়াপ্ত করে। আমার বাবার সুদীর্ঘ অধ্যাপক-জীবনেরগ্রন্থসংগ্রহ (প্রায় পাঁচ হাজার বই, মুখ্যত সংস্কৃত ভাষায় লেখা,সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, শিল্পতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক)সেনাশিবিরের সাহেব কাপ্তানদের পশ্চাদ্দেশ সাফাইয়ের কাজে লাগে। সরকারকিছু পরে বাড়িটি ভেঙে সেখান দিয়ে সড়ক তৈরি করে। আমরা গৃহহীণঅবস্থায় ছড়িয়ে যাই। তা সত্ত্বেও আমি যদি অন্ধকারে তলিয়ে না গিয়ে থাকিতার প্রধান কারণ শৈশবে এবং বাল্যকালে বাবার কাছে শিখেছিলাম মৃত্যুওবরং কাম্য, কিন্তু যাকে অন্যায় বলে জানি তার সঙ্গে রফা করে বাঁচবারচেষ্টা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। দ্বিতীয় কারণ, প্রথম যৌবনে মার্ক্স এবংকিছু পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় আমাকে শিখিয়েছিলেন যারা অত্যাচারিত তাদেরপক্ষ নিয়ে যারা শক্তিমান এবং অত্যাচারী

তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোইপ্রকৃত মনুষ্যত্ব। এবং সম্ভবত তৃতীয় কারণ, পিতার সরল এবং উদারজীবনচর্যার দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে বিত্ত বা প্রতিপত্তিকোনোদিনই আমাকে আকৃষ্ট করেনি। প্রেম, বন্ধুত্ব, জ্ঞানচর্চা এবংশিল্প-সাহিত্য সম্ভোগ আমাকে অল্প বয়সেই সেই আনন্দের স্বাদ দিয়েছিল অর্থবা প্রতিপত্তি যা দিতে অক্ষম।

যাই হোক, এখানে নিজের কথা লিখতে বসি নি। নিজের প্রসঙ্গটানবার কারণ চল্লিশের সেই অন্ধকার-পর্ব আমার প্রত্যক্ষঅভিজ্ঞতার বিষয়। আমার ধারণা চল্লিশের দশকে কলকাতার যে সর্বনাশ ঘটে তাথেকে না কলকাতা, না পশ্চিমবঙ্গ আজও উদ্ধার পেয়েছে, অথবা উদ্ধারের পথ খুঁজেপেয়েছে।

অবশ্য কোনো চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। বিধানচন্দ্র রায় কলকাতারপুনরুজ্জীবনের আশা সম্ভবত ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের উৎকাঙক্ষায়কল্যাণীতে, দুর্গাপুরে এবং লবণহ্রদে কয়েকটি কেন্দ্র গড়ে তোলবারচেষ্টা করেন। মনে হয় তাঁর দিক থেকে চেষ্টার খামতি ছিল না,কিন্তু এই বৃহৎ উদ্যোগে উপযোগী সহকর্মী পান নি। চল্লিশের দশক অধিকাংশবাঙালি ভদ্রলোকের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল। ধবংসের কাজে লোক খেপিয়েতোলা এ অবস্থায় সহজ ; :গড়ে তোলার কাজে নিষ্ঠাবান,পরিশ্রমী, দূরদর্শী, নিপুণ মানুষ মেলা খুবই শক্ত। তাছাড়া বিধানচন্দ্র দূরদর্শীএবং উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রভুত্বাত্মপ্রবণতা উপযুক্ত সহকর্মী লাভের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে।

দ্বিখণ্ডিত দেশ এবং উদ্বাস্তুদের সমস্যা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ যখন মহাসংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তখন এসে গেল নতুন সংবিধান অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনেরচাপ। সংবিধান রচয়িতারা :সদ্‌বিবেচনা করেই প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীপুরুষের সর্বজনীনভোটাধিকারকে পূর্বিতা দিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেরা নির্বাচিত হয়েছিলেনমুষ্টিমেয় ব্যক্তির ভোটে। কিন্তু এই বিরাট দেশে বিপুল জনসমর্থনে যথার্থপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হলে যে সব পূর্ব সর্ত মেটানোদরকার তা মোটেই সে সময়ে সম্ভব ছিল না। যে দেশে অধিকাংশ লোকনিরক্ষর, এবং নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কোনোদিনইতারা সংগঠিত ভাবে চেষ্টা করে নি, সেখানে কার্যক্ষেত্রে গণতন্ত্রেরনামে সর্বজনীন ভোটাধিকার অনেকটাই প্রহসনে পর্যবসিত হতে বাধ্য।বিরাট নির্বাচন ক্ষেত্র বা কনস্‌টিটুয়েন্সির প্রত্যেক নির্বাচনদাতারসঙ্গে যোগ স্থাপন বা ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা প্রচুরব্যয়সাপেক্ষ। এ কাজের জন্য যাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতেসক্ষম তাঁদের পক্ষেই নির্বাচনে নামা সম্ভব। সেই টাকা যোগাড়করবার জন্য অসংখ্য রকমের নীতিবিরুদ্ধ পন্থা উদ্ভাবিত হতে :লাগল। সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ সমাজসেবীর বাঞ্ছানীগুণীর পক্ষে বিরাট ব্যয়সাপেক্ষ নির্বাচনে দাঁড়ানো এক্ষেত্রে অকল্পনীয়। অসৎ উপায়ে অর্থসংগ্রহ, আত্মপ্রচার অথবানির্বাচকদের মিথ্যা স্তোক দিয়ে সমর্থন লাভ, অথবা কোনো না কোনোরাজনৈতিক দলের ব্যবহার্য যন্ত্রে পর্যবসিত হওয়া— এসব তাঁদের কাছে সংগতকারণেই ঘৃণ্য ঠেকায় তাঁরা প্রায় কেউই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি। চল্লিশের দশক নীতিবোধের গোড়ায় আঘাত করেছিল, পঞ্চাশের এবংষাটের দশকে ভোটের নামে নানা রকমের তঞ্চকতা, ভ্রষ্টাচার,অপক্রিয়া সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। স্বাধীনতা অর্জনের আগে যে আদর্শবোধ কয়েকপ্রজন্ম ধরে শিক্ষিত তরুণতরুণীদের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত করেমহত্তর সমাজ-স্বার্থ সাধনে আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করেছিল, ভোটাভুটির ধাক্কায়তা প্রায় বিলুপ্ত হল। রাজনৈতিক দলনেতারা তাঁদের অনুচরদের এইদুর্নীতিতে দীক্ষা দিলেন। দেশ স্বাধীন হবার পর গান্ধি কংগ্রেসকে ভেঙেদিয়ে জাতীয় সেবাদল গড়তে চেয়েছিলেন। মানবেন্দ্র তাঁর দল ভেঙে দিয়েছিলেন।কিন্তু নেহরু, প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা গান্ধিরপ্রস্তাবকে কোনো পাত্তাই দেন নি। মানবেন্দ্রের দলের সে সময়েকোনোই প্রভাব ছিল না। সুতরাং দল ভেঙে দেওয়াতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধিহল না।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তৎপূর্বকালীন স্বাধীনতাসংগ্রামীদেরমধ্যে অনেকে হয় বিস্মৃত নয় পেনশনভোগী হয়ে গেলেন। যাঁরা একসময়েসমাজবিপ্লবের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে ঝুঁকির পথ বেছেছিলেন, তাঁদেরমুখ্য দলটি স্বাধীনতার পরে আইনসঙ্গত পথে ক্ষমতার শরিক হবার পথ বেছেনিলেন। কমিউনিস্ট দল ষাটের দশকে দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায় ; কিন্তুতার আগেই পার্টির মুখ্য নেতারা সাম্যবাদের ঘোষিত আদর্শ বিসর্জনদিয়েছিলেন। কমিউনিস্টদের ভিতরে যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি তাঁদেরআগেকার ধ্যানধারণা একেবারে ছাড়তে পারেননি, তাঁরা তৃতীয় দল গড়েএকটা আন্দোলনের চেষ্টা করেছিলেন বটে। কিন্তু একদিকে জনসমর্থনের অভাব,অন্যদিকে তাঁদের নিজেদের নেতাদের ভিতরেই প্রবল এবং প্রায়হিংস্র মতভেদ তাঁদের পায়ের নিচে কোনোনির্ভরযোগ্য জমি রাখল না। যাঁরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়ছিলেন তাঁরা এই বহুবিভক্ত নকশালপন্থীদের নিষ্ঠুর হাতে দমন করলেন।গত একপাদ শতাব্দীকালের বেশি সময় ধরে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টরাক্ষমতায় আসীন বটে, কিন্তু অসাম্যের বিলোপ অথবা ন্যায় প্রতিষ্ঠাযে তাঁদের উদ্দিষ্ট, তাঁদের ক্রিয়াকলাপে এবং ঘোষণাতে তারপ্রমাণ মেলে না। কংগ্রেস যেমন একই সঙ্গে স্থানে অস্থানে গান্ধিরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে জীবনের এবং বিশেষ করে রাজনীতিরসর্বক্ষেত্রে গান্ধির আদর্শকে খারিজ করেছে, পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্টরাও তেমনি মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিনের মস্ত মস্ত মূর্তি শহরের কেন্দ্রে স্থাপিতকরেছে বটে, কিন্তু তাদের প্রধান প্রায় একমাত্র উদ্দেশ্য যে কোনোউপায়ে ক্ষমতায় দখল বজায় রাখা, এবং সেজন্য প্রয়োজন মাফিক সবরকম অপকর্মে আশ্রয় নিতে তারা দ্বিধাহীন। একদিকে লোভ, অন্যদিকে ভয় দুইমিলিয়ে এখানে কমিউনিস্টদের প্রশ্রয় এবং তাদের ক্ষমতা বজায়েরজন্য ব্যবহার্য হাতিয়ার হিসেবে বিভিন্ন মাফিয়া গোষ্ঠীর সম্প্রতি এখানেরবরবা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সৎ, ভদ্র এবং সংস্কৃতিমনস্ক বলেই জানি। কিন্তু তাঁরব্যক্তিগত সৌজন্য তাঁর পার্টির আত্মঘাতী রূপটিকে ততটাই আবৃত করেছে যতটাকরেছে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর কাব্যচর্চা তাঁর দল এবং রাজনৈতিকপরিবারের হিংস্র আগ্রাসী হিন্দুত্ববাদের ক্রিয়াকর্ম এবং সাম্প্রদায়িক স্বরূপকে।

।।:চার।।

এই পটভূমি স্মরণে রেখে আমরা প্রবন্ধের সূচনায়যে প্রশ্নটির উল্লেখ করেছি সেটিতে ফিরে আসি। জন্মসূত্রে সবমানুষের মধ্যেই বিভিন্ন বৃত্তি বা প্রবণতা আছে যাদের মধ্যে অনেকগুলিপরস্পরবিরোধী। এদের ভিতরে কোনো প্রধান বৃত্তি বা প্রবণতাকেসম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা যায় কিনা সন্দেহ ; অনেক ক্ষেত্রে নিরোধেরচেষ্টার ফলে দুশ্চিকিৎস্য মানসিক ব্যাধি দেখা দেয়। কিন্তু এপ্রস্তাব অভিজ্ঞতা-সমর্থিত যে পারিবারিক, সামাজিক ওপ্রাকৃতিক পরিবেশ এবং শিক্ষার ফলে কোনো কোনো বৃত্তি বাপ্রবণতার বলাধান ঘটতে পারে। যেমন ধরা যাক ভালবাসা। এটি মানুষেরএকটি সহজাত প্রবৃত্তি। উপযোগী পরিবেশ এবং সুশিক্ষার ফলেপ্রথমে যা শুধু মায়ের প্রতি টান তা ক্রমে ক্রমে শুধু আত্মীয়স্বজনবন্ধু-সহকর্মী নয়, ভাষা, জাতি, শিল্প-সাহিত্য, প্রকৃতিপরিবেশ,মনুষ্যজাতি, এবং অন্য জীবজন্তুর প্রতি গভীর অনুরাগে পরিণতি পেতে পারে।ভালবাসার অর্থ নিজের স্বার্থের চাইতে যাকে ভালবাসি তার কল্যাণের কথাবেশি ভাবা, তার জন্য ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা, তার অভাবে কষ্টএবং তার সান্নিধ্যে আনন্দ পাওয়া। অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রে ভালবাসার বোধহয়ত পরিচিত কিছু ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু তেমন উদারপরিবারে জন্মালে বা তেমন সুস্থ পরিবেশে বাস করলে বা তেমনসুশিক্ষা পেলে মানুষ বসুধাকে যথার্থই কুটুম্ব বলে গ্রহণ করতে পারে।এমন স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে বঙ্গদেশেও একেবারে নগণ্য ছিলনা।

এখন ভালবাসার পাশাপাশি আছে দখলদারির বা অধিকারপ্রতিষ্ঠার প্রবণতা বা প্রবৃত্তি। অনেক ক্ষেত্রে এ দুটিখুবই দুশ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত থাকে। শিশু চায় একান্তভাবেতার মাকে:; মা অন্য কারো দিকে মন দিলে তার ঈর্ষা হয়:;:পরে তা বিদ্বেষেও রূপ নিতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকারাওঅধিকাংশ সময়ে একে অপরের উপরে নিজের একান্ত স্বত্ব দাবি করে, এবংসে দাবি অবাস্তব প্রমাণিত হলে তাদের সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে ওঠে। যেপরিবারে স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, মাতা-পিতা এবং সন্তানদের মধ্যে ভালবাসাসুপ্রতিষ্ঠ সেখানে এই দখলদারির প্রবণতা প্রশ্রয় পায় না।সুস্থ পরিবেশ এবং জীবনচর্যার সুশিক্ষা এই সব পরিবারের মূলধন।প্রাজ্ঞ শিক্ষক, সজ্জন পাড়া প্রতিবেশী, সহৃদয় সহপাঠি-সহকর্মী,এবং অবশ্যই মহৎ চিন্তকদের রচনা থেকে একজন মানুষ শিখতে পারে যেদখলি স্বত্বের দাবি ভালবাসায় পরিপূর্ণতা না এনে তার গোড়ায় ঘুণ ধরায়।চিত্তের মুক্তিই যথার্থ ভালবাসার প্রশস্ত ক্ষেত্র।

এখন লক্ষণীয় যে মানুষের মধ্যে যে-সব বৃত্তি বা প্রবণতাপরস্পরকে আত্মীয় করে তোলে বিশেষভাবে গত বিশ বছরে নানা কারণে রসমাবেশে সেগুলি প্রায় সর্বত্রই ঘোরতর ভাবে ব্যাহত। আমি আগে উল্লেখকরেছি যে আদর্শের প্রেরণা ব্যক্তিকে স্বার্থপরতার সংকীর্ণ গণ্ডী থেকেউদ্ধার করে বৃহত্তর মানবসমাজের প্রতি কল্যাণকামী করে তোলে। বঙ্গীয়রেনেসাঁস, তারপর স্বাধীনতা আন্দোলন এবং তারপরে সাম্যবাদের প্রভাববাঙালি তরুণতরুণীদের চিত্তকে একসময়ে আত্মকেন্দ্রিকতা, ক্ষুদ্রমনস্কতা ওঅপহ্নুতি থেকে অনেকটা মুক্ত করেছিল। নকশাল আন্দোলন ভুল পথে গেলেও তারভিতরে কিছুটা আদর্শবাদের ভগ্নাবশেষ প্রেরণা হিসেবে কাজকরেছিল। রাষ্ট্রশক্তির নিরঙ্কুশ নির্বিবেকী প্রয়োগে সেআন্দোলনকে হিংস্রভাবে নিষ্পিষ্ট করা হয়। তারপর গত বিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গেকোনো ক্ষেত্রেই কোনো আদর্শবাদী আন্দোলন দেখা দেয় নি। কলেজে-স্কুলে,লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিক মহলে, সরকারী বেসরকারী দপ্তরে, মধ্যবিত্ত এবংনিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে এক সর্বব্যাপী শুভনাস্তিক শূন্যতা বিস্তার লাভকরেছে। সমকালীন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে আত্মকেন্দ্রিকতার প্রাবল্য এরিঅন্যতম ফল।

সকলেই জানেন গত বিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাকী দ্রুতহারে নিম্নগামী। অবশ্য এ দেশে শিক্ষাব্যবস্থা কোনো দিনই খুব দৃঢ়মূল ছিল না। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পূর্বে এবং তারপরও কিছুকালশিক্ষার অন্তত একটা মান এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে ঔচিত্যবোধপ্রতিষ্ঠিত ছিল। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু শিক্ষকই বিশেষযত্ন নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতেন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদেরশ্রদ্ধার এবং স্নেহের সম্পর্ক ছিল। ছাত্র এবং অধ্যাপক হিসেবে কয়েক দশক ধরে এইঅবস্থার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। গত বিশ বছরে এটিপ্রায় স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু তাব্যতিক্রম মাত্র। এখন বহু শিক্ষকই ক্লাসে পাঠ্য বিষয় যত্ন করে না পড়িয়েপ্রাইভেট টিউশনির ব্যবসা খুলে বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন।পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্দশ্যে বা ভাল ফলের জন্য ছাত্রছাত্রীরা সেখানেভীড় করে বটে, কিন্তু এই পরিবেশে শ্রদ্ধা বা স্নেহের বা নির্ভরযোগ্যআত্মীয়সম্পর্কের কোনো স্থান নেই। মানবীয় আসঙ্গ বা সংসৃতির স্থাননিয়েছে বাজারি সম্পর্ক। শুধু ছাত্রশিক্ষকের সম্পর্ক বিকৃত হয়নি:;:ছাত্রদের মধ্যেও প্রীতি সহযোগ বন্ধুত্বের স্থানে এসেছে প্রবলপ্রতিযোগিতা এবং শ্রেণীভেদ। পারিবারিক বিত্ত-সামর্থ্যের জোরে যারাইংরেজি-মাধ্যমে আগাগোড়া পড়ার সুযোগ পায় তাদের চোখে বাংলা মাধ্যমেপড়া ছাত্রছাত্রীরা নিম্নস্তরের জীব। উক্ত ওপরের স্তরের ইংরেজিবুলি আওড়ানো তরুণতরুণীদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা কে কাকেল্যাং মেরে ওপরে উঠতে পারে। তাদের মধ্যে স্থায়ী সখ্য বা সৌহার্দ্যখুবই দুর্লভ। আর যারা নিচে রয়ে গেল তারা শুধু হীনম্মন্যতায় ভোগেনা, তাদের অন্তর্গ্লানি রূপ নেয় আক্রোশে, হিংসা পরায়ণতায়, তারাসহজেই ধবংসাত্মক ক্রিয়াকর্মে আকৃষ্ট হয়। এখনকার আগ্রাসী রাজনৈতিকদলগুলি, তরুণ বা ছাত্র সংগঠনের এরাই হয়ে ওঠে ব্যবহার্য উপাদান। বর্তমানেআমাদের শিক্ষাজগতের পরিবেশ তরুণ চিত্তের সুস্থ বিকাশের পক্ষেমারাত্মক।

এটিও বোঝা দরকার যে গত দু' দশকে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবিত্তএবং তাদের অনুসরণে নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে যে আত্মকেন্দ্রিকতা প্রবল হয়উঠেছে, তার কারণ একদিকে যেমন পূর্ববর্তীদশকগুলির অবক্ষয়ী উত্তরাধিকার তেমনই অন্যদিকে সমকালীন বিশ্বব্যাপীনানা প্রবল চাপ। বিশ্বায়নের ফলে আমাদের আদর্শহীন জীবনযাত্রার ওপরেবাইরের, বিশেষ করে আমেরিকার, প্রভাব দ্রুত বিস্তার লাভকরে

ছ। আমাদের তরুণ প্রজন্মের মধ্যে যারা তাদের অধ্যবসায়ার্জিতবিদ্যা এবং প্রয়োগ নিপুণতার সামর্থ্যে হয়তো এই দেশের মধ্যেই ন তুন একসামাজিক-সাংস্কৃতিক জাগরণে নেতৃত্ব দিতে পারত তারা প্রায় সকলেইসুযোগ পাওয়া মাত্র এ দেশ ত্যাগ করে আমেরিকায় বা অন্য কোনো প্রাচুর্যেরদেশে চলে যাচ্ছে। এই ছেলেমেয়েদের মা-বাবা, পরিবার-পরিজন, শিক্ষক বাঅন্য বুদ্ধিজীবীরা কোনো স ময়েই চেষ্টা করেননি তাদের বোঝাতে যে দেশএবং দেশবাসীর প্রতি তাদের গভীর দায়িত্ব আছে, যে প্রীতি,প্রেম, সখ্য, সহযোগ বি ঞ্চত জীবনের নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতাবোধ বিত্ত-প্রতিপত্তিদিয়ে ভরানো যায় না, যে বিলাসব্যসনে নয়, সৌহার্দ্য, সেবা এবং সৃষ্টিরভিত র দিয়েই স্থায়ী আনন্দের অভিজ্ঞতা মেলা সম্ভব। গত প্রায় দুটিপ্রজন্ম আধুনিক প্রচারমাধ্যমের বলি। দূরদর্শনের নেশা একদিকেমনন বা চিন্তনের সমাহিতি ঘটিয়ে ব্যক্তিকে প্রায় নিষ্ক্রিয় দর্শকেপর্যবসিত করে, অন্যদিকে প্রাচুর্য, ভোগবিলাস এবং লঘুচিত্তপ্রমোদের রঙ্গিলা ছবি দেখিয়ে তরুণ মনকে লোভী এবং মতিভ্রান্ত করে।নির্দায়িত্ব লোলুপতার এবং লোভ মেটাবার জন্য নীতিবোধহীন ক্রিয়াকলাপেরইন্ধন মেলে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়, মাসিকে, সাপ্তাহিকে, তথাকথিত নানাসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, এবং সর্বোপরি বিজ্ঞাপনের ছয়লাপে। জীবনের উদ্দেশ্যকী তা নিয়ে চিন্তা তো দূরের কথা, একত্রে বসে নানা বিষয়েভাববিনিময়, স্মৃতি-অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান, স্রেফ সৌহার্দ্যস্নিগ্ধগালগল্প করতেও টেলিভিশনের নেশাগ্রস্ত মানুষরা ক্রমশ ভুলে যাচ্ছে।বস্তুত বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের সঙ্গে কুটুম্বিত া বাড়ার বদলে যা ক্রমেইপ্রবল হয়ে উঠছে তা হল ব্যক্তি-মানুষের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্নঅস্তিত্ব।

বস্তুত আত্মকেন্দ্রিকতার প্রথম বলি মানবীয় সম্পর্ক। পশ্চিমেযেখানেই অধ্যাপনা সূত্রে কিছুকাল থেকেছি সেখানেই প্রকৃতি, পরিবার এবংসমাজ থেকে ব্যক্তির আত্মিক বিচ্ছিন্নতার এবং তজ্জাত সমস্যার ব্যাপ্তি এবংপ্রাবল্য দেখে বিষাদিত হয়েছি। খুব সামান্য কারণেই স্বামীস্ত্রী-রসম্পর্কছেদ, পরিবার ভেঙে যাওয়া, প্রজন্মের সঙ্গে প্রজন্মেরবিরোধ, বন্ধুত্বের অবসান বারে বারে দেখে কিছুটা বুঝতে শিখেছি''পৃথিবীর গভীর অসুখে''-র কথা। একটি নিতান্তনিরানন্দ অভিজ্ঞতার উল্লেখ করি। মার্কিন দেশে প্রশান্ত মহাসাগরেরকূলে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার নিমন্ত্রণে কয়েক মাসের জন্য সপরিবারেগিয়েছি। সাগরতীরের পাশ ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস এবং ছাত্রছাত্রীদেরবাসস্থান। তীরের সমতল জমি থেকে উঠে গেছে কমলা লেবুর ক্ষেতভর্তি পাহাড়ের সারি, ওপরেই আসল শহর, সেখানে মাঝবয়েসী এবং বিত্তবানদেরনিবাস। অধ্যাপকরা প্রায় সকলে সুন্দর শহরটিতে এক একটি বাড়ি-বাগাননিয়ে একা অথ বা স্বামীস্ত্রী দুজনে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদেরজন্য ওপরে শহরে থাকবার ব্যবস্থা করলেও আমরা স্বেচ্ছায় ছাত্র পাড়াতেইএকটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিই। একদিন আমার এক ছাত্রের পিতা, তিনিও ঐবিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তাঁর গৃহে আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। কথায়কথায় আমাকে শুধোলেন, ওই বেজন্মা (ব্লাডি বাস্টার্ড) অর্থাৎ তাঁর ছেলে আমাকে কতটাজ্বালাচ্ছে। প্রশ্নটির মধ্য কোনো রসিকতার আভাস ছিল না, ছিলস্পষ্টতই তিক্ততার স্বাদ। কিন্তু ছেলেটি পড়াশুনোয় মনোযোগী। আমার সঙ্গেতার সম্পর্ক প্রীতিকর, সুতরাং 'ব্লাডি বাস্টার্ড'শব্দটি শুনে আমি মৃদু প্রতিবাদ করলাম। অধ্যাপক তখন তাঁর ছেলেরকুকীর্তির মস্ত ফিরিস্তি দিলেন। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করতেনা পারলেও যথেষ্ট বিচলিত হয়েই ফিরে আসি।

কয়েকদিন পরেই কোনো একটি বিষয়ে বুঝবারজন্য ঐ ছাত্রটি আমার ঘরে এল। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পর ছেলেটি একটুতিক্ত হেসে বলল, শুনলাম তুমি নাকি ওই বেজন্মার প্রাসাদে চা খেতেগিয়েছিলে। ছেলের মুখে তাঁর বাবা সম্পর্কে একই শব্দের পুনঃপ্রয়োগ শুনেযতটা চমকালাম তার চাইতে বেশি কষ্ট পেলাম যখন সে তার পিতারবিবিধ নষ্টামির বিবরণ দিল। তার কথাও কতটা সত্য আর কতটাপ্রতিহিংসা—প্রসূত জানি না, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই টেরপেলাম দুই প্রজন্মের মধ্যেই এই তিক্ত, প্রায় হিংস সম্পর্কমধ্যবিত্ত শ্রেণীতে খুবই:ব্যাপক।

পশ্চিমবঙ্গে অবস্থা নিশ্চয়ই এতটা উগ্র এবং আপোষহীনস্তরে নামে নি, কিন্তু এখানেও প্রজন্মের সঙ্গে প্রজন্মেরব্যবধান দ্রুত বাড়ছে, এবং তা ক্রমেই বিরোধিতার রূপ নিচ্ছে। অথচ তার ফলেতরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সুহৃদ-সম্পর্ক যে আদৌ দৃঢ়মূল হচ্ছতার চিহ্ন দেখি না। একদিকে কোনো রকম আদর্শের অভাব, অন্যদিকে বিবিধপ্রচারমাধ্যম মারফত বিশ্বায়ন তথা মার্কিনায়নের বিস্তার আমাদেরবর্তমান তরুণ প্রজন্ম এবং তাদের ঠিক পূর্ববর্তী প্রজন্মকেযেমন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে, তেমনই উভয় প্রজন্মকেইআত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। এই আত্মকেন্দ্রিকতার অর্থ শুধু স্বার্থপরতা নয়। এরমধ্যে নিহিত আছে নীতিবোধহীনতা, যে কোনো উপায়ে বিত্ত প্রতিপত্তি অর্জনেরউৎকাঙক্ষা, শক্তিমান এবং বিত্তবানের বশংবদ হবার প্রবণতা, দীন এবংদুর্বলের প্রতি ঘৃণা এবং তাচ্ছিল্য, অপরিমিত অর্থোপার্জনের চেষ্টাএবং বিবর্ধমান ভোগলালসা। এইসব প্রবণতা যাদের মধ্যেই অতি প্রবলতারা উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ। এবং যা আরো দুর্ভাবনার বিষয়,এদের দেখাদেখি এই মনোভাব নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ এবং তরুণতরুণীদের মধ্যেওদ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ সমাজের ন্যায়ভিত্তিক পুনর্গঠনের উদ্যোগেশিক্ষিত তরুণদের ভিতর থেকেই নেতৃত্ব আসবার কথা। সেখানেই এইস্বার্থপর ভোগপরায়ণ লঘুচিত্ততার প্রসার দেখে স্বয়ং পঞ্চভূতেপ্রত্যাবর্তনের পূর্বে খুবই আর্ত বোধ করি।

।।:পাঁচ।।

তবু ভাবতে ইচ্ছে হয়, এখনো হয়তো পশ্চিমবঙ্গের চরমবিপর্যয় অনিবারণীয় নয়। পশ্চিমেও আধুনিক সভ্যতার আগ্রাসী প্রবণতাকে রোধ করে সহযোগ এবং সংগতির ভিত্তিতে ছোট ছোট কমিউনিটি গড়েতোলবার নানা উদ্যোগ কিছুকিছু তরুণতরুণীদের ভিতরে দেখেছি। কেন্দ্রিতরাষ্ট্রশক্তি এবং অর্থশক্তি এবং বিরাট প্রভাবশালীপ্রচারমাধ্যমের বিরুদ্ধে তাদের এই আদর্শবাদী প্রয়াস কতটাফলপ্র

সূ হবে জানি না। কিন্তু ইতিহাস কোনো পূর্বনির্দিষ্ট পথে চলেনা। বাইরে থেকে যখন কোনো সভ্যতাকে খুবই প্রবল মনে হয়, ভিতর থেকে তার অবক্ষয় হয়তো তখনই সক্রিয় হয়ে উঠছে। অন্তত যেসভ্যতা বুশের মতো প্রায়োন্মাদ ব্যক্তিকে একটা মহাশক্তিশালী রাষ্ট্ররচূড়ায় বসায় তার স্থায়িত্ব বেশি দীর্ঘ না হওয়াই সম্ভব। আবার হয়তোতার আপজাত্যের ভিতর থেকেই আধুনিক সভ্যতার আমূল রূপান্তরেরসম্ভাবনা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

তবে এখানে যেহেতু আমাদের আলোচ্য বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিসমাজ, সে হেতু এ কথা স্পষ্টভাবে বলা সঙ্গত মনে করি যে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশমানুষ নয়, মুখ্যত উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশস্ত্রীপুরুষরাই গত বিশ বছরে দ্রুত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। অধিকাংশপশ্চিমবঙ্গবাসী স্রেফ টেঁকার সমস্যা নিয়েই বিপর্যস্ত এবং পারস্পরিক সহযোগছাড়া তাদের পক্ষে টেঁকা প্রায় অসম্ভব। শহরে এবং গ্রামে দরিদ্র এবংঅতিদরিদ্র শ্রেণীর যে সব স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে আমার সীমাবদ্ধ যোগাযোগ আছে তাদেরমধ্যে যেমন আত্মোন্নতি বা আত্মজিজ্ঞাসার চাড় বিশেষদেখিনি, তেমনই আত্মপরায়ণতার বা আত্মকেন্দ্রিকতার উপস্থিতি থাকলেওতা নিতান্ত স্তিমিত। কিন্তু এ লেখা যাঁরা আদৌ পড়বেন তাঁরামধ্যবিত্ত অথবা নিম্নমধ্যবিত্ত এবং শিক্ষিত শ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ। তাঁদের উদ্দেশেপরিশেষে কয়েকটি কথা নিবেদন:করি।

আত্মকেন্দ্রিকতা ও আত্মোন্নতি সমার্থক নয়। এই বঙ্গদেশেই বিশশতকের গোড়ায় একটি ''আত্মোন্নতি'' সংস্থা গড়েউঠেছিল যার সদস্যদের মূল সাধনা ছিল পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করা,নিজের চিত্তকে সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা থেকে ঊর্ধ্বে তোলা, যাঁরা দুঃস্থ,সহায়সম্বলহীন তাঁদের সেবা করা। তাঁরা স্বার্থসাধনকে আত্মোন্নতির নাম দিয়েআত্মপ্রতারণা করে নি। আবার যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ-উদ্যমের ফলেআধুনিক সমাজের বিকাশ সম্ভব হয়েছিল তাও ছিল বহির্মুখী, আত্মকেন্দ্রিক নয়। আসলেআত্মকেন্দ্রিকতা সমাজস্বার্থের বিরোধী। বিত্ত-প্রতিপত্তির লোভে নিজেরা এবংপরে তাদের শিক্ষায় এবং প্রশ্রয়ে তাদের পুত্রকন্যারা যেআত্মকেন্দ্রিকতাকে নীতি হিসেবে সম্প্রতিকালে গ্রহণ করেছে তা তাদের মনুষ্যত্বকেবিকৃত করছে, এবং তা সুস্থ মানবীয় সম্পর্কের গোড়ায় আঘাত করে সমাজএবং সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দিচ্ছে।

এই আত্মঘাতী প্রবাহকে রোধ করে যদি সমাজে নৈতিকতাএবং সহযোগবৃত্তির পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হয় তবে প্রথমেই দরকারপারিবারিক জীবনে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল রূপান্তরের জন্যব্যাপক আন্দোলন। তথাকথিত নিউক্লিয়ার পরিবার হয়তো নারীদেরস্বাধীনতা অর্জনের কিছুটা সহায়ক হয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বামীস্ত্রী ও পুত্রকন্যারমনে নিরঙ্কুশ স্বার্থপরতা এবং অপরিমিত ভোগাকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয়দিয়েছে। পুরোনো একান্নবর্তীর পরিবারের মডেলে ফেরবার চেষ্টাসম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। কিন্তু মানবিক সম্পর্কের বিকাশের জন্য সম্ভবত তিনপুরুষের একত্র বাসের প্রয়োজন আছে:; এবং পড়োশীদেরসঙ্গে মিলিতভাবে আত্মীয়সমাজ গড়ে তুললে হয়তো সৌহার্দ্য এবং সহযোগ আবারমানবিক জীবনযাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

আর শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন নির্ভরযোগ্য জ্ঞানার্জনেরব্যবস্থা অবশ্যই জরুরি, তেমনই সমান জোর দেওয়া দরকার সুস্থজীবনচর্যার শিল্পের ওপরে। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ এবংঅফুরন্ত দানের সম্বন্ধেসচেতন হয়ে গাছপালা, পশুপাখি,নদীপ্রান্তর, পাহাড়-অরণ্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ:; বিভিন্নধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতির স্ত্রীপুরুষকে সুহৃদ্ সুজন হিসেবে স্বাগত করতেশেখা:; জীবনের কেন্দ্রে সত্যনিষ্ঠা, সাহস, সৌন্দর্যবোধ, বিবেকবুদ্ধি,সেবাবৃত্তির প্রতিষ্ঠা—মানসবিকাশের জন্য এই অতি আবশ্যকদিকগুলি আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অবহেলিত। অথচ এইসব বাদদিয়ে যে শিক্ষা সে তো মানুষকে বড় জোর নিরঙ্কুশ যন্ত্রবিদ অথবাঅপরের ব্যবহার্য যন্ত্রে পরিণত করবার শিক্ষা। আত্মঘাতী আত্মকেন্দ্রিকতারপ্রভাব থেকে বাঙালি সমাজকে উদ্ধার করে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্জাগরণ যদিঘটাতে হয়, তবে সে কাজে মুখ্য ভূমিকা শিক্ষিত তরুণতরুণী সমাজের। যেদায়িত্ব তাদের পূর্ববর্তীরা পালন করেন নি বা করতে পারেন নি একুশশতকের সূচনায় নবীন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রী, তরুণশিক্ষকশিক্ষিকা, এবং সমাজসেবকসেবিকারা কি সে দায়িত্বভার নিজেদেরকাঁধে তুলে নেবে? পঞ্চভূতে প্রত্যাবর্তনে প্রস্তুত আমার মতো ৮২বছরের নাস্তিকেরও কিছু স্বপ্ন অবশিষ্ট থাকে। যা আমরাপারি নি নবীন প্রজন্ম হয়তো সেই সুস্থতায় প্রত্যাবর্তনেব্রতী হবেন, বহুবার আশাভঙ্গের পরও সে প্রত্যাশা আজও ছাড়তে পারি নি।

সম্পর্কহীনতার কথা ঃ কিছু উদ্বেগ

সৌমিত্র বসু::

::::

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে একদিকে যেমন পৃথিবীর আকার ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে, অন্যদিকে তেমনই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের দূরত্ব পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। অন্যের জন্যে কাজ করা তো অনেক দূরের কথা, অন্যের কথা ভাবা, এমন কি অন্যের কথা শোনার প্রবণতা কমে যাওয়াটাই এই মুহূর্তে 'স্বাভাবিক' বলে গণ্য করা হয়; এর অন্যথাটা ব্যতিক্রম রূপে চিহ্নিত হত। পাশ্চাত্ত্যে এটা এতটাই শক্তিশালী ও স্বীকৃত বাস্তবতা যে ওদেশের মানুষকে মন-প্রাণের কথা বলার জন্য পেশাদার কাউন্সেলরদের কাছে যেতে হয়। আমাদের সমাজেও মানবিক সম্পর্ক কি এই একই পরিণতির দিকে এগোচ্ছে? পাশ্চাত্ত্যের আর্থসামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর গঠনগত পরিবর্তনের ধারা আমাদের সমাজ ও পারিবারিক কাঠামোর ওপর যে ধরণের প্রভাব ফেলে চলেছে তার নিরিখে দেখলে সিঁদুরে মেঘ তো চোখে পড়বেই!

বস্তুতপক্ষে মানবিক সম্পর্কের মানচিত্রে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে অনেকদিন আগে থেকেই। রবীন্দ্রনাথের লেখাতেও আমরা এ বিষয় উদ্বেগ দেখতে পাই। মানব-সমাজকে ধরে রাখে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছিলেন 'আত্মীয়তা'। এই 'আত্মীয়তার' বৃত্তের কেন্দ্রে থাকে নিজের সাথে নিজের সম্পর্ক। এই আত্মীয়তা বিস্তৃত হতে পারে আন্তর্জাতিক মানবতার সীমায়। বাস্তববাদী রবীন্দ্রনাথ জানতেন সাধারণ মানুষের পক্ষে আত্মীয়তার আধ্যাত্মিক অথবা আন্তর্জাতিক সামাকে স্পর্শ করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তিনি কখনও দাবীও করেন নিযে সাধারণ মানুষের আত্মীয়তাবোধকে এতটা প্রসারিত হতে হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন যে মানুষ তার নিজের পরিবারের সীমার বাইরে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে ক্রমাগত অনাগ্রহী হয়ে উঠছে। 'পল্লী-সমাজের' মানুষদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সম্পর্কহীনতা রবীন্দ্রনাথকে উদ্বিগ্ন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ঃ

''.... আমাদের খুব একটা বড় সম্পদ ছিল, সে হচ্ছে আত্মীয়তা। এর চেয়ে বড়ো সম্পদ নেই। এই আত্মীয়তার যেখানে অভাব সেখানে সুখশান্তি থাকতে পারে না। ... মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে আজ এসেছি গ্রামবাসী তোমাদের কাছে। পূর্বে তোমরা সমাজবন্ধনে এক ছিলে, আজ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পরস্পরকে কেবল আঘাত করছো।''

রবীন্দ্রনাথের এই উৎকণ্ঠা আজ থেকে সত্তর বছরেরও আগের কথা। এই দীর্ঘ সময়ে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে এসেছে নানান পরিবর্তন। সভ্যতা ক্রমশঃ শহরকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে, যৌথ পরিবারে ভাঙ্গন শুরু হয়েছিল শহর কেন্দ্রিকতার সূত্রে। 'একক পরিবার' পার হয়ে এখন আমরা 'আরও ছোট একক পরিবারের' ধারণায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। জীবনসংগ্রামের জটিলতা বাড়ছে, জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিও পাল্টাচ্ছে। এই সব পরিবর্তনের সাথে সাথে মানবিক সম্পর্ক বা আত্মীয়তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসছে কি না সে বিষয়ে আমাদের দেশে কোন সমীক্ষা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক আগে কেমন ছিল এবং এখন কী দাঁড়িয়েছে তা বিশ্লেষণের আলোয় মানবিক সম্পর্কহীনতার গতিপ্রকৃতি বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে।

২।

মানবিক সম্পর্ক বা আত্মীয়তার তিনটি ধারা বা স্তরকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বিস্তৃতির দিক থেকে এই স্তর বিন্যাস করলে প্রথম স্তরে থাকবে সেইসব মানুষের সাথে সম্পর্ক যারা সাধারণ অর্থে আত্মীয় বলে গন্য নন। পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীরা এই

স্তরে অন্তর্ভুক্ত হবেন। পরবর্তী স্তরে রয়েছেন সেইসব মানুষ যারা একক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ন'ন অথচ যাদের সাথে পরিবারের সম্পর্ক রয়েছে। যৌথ পরিবার এবং তার বাইরের আত্মীয়েরা এই স্তরের আওতায় আসবেন। সব শেষ স্তরে রয়েছে একক পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ।

পাশ্চাত্ত্যে উপরিউক্ত তিনটি স্তরের ক্ষেত্রেই সম্পর্কহীনতা যতটা প্রকট আমাদের দেশে ততটা না হলেও এদেশেও মানুষের পারস্পরিক দূরত্ব বাড়ার ইঙ্গিত যথেষ্ট স্পষ্ট। পাড়া-প্রতিবেশীর, বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পল্লী-সমাজের সাথে সম্পর্কের কথাটাই প্রথমে আলোচনা করা যাক। আগে পাড়া প্রতিবেশীরা শুধু যে পরস্পরের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হত তাই নয়, প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিল যে এক বাড়ীর শিশু সন্তান স্বচ্ছন্দে অন্য বাড়ীতে মানুষ হত; ও বাড়ীর ছেলের আচরণে কোন অন্যায় দেখলে এ বাড়ীর মা-মাসীরা তাকে শাসন করতে দ্বিধা করতেন না। কোন প্রতিবেশীকে পাড়ায় কয়েকদিন দেখা না গেলে অন্যেরা উদ্বিগ্ন হ

তেন। প্রতিবেশীটি ফিরে এলে জিজ্ঞেস করতেন তার অনুপস্থিতির কারণ। হ্যাঁ, নিঃসঙ্কোচেই জিজ্ঞাসা করা হত — একদম নিজের কাছের মানুষকে যে মানসিকতা নিয়ে কুশল জিজ্ঞাসাকে সংশয় বা বিরক্তির চোখে দেখতেন না। এমনই ছিল আন্তরিকতার মাত্রা। কারও বিপদ হলে অন্যদের ডাকতে হত না। তারা আপনিই এসে জড়ো হতেন। একজনের বিপদ যেন সবারই বিপদ। সুখের ভাগ নওয়ার ক্ষেত্রেও অভিব্যক্তি একই রকম আন্তরিক। 'যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই' জাতীয় প্রবাদ এমনি এমনি আসে নি। পড়শীর সাথে আত্মীয়তার এই ছবিটা ধীরে ধীরে অনেকটাই বদলে গেছে। আমার ছেলের ভাল-মন্দ নিয়ে আশেপাশের মানুষ উদ্বিগ্ন হচ্ছে দেখলে আমরা এখন নিজের অজান্তেই হয়তো মনে করি 'মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী!' 'এতদিন দেখিনি কেন' গোছের প্রশ্নকে এখন 'অহেতুক কৌতূহল' বলে চিহ্নিত করার প্রবণতাই বেশী। সামগ্রিকভাবে 'পরের ব্যাপারে নাক না গলানোর' নীতিই এখন পড়শীদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথের সময়েই শহরের মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব এই মাত্রা পেয়ে গিয়েছিল। কলকাতার মানুষদের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''কলিকাতা শহর, যেখানে আমরা থাকি, জানি, প্রতিবেশীর সঙ্গে সেখানে প্রতিবেশীর সুখে দুঃখে বিপদে আপদে কোনো সম্বন্ধ নেই। আমরা তাদের নাম পর্যন্ত জানি না।'' রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে মফস্বল শহর এবং গ্রামাঞ্চলেও যে এই সম্পর্কহীনতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে সে বিষয়ে সন্দেহের বোধহয় অবকাশ নেই। এখন সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করাটাই প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্কের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'বিয়ে, অন্নপ্রাশন' ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে আগে প্রতিবেশীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করত। এখন অংশগ্রহণের স্থান নিয়েছে স্রেফ 'নিমন্ত্রণ রক্ষা'। যে অনুষ্ঠানে আমি যাচ্ছি সেটা আমারও অনুষ্ঠান এই বোধটা এখন খুব কম কাজ করে, সেই জন্যই হয়তো আমরা এইসব অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ রক্ষার পর অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের বিরক্তি প্রকাশ করি। সম্পর্কহীনতা যত বাড়ছে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে তত বেশী করে যান্ত্রিক আচার সর্বস্ব হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় স্তরের আত্মীয়তার ক্ষেত্রেও সম্পর্কের গভীরতা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। যৌথ পরিবারে থাকার সময়ে যাদের সাথে শুধু যে স্থানিক দূরত্বই বেড়েছে তা নয়, মানসিক দূরত্বও যেন বেড়ে গেছে। যারা যৌথ পরিবারের অঙ্গীভূত ছিল না, তাদের কথা তো বলাই বাহুল্য, একটা সময় ছিল যখন আত্মীয়রা পরস্পরের বাড়িতে গেলে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের হাট বসে যেত। আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারে কোন নিয়মতান্ত্রিকতা ছিল না। বিনা নোটিশে অসময়ে একজন অন্যের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতে পারতেন। এতে অনেক সময়ে অন্তঃপুরিকারা কিছুটা অসুবিধায় পড়লেও তাদের উদ্যোগ আয়োজন এবং আচার-আচরণে আন্তরিকতার কোন অভাব থাকত না। ছুটির দিনে আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়ার রেওয়াজ ক্রমশ কমে আসছে। বিনা নোটিশে গেলে অজস্র 'টেনশন' কাজ করে আমার যাওয়াটা ওনারা পছন্দ করবেন কিনা, ওদের 'প্রাইভেসি' কোনভাবে বিঘ্নিত হবে কি না ইত্যাদি। ইদানীং টেলিফোনে আগাম 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট' করে যাওয়াটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেক্ষেত্রেও যত কম সময় থাকা যায় উভয় পক্ষই তত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন! তাছাড়া আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে বেশীক্ষণ থাকার সমস্যাও তো রয়েছে। থাকতে হলে তো কথাবার্তা বলতে হবে। 'অন্যের কাছে' নিজের কথা বলার ব্যাপারে অনেক রকমের সংশয় আজকাল আমাদের মনে কাজ করে। আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের মন বোধহয় অনেক সরল ছিল তাই তাঁরা প্রাণখুলে নিজেদের কথা বলতে পারতেন, আমরা যে কোন কারণেই হোক এই ক্ষমতা ক্রমাগত হারিয়ে ফেলছি বলে আমাদের ক্ষেত্রে সমস্যা (অবশ্য, যদি এটাকে আদৌ সমস্যা মনে করা হয়) বাড়ছে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ধরনের আত্মীয়তার প্রতি মনোভাব সামগ্রিকভাবে আরও নেতিবাচক। কাকার বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার চেয়ে টি.ভি.তে সিনেমা দেখা অনেক বেশী আকর্ষণীয়। নিজস্ব পরিবারের গণ্ডির বাইরের আত্মীয়দের সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকাটা আজকাল অনেকটা নির্ভর করে আমাদের পরিবারের কোন বয়োঃজ্যেষ্ঠ সদস্যের ওপরে। তিনিই আমাদের সাথে আত্মীয়দের সম্পর্কের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই আত্মীয়তার বৃত্ত আবর্তিত হয়। আত্মীয়তা রক্ষার জন্য তাঁর এই আগ্রহ অনেকসময়ই আমাদের কাছে 'ভীষণ অস্বস্তিকর' বলে ঠেকে। এই আগ্রহের কারণে তাঁকে নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে অনেক গঞ্জনাও সহ্য করতে হয়। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই বয়োঃবৃদ্ধের আন্তরিকতাকে আমরা বুঝে উঠতে পারি না বা বোঝার চেষ্টাও করি না। পুরো ব্যাপারটাকেই একটা 'ব্যাক ডেটেড' মানসিকতার প্রকাশ বলে ধরে নিই এবং নিজেদের আধুনিক মানসিকতাকেই এক্ষেত্রে সঠিক বলে বিশ্বাস করি। সত্যিই এই আধুনিকতা কতটা 'মানবিক' সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়।

একথা মনে হতেই পারে যে বৃহত্তর সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অথবা দূরবর্তী পারিবারিক সম্পর্কের বিষয়ে আমরা কিছুটা উদাসীন হয়ে থাকলেও একক পরিবারের সদস্যদের সাথে আমাদের নৈকট্য এখনও পাশ্চাত্ত্যের যে কোন সমাজের চোখেই ঈর্ষণীয়। এই দাবীর যার্থাথ্যকে সামগ্রিকভাবে অস্বীকার করা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। অনেক উন্নত দেশের মানুষই এখনও আমাদের পারিবারিক সম্পর্কের বাঁধন দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁদের সমাজে এই নৈকট্য সম্ভব নয় বলে আফশোস করেন। এক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে পাশ্চাত্ত্যের মানুষদের কাছে আমাদের পারিবারিক কাঠামোর যে দিকটা সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলে মনে হয় তা দাঁড়িয়ে আছে মূলত দুটি বিষয়ের ওপর ঃ প্রথমটি হল একক পরিবারের মধ্যেও বয়োজ্যেষ্ঠকে যথেষ্ট সম্মান দেবার মানসিকতা। এমন কি য

খন এই বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি সংসারের প্রকৃত কর্তা ন'ন তখনও তাঁর প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শন করার ব্যাপারে অনেক অনুজই কুণ্ঠিত হ'ন না, বিশেষ করে বিদেশীদের সামনে তো নয়ই! দ্বিতীয় বিষয়টি যা বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক। বিদেশী সমাজে, বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্য সমাজে এই দুটি বিষয়ের অভাব যতটা প্রকট আমাদের দেশে এখনও তার ভগ্নাংশও নয়। কিন্তু তা বলে এক্ষেত্রেও আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ রয়েছে কি?

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে একক পরিবারের ক্ষেত্রেও সম্পর্কহীনতার বীজ আস্তে আস্তে মাথা চাড়া দিচ্ছে। একদিকে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলছে। অন্যদিকে বাড়ছে বিবাহ-বিচ্ছেদের সংখ্যা। নির্যাতিত নারীদের নিয়ে কাজ করেন যে সব সংস্থা তারা ক্রমাগত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন নির্যাতিত নারীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে। যে সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এখনও পুত্র বা কন্যার সাথে একই সংসারে রয়েছেন তাঁদের অনেকেই সমবয়স্কদের সাথে কথা বলার সময়ে অথবা জনান্তিকে বলছেন 'এর চেয়ে বৃদ্ধাশ্রমে থাকা ভাল।' অন্যভাষায় বলা যায়, একক পরিবারের বাঁধনেও টান পড়ছে। সেই টান এখনও বহিরঙ্গে তেমন প্রকাশ না পেলেও ভিতরে ভিতরে ক্ষয়ের ইঙ্গিত!

একসময়ে মনে করা হয়েছিল একমাত্র একক পরিবারেই পারিবারিক সুখ সম্ভব। মনে করা হয়েছিল ঘনিষ্ঠ মানবিক সম্পর্ক একক পরিবারেই দীর্ঘায়িত হতে পারে। এমনও অনেকে দাবী ও আশা করেছিলেন যে একক পরিবারে থাকলেই পরিবারের বাইরে অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখা সম্ভব। বাস্তবে ঘটল অন্যরকম। কারণ পরিবারের বাইরের আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য যে ইচ্ছেটা দরকার সেটাই মরে যেতে থাকে 'একা' থাকার ফলে। একক পরিবার আমাদের ইচ্ছের গতি-প্রকৃতিটাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। অনেকের সাথে থাকলে আমাদের বেশ কিছু ইচ্ছে পূরণের সুযোগ থাকে না, একথা ঠিক। কিন্তু ওই ইচ্ছেগুলো পূরণ না হওয়ার অভাব বোধটা চলে যায় অনেকের সাথে কষ্টটা ভাগ হয়ে যাওয়ায়। তাছাড়া অনেকের সাথে থাকার যে একটা পৃথক স্বাদ ও আনন্দ রয়েছে সেই আনন্দও ব্যর্থতা বোধকে অতিক্রম করতে সাহায্য করে। কিন্তু একক পরিবারের 'অনেকের সাথে সম্পর্কের মজা' পাওয়ার অবকাশ থাকে না বলে ইচ্ছাপূরণের অভাব হলেই দুঃখের সৃষ্টি হয়। ইচ্ছেপূরণের অভাবও যে বৃহত্তর কোন প্রাপ্তির কারণ হতে পারে সে বোধ গড়ে ওঠার সুযোগ না থাকায় ইচ্ছেপূরণ না হলে তাতে দু ধরণের কষ্টের সৃষ্টি হয়। যার ইচ্ছেপূরণ হল না সে দুঃখ পায় এবং যে ইচ্ছেপূরণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল তার মনে ব্যর্থতা বোধের জন্ম হয়। এই দুঃখ ও ব্যর্থতাবোধই কালক্রমে একক পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ব্যাহত করে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার, সন্তানদের প্রতি বাবা-মায়ের ব্যবহার সবই ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে উঠতে শুরু করে। আমেরিকায় গত শতাব্দীর শেষ ভাগে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে বেশী একাকীত্ব বোধের শিকার হচ্ছে। এবং এই একাকীত্বের মূলে অন্যতম প্রধান কারণ হল বাবা-মায়ের সাথে সম্পর্কহীনতা। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের চাহিদাপূরণে ব্যর্থ হয়ে বাবা-মায়েরা ধরেই নেন যে ওরা তাঁদের ওপর আর নির্ভরশীল নয়। অন্যদিকে ছেলেমেয়েরাও মনে করতে থাকে বাবা-মা তাদের ভালবাসেন না। ফলে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং এর নীটফল হয় সম্পর্কহীনতাজনিত একাকীত্ব। আমাদের সমাজেও একক পরিবারের সদস্যেরা ক্রমাগত একে অপরকে চাহিদা পূরণের যন্ত্র হিসেবে দেখতে বেশী মাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। ফলে পারস্পরিক সহনশীলতার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। পাশ্চাত্ত্যে তো পারিবারিক সম্পর্কের 'বোঝা'কে অস্বীকার করার জন্য পরিবার প্রথার বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা শুরু হয়ে গেছে। এই জেহাদ আমাদের কোন দিকে নিয়ে যাবে তা অবশ্য এখনও সংশয়িত। আমাদের সমাজে এখনও আমরা পুরনোপন্থীদের দলেই রয়ে গেছি। এখনও আমরা অন্তত নিজের পরিবারের মধ্যে মানুষকে কাছে চাই। অবশ্য আমাদের এই চাওয়া কতটা মেটে সে হিসেব খুব পরিষ্কার নয়। অনেক সময়ই আমরা বুঝতে পারি যাকে খুব কাছের মানুষ বলে মনে হচ্ছিল তারও মনের কাছাকাছি পৌঁছতে পারছি না। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা ধার করে বলা যাক ঃ

''যারা খুব কাছাকাছি তাদের গভীরে যেতে যেতে
একদিন থেমে যাই, কেননা এমন দূর পথ
যেতে হবে, তাও তো ছিল না জানা .....।''
(কাছাকাছি মানুষের)

হঠাৎ একদিন যখন খুব কাছের লোককে এভাবে অচেনা লাগে সেদিন আমরা, একক পরিবারের ঘনিষ্ঠরা, বুঝতে পারি ঃ ''যে কথা তোমার নয়, যে কথা আমার নয় / সকলেই সেই কথা বলে।'' ক্রমশ এই নৈর্ব্যক্তিকতা-বৃদ্ধির বোধ কি একক পরিবারের মানুষের কাছে খুব অচেনা?

৩।

প্রশ্ন হল, ক্রমবর্ধমান সম্পর্কহীনতার জন্য দায়ী করব কাকে? নিজেদের, না কি নিজেদের ওপরে চেপে বসা সমাজব্যবস্থাকে? যদি

বলা হয় দুটোই দায়ী তাহলে প্রশ্ন হবে কোনটা বেশী দায়ী? এধরনের প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু উত্তরের সন্ধান না করে থাকাটাও কি কঠিন নয়? সম্পর্কহীনতাকেই অনিবার্য পরিণাম বলে মেনে নিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকাটা কি খুব স্বস্তির? কাজেই উত্তর পাওয়া যাক বা না যাক উত্তর সন্ধান অন্তত কাম্য। কেন এমন হল? কেন মানুষ মানুষের কাছ থেকে এভাবে দূরে সরে গিয়ে বিচ্ছিন্ন একাকী হয়ে বাস করছে?

আর্থসামাজিক কারণের দিকে যাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তারা বলবেন ভোগবাদী বাজার সর্বস্ব সমাজ ব্যবস্থায় এর ব্যতিক্রম সম্ভব নয়। কোন্‌টা মূল্যবান কোন্‌টা নয় সে সম্পর্কে ধারণা এই আর্থসামাজিক ব্যবস্থা এমন ভাবে গড়ে দেয় যে মানবিক সম্পর্কটা সেখানে কোন ভাবেই প্রাধান্য পেতে পারে না। মনে রাখতে হবে মানবিক সম্পর্ক 'বাজারে' বিক্রীযোগ্য সামগ্রী নয়। উল্টোদিকে এই সম্পর্ককে গুরুত্ব দিলে ভোগবাদী বাজার অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই বিশ্বায়নের যুগে, পণ্য সর্বস্বতার যুগে মানবিক সম্পর্ককে কিছুতেই 'মূল্যবান' হয়ে উঠতে দেওয়া যায় না এটা সহজ বোধ্য। বিশ্বায়ন কীভাবে মানুষের মনের ওপরে প্রভাব ফেলে এবং কীভাবে মানবিক সম্পর্কের অন্তরায় হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে যত্নশীল বিশ্লেষণ পাওয়া যায় গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ''বিশ্বায়নের মন'' প্রবন্ধে। তিনি লিখছেন, ''আধুনিক অর্থবিজ্ঞানের প্রধান সুর উপযোগবাদ বা সুখবাদ। এর শূন্যতার দিকটি হল সে সুখ জিনিষটাকে খণ্ড খণ্ড করে দেখে। তাই ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সুখের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় হয়ে ওঠে, সুখের পারস্পরিক নির্ভরতাকে সে চিনতে পারে না। মানুষের আনন্দের পরিপূরকতা স্বীকৃতি পায় না। জাতিকে অখণ্ড এক সত্তা হিসেবে অনুভব করার ক্ষমতা হারিয়ে দার্শনিক ভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে সমাজ। সুখের খণ্ডিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক রূপ ও সুখের জাতীয় অখণ্ডতার চিরকালীন দ্বন্দ্বে ব্যক্তিসুখের পতাকা উড়তে থাকে।'' বলা বাহুল্য নিজেকে নিঃশেষ করে পাওয়া এই সুখ মানুষকে স্বস্তি দিতে পারে না। ফলে, ''একেকটা মানুষের সারাটা জীবন শুধু দৌড়ে পর্যবসিত। সামগ্রিক ভাবে মানুষের আচরণ আমূল পাল্টে যায়। প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ততা যেমন নিয়ে আসে বন্যা, মহামারী, যা আমাদের কাম্য নয়। তেমনি বাজারের সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ততাও সমাজকে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। যার উদাহরণ ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড। পৃথিবীর খোলা বাজারের দেশগুলির ক্রমবর্ধমান হতাশা, অবসাদ, একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতা ও আত্মহত্যা বিশ্বায়নের ভয়ঙ্কর দিকেরই ঘন্টাধ্বনি।'' আমাদের সমাজে এই ভয়ঙ্কর বাজার ব্যবস্থা এখনও পুরোপুরি থাবা বসাতে না পারলেও বিপদ খুব আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। তার ইঙ্গিত আমরা পাই সমাজমনে বেড়ে ওঠা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে। একদিকে নিরাপত্তাহীনতা, অন্যদিকে ভোগবাদের অন্তহীন আকর্ষণের মধ্যে পড়ে আমাদের মূল্যবোধ ক্রমাগত বিপর্যস্ত হচ্ছে। আমরা শ্রেয়ঃ কে ফেলে প্রেয়র পিছনে দৌড়চ্ছি। আমরা মনে করছি যত বেশী আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আসবে আমরা ততই ভাল থাকব। এই 'ভাল থাকার' চেষ্টায় কখন যে আপনজনদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছি বুঝতেও পারছি না। অথবা বুঝতে পারলেও কিছুই করে উঠতে পারছি না। সম্পর্কহীনতা বাড়ছে কি না এ সম্পর্কে কথা বলতে গেলে দেখতে পাবেন বেশীর ভাগ মানুষই মনে করেন তারা বাধ্য হয়ে সম্পর্কহীনতাকে মেনে নিচ্ছেন। অনেকেই বলবেন 'সম্পর্ক আগের মতোই আছে, তার প্রকাশই শুধু পাল্টে গেছে।' কিন্তু রাতের সব তারাই কি সত্যিই দিনের গভীরে লুকিয়ে রয়েছে? আসলে, সম্পর্কটা থাকুক এই ইচ্ছেটা রয়েছে আমাদের মনে। অথচ এই ইচ্ছেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য যা কিছু কর্তব্য তার ঠিক বিপরীত কাজটাই করে চলেছি আমরা। এইভাবে ক্রমাগত আত্মপ্রতারণা করে চলছি। এটা এক ধরনের আত্মবিচ্যুতিও বটে। অনেকেই বলবেন কার্ল মার্কস্‌ তো অনেকদিন আগেই সতর্ক করে গেছেন এই আত্মবিচ্যুতি অথবা আত্মবিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনার বিষয়ে। প্রশ্নটা সেখানেই, সম্পর্কহীনতার যন্ত্রণা অনিবার্য জানার পরও এত বোদ্ধা মানুষ ভোগবাদী ব্যবস্থাকে মেনে নিচ্ছে কী ভাবে? সত্যিই কি আমরা বিশ্বাস করি যে মানুষের সাথে, বিশেষ করে নিকটজনের সাথে সম্পর্ক একটা মূল্যবান বিষয়? সম্পর্কহীনতা কি সত্যিই আমাদের কোন বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে? রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মানবিক সম্পর্কহীনতা মানবসমাজের সুস্থ বিকাশের পরিপন্থী। যে ধরনের ঐশ্বর্য সন্ধান মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ''এ কথা সত্য, একটা প্রকাণ্ড দানবীয় ঐশ্বর্য্যের মধ্যে মানুষ আপনার শক্তিকে অনুভব করে। সেও বহুমূল্য, আমি তাকে অবজ্ঞা করব না। কিন্তু সেই শক্তি-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি মানুষী সম্বন্ধ বিকাশের ক্ষেত্র কেবলই সঙ্কীর্ণ হতে থাকে তবে সেই শক্তি শক্তিশেল হয়ে উঠে মানুষকে মারে, মারবার অস্ত্র তৈরী করে, মানুষের সর্বনাশ করবার জন্য ষড়যন্ত্র করে, অনেক মিথ্যার সৃষ্টি করে, অনেক নিষ্ঠুরতাকে পালন করে, অনেক বিষবৃক্ষের বীজ পোরণ করেই সমাজে।'' রবীন্দ্রনাথের কথাকে ভাববাদী কবির কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। মনে করা যেতেই পারে, কই পাশ্চাত্ত্যে এত সম্পর্কহীনতা সত্ত্বেও তো সেই সমাজে মানুষের সুখ এতটুকু কম নয়। মনে হতে পারে যে মানবিক সম্পর্ককে জিইয়ে রাখতে না পারলেও তার বিকল্প ব্যবস্থা হয়তো করা সম্ভব এবং সেই বিকল্পের জোরে সমাজ কাঠামোও টিকে থাকতে পারে। পাশ্চাত্ত্যে নানা রকম সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে তো মানবিক সম্পর্ক থেকে প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা পৌঁছে যাচ্ছে যথাস্থানে। বিপদে পড়লে সেই বিপদ থেকে রক্ষার দায়িত্ব যদি সরকার নেয় তাহলে খামোকা পাড়াপ্রতিবেশী কেন একে অপরের বিপদে ঝাঁপাতে যাবে? নিঃসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের দেখার দায় যদি সরকারী হোমের ওপরে বর্তায় তাহলে ওই বৃদ্ধের সুখী সন্তানদের সুখ নিয়ে টানাটানি করার কি দরকার? স্ত্রীর দায়দায়িত্ব না বহন করে যদি লিভ টুগেদারের মাধ্যমে পরস্পরের আবেগজনিত প্রয়োজনকে মেটানো যায় তাহলেও কি 'সমাজের ভাল' করার জন্য দীর্ঘস্থায়ী পারিবারিক সম্পর্কে ঢোকাটা আবশ্যিক?

লক্ষ্য করুন, ওপরে যে প্রশ্নগুলি রাখা হয়েছে সেগুলিকে 'স্রেফ ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থার' ফসল বলে চালিয়ে দেওয়া এবং প্রশ্নে অভিপ্রেত উত্তরগুলিকে মেনে নেওয়া খুবই সহজ কাজ। এবং এই সহজ কাজের বিপরীতটা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য বলেই হয়তো আমরা ইচ্ছে করেই সম্পর্কহীনতা অনুকূল অবস্থাগুলোকে মেনে নিই। অর্থাৎ সম্পর্কহীনতা কেবলমাত্র একটা সিস্টেমের ফসল হয়তো নয় । ওই সিস্টেমের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আমাদের ইচ্ছেগুলোও হয়তো এই পরিণতিকে মেনে নেওয়ার অন্যতম কারণ। যারা মনে করেন মানুষের ইচ্ছে সবসময়ই পরিস্থিতির অধীন তারা নিশ্চয়ই বলবেন ভোগবাদী সমাজে এই ইচ্ছের থেকে ভিন্ন আর কোনও ইচ্ছে সম্ভব নয়। বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলে। এমন অনেক মানুষ এখনও রয়েছেন যাঁরা ভোগবাদী ইচ্ছের হাড়িকাঠে গলা দেন না। তাঁরা কি করে পারলেন? পারা তা হলে সম্ভব। কিন্তু এই অন্যরকম ইচ্ছে তোলার প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা যতক্ষণ না সতর্ক হচ্ছি, তত ক্ষণ এই ইচ্ছে জেগে উঠতে পারেনা। যদি একথা মানুষ বুঝতে পারে যে সম্পর্কহীনতা তার নিজের ক্ষতি করবে তাহলেই মানুষ সতর্ক হবে।

প্রশ্ন হল সম্পর্কহীনতার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে কবি-দার্শনিকেরা ছাড়া বিজ্ঞান চর্চাকরী লোকেরা কি কিছু বলেছেন? যেহেতু যুগটা বিজ্ঞানের তাই বিজ্ঞানীদের দিকে তাকানোটা প্রাসঙ্গিক।

মনোবিজ্ঞানী আব্রাহাম মাসলো এবং কার্ল রাজর্স মানবতাবাদী বিজ্ঞানী বলে প্রসিদ্ধ। মনোবিজ্ঞানে যান্ত্রিকতাবাদের বিরোধিতা দুজনেই করেছেন যথাসাধ্য। মাসলোর মতে মানুষের ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ নির্ভর করে তার কয়েকটি মৌলিক চাহিদা পূরণ হওয়ার ওপরে। চাহিদাগুলিকে ক্রমান্বয়ে সাজালে এরকম হবে প্রথম চাহিদা বেঁচে থাকার রসদের, দ্বিতীয় চাহিদা নিরাপত্তার; তৃতীয় চাহিদা ভালবাসা পাওয়া এবং কারও সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার, চতুর্থ চাহিদা আত্মসম্মানের এবং চূড়ান্ত চাহিদা হল আত্মোপলব্ধির। মাসলো মনে করতেন চূড়ান্ত চাহিদাটি সব মানুষের পক্ষে পূরণ করা না সম্ভব হলেও ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশের জন্য চতুর্থস্তর পর্যন্ত চাহিদাগুলি মেটা দরকার। মানব সমাজে সম্পর্কহীনতা যদি সর্বস্তরে দেখা দিতে থাকে তাহলে মানুষ কোনক্রমেই ব্যক্তিত্ব বিকাশের তৃতীয় স্তরটি সুষ্ঠুভাবে অতিক্রম করতে পারবে না। ফলে পরবর্তীস্তরও তার কাছে অধরা থেকে যাবে। আত্ম সম্মানের স্তরে মানুষ পৌঁছতে না পারলে সে হবে হীনম্মন্যতার শিকার এবং এই হীনম্মন্যতার পথ ধরে তার জীবনে দেখা দেবে আরও নানান মানসিক সমস্যা। পাশ্চাত্ত্য যখন সম্পর্কহীনতার জয় জয়কার করছে ঠিক তখনই পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মানসিক রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে, এবং এই দুটি ঘটনার মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই এই দাবী এখনও কোন মনোবিজ্ঞানী করেন নি। মাসলোর মতোই রাজর্সও বলেছিলেন সমাজের একজন ব্যক্তি যদি অন্যকে শর্তহীনভাবে ভালবাসা দিতে শেখে তবেই সমাজে সুস্থ মনের বিকাশ সম্ভব হবে। সম্পর্কহীনতা যদি শেষ কথা হয় তাহলে মানুষের মন তা শেষ পর্যন্ত মেনে নেবে না সে কথা মনে রাখতে পারলেই হয়তো আমরা সম্পর্কহীনতাকে অনিবার্য বলে মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারব। তা না হলে পাশ্চাত্ত্যের মতো আমাদেরও হয় তো মানবিক সম্পর্কের স্পর্শ পাওয়ার জন্য পেশাদার মনোবিজ্ঞানীদের কাছে যেতে হবে।

৪।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা এখানেই যে আমরা জীবনের সমস্যাগুলোকে মোকাবিলা করার কোন শিক্ষাই পাঠক্রম থেকে পাইনা। বিদেশে এই মুহূর্তে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইতে জয়ী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শেখানোর ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে পাঠ্যসূচীতে। সম্পর্কহীনতার বিপদ সম্পর্কে যদি মানুষকে সময় থাকতে অবহিত করা যায়, যদি সুস্থ সম্পর্ক কী ভাবে বজায় রাখা যায় সে সম্পর্কে জানার ও শেখার সুযোগ ছাত্রজীবন থেকে থাকে তাহলে মানুষকে অনেক মানসিক বিপর্যয় থেকেই হয়তো রক্ষা করা যেতে পারে। একথা অবশ্যই সত্যি যে ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে অধীত এই শিক্ষাকে কার্যকরী করা কষ্টকর, কিন্তু এর বিকল্পও তো এই মুহূর্তে হাতের কাছে নেই।

অন্য যে বিকল্প এক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করতে পারে তা হল বাজার অর্থনীতির তত্ত্বে এমন পরিবর্তন আনা যা মানসিক মূল্যবোধগুলিকে যাথযথ গুরুত্ব দেবে। অর্থাৎ বাজার অর্থনীতিকে যদি কোন তত্ত্বের মাধ্যমে মূল্যবোধের সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করা যায় তাহলে মানুষের সুখের সন্ধান হয়তো তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ব্যাহত করবে না। কিন্তু এ ধরনের তত্ত্ব শুধু তৈরী হলেই তো হবে না, বাজার অর্থনীতির ধারক বাহক পৃথিবীকে এই তত্ত্ব তো প্রয়োগ করতে হবে। সেটাও তো একটা মূল্যবোধের ওপরই নির্ভরশীল। অর্থনীতিবিদেরা এই মূল্যবোধ রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে কতটা সঞ্চারিত করতে পারেন তার ওপরেই নির্ভর করবে মানবিক সম্পর্কহীনতার সমস্যা সমাধানে অর্থনীতির কার্যকারিতা।

সময়ের জ্বর সময়ের স্বর

হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়::

::::

:

মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে
একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
তোমার জন্যে গলির কোণে
ভাবি আমার মুখ দেখাব
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।
:
একটা দুটো সহজ কথা
বলব ভাবি চোখের আড়ে
জৌলুশে তা ঝলসে ওঠে
বিজ্ঞাপনে, রংবাহারে।
:
কে কাকে ঠিক কেমন দেখে
বুঝতে পারা শক্ত খুবই
হা রে আমার বাড়িয়ে বলা
বা রে আমার জন্মভূমি !
:
বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া
তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত
নিওন আলোয় পণ্য ওতপ্রোত
নিওন আলোয় পণ্য হলো
যা - কিছু আজ ব্যক্তিগত।
:
মুখের কথা একলা হয়ে
রইল পড়ে গলির কোণে
ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু
ঝুলতে থাকে বিজ্ঞাপনে।

:

জলের মতো ঘুরে ঘুরে কথা বলার দিন শেষ। দূরের আকাশ আর দূরতর আকাশ রেখার কোণে জেগে থাকা সাঁঝবাতির সাথে চুপিচুপি মন খারাপের গল্প বলার দিনও ফুরিয়ে এল দেখতে দেখতে, যেন উদাসী শালিখের চোখে ঘনিয়ে এল ঘোর। প্রসারিত টাটা সেন্টারের মাথায় ঝুপ্ করে দিনের আলো নিভে গেল এই চেনা মেলামেশার ঢঙ, বদলে যায় অলিগলির শিরা উপশিরা। তখন কতো মানুষের ভিড়ে কতো রকমের কথকতা, কেনাকাটা, ক্যাকোফোনি, কান্নাহাসির দোল দোলানো নৈমিত্তিক পৌষফাগুন। কতো আনাড়ি উচ্ছ্বাস আর সেয়ানা সফলতা নিয়ে কাড়াকাড়ি। মিটিং মিছিল, তেজি মাতাদোরের মতো তার বাঁচার লড়াই, দশটা-পাঁচটায়। তারপর কি থাকে তার অন্তর জুড়ে, অন্তর্দাহ নাকি অন্তর্ধানের ইচ্ছা--- কে জানে ! নাগরিক রাত শুধু দেখে একঘেয়ে এক ক্লান্ত রুটিন, দেখে সারি সারি বাড়ি আর গাড়ি আর পথচারী জনতার পায়ে পায়ে ক্রমশ ছড়িয়ে যায় তার পাল্লা --- বৃহৎ এক বাজারের মাঝে।শ্যামবাজার বাগবাজার ছাড়িয়ে, রাজাবাজার রাধাবাজার লালবাজার ছাড়িয়ে, শহর ছাড়িয়ে আরো দূরের শহরেরদিকচক্রবাল ছাড়িয়ে, দেশ ছাড়িয়ে, পৃথিবীময়। অনন্ত এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোর যেন, যেখানে আমি তুমি সামগ্রী, সে সামগ্রী, দেবতা - দেশপ্রেম সামগ্রী, স্ত্রীলোক সামগ্রী, বিদ্যা সামগ্রী, বিদ্বান সামগ্রী, মুখ - মন - মগজ সামগ্রী, ঠোঁটসামগ্রী, চুমুও তাই। এখানে সব কিছু বিকায়। ল্যাম্পপোস্টের গায়ে লটকানো পোস্টার, বহুতলের গায়ে সাঁটা ফ্রেমে আঁটা রঙিন আলোর প্রেম, কিংবা ট্রামে বাসে, কাগজ পত্রে, টিভি সিরিয়ালের ভাঁজে ভাঁজে জমিয়ে তোলা নানা সামগ্রীর দৃশ্যকথামালা -- ক্রেতা ধরার কেতা কতো সহজে আড়াল করে আর সব। স্বভাব এবং অভাব। এইভাবে মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।

:

মানুষ বাড়ছে তাই প্রয়োজন বাড়ছে, চাহিদা বাড়ছে তাই বাড়ছে যোগানদারদের বাজার ধরার দস্তুর। তাই এত বিজ্ঞাপন। প্রতিযোগী পণ্যের এই বাজারধর্মী বিপন্নতা তাই প্রতিমুহূর্তে বিজ্ঞাপনের শরীর ছুঁয়ে বাড়তে চাইছে, বাঁচতেচাইছে। এবং এই যে শঙ্কিত সাম্প্রতিক দিনগুলিতে এই যে মিডিয়ার গ্রাসে নিহত নির্জনতা, এই যে বিজ্ঞাপনের বাচাল প্রহরে, দিকে দিকে 'গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের, ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন' --- এর মাঝে কেমন থাকেন কবি শিল্পী, সংবেদনশীল মানুষ ? শিল্পীর কারুবাসনা ? এত তীব্র বিপরীতের দ্বন্দ্বে কি ভালো থাকা যায় ? বিরিয়ানি বিপণির আমিষগন্ধ আর শীততাপনিয়ন্ত্রিত সাইবার কাফেদের ঝকঝকে ব্যস্ততাকে জুড়ে নিয়ে নিছক প্রয়োজনের পৃথিবীতে কতোটা ভালো আছেন আমাদের প্রিয়জন ? আসুন তার কিছু পরিচয় খুঁজ নিতে, কবিতার অক্ষরে অক্ষরে। কবি শঙ্খ ঘোষের মেধাবী বিষাদ যেখানে ধরা আছে, আসুন পড়ি তাঁর কবিতা:

:

''একলা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি
তোমার জন্যে গলির কোণে
ভাবি আমার মুখ দেখাবো
মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে''

:

নিঃশব্দের তর্জনী তুলে ‘এত বেশি কথা বলো কেন? চুপ করো / শব্দহীন হও’ বলে যখন নিস্তার নেই, সেই প্রগল্‌ভসময়ে কেউ কেউ --- মুদ্রাদোষে নয় -- স্বেচ্ছায় কিছুটা নিরালা খুঁজে নেয়, সবার থেকে দলছুট হয়ে একলা দাঁড়ায়, কারবারি লাভের বাইরে, শুধু ‘তোমার জন্যে’। এই যে কেজো, কর্তাভজা, কৃত্রিম পৃথিবী, যেখানে সবাই ছুটছে কিছু না কিছু অ্যাচিভ করার জন্য, সেখানে এক জন গলির কোণে দাঁড়িয়ে আছে, ঘনিষ্ঠ একজনকে একটু মুখ দ্যাখাবে বলে --- নিচু প্রোফাইলে গড়া এই নিবিড় অনুরাগের কথাগুলি অকস্মাৎ ধাক্কা খায় যেন, ‘মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।’ শুধু কি মুখ ঢেকে যায়, মনও ঢেকে যায় হয়তো বা। নিজের খাঁটি নিজস্বতা টুকু হারিয়ে যায় এই বিপণন আর বিজ্ঞাপনের মাদারিখেলায় :

:

‘‘একটা দুটো সহজ কথা
বলব ভাবি চোখের আড়ে
জৌলুশে তা ঝলসে ওঠে
বিজ্ঞাপনে, রংবাহারে।’’

:

এ এক আশ্চর্য সময়, যখন নিজের ঢাক নিজে না পেটালে ‘লোকে বলবে মূর্খ বড়ো, লোকে বলবে সামাজিক নয়।’ তবু কিছু ব্যতিক্রমের মতো মানুষ থেকে যাবে, যারা ধূর্ত হবে না হাবেভাবে। যারা নিজেকে জিজ্ঞাসা করবে ‘বড়ো বেশি কথা বলা হলো?’’ আর ভাববে ‘চতুরতা, ক্লান্ত লাগে খুব?’’ কথা তো, প্রতিটি উচ্চারিত কথাই তো, তাদের কাছে অঙ্গীকার , অর্থহীন দিশাহীন শব্দসমষ্টিমাত্র নয়। তাই ‘একটা দুটো সহজ কথা’ যদি নিজের সত্য অস্তিত্ব হারায়, তার গায়ে যদি জমে জৌলুশ আর চটক, সেই রংবাহারে পথ হারাবে প্রেম ও প্রতিজ্ঞা, হয় তো প্রতীক্ষাও !

:

একররকম বিজ্ঞাপন থাকে বাইরে, পণ্যদ্রব্যের গায়ে, কারবার কৌশলের শিরায় শোণিতে, মুনাফার নীল নক্‌শায়। স্পর্শকাতর মানুষ বিপন্নবিস্ময়ে নাজেহাল হয় তার কারিগরি দক্ষতায়। সমাজবিজ্ঞানী বিনয় ঘোষ তার কিছু পরিচয়তুলে ধরেছেন ; ক্রেতাকে কন্‌ভন্‌সড করতে না পারো তো কন্‌ফিউসড করে দাও --- এই হল বিজ্ঞাপনের দর্শন। বিনয়বাবুর ভাষায়----

‘‘এই যে দেদার ভোগ্যদ্রব্য যার শতকরা পঁচানববই ভাগ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন নেই, এমন কি বাঁচার মতো বাঁচার জন্যও নেই। শুধু সামাজিক অপচয়, তা বাজারে চালাতে গেলে বেচতে গেলে তারজন্য চাহিদা সৃষ্টি করতে হয় অর্থাৎ নতুন নতুন অভাববোধ জাগাতে হয় মানুষের মধ্যে এবং যা করতে গেলে সকলের আগে এবং সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় বিজ্ঞাপনের। বিজ্ঞাপন তাই একালের মনোপলি ক্যাপিটালের জীবনমরণ কাঠি এবং তার জন্য বর্তমান সমাজে বিজ্ঞাপনের নৈতিক মানসিক প্রভাব যে কত গভীর স্তর পর্যন্ত প্রসৃত ও কত ব্যাপক তা সহজে ধরা যায় না’’

:

আধুনিক অথবা উত্তর আধুনিক পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যেন অভিমন্যু, তাকে ঘিরে অগণিত কাগজপত্র, টেলিভিশনের নানা চ্যানেল, ইন্টারনেটের দূরপাল্লায়, অডিও ভিডিও ক্যাসেটের অজস্র পাকে, কম্প্যাক্ট ডিসকের সুদর্শন চক্রেচলে নানা ভাষায় বিজ্ঞাপন। যেখানে অতিশায়নের সীমা ছাড়িয়ে মিথ্যাকে কেমন অনায়াসে সত্যি বলা হয়, সত্যি করা হয়। বলা হয় প্রশ্রয়ের সুরে ‘Permissible lie’! এই মনোরম মিথ্যাই বিজ্ঞাপনের ‘জ্ঞাপন’। যোগ্যজনে বলে : “Advertising is Communication–mass produced, a brain of child of our mechanized civilization,”

বাণিজ্যবিজ্ঞাপনের নাকি বিবেক থাকতে নেই ! কি জানি, হবেও বা। সর্বাধিক ক্রেতা ধরার জন্যই সম্ভবত নীতিবোধ শিকেয় তুলে ক্রিকেট টেলিকাস্টের ফাঁকে থাকে কনডোম কিংবা স্যানিটরি ন্যাপকিনের বিজ্ঞাপন, অথবা, বাকার্ডি বা কিংফিসারের বিজ্ঞাপন। বিব্রত বাবা মায়ের আড়ালে কিছু কৌতূহলী অপরিণত চোখে বিস্ময় ঘনিয়ে আসে। পণ্যের ভাবী ক্রেতারা অসময়ে, অন্যায় ভাবে ‘বড়ো’ হয়ে যায়। তাদের ‘এ দিল মাঙ্গে মোর’। অ্যাগ্রেসিভ মার্কেটিং করপোরেট কর্তাদের কানে কানে মন্ত্র জপে-- ‘Advertise or perish’, আর বিজ্ঞাপনজগৎ দিকে দিকে, ঝাঁপিয়ে ছিল রুমাল টাকে বিড়াল বানানোর ‘সুকুমার’ খেলায়। খেলাই বটে। তথাকথিত বাণিজ্যের বাংলায় ---- ‘ধামাকা’।

:

এই সব কিছুর চাপে একটু একটু করে বদলে যায় সামাজিক চলন, প্রতিযোগিতার দর্শন বদলে দিতে থাকে তার সাবেক আদর্শ ও মূল্যবোধ। কালো মেয়ের কান্নাকে পণ্য করে ‘ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি’, ইভটিজিংকে আশ্রয় করে চলতেই থাকে ঊষা ফ্যান। চিন্তাদর্শে বড়ো রকম বদল না হলে ওনিডা কেন রভিন টিভি বেচতে শয়তানকে সাক্ষী রেখে পড়শির ঈর্ষাকে ক্রেতার গর্বের বিষয় করে তুলবে ? কেন শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে শরীর দ্যাখাতে হবে? ক্যাডবেরির বিজ্ঞাপনে কেন ক্যাটালিস্ট হবে নারীদেহ? ঠিকই বলেছেন বিনয় ঘোষ, এই সব কিছুর ফলাফল চুঁইয়ে নামে --- ‘জেনারেশন নেক্সট’ - দের চেতনায় -- আদর্শহীনতার এই নব্য আদর্শ, এই হেজিমনি

। অথচ একদিন ছোটদের মন ভোলাতে আমাদেরও ছিল ঠাকুমার ঝুলি, একটু বড়ো হলে নাচ আর নাটক। ব্রতচারী আর বয়স্কাউট । ছিল ছোট ছোট পাড়ার ক্লাব, শীতে দল বেঁধে পিকনিক, বিজয়ার পর গানের জলসা। ওবাড়ির পিসিমার কাছে ভুতের গল্প শুনতে যেত যারা, এবাড়ির দাদার কাছে ডাকটিকিট আর লুকিয়ে চুরিয়ে দিদার আমের আচার নিয়ে যেত যারা, দুষ্টু দুপুরে দস্যিপনার পর পাড়ার মান্য অভিভাবকের কাচে কানমলা খেত যারা, তারপর সেই দুঃখে 'আবার যখের ধন' কিংবা 'চাঁদের পাহাড়' নিয়ে বসে পড়তো যারা--- তারা কি তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য সেই অবকাশ মঞ্জুর করছে কোথাও ? ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের কড়া শাসন আর অনুশাসন কি সেই সরল দিনরাত্রি দিচ্ছে তাদের? ইস্কুল - কোচিং ক্লাস, গান আর আঁকার ক্লাস, সাঁতার সেতার ও কমপিউটার শেখার পর আর কিছু খোলা আকাশ কি থাকে তাদের জন্য? অথচ শিশুরা কেমন দ্রুত বাল্য এবং কৈশোরে পৌঁছে যায়। 'তন্ত্রে'র নিশিডাক তারা শোনে, ইন্টারনেট সার্ফ করতে করতে দ্যাখে, যা তাদের দ্যাখার নয়। তারা হিংস্র হয়, ক্লান্ত হয়। বাবা - মারা ব্যস্ত যখন কেরিয়ার দৌড়ে, তখন তাদের বন্ধু হতে পারতো যারা --- সেই দাদু ঠাকুমারাও তো থাকে না কাছেপিঠে -- নিউক্লিয়ার পরিবারের আড়াই কামরার ফ্ল্যাট বাড়িতে তাদের ঠাঁই হয় নি। নেই কাকা পিসিরাও। পৃথগন্নের পরিখা মাঝখানে একক পরিবার নিষ্ঠুরভাবে পরিকল্পিত। অগত্যা 'ক্রেশ'- য়েই পালিত হয় তাদের কারও কারও জন্মদিন, পায়েসের অভাব পূরণ করে পকেটমানি আর মন্‌জিনিসের কেক। অগত্যা একলা থাকার অস্থির প্রহরে এই 'পিকু'দের আঙ্গুল রিমোটে অস্থিরতর চাপ দিয়ে টিভির চ্যানেল থেকে চ্যানেলে খুঁজে ফেরে সেক্‌স কিংবা অ্যাকশন। ওরা এই ভাবে 'বড়ো' হয়, আধুনিক বড়বাজারের আগন্তুক হয়।

:

অথবা, সত্যিসত্যি 'বড়ো' হবার আগেই, ভাবে, এই যাচ্ছেতাই জগৎটাকে বদলে দিতে ওদের সাথী যদি হত কোনও অদ্ভূতকর্মা --- ব্যাটম্যান, স্পাইডারম্যান কিংবা পোকেমনদের কেউ, কিংবা দিশি 'শক্তিমান'। পার্লেজি বিস্কুট মুখে দিয়ে হয়তো ভাবে, যদি শক্তিমান তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেত অন্য ভুবনে। এবং এইসব ভাবতে ভাবতেই হয়তো তাদের মধ্যে কেউ একজন অসীম বিশ্বাসে লোকলোচন এড়িয়ে উঠে আসে বহুতল বাড়ির মগডালে। তারপর ছাতের বিপজ্জনক কিনারা থেকে নিজেকে ছোট্ট পাখির মতন ভাসিয়ে দ্যায়, গাঢ় অক্সিজেনে ভরা আকাশের দিকে --- পড়ে যাবার আগেই প্রিয় শক্তিমান তাকে লুফে নেবে, এই জেনে। তারপর আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণের থেকে বড় অসময়ে বিদায় -- মিডিয়ার খবর আর মনোবিজ্ঞানীর সাবজেক্ট হয়ে যায় সে।

:

এইভাবে মুখ ঢেকে যায় --- লজ্জায়। এইভাবে মুখ ঢেকেযায় বিজ্ঞাপনে। বোরোলিন বলেছিল, জীবনের ওঠাপড়া যেন গায়ে না লাগে। এখন আমাদের অনেক কিছুই গা সওয়া হয়ে গেছে। তবু অনুভবী কবি কবিতায় সত্যবান থাকতে চান, একটা দুটো সহজ কথায় শোনাতে চান সামাজিক স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। আর সেখানেই হাহাকার হয়ে ঝরে তাঁর কবিতার দুঃখিনী বর্ণমালা : শিরে সংক্রান্তি নিয়ে স্তম্ভিত স্বদেশ আরও বড়ো সর্বনাশের জন্য অপেক্ষায় থাকেযেন। বেদনায় নীল হয়ে যাওয়া জন্মভূমির বর্ণপরিচয় কবি নতুন করে পড়তে চান----

'কে কাকে ঠিক কেমন দেখে
বুঝতে পারা শক্ত খুবই
হা রে আমার বাড়িয়ে বলা
হারে আমার জন্মভূমি!''

কে কাকে কেমন দেখবে, তাও তো আজকাল প্রচারে প্রচারে ঠিক হয়ে যায়। তাই তো ধর্মের বিজ্ঞাপন, রাজনীতির বিজ্ঞাপন, দল ও প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন। এটা ঠিক, এই আধুনিক জীবনে আমরা বিজ্ঞাপন বেষ্টিত। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নিজেরাও কি নিজেদের বিজ্ঞাপন হয়ে যাই নি ? প্রতি মূহূর্তে আমাদের সামাজিক জীবনে, পেশা জীবনে, এমন কি, ব্যক্তিজীবনে আমরা কি নিজেদের যথাযথ মাপে স্থাপন করি ? নাকি সহজ কথাগুলিতে লাগাই রঙের পালিশ আর মিথ্যা দিয়ে গড়ে তুলি আত্মপরিচয়? এই যে নিজেকে নিজেই সেবার শিরোপা দেওয়া --- একি আত্মবিজ্ঞাপন নয় ? এই বাড়িয়ে বলা, এই আস্ফালন সেভাবে এখন বিব্রত করে না আমাদের সৌজন্যবোধকে। অনেক সময় অন্যকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য, অনেক সময় অন্যের চোখে ধুলো দেবার জন্য, এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে অন্যের মনে ভয় ধরিয়ে দেবার জন্য আমরা নিজেদের জাহির করি। ভুলে যাই, এই আত্মবিজ্ঞাপন, এই আত্মপ্রশংসা আসলে নিজের দুর্বলতা বা হীনম্মন্যতাকেই প্রকাশ করে। বিশেষত এই ফলস আইডেনটিটি হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে তখন শুধু নকলনবীশ স্মার্টনেস দিয়ে সামাল দেওয়া যায় না সেই ফাঁকি আর শূন্যগর্ভ অস্তিত্বকে। তথাকথিত বুদ্ধিমানকে কী দারুণ নির্বোধ লাগে তখন। কথামালার সেই নীলবর্ণ শেয়ালের মতে প্রতারক মনে হয়, যে ঘটনাচক্রে নিজেকেও প্রতারণা করেছে। কবি তো নিজেই অন্য কবিতায় বলেছেন --- ''হঠাৎ কখনো যদি বোকা হয়ে যায়, কেউ, সে তো নিজে আর / বুঝতেও পারে না সেটা।'' তবু অনুভূতিশীতল অন্যরা তা বোঝে কখনো কখনো। এবং সেই ক্ষণে, আত্মবিজ্ঞাপিত প্রতিমার গা থেকে খুলে যায় ঝুটা রঙের পলেস্তারা, বার হয়ে পড় খড়কুটোর, কঞ্চির কাঠামো, পরিমাটির মামুলিপনা। রাজনৈতিক নেতা, অথবা, রুপোলি পর্দার তারকা, কিংবা , খেলার মাঠের হিরো -- নিজের সাতকাহন গরিমাগাথা শুনে, বা, বলে লজ্জিত হয় না কোনো কোনো মানুষ, অথচ এই শিষ্টাচারের অপমৃত্যুতে লজ্জিত হন কবি, ব্যথিত হয় তাঁর কণ্ঠ :

:

''বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া
তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত
নিয়ন আলোয় পণ্য হলো
যা কিছু আজ ব্যক্তিগত।''

আজকাল যখন সেলিব্রিটির প্রেম কথা তথা বিছানা বৃত্তান্ত ট্যাবলয়ে কাগজের দামি খাদ্য, হলুদ সাংবাদিকতার সেই রম্য পণ্যপ্রজন্ম 'ব্যক্তিগত' বলে কিছু নেই। থাকতে নেই। একটি কথার দ্বিধা থরো থরো চূড়ে এখন আর সাতটিআমরাবতীর ভার সয় না, বরং কথাগুলি যদি লেডি ডায়ানা বা ডেভিড বেকহ্যামের হয়, তবে তার সঙ্গে উপযুক্ত মশলা মিশিয়ে রুচিহীন রেসিপি বানানো হয় সঙ্গ সঙ্গে। ভারী ভাবমূর্তির জনপ্রিয়তাকে ভাঙিয়ে ভরে ওঠে বার্তাসম্পাদকের ক্যাশবাক্স। 'গোপন কথাটি রবে না গোপনে' বলার মধ্যে যে সৎ উত্তেজনা ছিল, তাও কিন্তু মরে গেছে এখন, এ লগনে গান শোনা নয়, লগ্ - অন করে ভিডিওকন টিভিতে কেচ্ছা শোনাই রীতি, এই স্বেচ্চাচারের বাইরে গেলে তাকে ত্যারছা নজরে দ্যাখা হবে, দেগে দেওয়া হবে ভুল নামে।

:

অথচ প্রতিটি মানবিক সম্পর্কের একটা মাহাত্ম্য ছিল একদিন। প্রতিটি সম্পর্কের সমাজ নির্দিষ্ট কোনও নাম হয় নতা হয়তো, তবু তার একটি ব্যক্তিগত পূর্ণতার মূল্য ছিল কোথাও। সেই সব অসমান, অন্যরকম সম্পর্কগুলি এখন মথিত হয়ে স্থূল একমাত্রায় মিশে গেছে। 'চোখের চাওয়া' কিবিকিয়ে যায় নি আজ কোম্পানির আই স্যাডো বা আইল্যাসের দামে, অথবা, আরও দামী কনট্যাক্ট লেন্সর লাস্যে ? কিংবা, হারিয়ে যায়নি কি তার আবেদন, রে ব্যানের রোদচশমার সেই কালো রহস্যের আড়ালে? অতএব, কবি বলেন ভিতর কথা ; সব কিছু একাকার হওয়ার, আত্মপরিচয় খোয়ানোর যন্ত্রণা সেখানে----

''মুখের কথা একলা হয়ে
রইল পড়ে গলির কোনে
ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু
ঝুলতে থাকে বিজ্ঞাপনে।''

'তুমি' বোঝনি, 'আমি'ই ভিতরে ভিতরে দু টুকরো হয়ে গেছি। বলতে চাওয়া কথাগুলি পড়ে রইল, একাকী, দূরে, গলির অন্ধকার কোণে। আর রাজপথে আজ ঝুলতে থাকলো আমার, আমাদের মুখর মুখোশ --- আলোকিত বিজ্ঞাপনে তার আয়তন বদলে বদলে গেল, সম্ভব থেকে অসম্ভবে। অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করা এই মিছে ছলনার রূপসী কথাগুলি শুধু ক্লান্ত করে আমাদের। ক্লান্ত, ক্লান্ত করে।

:

তারপর কেউ যদি ভাবে ---- ''লাসকাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নাই / তাই ...'' তাকে শুধু সিনিক্ বলাটা খুব সমীচীন হবে তো ? নিজের সঙ্গে কতোক্ষণ অভিনয় করতে পারে মানুষ, মুখোশ কতোদিন মুখশ্রীর বিকল্প হবে তবে? কেন হবে ?

:

তথ্যসূত্র :

১. বিনয় ঘোষ, মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ (বিজ্ঞাপন ও মন), ওরিয়েন্ট ল্যাংম্যান পৃ - ১৮০

২. John Corner, Edward Arnold and Jemy Howthorn, Communication studies, p – 16

শঙ্খ ঘোষের সংশ্লিষ্ট কবিতার উদ্ধৃতিগুলি সবটাই দে'জ প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কবিতা'র সাম্প্রতিক সংস্করণ থেকে গৃহীত। 'কাব্যগ্রন্থ মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৪ তে, কবিতাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮২ - ৮৩ নাগাদ।

ট্যাবলয়েড সংবাদপত্র ও আজকের সাংবাদিকতা

স্বাতী ভট্টাচার্য

যাঃ , গার্ডিয়ানও ট্যাবলয়েড হয়ে গেল।

বিলেতে ওজনদার দৈনিক বলতে চারটে, দ্য ইন্ডিপেন্ডন্ট, দ্য টাইম, দ্য গার্ডিয়ান আর দ্য ডেলি টেলিগ্রাফ। বিক্রির সংখ্যায়'স ান' বা 'ডেলি মিরর' -এর মতো ট্যাবলয়েডগুলো দীর্ঘদিন ধরে টেক্কা দিয়ে আসছে এই চার 'ব্রডশিট' কাগজকে। তার উপর ২৪ ঘন্টা ইন্টারনেটে হরবখত ফ্রি নিউজ, যে - কোনো কাগজের ইন্টারনেট সংস্করণ কেবল ক্লিক - এর অপেক্ষায়। ফলে ন ব্বইয়ের দশকে বড়ো কাগজগুলোর পাঠকসংখ্যা ক্রমশ চড়চড় করে কমে আসছিল। সেই পড়ন্ত বিক্রিকে চাগিয়ে তুলতে আ য়তনে পরিবর্তন আনার ঝুঁকিপ্রথম নিয়েছিল ইন্ডিপেন্ডন্ট। ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে টেবিল - ঢাকা সাইজের কাগজ হ য়ে গেল টেবিল ম্যাট সাইজের ট্যাবলয়েড। তার ছয় সপ্তাহ পরেই টাইম কাগজ তার দীর্ঘ ট্র্যাডিশন ভেঙে ছোটো আকারে এল বাজারে। ফলও পেল দুটো কাগজই--- ছয় মাসের মধ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্টের প্রচারসংখ্যা বাড়ল ২০ শতাংশ, টাইম - এর পা ঠকসংখ্যা বেড়েছে এক বছরে ৪.৫ শতাংশ। অন্যদিকে, গার্ডিয়ান খুইয়েছে প্রায় ২৫ হাজার পাঠক। অতএব এই ১২ সেপ্টে ম্বর থেকে, ১৮৪ বছরের ট্র্যাডিশনের মায়া ভুলে, দ্য গার্ডিয়ানও হ্রস্বাকার। একেবারে ট্যাবলয়েড নয় অবশ্য, স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে তার চেয়ে একটু বড়ো -- ১২.৫ ইঞ্চি বাই ১৮.৫ ইঞ্চি। কাজের দুনিয়ার এই সাইজকে বলে 'বার্লিনার', যদিও জাম র্নির রাজধানী থেকে আজ আর এই সাইজের একটাও খবরের কাগজ বেরোয় না,বরংফ্রান্সের ল্য মোন্দ্, ইতালির লা রেপু বলিকা আর বার্সিলোনার লা ভ্যানগুয়ার্দিয়া হল এই 'বার্লিনার'অ সাইজের দৈনিক। ট্যাবলয়েডের মাপ সেখানে ১১.৫ ই ঞ্চ বাই ১৪.৭ ইঞ্চি।

প্রতিযোগিতায় গার্ডিয়ান দু-বছরে পিছিয়ে পড়েছে, বিক্রি নেমে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র সাড়ে তিন লক্ষে, তার ওপর নতুন কে র খবরের কাগজ বার করতে ৮০ মিলিয়ান পাউন্ডখরচ করে যন্ত্রপাতি বসিয়েছে। সুতরাং সাইজ খাটো করে বিক্রি বাড়ানো র চেষ্টা কতটা ফলপ্রসূ হয়, তা নিয়ে নিশ্চয় বেজায় টেনশনে আছেন গার্ডিয়ানের সম্পাদক, অ্যালান রাসব্রিজার। তবে যা এ খনি জলের মতো পরিষ্কার তা হল, ব্রিটেনের জাতীয় দৈনিকের বাজারে আর মাত্র একটা কাগজ রয়েছে, যা আমাদের চেনা মাপের খবরের কাগজ, বা ব্রডশিট। তা হল ডেলি টেলিগ্রাফ। ব্রিটেনের জাতীয় কাগজগুলোই শুধু নয়, দ্য স্কটসম্যান বা দ্য বলফাস্ট টেলিগ্রাফের মতো আঞ্চলিক দৈনিকও ট্যাবলয়েড হয়ে গিয়েছে।

ব্যবসায়িক কাগজগুলোও থেমে নেই। এই তো অক্টোবর থেকে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এশিয়া এবং ইউরোপ সংস্করণ হয়ে য াচ্ছে ট্যাবলয়েড। এ-ঢেউ লেগেছে খোদ এশিয়ার মিডিয়া জগতেও। এ - বছরই এপ্রিলে মালয়েশিয়ার প্রাচীনতম ইংরেজি দৈ দনিক, নিউ স্ট্রেটস টাইমস, ১৬০ বছরের ব্রডশিটের ঐতিহ্য স্মৃতির সিন্দুকে তুলে রেখে ট্যাবলয়েড হয়ে এল বাজারে এক স াক্ষাৎকারে এডিটর ইন চিফ কালিমুল্লা হাসান বলেছেন, 'ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই সিদ্ধান্ত নিতে হল আমাদের। এ আমাদের দু ঃখের দিন, কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে যা রূঢ় সত্য তা আমাদের মেনে নিতেই হবে।' সেই সত্য হল এই যে, 'দ্য স্টার' নামে ট্যাবল য়েড আকারের একটি ইংরেজি দৈনিকপ্রচার সংখ্যায় অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে নিউ স্ট্রেট টাইমসকে। নিউ স্ট্রেট টাইমস যেখানে ১ লক্ষ ২৯ হাজার, স্টার সেখানে প্রায় ৩ লক্ষ। এরপর কাগজ ছোটো না করে উপায় কী?

কাগজের পাঠকেরা যে ট্যাবলয়েড সাইজের কাগজ পছন্দ করে, সে নিয়ে তেমন সন্দেহ নেই। ছোটো সাইজের কাগজ সহজে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া চলে ট্রেনে - বাসে, ভাঁজ করতে গেলে দুমড়ে - মুচড়ে একাকার হয় না। মস্ত কাগজের পাতার না না কোণে খবরের সন্ধান করে বেড়াতে হয় না, ছোটো পাতার মাত্র দুটো কি তিনটে খবর সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষ ত মহিলা এবং অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের কাছে ট্যাবলয়েড যে বড়ো কাগজের চেয়ে বেশি পছন্দসই, তা ইউরোপ আর আমেরিকায় নানা সমীক্ষায় স্পষ্ট হয়েগিয়েছে। মুশকিল হল, পাঠক হারানোর খবরের কাগজের জন্য যে দাম পাওয়া যায়, তা থেকে কাগজগুলোর বড়ো জোর ২০-৩০ শতাংশ খরচ ওঠে। বাকিটা ওঠে বিজ্ঞাপন থেকে, আর বিজ্ঞাপনদাতারা ছোটো সাইজের কাগজ তেমন পছন্দ করেন না। বড়ো কাগজের পাতা - জোড়া বিজ্ঞাপনে যে - কোনো পণ্য অনেক তরিবত করে 'ডিসপ্লে' করা যায়। প্রায় টিভি স্ক্রিনের বিজ্ঞাপনে যে - কোনো পণ্য অনেক তরিবত করে 'ডিসপ্লে' করা যায়। প্রায় টিভি স্ক্রিনের সাইজের কাগজের চেয়ে ট্যাবলয়েডের খুদে পাতার বিজ্ঞাপনের সাইজ ঠিকঅর্ধেক, তা হলে বিজ্ঞাপনদাতারা একই রেটে পয়সা দিতে যাবে কেন? এই কারণে, ইউরোপের যতগুলো কাগজ ট্যাবলয়েড হয়েছে, তাদের প্রায় প্রতিটিরই পাঠক বাড়লেও, বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের পরিমাণ গোড়ায় অনেকটাই কমছে। বছর দুয়েক পরে আবার আস্তে আস্তে তা বেড়ে ক্ষতির পরিমাণ পুষিয়ে নিয়েছে, বলছেন মিডিয়া বিশেষজ্ঞরা। এই কারণেই আমেরিকার জাতীয় দৈনিকগুলোয় এখনো ট্যাবলয়েডের হুজুগ তেমন ভাবে ওঠেনি। ইউরোপে কাগজ - পিছু ক্রেতার থেকে যত আয় হয়, আমেরিকায় হয় তার চেয়েও কম। অর্থাৎ কাগজ ছাপার দামের বেশির ভাগটাই তুলে দিচ্ছেন বিজ্ঞাপনদাতারা, তাঁদের দাপটও সেই কারণে বেশি। তাই সান ফ্রান্সিসকোর'দ

্য একজামিনার' কাগজের মতো দু-একটা দৈনিক ছাড়া এখনো কোনো বড়ো দৈনিক ট্যাবলয়েড হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সে আর কতদিন? পাঠকের সংখ্যা যদি কমে, তা হলে শেষ অবধি বিজ্ঞাপনদাতাদেরও নড়েচড়ে বসতেই হবে। গত বছরে আমেরিকায় সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যা ৮ শতাংশ কমছে। সেখানকার ডিজাইনার, প্রকাশকরাও স্বীকার করছেন যে, ২০২০ সালে মধ্য ডশিট ব্যাপারটাই হিতহাস হয়ে যাবে। তবু অষ্ট্রেলিয়া থেকে আর্জেন্টিনা অবধি ট্যাবলয়েড করণ শুরু হলেও, আমেরিকায় এখনো বিজ্ঞাপনদাতাদের চটিয়েতেমন ঝুঁকি নিতে কেউ রাজি নয়।

আর ভারতে? ভারতের কাগজের অত সিঁটিয়ে থাকার কিছু নেই, কারণ ইউরোপ বা আমেরিকার মতো, আমাদের কাগজে রমালিকদের, পাঠকসংখ্যা নিয়ে 'গেল গেল' রব তোলার দশা এখনো হয়নি। সেখানে পাঠক কমছে, এখানে সাক্ষরতার হাত ধরে পাঠকসংখ্যা বাড়ছে। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, গত তিন বছরে ভারতের পাঠকের সংখ্যা ১৪ শতাংশ বেড়েছে, যার বেশির ভাগটাই আঞ্চলিক ভাষার কাগজের। বিজ্ঞাপনের দিক থেকেও ভারতের সংবাদপত্র যথেষ্ট সবল - গোটা মিডিয়ায় যত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তার ৪৬ শতাংশ পায় খবরের কাগজ। প্রতিষ্ঠিত কাগজগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে, সেগুলোও ব্রডশিট আকারেই বেরোচ্ছে। মুম্বইয়ে ডি এন এ (ডেলি নিউজ অ্যান্ডঅ্যানালিসিস) কাগজ শুরু করল দৈনিক ভাস্কর এবং জি নেটওয়ার্ক, যা সম্পূর্ণ নতুন, প্রায় ১০০ পাতার ব্রডশিট।বাংলায় নবতম দৈনিক দ্য স্টেটসম্যান, সেও ব্রডশিট। একটা নতুন ট্যাবলয়েডও অবশ্য শুরু করেছে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রকাশকরা, তার নাম মুম্বই মিরর। তবে তা প্রধানত অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের আকর্ষণের জন্য, আর সে - শহরের (মুম্বই) প্রতিষ্ঠিত ট্যাবলয়েড কাগজ 'ডিম ডে'-র সঙ্গে লড়াইয়ে মুম্বই মিরর তেমন দাঁড়াতেও পারছে না। ট্যাবলয়েড আকার আমরা এখন প্রধানত দেখি অপরাহ্ন বা সান্ধ্য দৈনিকে, যা মেজাজে, মর্যাদায় প্রভাতী কাগজের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ-ছাড়া দ্য হিন্দু বা দ্য টেলিগ্রাফের মতো কিছু ইংরেজিকাগজ তাদের ফিচার বিভাগগুলো নিয়মিত ট্যাবলয়েড আকারে প্রকাশ করছে। তবে হ্রস্বকরণের প্রয়োজন যে আমাদের দৈনিকগুলির হয়নি, তাও নয়। নিউজপ্রিন্টের চড়া দামের কারণে গত বছর খানেকের মধ্যে প্রায় সব ক-টি জাতীয় দৈনিক চওড়ায় ৩৬ সেন্টিমিটার থেকে কমে ৩৩ সেন্টিমিটার এসে দাঁড়িয়েছে। যদিও বেশিরভাগ কাগজই একে 'স্মার্ট লুক' বা 'ইন্টারন্যাশনাল লুক' বলে চালাতে চাইছে, আসল কারণ টাঁকের টান।

কিন্তু সংবাদপত্রের ট্যাবলয়েড হয়ে ওঠা মানে তো কেবল আকারে ছোটো হওয়া নয়, তা সে সংবাদের চরিত্র নিয়েই টানাটানি। ট্যাবলয়েড দৈনিক বলতে সংবাদিকতার একটা ধারাই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে, যেখানে ক্লিন্টনের বিদেশনীতির চাইতে মনিকা লিউনস্কির সঙ্গে তার কেচ্ছা অনেক, অনেক বেশি জায়গা জুড়ে বসে, যেখানে রাষ্ট্রনীতি এঁটে উঠতে পারে না ফ্যাশান, সিনেমার সঙ্গে। সেইঅর্থে পাক্কা ৩৬ ইঞ্চি বহর নিয়েও বহু কাগজ ট্যাবলয়েড হয়ে উঠেছে। বছর তিনেক আগে বিলেতের কাগজগুলো নিয়ে পড়াশোনার সুযোগ হয়েছিল। সেই সময় পপ গানের এক অনুষ্ঠানে এক পুরুষ পপস্টার স্টেজে গাইতে গাইতে তার সঙ্গী মহিলা স্টারের পশ্চাদ্দেশে হাত দেন, ইংরিজিতে যাকে বলে 'গ্রোপ' করা। অবাক হয়ে দেখেছিলাম, সেখানকার ট্যাবলয়েডগুলো কেবল নয়, টাইম বা গার্ডিয়ানের মতো দিমাগ - দেমাকী কাগজগুলোও প্রথম পাতায় ফলাও করে সে - ছবি ছাপল, রিপোর্টও লিখল। ভদ্র ভাষায় একে বলে ট্যাবলয়েডাইজেশন, সোজা সাপটা বললে, 'জামবিং ডাউন।' ফলে কোনো ঘটনার 'খর' হয়ে ওঠার শর্তগুলোই পালটে যায়। জ্যানেট জ্যাকসনের 'ওয়ার্ডরোব ডিসফাংশানের' মতো খবরকে কাগজের প্রথম পাতায় ফলাও করে ছাপার প্রস্তাব দিলে গৌরকিশোর ঘোষ হয়তো মূর্ছা যেতেন, অন্তত বেজায় রাগ করতেন তা নিশ্চিত, কিন্তু আজকের সম্পাদকের কাছে তা নেহাত জলভাত। সংবাদের এই 'অবমূল্যায়ন' নিয়ে বহু কথা হয়েছে, হচ্ছে, তবে সেই কথা বেশিরভাগ সময়েই একটা হতাশা - মিশ্রিত নিন্দা। তার মধ্যে 'ছ্যা ছ্যা' করার ইচ্ছেটা যত প্রখর, বিশ্লেষণের ঝাঁকটা তত প্রবল নয়। সংবাদমাত্রই ভুয়ো, সাংবাদিক মাত্রই দালাল, এমন আলোচনায় মনের ঝাল অনেকটা ঝাড়া যায় ঠিকই, কিন্তু 'কেন,' 'কতখানি', 'কী উদ্দেশ্যে'--- এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তেমন মেলে না।

প্রথমত, যেগুলো প্রতিষ্ঠিত দৈনিক, তাদের সংবাদ পরিবেশনের নকশায় খুব পরিবর্তন যে হয়েছে, সেই কথাটাই অনেকে স্বীকার করতে চায় না। টাইম বা গার্ডিয়ান, যে - কোনো কাগজের কর্তৃপক্ষই বলবেন, খবরে তাঁরা সিরিয়াস বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন।অন্য বিষয়গুলো এখন অর্ন্তভুক্ত করেছেন বটে, তবে তার জন্য পাতাও বাড়িছেছেন। অতএব রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের বরাদ্দ কমেনি,অন্য খবরের বরাদ্দ বেড়েছে। এমন কথা ভুল প্রমাণ করতে কেবল ধারণায় কাজ চলে না, চাই সমীক্ষা এবং গবেষণা। এমন একটি সমীক্ষা ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৭, এই ২০ বছরের সংবাদ খতিয়ে দেখেছে। গবেষকরা বলেছেন, ১৯৯৭ সালে স্ক্যান্ডাল নিয়ে লেখা খবর ছিলএক শতাংশেরও কম, ১৯৯৭ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১৭ শতাংশ। এই একই সময়কালে টাইম ম্যাগাজিনের সরকার সম্পর্কিত খবর ১৫ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় চার শতাংশে, যেখানে বিনোদন ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১৫ শতাংশে। সুতরাং খবরের নকশায় মৌলিক পরিবর্তন যে সত্যিই এসেছে, তা মানতে হবে।

আমাদের দেশে এমন সমীক্ষা হয়েছে বলে জানা নেই। যদি তেমন সমীক্ষা হয়, তা হলেও ইংরেজির সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার কাগজ, শহরের কাগজের সঙ্গে জেলার কাগজ, বড়ো কাগজের সঙ্গে মাঝারি কাগজের খবরের বন্টনের নকশায় পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। তবু তর্কের খাতিরে মোটের ওপর ওটা ধরে নেওয়া চলে যে, বড়ো মাপের সংবাদপত্র, অর্থাৎ যেগুলির প্রচা

রসংখ্যা ১০ লক্ষের উপরে, সেগুলিতে গত এক - দেড় দশকে রাজনীতি, রাষ্ট্র এবং প্রশাসন, যাকে সাংবাদিক পরিভাষায় 'হার্ড নিউজ' বলা হয়, তার প্রাধান্য কমেছে, বেড়েছে 'সফট নিউজের' প্রধান্য, যার মধ্যে প্রধানত পড়ে স্ক্যান্ডাল, সেলিব্রিটি আর স্পোর্টস।

কিন্তু কেন এই পরিবর্তন? অনেকেই বলতে পারেন, কেন নয়? কেবল ভারিক্কি নীতির তাত্ত্বিক আলোচনা করে সংবাদপত্রকে সমাজের গোটাকয়েক মানুষের কুক্ষিগত করে রাখাই বা হবে কেন? পাঠক যা চায়, সংবাদপত্রকে তা দিতে হবে। আর পাঠক যদি সিনেস্টারের প্রেমলীলা পড়তে পয়সা খরচ করতে চায়, তা হলে তাকে জোর করে ইরাক - নীতি গিলিয়ে লাভটা কী? সংবাদপত্র না হয় পাত পেড়ে খাওয়ায়, কিন্তু ইন্টারনেটের খবর তো বুফে ডিনার। সেখানে মাপাও যায়, কে কোন খবর বেশি পড়ছে। লাইকোস সার্চ ইঞ্জিনে দেখা যাচ্ছে, জ্যানেট জ্যাকসনের বক্ষবন্ধনী ছিঁড়ে যাওয়ার খবর মার্স রোভারের চেয়ে ২৫ গুণ বেশি 'হিট' হয়েছে। আর লোকে কীখবর পড়তে চায়, তা কেবল খবরের কাগজের উপরেও নির্ভর করে না। করে তার সামগ্রিক চিন্তার উপর। একটা সময় ছিল যখনলোকে বাস্তবিক বিশ্বাস করত, রাজনীতি মানুষের ভাগ্য বদলাতে পারে। রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্যের কারণে মানুষের জীবনধারা,সমাজের উন্নয়নের পথ আলাদা হয়ে যেতে পারে। আজ সে - বিশ্বাস আর নেই। এখন আমরা জানি, ম্যানিফেস্টো কেবল কথার কথা, আদর্শ ও বাণীসর্বস্ব। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব মানে নেতাদের ক্ষমতা কাড়ার লড়াই, যেখানে জনগণ সতত উলুখাগড়া। তা হলে সেই কুৎসিত নেতাদের মিথ্যে কথা পড়ে সকালটা নষ্ট করে লাভ কী?

এ - কেবল রাজনীতির নয়, একে গণতন্ত্রের সংকটই বলতে হবে। কিন্তু তা হলে সংবাদপত্রের দায়িত্ব কি আরো বেড়ে যায় না? ভোট পাঁচ বছরে একবার হয়, কিন্তু প্রশাসন নিত্যদিনের, সেখানে প্রতিনিয়ত অনুসন্ধিৎসু চোখ মেলে রাখাই তো সাংবাদিকের কাজ। নেতা যেমনই হোক, তার নীতি তো চাপছে মানুষের উপর। সেই নীতি নিয়ে সমালোচনার, আপত্তির, প্রতিবাদের, অন্য কোনো মঞ্চযদি নাও থাকে, মিডিয়ার তার জায়গা তো বুজিয়ে ফেলা যায় না। গণতন্ত্র বড়ো দুর্লভ ধন, তাকে অমন আনমনে হারিয়ে ফেলা চলে না।

বড়ো ঠিক কথা, কেবল প্রশ্ন একটাই --- সংবাদপত্রে নীতি নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে আলোচনার জায়গা যে অপসৃত হচ্ছে, সে কী পাঠকের অমনোযোগের জন্য? নাকি অনাস্থার জন্য? বছর দু-এক আগে নিউ ইয়র্ক টাইমসের জেসন ব্লেয়ার নামে এক সাংবাদিককে বেশ ঘটা করে বরখাস্ত করা হয়েছিল, কারণ জানা গিয়েছিল যে, সে স্রেফ বাড়িতে বসে বানিয়ে রিপোর্ট লিখছে। তা নিয়ে দিন কতক বেশ হইচই চলেছিল। সেই সময় একটি 'গলাপ পোল' করা হয়েছিল জানতে যে, মিডিয়ার খবরের উপর কত মানুষ ভরসা করে। মাত্র ৩৬ শতাংশ মানুষ বলেছিলেন, তাঁরা মনে করেন যে, মিডিয়া সাধারণত ঠিক তথ্য পরিবেশন করে। ভারতে এমন সমীক্ষার কথা জানা নেই, তবে ফলাফলটা খুব ভিন্ন হবে কী? মনে আছে, কিছুদিন আগে একটি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'আগে ভাবতাম, খবরের কাগজে দিয়েছে, তা হলে ঠিক খবরই হবে। এখন ভাবতে হয়, কোন কাগজ লিখছে, কে লিখছে, কোন পাতায় লিখছে।

তবু তথ্যের সত্যতা নিয়ে এই সংশয়ের চেয়েও গভীর সংকটময় এক প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হবে আজকের সাংবাদিককে। তা হলে, সে কী আদৌ তার নিজের পরিবেশিত তথ্য বা তত্ত্বে বিশ্বাস করে? সে কী কেয়ার করে? তার পাঠকের যা দুশ্চিন্তা, তাতে কি সাংবাদিক আদৌ বিচলিত? যে সংবাদ লিখছে, যে সংবাদ পড়ছে, সে কি বিষয়টা সম্পর্কে লেখার মতো, বলার মতো, কিছু জানে? নাকিবাইলাইন আর সাউন্ডবাউটের দায় সেরেই সে দিনের কাজ শেষ করার তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফেরে? সংবাদপত্রের খবর পড়ে বহুদিনইএ-চিন্তা কুরে কুরে খেতো। সম্প্রতি টি.ভি.-র খবর দেখলে এই অস্বস্তি আরো ঘুলিয়ে ওঠে। গুরগাঁওয়ে যে ছাঁটাই - হওয়া শ্রমিকরা মার খেলেন, তাঁদের খবর বলছিলেন যে কোন - টাই পরা তরুণী, যিনি বারবার 'ড্রামাটিক' শব্দটি ব্যবহার করছিলেন! ওই শ্রমিককুল, তাঁদের জীবনযাত্রা, তাঁদের জীবনমরণ সমস্যা সম্পর্কে তিনি সত্যিই কি কিছু জানেন? না কেবল আজকের ডিউটি করেছেন? যে - কোনো পরিস্থিতিতে, যে - কোনো ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে, তাঁরা গুটিকতক গতে-বাঁধা প্রশ্ন করেন -- কেন এমন হল? অমুক কী বলছে? এরপর কী হবে? কিছুদিন আগে রাজদীপ সরদেশাই বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, সলমন - ঐশ্বর্যের টেপ নিয়ে এত জলঘোলা হল, কেউ জিজ্ঞেস করল না, মুম্বই পুলিশ চার বছর টেপ পেয়েও চেপে বসে রইল কেন? এ তো কেবল একটা প্রশ্ন, এমন কত প্রশ্ন রোজ বন্ধ ঘরে চড়াইয়ের মতো ঘুরপাক খায়। এন ডি . টি. ভি. -র বরখা দত্তকে যে এক সময়ে মানুষ এমন আপন করে নিয়েছিল, তার কারণ কেবল তাঁর সাহস, তাঁর সাংবাদিকতার উৎকর্ষ নয়, তিনি দর্শকের কাছে নিজের প্যাশনের, নিজের বোধের সততার পরিচয় রাখতে পেরেছিলেন।

বিশ্বাসযোগ্যতা, বোধশক্তি, এই দুয়ের সংকটে পড়েছে সাংবাদিক, সংবাদমাধ্যম, কেন? একটা কারণ অবশ্যই সংবাদমাধ্যমে কর্পোরেটের আধিপত্য, যা ক্রমশ মনোপলিতে পর্যবসিত হচ্ছে। মাত্র কয়েকটি সংস্থা বা পরিবারের দ্বারা পৃথিবীর সংবাদপত্র - শিল্প নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ভারতেও এই পরিবারতন্ত্রের ছবি ভিন্ন নয়। সংবাদপত্র নিরপেক্ষ থাকবে, তা বস্তুত কেউ কোনোদিন আশা করেনি। কিন্তু ভরসা রেখেছে ভারসাম্যের ধারণায় -- ভিন্ন স্বার্থের সংঘাতের ফলে এক এমন জমি তৈরি হবে, যেখানে নানা মতের জায়গা থাকবে।কিন্তু অল্প কয়েকজনের হাতে সংবাদশিল্প চলে আসছে ক্রমশ, ফলে সেই প্রত্যয় আর থাকছে

না। এও বহুবিদিত যে বেশিরভাগ স্বত্বধারী পরিবারেরই অন্যান্য ব্যবসা রয়েছে, এবং সংবাদপত্র বা টি.ভি. চ্যানেল তাদের মূল ব্যবসার একটি সংঘটক মাত্র। তাই সংবাদপত্রের আর সাংবাদিকের বিশ্বাসযোগ্যতায় এমন চিড় ধরেছে। হয়তো সেইজন্যই বিনোদনটুকু ছাড়া পাঠক বিশেষ কিছু আশা করে না।। আবার মালিকও 'লাইফস্টাইল' দিয়ে ভরিয়ে দিতে চায় পাতা, কিংবা করিনা কাপুরের চুম্বন - সংক্রান্ত কোনো অর্থহীন বিতর্ক দিয়ে। ফলে সাংবাদিকও এখন ক্লীব, কলমকে ভাড়া খাটায়। দুঃখের কথা, অনুসন্ধানী সাংবিদকতার কাজে, পেশাদার সাংবাদিকের চেয়ে অনেকসময়ে বেশি অগ্রণী হন অন্য পেশার মানুষ। ২০০১ সালের তীব্র খরায় রাজস্থানের মানুষের দুর্বিষহ অবস্থার কথা সিরিজের আকারে লিখেছিলেন সমাজবিজ্ঞানী জাঁ দ্রেজ। সরকারের খরাত্রাণের দাবির মুখ ঘষে দিয়েছিলেন মাটিতে। কোনো সাংবাদিক এই উদ্যোগ নেননি কেন?

সাংবাদিকতা নিয়ে মানুষের সংশয়, অবিশ্বাসকে পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে সাংবাদিককে। তবু নৈরাশ্যের দেওয়াল সত্যের সম্পূর্ণতাকে যেন ঢেকে দিতে না পারে, তা দেখতে হবে। একটি বিদেশি কাগজ লিখছে, ভারতে আজকের সংবাদপত্রকে দেখলে বিংশ শতকের গোড়ার আমেরিকার কথা মনে পড়ে, যখন মানুষ বাস্তবিক বিশ্বাস করত যে সংবাদমাধ্যম রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করতে পারে। কিছুটা হলেও এ-চিন্তা ঠিক। নইলে নবসাক্ষর মানুষও ট্যাঁকের পয়সা খরচ করে কেন কিনবে খবরের কাগজ? রাষ্ট্রযন্ত্রের, বাণিজ্যজগতের বৃহৎ জটিলতার কথা তাঁরা হয়তো কিছুটা বোঝেন, কিছুটা বোঝেন না। কিন্তু কারণেই হোক বা অকারণে, তাঁদের এখনো এই আশা রয়েছে যে, যে - কথা তাঁরা বলতে পারছেন না, যে - প্রশ্ন তাঁরা করতে পারছেন না, তা সংবাদমাধ্যম প্রকাশ করবে। কেবল নতুন পাঠকইনন,পুরোনো পাঠকের সন্দেহের, নিরাশার কৃষ্ণতম মেঘের চারপাশেও এমন একটি আলো জেগে থাকে, তাই সকালে কাগজ পড়া এখনো স্রেফ 'সময় নষ্ট' হয়ে ওঠেনি।

যে - জমিতে প্রোথিত আশার এই শিকড়, সেখান থেকেই যদি রসগ্রহণ করে আজকের সাংবাদিক, তা হলে হয়তো বীজতলা নিঃশেষ হয়ে যাবে না। আজ আমরা এমন যুগে বাস করছি, যখন সর্বাধিক প্রচারিত ইংরেজি কাগজে সম্পাদকীর পাতা উঠে যাচ্ছে, সম্পাদকীয় কলাম নিলাম হচ্ছে, টাকার বিনিময়ে কর্পোরেট কর্তার ছবি ছাপা হচ্ছে, খবরের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের তফাত বুঝতে হিমসিম -- হয়তো সাংবাদিক নিজেও সব সময় সেই সূক্ষ্ম সীমারেখা চিনতে পারে না। চিন্তা করার যন্ত্রণা অনেক, চিন্তা না - করার প্রলোভন অপরিসীম। কিন্তু মালিকের কাছে সে - ব্যক্তি কর্মচারী, পাঠকই তাকে 'সাংবাদিক' করে তোলে। তখন নয়, যখন সাংবাদিক তাকে উদ্ধৃত করে, তার মুখের সামনে মাইক্রোফোন ধরে। সংবাদ - কর্মচারী থেকে মানুষ একজনকে সাংবাদিক করে তোলে তখন, যখন সে নিজের প্রশ্নের উত্তর পায় সাংবাদিকের কলমে।

কী সেই প্রশ্ন ? মানুষের জীবনের তিন মৌলিকতম বিষয় যদি হয় আহার - নিদ্রা - মৈথুন, তা হলে প্রথম তিনটি প্রশ্ন, কী খাব, কোথায় শোব, আর কার সঙ্গে শোব। চতুর্থ কোন প্রশ্ন উসকোয় মানুষকে? মনে হয় সে - প্রশ্ন এই - কী ভাবব? কেমন করে চিন্তা করব আমরা চারপাশ নিয়ে, আমাকে নিয়ে, আমার জীবনকে নিয়ে? কীভাবে বুঝে নেব আমার অবস্থান, আমার চাওয়া - পাওয়ার সম্ভাবনা? এখানেই রাষ্ট্রের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তির যোগ, আর সেই সীমারেখায় দাঁড়িয়ে থাকে সাংবাদিক। সতত সীমান্তবাসী সে, নিয়ত সীমান্তযুদ্ধের সাক্ষী। যে - সীমান্ত রোজ রচিত হয়, আবার ভাঙে, আবার আঁকা হয় রক্ত- অশ্রুতে। সে যদি থাকে অবচেতনে, এক মুহূর্তে বস্তুত বহু অগণিত লোক উদ্বাস্তু হয়ে যায়। তাই রোজ সমাজ - জমিনের জরিপ করতে হয় সাংবাদিককে, জোগাতে হয় চিন্তাসূত্র। এই তার সাধনা, তার ধর্ম, এ-ধর্মাচরণ ফুরোবার নয়। সাংবাদিক নিজে যদি রণে ভঙ্গ না দেয়, তবে সাংবাদিকের পায়ের তলায় এই জমিটুকু কেড়ে নেওয়া কঠিন। কারণ এখানে মানুষের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে তার যোগ। ব্রডশিটের বিস্তার যদি বা হয় ট্যাবলয়েডের আঁটসাঁট স্বল্পতা, সংবাদ সংগ্রহের নামে হাজার আদেখলেপনা ঘটতে থাকে চারপাশে, সাংবাদিক চাইলে তার কলম এক গণ্ডুষ জলকে অকূল সমুদ্র করতে পারে। অ াজো পারে। এই সম্ভাবনাই এখন সম্বল সাংবাদিকের। আর এই সমাজের, এই সময়ের।

রাজ্য সরকারের নয়া কৃষিনীতি

শঙ্কর ঘোষ::

ঃ সর্বনাশের নীল নকশা শিল্পাঞ্চল

দু'হাজার সালের শেষদিকে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জাতীয় কৃষি নীতি গ্রহণ করে। এই নীতির উদ্দেশ্য ব্যাকা করে তখনকার কৃষিমন্ত্রী নীতীশকুমার বলেছিলেন, 'কৃষি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার কাছে আমাদের যে দায়বদ্ধতা আছে তা পূরণ করার প্রয়োজনেই এই নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে' বক্তব্য থেকে উদ্দেশ্য পরিষ্কার। দায়বদ্ধতা এদের দু'টো। এক, কৃষি ক্ষেত্রে ক ব্যক্তিগত পুঁজিঅর্থাৎ দেশি - দিদেশি একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে ব্যবহার করা; দুই, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সর্তাবলীকে বাস্তবায়িত করা। কেন্দ্রের সরকারের পাশাপাশি সেদিন রাজ্য সরকারের কর্তাব্যক্তিরাও দেশি - বিদেশি পুঁজির স্বার্থে কৃষিক্ষেত্রে একটা নয়া পরিকল্পনা গ্রহণের কথা চিন্তা করেছিলেন। ১৯৯৭ সালে, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'মুক্ত অর্থনীতির ফলে কৃষিকাজে পুঁজি বিনিয়োগের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১.৫.৯৭)। 'পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের জন্য তাঁরা তখন থেকেই নানা উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকেন। এই সময়েই (১৯৯৬ সালে)ভূমিসংস্কার আইনের ১৪ (জেড) ধারার সংশোধন করা হয়, বর্গাদার আইন পরিবর্তিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল--- চা বাগান, রাবার শিল্প ইত্যাদি স্থাপনের জন্য শিল্প মালিকদের জমি সরবরাহ করা। এই কাজে কৃষককে জমি থেকে ছলেবলে উচ্ছেদ করা হয়েছে, বর্গাদারেরা বিতাড়ত হয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকারের এই ধরনের কাজ তখন শিল্পমহলের বাহবা কুড়িয়েছিল। কিন্তু এইসব কার্যক্রমকে খুশি হয়ে শিল্পমহল সমর্থন করলেও তাঁরা বলতে থাকেন, 'এইসব পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় কিন্তু যথেষ্ট নয়। চাই একটা সুংসহত পরিকল্পিত উদ্যোগ।' তাই তারা দাবি জানাতে থাকে, বিজেপি সরকার যেমন জাতীয় কৃষিনীতির মধ্যে দিয়ে দেশের কৃষিক্ষেত্রকে শিল্পেক্ষেত্রের মতই উন্মুক্ত করে দিয়েছে, একই রকমভাবে রাজ্য সরকারও একটা কৃষিনীতি গ্রহণ করুক, যার ফলে রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে দেশি - বিদেশি বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির অবাধ অনুপ্রবেশ পথে যতটুকু বাধা এখনও আছে তা দূর করা যায়।

রাজ্য সরকার ওদের এই দাবিকে গুরুত্ব দিয়েছে। তৎপরতার সঙ্গে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভাড়া করা হয়েছে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি ম্যাকিনসেকে। কী ধরণের কৃষি পরিকল্পনা গ্রহণ করলে রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে দেশি - বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ সহজতম হয় সে সম্পর্কে ম্যাকিনসের রিপোর্ট জমা পড়েছে। রাজ্য সরকার সেই সুপারিশের সারাংশ গ্রহণ করে নিজেদের ভাষার চাতুরি মিশিয়ে নয়া কৃষিনীতির খসড়া রচনা করেছে।

বুঝতে অসুবিধা হয় না রাজ্য সরকারের এই কৃষিনীতি কাদের স্বার্থরক্ষা করবে। সর্বনাশা এই নীতির গায়েরাজ্য সরকার এখন জনদরদের একটা মোড়ক লাগাতে চাইছে। ভাবখানা এমন যে রাজ্যের কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের বাস্তব তাগিদ থেকেই তাঁরা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এটা প্রমাণ করতে খসড়া কৃষিনীতিতে ওঁরা বলেছেন, 'রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে সুষম বিকাশের যে প্রক্রিয়া চলছে তাকে আরও শক্তিশালী করাই হবে রাজ্য সরকারের নতুন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।' প্রতিদিন রেডিও, টিভি, খবরের কাগজের মাধ্যমে ওঁরা গ্রামের গরিব মানুষদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন এর ফলে গরিব চাষির উপকার হবে কৃষি উৎপাদন বাড়বে, বিদেশ সেই কৃষিপণ্য বিক্রি হয়ে চাষির রোজগার হবে, গ্রামের উন্নয়ন, অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটবে। এমনভাবে ব্রামফ্রন্ট সরকারের নেতা মন্ত্রীরা বিষয়টাকে উপস্থাপনা করছেন যেন যেসব দেশি - বিদেশি একচেটিয়া পুঁজি বাংলার কৃষিক্ষেত্রে পুঁজির থলি নিয়ে বিনিয়োগ করতে আসবে তাদের সব দয়ার শরীর। গ্রামবাংলার মানুষের অর্থকষ্ট সহ্য করতে না পেরে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এরা এখানে পুঁজি বিনিয়োগ করতে আসছে, যেন এদের কোনও শ্রেণী চরিত্র নেই, যেন এদের শ্রেণীশোষণের কোনও মতলব নেই! এক সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের খয়ের খাঁ রায় বাহাদুর, খান বাহাদুরেরা যেমন সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণের মহিমা কীর্তনে পঞ্চমুখ ছিল, বর্তমানে কংগ্রেস - বিজেপির সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজ্য সরকারও একইভাবে কৃষিতে বিদেশি পুঁজির গুণকীর্তন করে যাচ্ছে।

বামফ্রন্টের নতুন কৃষিনীতির খসড়া পাঠ করলে মনে হবে রাজ্যের মধ্য নিম্ন-প্রান্তিক কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের জীবন কোনও সমস্যা নেই, তাঁরা বেশ দুধেভাতে আসছেন। কোথাও কোনও সমস্যা সঙ্কট নেই। তাই আশ্চর্যের হলেও এটাই সত্য, ওদের কৃষিনীতির খসড়ায় কোথাও পশ্চিমবঙ্গের কৃষককুলের ভয়াবহ দুরবস্থা সম্পর্কে একটা কথাও নেই। কেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কৃষক জমি হারিয়ে ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছে, কেন গ্রামীণ ও কৃষি মজুর সর্বস্ব হারিয়ে ফুটপাতে এসে আশ্রয় নিচ্ছে, কেনই বা গরিব চাষি ঋণগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যার বেদনাদায়ক পথ গ্রহণ করেছে, সেসব কেন এবং কোন নীতির ফল, এর প্রতিকারের উপায় কী, এসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এই খসড়া কৃষিনীতি একেবারেই নীরব। বরং এটা পাঠ করলে মনে হবে শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যেই বামফ্রন্ট রাজত্বে গ্রাম বাংলায় এক ধরনের স্বর্গরাজ্য কায়েম হয়েছে এবং এই স্বর্গরাজ্যকে আরও পোক্ত করার প্রয়োজনেই ওদের এই নয়া কৃষিনীতির পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার চরিত্র কী এবং কেনই বা ওরা এর বাস্তবায়নে মরিয়া তা বিস্তারিত আলোচনার আগে রাজ্যে

র কৃষিক্ষেত্রে এই সরকার এতদিন কী ভূমিকা নিয়েছে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা যাক।

:

।। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের ভূমিকা ।।

সবাই জানেন যে কোনও কৃষকদরদি সরকার যারা কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন আন্তরিভাবে চাইবে, তাদের প্রাথমিক কাজ হবে দুটো। তাদের দেখতে হবে, কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য যে সমস্ত শিল্প সামগ্রী প্রয়োজন অর্থাৎ সার, বীজ, তেল, বিদ্যুৎ, ডিজেল ইত্যাদি যাতে কৃষকেরা সস্তায় পান তা সুনিশ্চিত করা এবং তারপর উৎপন্ন কৃষিপণ্য যাতে জলের দরে অভাবে বিক্রি না করে দিতে হয় তার ব্যবস্থা করা। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এতদিন এ বিষয়ে কী ভূমিকা গ্রহণ করেছে?

সার - বীজ- তেল - ডিজেল ইত্যাদির কথা তুলব না, কারণ এই সমস্ত পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কথা বললেই রাজ্য সরকার বলবে এই সমস্ত পণ্যের দাম মূলত নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় সরকার বা ব্যবসায়ীরা; সুতরাং রাজ্য সরকার কী করতে পারে! যদিও এই যুক্তি সর্বাংশে সত্য নয়। কেন্দ্রীয় সরকার ফি-বছর ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি করে কিন্তু রাজ্য সরকারও তার উপর সারচার্জ বসিয়ে সেই মূল্যকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই এইসব পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির আংশিক দায় রাজ্য সরকারকে বহন করতে হবে বৈকি। কিন্তু বিদ্যুতের বেলায় তো এই যুক্তি খাটবে না। বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্টন, মূল্যনির্ধারণ সবই রাজ্য সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে। এ ক্ষেত্রে সরকারি ভূমিকা কী? রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে সেচের জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজন সবারই জানা। সেই বিদ্যুৎ গ্রামে কৃষকদের কাছে কীভাবে পৌঁছে দিচ্ছে সরকার? বিষয়টা খতিয়ে দেখা যাক।

এ রাজ্যে বিদ্যুৎচালিত পাম্পসেটের সংখ্যা বর্তমানে ১ লক্ষ ২৫ হাজার এর মধ্যে কিছু পাম্পসেট ও কিছুগভীর নলকূপ সরকারি কৃষি দপ্তরের অধীন, যার সংখ্যা ৮-১০ হাজারের মতো, বাকি সমস্ত পাম্পসেটই কৃষকের গাঁটের পয়সা খরচ করে কেনা। এর বেশিরভাগই ৫ অশ্বশক্তির শ্যালো বা অগভীর নলকূপ। আর কিছু আছে মিনি ডিপটিউবয়েল বা সাবমার্সিবল পাম্প। এই সবক্ষেত্রে বিদ্যুতের কি ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি করা হয়েছে তা নীচের সারণিরদিকে দৃষ্টি দিলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

সারণি - ১

তিন থেকে পাঁচ অশ্বশক্তির জন্য বিদ্যুতের বার্ষিক মাসুল

(দার্জিলিং, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে)

অগভীর নলকূল সাবমার্সিবল পাম্প

সাল	টাকায়	শতকরা বৃদ্ধি	টাকায়	শতকরা বৃদ্ধি
১৯৮৫	৯০০.০০	----	----	---
১৯৯১	১৩৮০.০০	৫৪.৫	১৩৮০.০০	----
১৯৯৬	১৬৬০.০০	২০	২৫০০.০০	৮৯
১৯৯৯	৩১৫৬.০০	৯১	৪৭৪৮.০০	৮০
২০০১	৪০৬৪.০০	২৮.৭	৫০৮০.০০	০৮
২০০২	৭৫১২.০০	৫০	৭৬২০.০০	৫০

:

(অন্যান্য জেলার জন্য)

১৯৮৫	১১০৪.০০	----	----	---
১৯৯১	১৭০০.০০	৫৪.৫	১৭০০.০০	---
১৯৯৬	২০৪০.০০	২০	৩০৬০.০০	৮৯
১৯৯৯	৩৯০৮.০০	৯১	৫৭৯৬.০০	৮০
২০০১	৫০০৮.০০	২৮.৭	৬২৫২.০০	০৮
২০০২	৭৫১২.০০	৫০	৯৩৭৮.০০	৫০

পশ্চিমবঙ্গের কৃষিনীতি কৃষকের ভবিষ্যৎ

:

কী দেখা গেল? ১৮৯৫ থেকে ২০০১ এই ১৬ বছরে ৫ অশ্বশক্তির অগভীর নলকূপের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের চার্জ বেড়েছে ৩৯০৪ টাকা

এবং তারপর আবার ২৫০৪ টাকা মূল্যবৃদ্ধির সুপারিশ রয়েছে। মিনি ডিপটিউবয়েলের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ যথাক্রমে ৪৫৫২ টাকা ও ৩১২৬ টাকা। ভাবা যায়? এ রাজ্যের ৯৩ শতাংশ জোত অলাভজনক, ৭৩ শতাংশ কৃষক নিম্ন ও প্রান্তিক পর্যায়ের। তারা এই বিপুল পরিমাণ টাকা প্রতি বছর ব্যয় করে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনতে পারবে? বুঝতে অসুবিধা হয় না, পারবে না। এবং এই কারণেই দেখা যাচ্ছে গ্রামবাংলার হাজার হাজার চাষি বর্তমানে বিদ্যুতের বিল দিতে পারছে না। ফলে বিদ্যুৎ পর্ষদ বিদ্যুৎ সংযোগ কেটে দিচ্ছে। এইভাবেই সরকার প্রান্তিক কৃষকদের সেচের জল সরবরাহের দায়িত্ব পালন করছে।

কৃষিতে বিদ্যুতের দাম পশ্চিমবঙ্গেই যে সবচেয়ে বেশি একথা গত ৩রা মার্চ ২০০১, দিল্লিতে বিদ্যুৎমন্ত্রীদের বৈঠকে রাজ্যের মন্ত্রী মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং স্বীকার করেছেন, কৃষিতে বিদ্যুৎ মাসুল ইউনিট প্রতি ন্যূনতম ৫০ পয়সা ধার্য করার প্রস্তাব অনেক রাজ্যেই মানতে রাজি হয়নি। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে পাঞ্জাব। তামিলনাড়ুপাঞ্জাবকে সমর্থন জানায়। পশ্চিমবঙ্গ অবশ্য ভিন্নমত। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুতের মাসুল ইউনিট প্রতি ৫০ পয়সার বেশি দরেই বিক্রি হয় (আনন্দবাজার পত্রিকা ৪.৩.২০০১)। '৫০ পয়সার বেশি দরে' নয় অনেক অনেক বেশি দরেই বিদ্যুৎ পশ্চিমবঙ্গের গরিব কৃষকদের কাছে বিক্রি করে থাকে রাজ্য সরকার। লজ্জায় হয়তো সে কথা স্বীকার করতে পারেননি মৃণালবাবু।

কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান সস্তা করে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী কী, বিদ্যুৎ হল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । ফলে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের দাম বাড়ছে দ্রুতগতিতে। কোনওটা বাড়াচ্ছে কেন্দ্র, কোনওটা রাজ্য, কোনওটা আবার রাজ্যের যৌথ মদতে ব্যবসায়ীরা। তাই চাষের খরচ বেড়ে গিয়েছে আগের তুলনায় বহুগুণ। এই খরচ সামাল দিতে চাষিকে চড়া সূদে টাকা ধার করতে হচ্ছে এবং তার পরিণাম যে কী হয়েছে তাতে আমাদের সবারই জানা।

:

।। ফসলের দাম : সরকারি ব্যবস্থা।।

কষ্টের এই ফসলের ন্যায্য দাম পাবার কি কোনও ব্যবস্থা হয়েছে গত ২৫ বছরে? এক কথায় বলা চলে, না । সেই একই ট্রাডিশান এখনও চলছে। চাষিরা যখন ফসল নিয়ে বাজারে যায়, ফড়েরা পরিকল্পিত ভাবে দাম কমিয়ে দেয়; বাধ্য হয়ে চাষিকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ফড়েদের হাতেই ফসল জলের দরে দিয়ে আসতে হয়। কারণ এই বাস্তব গ্রাম বাংলায় নিত্য দিনের ঘটনা। গ্রাম বাংলায় উন্নয়নের দাবিদার বামফ্রন্ট সরকার এক্ষেত্রে কোনওভূমিকাই পালন করেনি এতদিন। কিন্তু এ বছর ধানের দাম নিয়ে এই সরকার যা করেছে তার তুলনা মেলা ভার।

গত বছরে (২০০২ সাল) রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ধানের সহায়ক মূল্য ঘোষণা করা হয়েছিল, সাধারণ দাম (সরকারি পরিভাষায় FAQ- Fair Average Quality) প্রতি কুইন্টাল মোটা ৫০৩ টাকা এবং সরু ৫৬০ টাকা। চাষিরা খবরের কাগজে সরকার ঘোষিত এই দামের কথা জেনেছেন কিন্তু বাস্তবের বাজারে তাদের এই ধান বিক্রি করতে হয়েছে ২৭৫ টাকা থেকে ৩৫০ টাকার মধ্যে। কারণ সরকারি দামে ধান কেনার জন্য বাজারে কেউ হাজির ছিল না।

রাজ্য সরকার এই সহায়ক মূল্য ঘোষণা প্রথমে করেছিল ২০০১ সালে ২৩শে নভেম্বর। তখন এক সার্কুলারে বলা হয় মিল মালিকে করা সরকারি দামে চাষিদের কাছ থেকে ধান কিনবে এবং সরকার মিল মালিকদের কাছ থেকে মোটা চাল ৮৭১.৯০ এবং সরু চাল ৯১৩.৬০ টাকা কুইন্টাল দরে কিনবে। ঠিক হয়, এই প্রক্রিয়ায় সরকার সারা রাজ্যে ৬ লক্ষ টন চাল সংগ্রহ করবে। রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার হয়ে যায়, চাষিকে ধানের সরকারি দাম দেবার দায়িত্ব মিল মালিকদের। মিল মালিকেরা এই দায়িত্ব তাদের চরিত্রানুযায়ী পালন করেছে। তারা দালালদের সহায়তা সরকারি দল ও নেতাদের সঙ্গে যোগসাজসে পঞ্চায়েত কর্তাদের হাত করে সরকারি দামেধান কেনার সার্টিফিকেট জোগাড় করে কোটি কোটি সরকারি টাকা আত্মসাৎ করছে।

কিন্তু এতো গেল আমন ধানের কথা। বোরো ধানের ক্ষেত্রে সরকারি ভূমিকা আরও অভিনব। এ রাজ্যে বোরো ধান চাষিরা ঘরে ডঠাতে শুরু করে এপ্রিল মাসের শেষ দিকে। মে মাসের মাঝামাঝি নাগাদ প্রায় সমস্ত ধান চাষিরা ঘরে উঠে যায়। সবাই জানেন, দুর্বিষহ যে অনটনের মধ্যে এ রাজ্যের কৃষককে চাষ করতে হয়, তাতে তার পক্ষে ঘরে ধান ধরে রাখা অসম্ভব। ঘরে ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বিক্রি করে দিতে হয়। রাজ্য সরকারের কর্তাব্যক্তিরা এটা ভাল করেই জানেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কী ভূমিকা পালন করলেন? অনেক টালবাহনার পর তারা সরকারি দামে ধান কেনার জন্য ১৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ করলেন এবং বরাদ্দ সেই টাকায় ধান কেনা শুরু করলেন জুন মাসের শেষদিকে, যখন গরিব চাষির ঘরে বিক্রি করার মতো এক দানা ধানও আর অবশিষ্ট নেই। বুঝতে অসুবিধা হয় কি সহায়ক মূল্যের সহায়তা শেষ পর্যন্ত কাদের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে?

পাট, আলু সহ কৃষকদের উৎপাদিত সমস্ত ফসলের ক্ষেত্রেই চলছে একই প্রক্রিয়া। ফসলের লাভজনক দাম পাবার ঘটনা ব্যতিক্রম। বাস্তব হল রক্ত, ঘাম, পরিশ্রমের বিনিময়ে উৎপন্ন ফসল চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাজ্যের কৃষককে জলের দরে ফড়েদের কাছ বিক্রি করতে আসতে হয়। ফলে চাষের খরচ বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে ফসলের লাভজনক দাম পাবার কোনও ব্যবস্থা না থাকার জন্যই চাষি ক্রমাগত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে, পরিণামে প্রান্তিক কৃষক ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছে। যদিও ঘটনা হল, নিদারুণ এই বাস্তবকে বামফ্রন্ট সরকারের নেতা - মন্ত্রীরা কোনও মতেই স্বীকার করতে চান না, তাঁদের দাবি, 'গ্রামের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনযাত্রা

র মান লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।' (গণশক্তি, ১০.৭.০২) 'জীবনযাত্রার মান ও ক্রময়ক্ষমতার' উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটলে চাষির হ াত থেকেক্রমাগত জমি চলে যাচ্ছে কী করে তার যুক্তি সঙ্গত ব্যাখ্যা ফ্রন্টের নেতাই দিতে পারবেন। তাই এ বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে . দেখা যাক গত ২৫ বছরে কী অবস্থায় দাঁড়িয়েছে গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ।

:

।। কৃষকের হাত থেকে জমি চলে যাচ্ছে ।।

কৃষি সাফল্যের দাবিদার বামফ্রন্ট সরকারের ২৫ বছরের রাজত্বে এ রাজ্যের জমি মালিকানায় কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে অর্থাৎ কীভাবে আধা মাঝারি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণত হচ্ছে, অন্যদিকেবড় জোতদারের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা এবার তথ্য সহযোগে বিচার করে দেখা যাক।

সারণি - ২

জমির মালিকের সংখ্যা (লক্ষ)

বছর	১ হেক্টরের নীচে	১-২ হেক্টর	২-৪ হেক্টর	৪-১০ হেক্টর	১০ হেক্টরের বেশি
১৯৮৫-৮৬	৪২.০৩	১৭.৭৫	৫.১৭	০.৯৪	০.০১
১৯৯০-৯১	৪৬.৩৯	১১.০৭	৪.৫৭	০.৭৯	০.০১
১৯৯৫-৯৬	৫০.০০	১১.০০	৩.৮২	০.৬০	০.০১

(সুদ্র : Evaluation Programme, Evaluation wing, Directorate of Agriculture, Govt. of West Bengal)

এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে (সারণি : ২) ১৯৮৫-৮৬ থেকে ৯৫-৯৬, এই দশ বছরে এই রাজ্যে এক হেক্টরের (১ হেক্টর ঞ২৪৭ শতক ঞ৭১/২ বিঘা প্রায়) কম জমির মালিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৬ লক্ষ ১০ হাজার। অন্যদিকে১-২ হেক্টর জমির মালিকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৭৫ হাজার, ২-৪ হেক্টর জমির মালিকের সংখ্যা কমে গিয়েছে ১লক্ষ ৩৫ হাজার এবং ৪-১০ হেক্টর জমির মালিকের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ৩৪ হাজার। অর্থাৎ এক কথায় এই সময়ে প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হ্রাস পেয়েছে ক্ষুদ্র আধা মাঝারি ও মাঝারি কৃষকের সংখ্যা। কিন্তু শুধু সংখ্যাতেই এরা হ্রাস পায়নি, তাদের হাতে জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। ৩নং সারণি থেকেই এ ছবি স্পষ্ট।

:

সারণি : ৩

বছর	জমির মালিকের সংখ্যা (লক্ষ)	:		
:	১-২ হেক্টর	২-৪ হেক্টর	৪-১০ হেক্টর	১০ হেক্টরের বেশি
১৯৮৫-৮৬	১৭.৫৩	১৩.৮২	৪.৮৬	২.০০
১৯৯০-৯১	১৬.৯৪	১২.৬৯	৪.২৫	২.০২
১৯৯৫-৯৬	১৬.২৪	১০.৪৬	৩.১৬	২.০৩

।। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিনীতি কৃষকের ভবিষ্যৎ ।।

দেখা যাচ্ছে, ১-২ হেক্টর জমির মালিকের হাতে ১৯৮৫ - ৮৬ থেকে ১৯৯৫ - ৯৬, এই দশ বছরে জমি কমে গিয়েছে ১ লক্ষ ২৯ হ াজার হেক্টর, ২-৪ হেক্টর জমির মালিকের ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার হেক্টর ৪-১০ হেক্টর জমির মালিকের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ ১ লক্ষ ৭০ হাজার হেক্টর। অর্থাৎ আলোচ্য দশ বছরে ক্ষুদ্র - আধামাঝারি ও মাঝারি কৃষকের সংখ্যা যেমন কমেছে ২ লক্ষ ৪৪ হাজা র তেমনি এই পর্যায়ের কৃষকের হাত থেকে জমি চলে গিয়েছে ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার হেক্টর বা প্রায় ৪৭ লক্ষ ৬৩ হাজার বিঘা। তাই এই ধরনের কৃষক সংখ্যায় কমেছে, জমি হারিয়েছে ব্যাপক হারে। এই নির্মম সত্য অস্বীকার করা চলে কি? কিন্তু এটা হল সত্যের অর্দ্ধেক। বাকি অর্দ্ধেকও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সারণি ২ ও ৩ এর দিকে একটু লক্ষ্য করলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, ওই একই সময়ে ১ ০ হেক্টরের উর্দ্ধে জমির মালিকের সংখ্যা না বাড়লেও তাদের হাতে জমি বেড়েছে প্রায় সাড়ে বাইশ হাজার বিঘা। অর্থাৎ ধনী চাষি দের হা৪তে জমি কেন্দ্রীভবনের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বেশি দিন আগের কথা নয়। ১৯৯৫ সালে বর্ধমানের মুখ্য কৃষি আধিকারিককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যে সমস্ত ভূমিহীন কৃষককে এই জেলায় জমি দেওয়া হয়েছিল তাদের বর্তমান অবস্থা কী? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'বামফ্রন্ট সরকারের ভূমি সংস্কার কর্মসূচী অনু যায়ী পাট্টাপ্রাপ্ত এই জেলায় ২,২৪,০৫১ জন কৃষকের ৬০ শতাংশ যাঁরা প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর জমির মালিক ছিলেন, তাঁরা তাঁদে র জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রেতারা হলেন বড় ভূস্বামী বা গ্রামাঞ্চলের নতুন ধনী, যারা আজকাল ক

ৃষিকাজে প্রচুর পুঁজি বিনিয়োগ করছেন (The Statesman, 25.2.95)। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, রাজ্যের ১৩ শতাংশ পাট্টাদার বিভিন্ন কারণে তাঁদের পাট্টাপ্রাপ্তজমি হারিয়েছেন। এর মধ্যে ২.৭৩ শতাংশ পাট্টাদার তাদের জমি বিক্রি করে দিয়েছেন। তা ছাড়া প্রায় ৩.০২ শতাংশ বর্গাদার উচ্ছেদের কারণে জমির উপর তাঁদের অধিকার হারিয়েছেন (Times of India, 23.08.02)

তথ্যই দেখিয়ে দিচ্ছে কৃষি ও কৃষকের শ্রীবৃদ্ধির যে দাবি বামফ্রন্ট সরকার করছে তা কতটা অন্তঃসারশূন্য।বলা যায় এই সরকারেব . অনুসৃত কৃষিনীতি কৃষকের সর্বনাশই ডেকে এনেছে।

:

।। দেশের কৃষিক্ষেত্রে দেশি - বিদেশি পুঁজির জোটবন্ধন ।।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এদেশের কৃষি পুঁজিবাদী পথেই বিকশিত হয়েছে। পশ্চাদপদতা তার যাই থাক, যতই অনুন্নত প্রথায় চাষ আবাদ হোক, এ দেশের কৃষিপণ্যের পুঁজিবাদী পথে বিকাশের এই প্রক্রিয়ায় বর্তমান ভারতের কৃষিপুঁজি আপেক্ষিক অর্থে অত্যন্ত শক্তিশালী আকার ধারণ করেছে। এরা ভারতের কৃষি ও কৃষিপণ্যের ভুবনীকরণের দাবি তুলছে। ভারতের একচেটিয়া পুঁজি ও শক্তিশালী এই কৃষিপুঁজির জোট বন্ধনের ভিত্তিতেই কৃষি বিকাশে সরকারি অনুদানের সিংহভাগই এর ব্যবহার করে এসেছে। সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে এদেরে মদত দিয়ে এসেছে। সবুজ বিপ্লবের তথাকথিত স্বর্ণযুগের কথাই ধরা যাক। কৃষি শিল্প গবেষণার জাতীয় কাউন্সল -এর সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে, 'সবুজ বিপ্লবের সময় সার, উচ্চ ফলনশীল বীজ সেচ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ধনী কৃষকরাই বেশি সুবিধাপেছেয়ে। ফলত অনেক বেশি মুনাফা এই সময়ে তারাই করেছে।' তাই দেখা যাচ্ছে, একদিকে পুঁজিবাদী শোষণের স্বাভাবিক নিয়মেই গ্রামাঞ্চলে একদল মানুষের হাতে যেমন জমি ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, অন্যদিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সরকারি সাহায্যে এই গ্রামীণ পুঁজিপতিরা ক্রমশই ফুলে ফেপে উঠছে। এরই ফলে কৃষিতে পুঁজি সৃষ্টির পরিমাণও বেড়ে গিয়েছে ব্যাপকহারে। ১৯৯০-৯১ সালে এদেশে কৃষিতে পুঁজি সৃষ্টির পরিমান যেখানে ছিল ৪৫৯৪ কোটি টাকা, ১৯৯৭-৯৮ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২০,৯৯৫ কোটি টাকা। লক্ষ্যনীয় এই পুঁজির ৭৯ শতাংশই ব্যক্তিগত (Economic Survey, 1998-99)। শক্তিশালী এই কৃষি পুঁজি শুধুমাত্র আর কৃষিকাজের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ রাখতে চাইছে না। খাদ্যশস্যের ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষিভিত্তিক শিল্প, পরিবহন, চালকল প্রভৃতির ক্ষেত্রে এরা বিপুল পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করছে।

দেশের বৃহৎ একচেটিয়া শিল্পগোষ্ঠীও কৃষি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। জমি এখন তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্ব বর্তমানে একটাই যে দেশের সমস্ত অনাবাদী ও পতিত জমিকে ৫০ বছরের জন্য হৃহৎ একচেটিয়া পুঁজিকে লিজ দেওয়ার দাব ওরা সরকারের কাছে রেখেছে। কৃষি এখন ওদের কাছে শুধু শিল্প সহায়ক ক্ষেত্র নয়, মুনাফা অর্জনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। এই কারণে দেশের বৃহৎ পুঁজি কৃষিক্ষেত্রে আরও বেশি পরিমাণে বিনিয়োগের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

এই সব পরিবর্তন দেশের কৃষিক্ষেত্রে একটা নতুন জোটবন্ধনের জন্ম দিয়েছে। দেশীয় একচেটিয়া শিল্প পুঁজি ও গ্রামীণ পুঁজির মধ্যে এক অদ্ভুত মৈত্রী দেখা যাচ্ছে। যদিও মনে রাখা দরকার এদের মধ্যে স্বার্থের বিরোধও বর্তমান। তাই দেখা যায় গ্যাট বা নয়া আর্থিক নীতিকে শিল্প পুঁজির বিভিন্ন সংগঠন (সি আই আই, ফিকি, অ্যাসোচেম ইত্যাদি) যেমন সমর্থন করেছে, তেমনি সমর্থন করেছে শারদ যোশীর ক্ষেতকারী সংগঠন বা পাঞ্জাব - হরিয়ানার কুলাক লবি। উভয়েই অর্থনীতির তথাকথিত বিশ্বায়নের সুযোগ গ্রহণ করতে চাইছে এবং এই কারণেই নতুন কায়দায়নুতন কৌশলে এরা ভারতীয় কৃষি ক্ষেত্রকে ব্যবহার করতে চাইছে।

গ্রাম শহরে পুঁজিপতিদের এই জোটবন্ধনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানিগুলির স্বার্থ। তাদের মুখপাত্র হিসাবে ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রকে সংস্কারের উদ্দেশ্যে সরকারের কাছে এক গুচ্ছ প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল---

১.:::::::::: কৃষিপণ্য বেচাকেনার সমস্ত বিধিনিষেধ তুলে দিতে হবে।

২.:::::::::: খাদ্যদ্রব্য ভর্তুকি ব্যাপক ভাবে কমাতে হবে।

৩.:::::::::: কী উৎপাদন হবে এবং কোথায় বিক্রি হবে তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সব বাধা দূর করতে হবে।

৪.:::::::::: কৃষি বাণিজ্য সংস্থাগুলিকে খুশিমতো কাজ করতে দিতে হবে।

৫.:::::::::: জমির উধর্বসীমা আইন তুলে দিতে হবে।

:

নিজেদের মধ্যে স্বার্থের যতই সংঘাত থাকুক না কেন, একটু খতিয়ে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে এই সব সুপারিশের সঙ্গে এদেশের শিল্প ও কৃষিপুঁজির স্বার্থের ঐক্য রয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে, মাত্র ১১ বছরের মধ্যে এদেশে গড়েউঠেছে দেশি - বিদেশি পুঁজির বিশাল যৌথ উদ্যোগ। ১৯৯১ সালের আগষ্ট মাস থেকে ২০০২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কী কী ক্ষেত্রে এই যৌথ উদ্যোগ গড়ে উঠেছে তা ৪ নং সারণির দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

:

সারণি - ৪

ক্ষেত্র	যৌথ উদ্যোগের সংখ্যা	বিদেশি নিয়োজিত পুঁজি (কোটি টাকায়)
সার	৬৫	২৪৭
চাষের যন্ত্রপাতি	৪৮	৪৫৩
রবার	২১৫	১৩৫৩
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ	৭৪৭	৯২০২
সামুদ্রিক পণ্য	৯৫	৯৩
বনস্পতি	৪৭	২৪৯
ফল- ফুল ও কৃষিভিত্তিক শিল্প	১৮৮৬	৫৩২১
মোট	৩১০৩	১৬৯১৮

সহজে বোঝা যায় ভারতের কৃষি নির্ভর শিল্পের ক্ষেত্রে কি বিপুল পরিমাণ বিদেশি পুঁজির বিনিয়োগ শুরু হয়েছে। দেশিয় - বিদেশি পুঁজিপতিরা বাজার বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে আগামী দশকে এদেশে একমাত্র তৈরি খাবারের চাহিদাই দাঁড়াবে প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকার। লগ্নির প্রয়োজন হবে প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা। তাদের ধারণায়, বিদ্যুৎ বা টেলিযোগাযোগ শিল্পের চেয়েও অর্থনীতিতে এর প্রভাব হবে অনেক গুণ বেশি। এই ধরনের প্রয়োজন থেকেই ওরা এদেশে কৃষিপণ্যের উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, তার চরিত্রকে পাল্টে দিতে চাইছে। ওদের বক্তব্য হল---

১.::::: এদেশের কৃষিতে এত দিন ধরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপর যে জোর দেওযা হয়েছে তার পরিবর্তন করতেহবে।

২.::::: কৃষিপণ্যকে রপ্তানিমুখি করতে হবে।

৩.::::: খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বা কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের দিকে লক্ষ্য রেখেই কৃষি পণ্য উৎপাদন করতে হবে।

দেখা যাচ্ছে এই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের দেশে কৃষিপণ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটক, গুজরাট, রাজস্থানে রেপসিড, সয়াবিন, সূর্যমুখী, তেলবীজ ইত্যাদি কৃষিপণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। গমের জায়গাটা টম্যাটো, ধানের জায়গায় ফুলচাষ প্রাধান্য পাচ্ছে। কেরলের বনাঞ্চল ও ধান জমির একটা বড় অংশকে রবার, কফি ও নারকেল বাগিচায় রূপান্তরিত গরা হচ্ছে।

ফল কী হয়েছে? শুধু কর্ণাটকেই ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ১০,৯৫৯ জন কৃষক আত্মহত্যা করছে। এই আত্মহত্যার কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে, 'The village as an institution has crumbled under the pressure of commercialization,' (EPW 29.06.02)। অর্থাৎ বাণিজ্যিকীকরণের চাপে গ্রাম ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। পাঞ্জাব অন্ধ্রেও একই অবস্থা। সেখানেও আত্মহত্যার মিছিল। এখন এই নীতিই এরাজ্যে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বামফ্রন্ট সরকার।

দেশি- বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি সম্প্রতি রাজ্য সরকারের কাছে তাদের পরিকল্পনা পেশ করেছে। কারগিল ইন্ডিয়ার রপ্তানি বিভাগের প্রধান সঞ্জীব আসথানা বলেছেন, 'আমরা আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে চাল সংগ্রহের কথা ভাবিনি। আমরা জানতে চাই পশ্চিমবঙ্গ আমাদের কী দিতে পারে। তারপরই আমরা বিচার করব, সেগুলো আমাদের চাহিদা মেটাবে কিনা।' মার্কিন এই কোম্পানি রাজ্যর কৃষি থেকে কীভাবে মুনাফা করা যায় তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে। ম্যাকিনসেও তাদের রিপোর্ট বলেছে এখনই দশটা দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত। ম্যাকিনসেকৃত তালিকাটি এরকম---

:

লগ্নিকারী	ক্ষেত্র	পরিকল্পনা	
:	:	লগ্নির পরিমান (কোটি টাকা	আদায় (কোটি টাকা
১। র‍্যালিজ (টাটা)	ক) খাদ্যের খুচরা বিক্রি		
খ) ফল ও সবজি খাদ্য	৮০	বছরে ৫০	
২০	উল্লেখ নাই		
২। সুবীক্ষা	:	উল্লেখ নাই	বছরে ১০০
৩। এনডিডিবি	ফল ও সবজি	১৫০	দিনে ৭৫০
৪। এইচ এল এল	টমাটো ও ফল প্রসেসিং	৫	উল্লেখ নেই
৫। কারগিল	চাল রপ্তানি	১২৫	উল্লেখ নেই
৬। ডাবর ও পেপসি	আনারস ও লিচু প্রসেসিং	:	:
৭। আই টি সি	চিংড়ি প্রসেসিং	৩ বছরে ৩০	৩ বছরে ৩০০

৮। ঈগল ইন্ডাষ্ট্রিজ	পোলট্রি	৭০	বছরে ২৫০
৯। ভেঙ্কটেশ্বর	পোলট্রি	১৫	বছরে ৫০

এ রাজ্যের চালকে কেমন করে ব্যবহার করবে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি তার পরিকল্পনা এই রকম---
কোম্পানি লক্ষ্য

১ । কারগিল পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভাল চাল সংগ্রহ করে বাংলাদেশ, আফ্রিকায় রপ্তানি করা, এবং রাজ্যকে দামি বাসমতি ও সরু চালের উৎস হিসাবে গড়ে তোলা।
২। কাগিল ফুড তাদের নিজস্ব ব্র্যান্ডের জন্য দামি চাল সংগ্রহ করা।
৩। আই টি সি বাংলাদেশ বিক্রির জন্য ভাল চাল সংগ্রহ করা।
৪। এইচ এল এল নিজেদের ব্র্যান্ডের চাল (দার্জিলিং চাল) ভারতে ও বাইরে বিক্রির ব্যবস্থা করা

:

বুঝতে অসুবিধা হয় না পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রকে তাদের মুনাফার স্বার্থে ব্যবহার করতে পুঁজিপতিরা কতটা উদগ্রীব। তাদের এই স্বার্থ ও চাহিদাকে ভাষা দিতেই রাজ্য সরকার রচনা করেছে কৃষিনীতির নয়া খসড়া এবং তাকেই উন্নয়নমুখী ও জনমুখী নীতি বলে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

১.::::: এতদিন ধরে এই রাজ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপর জোর দেওয়ার যে নীতি অনুসৃত হচ্ছিল তার পরিবর্তন করতে হবে। বিশেষ করে তৈলবীজ, ডাল, ফল, শাকসবজি, ফুল এবং অন্যান্য অ-খাদ্য উৎপাদনের উপর জোর দিতে হবে।

২.::::: পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৬১ লক্ষ হেক্টর জমিতে ধানচাষ হয়। উৎপাদনের হার হেক্টর প্রতি দেড়গুণ করেধানচাষের জমির পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে ৪৮ লক্ষ হেক্টরে। বাকি ১৩ লক্ষ হেক্টর জমি ওই সমস্ত বানিজ্যিক ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

৩.::::: নানা ধরণের বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন ও বিপণনের জন্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ জোন তৈরি করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্কিমের সাহায্য নিয়ে নানা ধরনের বাণিজ্যিক ফল- ফুল উৎপাদন ও বিপণন করবে।

৪.::::: বাণিজ্যিকভাবে ফসল উৎপাদনের জন্য দেশী - বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সাথে কৃষকদের এক ধরনের চুক্তি হবে এবং তার ফলেই কৃষক ভূমিব্যবহার, ফসল উৎপাদন বা বাজার সম্পর্কে সর্বাধুনিক প্রকৌশলের অধিকারী হবে।

৫.::::: আর এই সমস্ত কাজে চাষী ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করবে পঞ্চায়েত। জেলা প্রশাসনকেও এই পরিকল্পনার অংশীদার করতে হবে।

এই হল বামফ্রন্ট সরকারের নয়া কৃষিনীতির মোটামুটি সারমর্ম। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে অসুবিধা হবেনা যে, এই কৃষিনীতিতে দেশি - বিদেশি পুঁজির মুনাফার স্বার্থে প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদনের দিকেইজোর দেওয়া হয়েছে। আর তা করা হবে তাদের সঙ্গে রাজ্যের ক্ষুদ্র কৃষকদের এ ধৰনের চুক্তির বিত্তিতে। বলা হচ্ছে, 'পারস্পরিকবিশ্বাসের উপর ভর' করেই এই চুক্তি-চাষ চলবে। পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর ভর করে নাকি নতজানু হয়েই বাংলার কৃষককে এই চুক্তি-চাষ করে সর্বস্ব খোয়াতে হবে। এবার সেই সেই বিষয়েই আলোকপাত করা যাক।

:

।। চুক্তিতে চাষ : কেন, কার স্বার্থে ।।

রাজ্য সরকার যখন চুক্তি চাষের জয়গানে মুখর তখন আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছেন বহুদিন আগেকার বাংলার নীল চাষিদের দুর্দশার কথা। কারণ তারাও নীলকর সাহেবদের সঙ্গে চুক্তিতেই চাষ করতেন। কিন্তু কেমন ছিল সেই চুক্তি? বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানির মফঃস্বল ম্যানেজার টমাস লারমুর ১৮৬০ সালে নীল কমিশনে সাক্ষ্য দিতেগিয়ে বলেছিলেন, 'বাংলার চাষিদের জমিতে, তাদের অতিরিক্ত শ্রমে আমরা সারা পৃথিবীর বাজারে ব্রিটেনের জন্য নীলের এক বিশাল বাজার তৈরি করেছি এবং বাংলার মাত্র দুটো জেলা থেকেই ৩ কোটি পাউন্ড লাভ করেছি। কীভাবে ? যখন বাজারে নীলের দাম মন প্রতি ১০ থেকে ৩০ টাকা, তখন দাদনচুক্তি অনুসারে চাষি পাচ্ছে ৪ টাকা। এর ফলে কী হয়েছিল? আমাদের অধীনে দাদন প্রথায় যে ৩৩,২০০ জন রায়ত নীল চাষ করে, তাদের মধ্যে ২৪৪৮ জন রায়ত দাদন শোধই করতে পারেনি; তারা তাদের বোনা নীলগাছ কুঠিতে পৌঁছে দেয় বিনা পয়সায় এবং নিরুপায় হয়ে পরের বছরের জন্য একই শর্তে নীল চাষে দানপত্রে দস্তখত করে।' নীলচাষের সেই কালো দিন কি রাজ্য সরকার আবার ফিরিয়ে আনছে চাইছে?

সাধারণত বহুজাতিক পুঁজি ইউরোপ, আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা বা আফ্রিকার দেশগুলিতে বড় বড় খামারের মালিক হয়ে আধুনিক প্রথায় চাষ করে। বড় বড় খামারের একটা মস্ত সুবিধা হল, সেখানে যন্ত্র ব্যবহার ব্যাপকভাবে করা যায় এবং এর ফলে উৎপাদনের হারও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই সুবিধা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে ওরা চুক্তি প্রথার চাষের পরিকল্পনা করছে কেন? ম্যাকিনসের রিপো

র্টই এর উত্তর মিলবে। সেখানে বলা হচ্ছে---- 'With the increase in Labour cost these Companies are moving away from managing Captive farming where they work closely with independent farmers.' অথাৎ মজুরির খরচ বেড়ে যাওয়ার ফলে বহুজাতিক পুঁজিরা জমির মালিক হয়ে বড় বড় খামার তৈরির পথ থেকে ক্র মশই চুক্তি - চাষের দিকে সরে যেতে চাইছে। ওরা দেখেছে, এই প্রথায় ওদের লাভ হবে তিন ধরনের---

১.:::::::::: এই প্রথায় মজুরি খাতে খরচ হবে না এক পয়াসও। ছোট চাষি নিজেরাই চাষ করবে। বহুজাতিকরা তাদের কাঙ্খিত পণ্য পেয়ে যাবে

২.:::::::::: খুশিমতো চুক্তি বাতিল করা যাবে। বহুজাতিক কোম্পানির চাহিদা মতো মুনাফা হলে চুক্তি বহাল থাকবে, না হলে বাতি ল। শিল্পের যেমন ওরা Exit

Policy -র দাবি জানাচ্ছে, অর্থাৎ যখন খুশি পুঁজির অন্যত্র চলে যাওয়া, চুক্তি - চাষ ওদের হাতে সেই সুযোগতুলে দিচ্ছে।

৩.:::::::::: এই প্রথায় জমি যেহেতু চাষির, তাই তার থেকে অল্প সময়ে সর্বোচ্চ মুনাফা কামিয়ে জমিকে যথেচ্ছ ব্যবহারে বন্ধ্যা করে ফেলে ওরা সরে পড়বে।

দেখা যাচ্ছে এই প্রথায় চাষই ওদের স্বার্থের পক্ষে সব থেকে অনুকূল।

পশ্চিমবঙ্গের আর একটা বিশেষ পরিস্থিতির কথাও ওরা মাথায় রাখতে বাধ্য হয়েছে। এ রাজ্যে ৯৩ শতাংশ জোতই হল ক্ষুদ্র জো ত এবং এই জোতগুলিতে কৃষি জমির পরিমাণ রাজ্যের মোট কৃষি জমির ৭২ শতাংশ। তাই এ রাজ্যে রাতারাতি বড় জোত গঠনে ও অসুবিধা রয়েছে। আবার এই রাজ্যে বেনামি জমি উদ্ধার আন্দোলনের ফলেই ভূমিহীনেরা জমির মালিক হয়েছেন। কৃষক আে ন্দালনের চাপে এই রাজ্যে কয়েকবার জমির উর্ধসীমা আইন পাল্টেছে। কৃষক আন্দোলনের এই অতীত ঐতিহ্যের কথাও ওদের মা থায় রাখতে হচ্ছে। এই সমস্ত কারণে রাজ্য সরকারের পক্ষে এখনই বহুজাতিক পুঁজির হাতে তাদের কাঙ্খিত পরিমাণ জমি তুলে দে ওয়া সম্ভব নয়। এই অসুবিধার কথা ম্যাকিনসে রিপোর্টও উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'ছোট কৃষকদের জমি দেওয়া র আন্দোলন তীব্র হওয়ার কারণে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে বিশাল বিশাল খামার গড়ে তুলবার মতো জমি পাওয়াই এই সমস্ত ে কাম্পানিগুলির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।'

এই অসুবিধা এবং চুক্তি চাষের বিশেষ সুবিধা--- সব মিলিয়েই বহুজাতিক পুঁজি মনে করচে মালিকানার ভিত্তিতে বড় খামার গড়ে তোলার চেয়ে ছোট ছোট অসংখ্য কৃষকের সঙ্গে চুক্তিতে যাওযাই সুবিধাজনক। বামফ্রন্ট সরকারও তাই এই প্রথায় চাষের জয়গান গাইতে শুরু করেছে।

চুক্তিতে এই চাষ গ্রামবাংলায় কৃষকজীবনে সর্বনাশ ডেকে আনবে। লিজ প্রথায় চাষ এখনও এই রাজ্যে আইনসঙ্গত নয়। কিন্তু বাস্ত বে বহু আগেই এই প্রথায় চাষ শুরু হয়েছে এই রাজ্যে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৩৫ টি ব্লক ও মেদিনীপুর জেলার ১৫ ট সমুদ্র উপকূলবর্তী ব্লকে গড়ে উঠেছে বিশাল বিশাল সব মাছের ভেড়ি। এইসব ভেড়িতে প্রধানত চিংড়ি ও কাঁকড়ার চাষ হয়ে থাে ক। গ্রামীণ জোতদারেরা ছোট ছোট জমির মালিকদের জমি মৌখিকভাবে লিজ নিয়ে জমিতে লবণাক্ত জল ঢুকিয়ে দেয়। প্রথম প্রথ ম দু'এক বছর জোতদারেরা কৃষককে শর্তমতো টাকা যথাসময়ে দেয়। কিন্তু তারপরেই শুরু হয়ে যায় আসল খেলা। ইতিমধ্যে জমি লবণাক্ত হয়ে পড়ায় ওইজমিতে অন্য কোনও ফসলের চাষ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে বাধ্য হয়েই ছোটজমির মালিকদের সেখানে ব ড় জোতদারের দয়ার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়। এই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে বহু জায়গায় ভেড়ি মালিক ছোট চাষিকে তার প্রাপ্য টাকা এমনকি জমিক অধিকার থেকেও গায়ের জোরে বঞ্চিত করছে। উত্তর ২৪ পরগনায় সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকাগুি লতে গেলেই মর্মান্তিক এই প্রক্রিয়ার বহু নজির পাওয়া যাবে। জমির মালিক জমির উপর তার বৈধ অধিকারের কাগজপত্র নিয়ে সরকারের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছে, আবেদন জানাচ্ছে। কিন্তু কোনও সুরাহাই হচ্ছে না। জমি সে ফিরে পাচ্ছে না, চুক্তিমতো টাকাও মিলছে না। এই হল নিষ্ঠুর বাস্তব।

:

।। কেমন সেই চুক্তি ।।

রাজ্য সরকারের নেতা - মন্ত্রীরা বলতে পারেন, সরকারি উদ্যোগে চুক্তিতে যে চাষ শুরু হবে তা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত, সুতরাং তাতে আশঙ্কিত হওয়ার কী আছে? আমরা বলি, আশঙ্কার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, আইন এ রাজ্যের কৃষককে বাঁচাতে পারবে না। বিষয .টা একটু তলিয়ে বোঝা যাক। এই যে চুক্তি প্রথায় চাষের কথা বলা হচ্ছে, তা কৃষকের সঙ্গে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির চুক্তি। সে ই চুক্তির ধরন কী রকম হবে? সরকারি খসড়াতে এ সম্পর্কেবিস্তারিত কিছু নেই। কিন্তু এই খসড়ার উদ্ভব যেখান থেকে সেই ম্যাকি নসে রিপোর্টে এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট বলা হয়েছে চুক্তির ধরন হবে এই রকম---

১.::::: জমিতে কী ধরনের ফসল ফলানো হবে তা ঠিক করবে বহুজাতিক কোম্পানি।

২.::::: জমিতে কী ধরনের বীজ, সার, তেল, জল কী পরিমাণে দিতে হবে তাও ঠিক করবে ওরা।

৩.::::: প্রয়োজনীয় প্রাথমিক মূলধন নির্দিষ্ট সুদে চাষিকে ঋন দেওয়া হবে।

৪.::::: ফসল ওঠার পর কিছু অংশ নির্দিষ্ট দামে, বাকিটা বাজার দরে চাষির কাছ থেকে কিনে নেওয়া হবে।

৫.::::: প্রাকৃতিক বা অন্যান্য কারণে ফসলের ক্ষতি হলে তার দায়ভার কোম্পানি বহন করবে না, সমস্ত দায় চাষিকেই বহন করতে হবে।

চুক্তির এই ধরন লক্ষ্য করলেই সহজে বোঝা যাবে, এর সমস্ত শর্তই কৃষক স্বার্থ বিরোধী। অন্য সমস্ত শর্ত বাদ দিয়ে শেষ দুটো শর্তের কথাই ধরা যাক। বলা হচ্ছে, 'ফসল ওঠার পর বাজার দরে চাষির কাছ থেকে ফসল কিনে নেওয়া হবে।' কিন্তু প্রশ্ন হল এই 'বাজার দর' নিয়ন্ত্রণ করবে কারা এবং কীভাবে? সন্দেহের অবকাশ নেই এটানিয়ন্ত্রণ করবে বহুজাতিক কোম্পানি। তারা যে দর বেঁধে দেবে সেই দরেই চাষিকে ফসল বিক্রি করতে হবে। এখনবিক্রি করতে হয় ফড়েদের কাছে, তখন বিক্রি করতে হবে ওদের কাছে, পার্থক্য এই যা। আর এই বহুজাতিক কোম্পানিগুলি নিজেদের মুনাফা কমিয়ে চাষির শ্রীবৃদ্ধি ঘটাবে, তা কি বিশ্বাস করা যায়?

চুক্তির এমনই মহিমা, প্রাকৃতিক কারণে ফসল মার খেলেও দায়ী চাষিরা, কোম্পানি কোনও দায় বহন করবে না। ফলে কৃষক এক বার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে সে ঋণ পরিশোধ করা তার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। তাই নামে মালিক থাকলেও ঋণগ্রস্ত বাংলার কৃষক এই সমস্ত বহুজাতিক কোম্পানির ঋণ জালে আটকা পড়ে হাঁসফাঁস করবে, এর থেকে বেরিয়ে আসার কোন উপায় তার থাকবে না। ফলে কোম্পানি যা বলবে তাই তাকে মাথা পেতে মেনে নিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুরগি চাষিদের করুণ অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সবাই জানেন, মুরগি চাষের ক্ষেত্রে জমি, ঘর ও পরিশ্রম চাষির, বাচ্চা খাবার ওষুধ ইত্যাদি যোগায় বহুজাতিক কোম্পানি। মুরগি তৈরি হবার পর কী দামে বিক্রি হবে তা ঠিক করে ওই বহুজাতিকের এজেন্টরা। আবার সেই ইচ্ছা করলে মুরগি নাও কিনতে পারে। মুরগি রোগে মারা গেলে দায় চাষির। অর্থাৎ বহুজাতিক কোম্পানির লাভ দ্বিবিধ। মুরগির বাচ্চা, খাবার, ওষুধ বিক্রি করে লাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে তৈরি মুরগি বিক্রি করে লাভ। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই তার কোনও ঝুঁকি নেই। ষোল আনা ঝুঁকি চাষির। তারই সর্বস্ব চলে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই দেখা যাচ্ছে এই রাজ্যে মুরগি চাষের ক্ষেত্রে ছোট ছোট চাষি ঋণগ্রস্ত হয়ে সর্বস্ব হারাচ্ছে, অন্যদিকে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মুনাফার পাহাড় ক্রমশইস্ফীতহচ্ছে। কি সুন্দর অলিখিত চুক্তি বলুন তো? লাভ আমার লোকসান তোমার। এই ধরনের চুক্তিই এবার রাজ্যের কৃষিক্ষেত্রে সর্বত্র চালু হতে যাচ্ছে।

:

।। রপ্তানিমুখী বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য উৎপাদন করার স্বার্থে ।।

রাজ্যসরকারের কর্তাব্যক্তিরা বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রী প্রচার করছেন, বিশ্বয়নের বর্তমান পর্যায়ে শুধু প্রথাগত খাদ্যশস্য উৎপাদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, কৃষককে আন্তর্জতিক বাজারের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে; তাহলেই বাংলার কৃষক আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজারে তার পণ্যের লোভনীয় দাম পাবে, কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন ঘটবে দ্রুতগতিতে। দেশি - বিদেশি পুঁজির ব্যাপক বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য উৎপাদন করলেই কৃষকের উন্নয়ন ঘটবে? এই নীতি অবলম্বন করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যারা বহুদিন আগে থেকেই কৃষিপণ্য উৎপাদন করছে তাদের অভিজ্ঞতা কী? কী অভিজ্ঞতা আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের? মেক্সিকো, হণ্ডুরাস ভেনেজুয়েলা, আর্জেন্টিনা বা সুদান, মরক্কোর অবস্থা তো এক কথায় ভয়াবহ। লক্ষ লক্ষ ছোট কৃষক সর্বস্ব হারিয়েছেন সেখানে। লক্ষ লক্ষ একর জমি বন্ধ্যা। হন্ডুরাসের অর্দ্ধেক বনাঞ্চল ধবংস হয়েছে। মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলির সর্বগ্রাসী মুনাফা শিকারের পরিণাম সম্পর্কে সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে---

'On March 30, 1998, the American Banana Transnational United fruit Company celebrated its 100 years of operations in Central America. For shareholder, both in the United States and this region, it was a day to rejoice. But for thousands of Central Americans it was a day of mourning.
United Fruit received significant land leases, Privileges, tax exemptions, and cheap labor in exchanges for huge amounts of money for Government officials. Thousands of farm workers were dislodged, many other were killed, all these in the name of progress.
…After a hundred years of Banana Production, Central America is barely developed and thousands of its inhabitants have died under slavery conditions.
…Workers live in misery and despair, specially in the areas where hurricanes caused thousand of deaths, destruction of properties, material losses. As always, farmers pay the highest price in this commercial war.
…The multinational corporations that for years have profited from banana productions have discharged thousand of workers. Today, Plantations were filled with unemployed workers who have almost no social assistance' (Annual Report on workers' Rights, Agricultural Workers, 2001).

উন্নয়নের এই নকশা বুদ্ধবাবুদের অজানা নয়। তাঁরা ভাল করেই জানেন--- দক্ষিণ মধ্য আমেরিকা বা আফ্রিকাতে সাম্রাজ্যবাদীরা যে ধরনের উন্নয়ন ঘটিয়েছে ঠিক সে ধরনের উন্নয়নই তারা এ রাজ্যে ঘটাবে। তবে কেন এই ধরনের পরিকল্পনা?

শুধু বিদেশের অভিজ্ঞতাই নয়। এ দেশের তুলা চাষিদের অভিজ্ঞতা কি? আমরা জানি, দেশের অন্যতম প্রধান অর্থকারী ফসল তুলা

। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেই এই তুলা চাষ হয়ে থাকে। গুণমানের দিক দিয়ে ভারতীয় তুলা বিশ্বের অন্যতম সেরা। বিশ্ববাজারে এর চাহিদা প্রচুর। এই কারণে এ দেশের তুলা লবি (অর্থাৎ তুলা চাষের সঙ্গে যুক্ত কুলাক ও বৃহৎ তুলা কর্পোরেশনগুলি) তুলা রপ্তানির উপর সমস্ত নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে এসেছে দীর্ঘদিন। এই দাবি মেনেই তুলা রপ্তানির উপর থেকে সমস্ত বিধি নিষেধ তুলে দেওয়া হতে থাকে ধীরে ধীরে। অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বড় বড় তুলা কর্পোরেশনগুলি ইচ্ছামতো তুলা রপ্তানি করতে পারবে। এই অধিকার তাদের দিয়ে দেওয়া হয়। একারণের তুলা রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে যায় প্রায় ৪৯০ শতাংশ। এই সময়ে তুলা উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লেও তা খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। ফলে তুলার বাজারে জোগানের তুলনায় চাহিদা বেড়ে যায়। চাহিদা জোগানের ভারসাম্যের অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী তুলার দাম বৃদ্ধি হওয়ার কথা এবং তার ফলে তুলা চাষি বিশেষত মধ্য - নিম্ন - প্রান্তিক চাষির উপকৃত হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। তুলা কর্পোরেশনগুলি বাজারের উপর তাদের একচেটিয়া আধিপত্যের সুযোগ নিয়ে দাম কম দিয়েছে এবং আগের তুলনায় বেশি দামে তুলা বিক্রি করে মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়েছে। অসহায় চাষিরা তুলা কর্পোরেশনগুলি বেঁধে দেওয়া দামেই তাদের কাছে অভাবি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। দেখা গিয়েছে, 'ভারতের তুলা কর্পোরেশন ও মার্কফেড ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হিসাবে অন্ধ্রপ্রদেশে কুইন্টাল প্রতি পনের'শ টাকায় তুলা কিনেছে যা বিগত বছরগুলির তুলনায়শতকরা ২৫ টাকা কম। অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী তুলা চাষিদের আশ্বস্ত করতে বলেছেন, প্রতি কুইন্টাল ২১০০ টাকা দরে অন্তত শতকরা ৩০ ভাগ তুলা ভারতের তুলা কর্পোরেশনগুলি ও মার্কফেড কিনবে। কিন্তু এই দুটি সংস্থা তা করতে অস্বীকার করে। তারা বলে যে, তারা বাণিজ্যিক সংস্থা, দাতব্য তাদের কাজ নয়। কৃত্রিমভাবে তুলার এই দাম কমানোর ফলে লাভ হয়েছে ফড়ে, মিল মালিক ও বিদেশি তুলা ক্রেতাদের। ৯৬-৯৭ সালে তুলার দাম যেখানে ছিল কুইন্টাল প্রতি ২৩০০ টাকা, এ বছরে তা দাঁড়িয়েছে ১৮০০ টাকায়। চাষিদের মজুত করে রাখার ক্ষমতা নেই। তাদের গুদাম ঘর বা যানবাহনও নেই। তাদের দেনা শোধ করতে হবে। তাই অপেক্ষা করারও কোনও উপায় নেই। আবার শস্য নষ্টও হয়ে যেতে পারে। তাই ফড়েরা যে দাম পায় তার থেকে ২৫-৩০ শতাংশ কম দামেই তাদের শস্য বিক্রি করে দিতে হয়' (Aspects of Indian Economy, Vol. 26-27, p.30-31)।

সবুজ বিপ্লবের স্বপ্নভূমি পাঞ্জাবেও একই ঘটনা। 'দেনার দায়ে পাঞ্জাবের তুলা চাষিরা তাদের জীবজন্তু অর্দ্ধেক দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে, এমন অসংখ্য ঘটনার নজির রয়েছে' (পাঞ্জাব ট্রিবিউন, ১৪.১০.৯৮) ওই পত্রিকা আরও জানাচ্ছে, 'কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, দক্ষিণ পাঞ্জাবের শতকরা ৯০ জন চাষি ঋণের জালে আবদ্ধ। এ পর্যন্ত ১৩৩টি আত্মহত্যার ঘটনা জানা গিয়েছে' (৪.১.৯৮)। ট্রিবিউনের মতে, 'সরকারি বিভিন্ন সূত্র অনুযায়ী এ পর্যন্ত এক হাজার আত্মহত্যার ঘঠনা ঘটেছে' (ঐ, ২৪.৯.৯৮)।

তাহলে দেখা গেল আন্তর্জাতিক বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে এমন বাণিজ্যিক কৃষিপণ্য উৎপাদন করেও আধমাঝারি, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক কৃষকের নিস্তার নেই। যতক্ষণ না তার কৃষিপণ্য লাভজনক দামে বাজারে বিক্রি করার কার্যকর কোনও সরকারি ব্যবস্থা থাকবে ততক্ষণ অলাভজনক দামে তার পণ্য চাষিকে অভাবি বিক্রি করতে হবেই এবং সেই সুযোগ বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিগত পুঁজি বিপুল পরিমাণ মুনাফা ঘরে তুলবেই। এই ব্যাপারটা ঘটেছে তুলা চাষির ক্ষেত্রে। সে যখন দেনাগ্রস্ত হয়ে হাল - বলদ বিক্রি করে আত্মহত্যার পথ গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে, ঠিক তখনই তার উৎপাদিত পণ্য, তথাকথিত সাদা সোনা বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল মুনাফা ঘরে তুলছে দেশি - বিদেশি তুলা কর্পোরেশনগুলো। তাই উৎপন্ন কৃষিপণ্যের রপ্তানিযোগ্যতা আছে কিনা, বিদেশে তার বাজার মিলবে কিনা, এটা একটা বিষয় হলেও, অনেক বড় কথা হল, চাষির অভাবি বিক্রি বন্ধে কোনও সরকারি ব্যবস্থা করা যাবে কিনা। না হলে অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করা যাবে না।

এই সাধারণ কথাটা কি রাজ্য সরকারের অজানা? নিশ্চয়ই না। কিন্তু এই সামান্য কাজটাও তারা গত ২৫ বছরে করে উঠতে পারে নি, আগামী দিনেও করবেন এমন কোনও পরিকল্পনাও নেই। তাঁরা পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতির জয়গানে এখন সোচ্চার। তাই স্বচ্ছন্দে বলতে পারছে চাষির উৎপাদিত ফসল রপ্তানিকারকেরা বাজারদরেই কিনবে। মুশকিল হল, গ্রামবাংলার হাটে হাটে ফড়েরা বাজারদরেই চাষির ফসল কিনে থাকে। বুদ্ধবাবুদের পরিকল্পনায় ফড়ের জায়গা দখল করবে একচেটিয়া পুঁজির এজেন্টরা। তারা এমন বাজার দরে চাষির ফসল কিনতে থাকবে যে ঘটি বাটি বিক্রি করে বাংলার চাষিকে কলকাতার ফুটপাতে অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

কিন্তু তিক্ত এই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার সুখস্বপ্নে মশগুল। নয়া কৃষিনীতির পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সগর্বে আমাদের জানিয়েছেন, 'এই তো কদিন আগে আমি বাড়িতে একটা প্যাকেট পেলাম, খুলে দেখলাম বিদেশে রপ্তানি হওয়া পশ্চিমবঙ্গের লিচু। কী সুন্দর মোড়ক! চিনকে পিছনে ফেলে পশ্চিমবঙ্গের লিচু ইউরোপের বাজার মাত করে ফেলেছে' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১-০৬-০২)। বিদেশে রপ্তানি হওয়া লিচু আবার স্বদেশে এসে কীভাবে বুদ্ধবাবুর অন্দর মহলে ঢুকে পড়ল এ প্রশ্ন না হয় উহ্যই থাক! কিন্তু একটা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তো তাঁকে করাই যেতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে ধরে নিলাম এ রাজ্যের হাজার হাজার চাষি ধান চাষকে কুলোয় বাতাস দিয়ে বিদায় করে লিচু উৎপাদনে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং 'সুন্দর মোড়কে ভরা সেই লিচু' চিনকে পেছেন ফেলে ইউরোপের বাজার মাত করল। কিন্তু তারপর? পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ লিচু চাষিরা তাতে দাম পাবে তো? তাদের অবস্থাও অন্ধ্র পাঞ্জাবের তুলা চাষিদের মতো হবে না তো? তাঁরা লিচু সংরক্ষণ করতে পারবে না, বাজার তেজি হওয়ার জন্য

অপেক্ষা করার ক্ষমতাও তাদের আয়ত্তের বাইরে। এই অবস্থায় আন্তর্জাতিক বাজারের সুবিধা গ্রহণের কথা তাদের স্বপ্নেরও বাইরে। তাহলে এই হাজার হাজার চাষির লিচু কিনবে কে? কিনবে হয় সরাসরি বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি, আর নয় স্বদেশি পুঁজির লিচু লবি বা তাদের নিযুক্ত ফড়েরা। যে বছর ফসল ভালহবে সে বছর যদি ওরা বলে লিচুর কেজি ১ টাকা। তখন লিচু চাষিদের বাঁচাবে কে? রাজ্য সরকার তো কোনও দায়িত্ব নেবে না। তাহলে বাস্তবে অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে কী রকম? বাংলার কৃষকদের ওরা বহু জাতিক পুঁজির করুণার উপর ছেড়ে দিচ্ছে। এবং এইসব পুঁজিপতিরা যে কেমন করুণাময় তা এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার কোটি কোটি কৃষকআজ হাতে হাতে উপলব্ধি করছেন। বাস্তবে যা দাঁড়াবে, এ রাজ্যের উর্বর জমি ও শস্তা শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বহুজাতিক পুঁজি তাদের মুনাফা আরও স্ফীত করবে এবং কৃষক সর্বস্ব হারিয়ে পথের ভিখারিতে পরিণত হবে।

:

।। বীজ কোম্পানিগুলির স্বার্থ ।।

আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করার মতো বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন কৃষকদের উৎসাহিত করার পেছনে আরও একটা স্বার্থ কাজ করছে। তা হল দেশি - বিদেশি বীজ কোম্পানিগুলির স্বার্থ । ওরা জানে, সাবেকি চাষের জন্যপ্রয়োজনীয় বীজে মুনাফার হার অনেক কম। বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সঙ্কর বীজে এই মুনাফার হার অনেক বেশি। তাই বীজ কোম্পানিগুলি চাইছে অর্থকরী চাষের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করতে। সে কথাগোপনও করছে না ওরা। খোলাখুলি বলছে, 'কৃষকেরা প্রথাগত বীজের পরিবর্তে সঙ্কর বীজের ব্যবহার করলেই আমাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ পূরিত হতে পারে' ছদ্রত্ন, ২০.১০.৯৮)। মহেন্দ্র সিড্‌সের ডাইরেক্টর কে আর চোপড়া এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সম্প্রতিকালে সঙ্কর বীজের যে বাণিজ্যিক ব্যবহার আমরা করেছি তার ফলেই এ দেশের বীজ ব্যবসার ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অভাবনীয় বিকাশ সম্ভব হয়েছে।'' (সূত্র, ঐ) এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে কারগিল, মনসান্তো, দ্যুপোঁ, আই টি সি জেনেকা ইত্যাদি বহুজাতিক পুঁজিরস্বার্থ। হিসাব কষে ওরা দেখেছে দেশের বীজ বাজার থেকে সাবেকি বীজ শতকরা ৫০ ভাগ অপসারিত করতে পারলে ওদের বাৎসরিক মুনাফা বৃদ্ধি পাবে ৬ হাজার কোটি টাকা। ওরা যে দেশজুড়ে সঙ্কর বীজ ও বাণিজ্যিক চাষের ব্যাপক প্রচলনের পক্ষে হাওয়া তুলতে উঠে পড়ে লেগেছে, এই হল তার প্রধান কারণ।

এই পরিকল্পনায় আর একটা সুদূরপ্রসারী উদ্দেশ্য রয়েছে। যদি প্রথাগত বীজকে সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপিত করা যায় তবে চাষিকে বীজের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে বহুজাতিক কোম্পানির উপর। বীজের চরিত্রের উপরই চাষের চরিত্র অনেকাংশে নির্ভরশীল। চাষে কী পরিমাণ জল, সার, কীটনাশক তেল বা অন্যান্য উপাদান লাগে তা অনেকাংশেই নির্ভর করে বীজের গুণাগুণের উপর। বীজ বহুজাতিক কোম্পানির সম্পূর্ণ করায়ও হয়ে গেলে চাষের এইসমস্ত উপাদানের জন্যে চাষিকে ওদের উপর নির্ভর করতে হবে। তাই দেখা যাচ্ছে, বীজ কোম্পানিগুলি এখন আরশুধু বীজ সরবরাহ করে না, তারা সার, কীটনাশক তেল ইত্যাদিও সরবরাহ করে এবং এইভাবে বীজ - বাজার দখল করে ওরা সমগ্র চাষের প্রক্রিয়াকেই দখল করতে চায়। বহুজাতিক পুঁজির এই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাকেই রাজ্য সরকার ক্রমাগত মদত দিয়ে চলেছে। দুঃখের হলেও, এটাই বাস্তব।

বাণিজ্যমুখী চুক্তিভিত্তিক চাষ চালু করতে গিয়ে বহুজাতিক পুঁজি কতগুলো বাস্তব অসুবিধার কথা চিন্তা করছে। যেমন ১। এ রাজ্যের হাজার হাজার কৃষককে চুক্তিভিত্তিক চাষে উৎসাহিত করার জন্য প্রচার চালাবে কে। ২.কোন কোন চাষির সঙ্গে চুক্তি করলে বহুজাতিক কোম্পানির সুবিধা হবে তা নির্ধারণ করবে কে। ৩. চাষিদের যে বাকিতে সার - বীজ - তেল ইত্যাদি পণ্য দেওয়া হবে, যদি দেখা যায় কোনও কারণে চাষি তা শোধ করতে পারছে না,তখন তা আদায় করার দায়িত্ব নেবে কে ইত্যাদি ইত্যাদি। বহুজাতিক কোম্পানির কর্তাব্যক্তি এবং তাদের বিভিন্ন পরামর্শদাতারা দেখেছে এইসব কাজ যদি মাইনে করা লোক রেখে করতে হয় তবে এক দিকে খরচ অনেক, অন্যদিকেচাষিদের সঙ্গে নিত্যদিনের যোগাযোগের অভাবে তা খুব একটা ফলপ্রসূও হবে না। তার থেকে এই কাজ যদি পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করা যায় তবে তাদের প্রভাব খাটিয়ে এক দিকে যেমন প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষকদের চুক্তি - চাষের আওতায় নিয়ে আসা যাবে তেমনি বকেয়া আদায়ের অনেক সুবিধা হবে। অথচ এতে বহুজাতিক পুঁজির কোনও খরচনেই। জনগণের ট্যাক্সের টাকায় পঞ্চায়েত চলে, এবার পঞ্চায়েত চলবে বহুজাতিক পুঁজির কর্তাদের কথায়।

আর একটা কথা। রাজ্য সরকার বলছে, চুক্তি নিয়ে চাষিদের সঙ্গে বহুজাতিক পুঁজির বিরোধ দেখা দিলেপঞ্চায়েতগুলো মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করবে। এদেশের উচ্চস্তরের আমলা নেতা - মন্ত্রীদের মধ্যে এই বহুজাতিকপ্রভাবের কথা আমরা সবাই জানি। বাস্তবে তাদের কথায় সরকার ওঠে বসে। এই অবস্থায় চাষির সঙ্গে বহুজাতিক কর্পোরেশনের স্বার্থের সংঘাত দেখা দিলে পঞ্চায়েত কর্তারা শেষ পর্যন্ত কার পক্ষ অবলম্বন করবে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

এই কৃষিনীতিতে যে কৃষকের সমূহ সর্বনাশ এটা বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু ক্ষেত মজুরদের কী হবে? পুঁজি ক্রমশই আরও বেশি করে পুঁজিপ্রধান শিল্পের দিকে ঝুঁকছে। ফলে ছাঁটাই, কর্মসংকোচন, লে - অফ, লক - আউট এখন শিল্প শ্রমিকদের নিত্যদিনের সঙ্গী। এটা যে শুধু আমাদের দেশে ঘটছে তাই নয়, গোটা দুনিয়ারই এই অবস্থা। এমনকি সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গত বছরেই ৪ লক্ষ শ্রমিককে ছাঁটাই করে হয়েছে এবং আরও বহু লক্ষ ছাঁটাইয়ের আশঙ্কায় দিন শুনছে। শিল্পক্ষেত্রে তারা এটা করছে কেন? অন্যান্য বহু কারণের মধ্যে একটা বড় কারণ হল শ্রমখাতে খরচ কমানো। তাহলে প্রশ্ন হবে শিল্পের ক্ষেত্রে তারা যে নীতি নিয়ে চলছে, কৃষিক্ষেত্রে কি তার উল্টোনীতি নেবে? কৃষিক্ষেত্রে কি তারা শ্রমনিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহার করবে? এই প্রশ্নের একটাই উত্তর, না

তাহলে? এই নীতিতে ক্ষেতমজুর কাজ হারাবে ব্যাপক হারে।

ওদের পরিকল্পনায় ধান চাষের জায়গায় অন্যান্য অর্থকরী ফসল ফলাবার কথা বলা হচ্ছে। ধান চাষের এলাকা কমে যাওয়ার ফলে রাজ্যের খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে কোনও সঙ্কট দেখা দেবে কিনা এ প্রশ্ন না হয় তোলাই থাক। বিশেষজ্ঞরা নানা দিক দিয়ে এ নিয়ে আলোচনা করছেন। কিন্তু এই পরিবর্তন গ্রামীণ ক্ষেতমজুরের জীবনে কী বার্তা বহন করে আনবে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। আমরা জানি, ধান চাষ চরিত্রে শ্রমনিবিড়। ধানের বীজ খোলা তৈরি, জমি তৈরি, রোয়া, আগাছা নিড়ানো, সার দেওয়া কীটনাশক ছড়ানো, ধানকাটা - বাঁধা, ঝাড়াই, বস্তাবন্দি করা ইত্যাদি এই চাষের প্রতিটি পর্যায়েই শ্রমিকের প্রয়োজন এবং তা সংখ্যায় কম নয়। ধরা যাক, ধান চাষ বন্ধ করে কলা চাষ করা হল। কলার চারা বসানোর পর মাঝে মাঝে সামান্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজ ছাড়া তিন ব ছরে ওই জমিতে শ্রমিকের আর বিশেষ প্রয়োজন নেই। আম বা লিচু চাষের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। ফলে দেখা যাচ্ছে, ধানের জায়গায় এই সমস্ত চাষের শ্রমিক লাগবে অনেক কম অর্থাৎ ক্ষেতমজুর কাজ হারাবে। কৃষিনীতির খসড়ায় রাজ্য সরকার বলছে, 'এই নীতির উদ্দেশ্য হল গ্রামাঞ্চলে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা।' পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বাস্তবের সঙ্গে সরকারি দাবি ও ঘোষণার ফারাক বিস্তর।

রাজ্যে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বাড়ছে, মাথাপিছু কাজের সুযোগ (জনদিন) কমে যাচ্ছে। গড়পড়তা দৈনিক মজুরি কমছে, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে ভয়ানক গতিতে, বাড়ছে অপুষ্টি, অনাহার, আত্মহত্যা। এরপর উন্নয়নের নামে রাজ্য সরকারের এই নয়া পরিকল্প না গ্রামবাংলায় আরও লক্ষ লক্ষ ক্ষেতমজুরকে কর্মচ্যুত করবে, ঠেলে দেবে সর্বনাশের অন্ধকারে।

অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। যতই এদেশে কৃষির তথাকথিত এই ভুবনীকরণ ঘটবে, যতই দেশীয় একচেটিযা পুঁজি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গে জোট বেঁধে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারের স্টিম রোলার চালাবে, যতই তারা নিজেদের মুনাফার থলি পূর্ণ করবে, ---তত তই দেশের মানুষ বেশি করে দেখবে অভাবনীয় প্রাচুর্যের মধ্যেই তারা অনাহারে, বা অভাবনীয় প্রাচুর্য সৃষ্টির এই পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার জন্যই তারা সর্বস্বহারা। বুঝতে হবে, এই আক্রমণ শুধু কৃষক বা ক্ষেতমজুরদের উপর আক্রমণ নয়, এই আক্রমণ সমস্ত সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ।

এ কাউকেই রেহাই দেবে না। একমাত্র জোটবদ্ধ গণসংগ্রামই এই সর্বনাশের নীল নকশাকে রুখে দিতে পারে।

ভূমি ব্যবহারের কোনও নীতিই নেই

দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার নিয়ে দেশে ও কিছু বিদেশে অনেক তথ্যভিত্তিক ও তাত্ত্বিক লেখা হয়েছে। দু - পর্বের ভূমিসংস্কার হয়েও গে ছে অনেক দিন আগে। প্রথম পর্ব হয় ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ -৭০ এবং দ্বিতীয়টি হয় ১৯৭৮-৭৯তে। প্রথমে প্রায় ১০লক্ষ একর উর্বর কৃ ষি জমি আইন মাফিক সরকারে ন্যস্ত হয়। এতে পশ্চিমবঙ্গের জমি নির্ভর আভজাত্য (aristocracy) একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পরবর্তীকালে এরই জন্য মধ্য ও উচ্চ চাষি সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে অনেকটা এগিয়ে আসে। এর ফল পরিস্কার ভাবে দেখা যায় উৎপাদনের অগ্রগতিতে। দ্বিতীয় পর্ব অপারেশন বর্গা হয় ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৯-এর মধ্যে যাতে প্রায় ১২ /১৩ লক্ষ বর্গা দারদের নাম নথিভুক্ত করা হয় এবং তারা security of tenure এবং ফসলের ন্যায্য ভাগের অধিকারী হয়।

বামফ্রন্ট ও তার শ্রেণীভিত্তি ঃ

১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন করে ঐ ব্যবস্থা পুনরায় চালু করে। এই ক্ষমতা বিকেন্দ্রকরণে মূলত লা ভবান হয় মধ্য ও উচ্চ চাষি শ্রেণী। অভিজাত শ্রেণীর অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙে যায় ১৯৬৭-৭০-এ, বাড়তি জমি অধিগ্রহণের ফলে । তারা গ্রামীণ সমাজ ও রাজনীতি থেকে ক্ষমতাচ্যুত হয়। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্টকে প্রায় ৬০/৬৫ হাজার প্রার্থী দাঁড় করাতে হয় প ঞ্চায়েতের জন্য। সিপিএম-এর এত সদস্য তো দূরে থাক, সক্রিয় সমর্থকও সেইসময় ছিল না গ্রামবাংলায় । মধ্য ও উচ্চ চাষিরা সি পিএমকে বেশ ভয় করত ও তারা কংগ্রেস সমর্থক ছিল। রাজনৈতিক বাতাবরণ বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা দেখল যে, বাম টিকিটে যদি তারা ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত দখল করতে পারে, তাহলে তাদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করতে সুবিধে হবে। সিপিএম-ও তত্বগতভাবে মধ ্য ও উচ্চ চাষিকে শ্রেণীশত্রু মনে করে না। কাজেই মণি- কাঞ্চন যোগ হল। মধ্য ও উচ্চ চাষিরা অভিজাতদের সরিয়ে ক্ষমতায় এল এবং সিপিএম - ও তাদের স্থানীয় ভিত্তি তৈরি করে ফেলল। সংখ্যাগতভাবে ১৯৭৮ -এর নির্বাচনে মাত্র শতকরা ৭ ভাগ পঞ্চায়েত সদস্য ছিল বর্গাদার বা ভূমিহীন চাষি। আর শতকরা ৯৩ ভাগ ছিল জমির মালিক বা মালিক পরিবারভুক্ত। বেকায়দায় পড়ে সিপি এম তখন বলল যে আসলে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি ভূমিহীন, কারণ শিক্ষক সদস্য ছিল শতকরা ৫০ ভাগ। এটা মিথ্যাচার। পশ্চি মবঙ্গে দায়ভাগ রীতি অনুযায়ী উত্তরাধিকার হয়। ফলে পিতার বর্তমানে পুত্র কোনও অর্জিত সম্পত্তির মালিক হয় না-- যা মিতাক্ষ রা ব্যবস্থায় হয়। তাই একটা ছেঁদো কুতর্ক করে ভূমিহীন সদস্যদের সংখ্যা বাড়াবার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তাতে নবগঠিত প ঞ্চায়েতের শ্রেণীচরিত্রের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

এর একটা সুফল হয়েছিল। মধ্য ও উচ্চ চাষিরা মূলত উৎপাদক শক্তি নির্ভর, খাজানা নির্ভর নয়। তাই ক্ষমতায় এসে গ্রাম উন্নয়ে নর জন্য যে প্রচুর টাকা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে খরচ হতে লাগল, তার বেশ কিছু অংশ তারা নিজেদের শ্রেনীস্বার্থে 'micro public works in support of
agriculture' করতে লাগলো। যখন কৃষিতে গণবিনিয়োগ কমে, সেই সময়ে এই ধরনের, ছোট হলেও, বিনিয়োগের ফলে কৃষির অগ্রগতির সাহায্য করে। এটা প্রথমপর্যায়ের ভূমি সংস্কারের বিলম্বিত সুফল।

কৃষিতে অগ্রগতির হার নিম্নমুখী কেন ঃ

ফ্লাউড কমিশন(১৯৪০)-এর মতে বর্গ জমির পরিমাণ শতকরা ২০ ভাগ। যদিও NSSO
মতে শতকরা ৭ ভাগ। জমির অধিকারের ব্যাপারে NSSO
খুব বিশ্বাসযোগ্য নয়, একারণে য়ে উত্তরদাতারা সম্পত্তি বা জমির ব্যাপারে সরকারি সমীক্ষাকারীদের কাছে সত্যি কথা বলতে ভয় পান ----যা consumer expenditure
-এর বেলা হয় না। কাজেই শতকরা প্রায় ২০ ভাগ কৃষি জমি নথিভুক্ত বর্গাদারের হাতে থাকায় সেখানে চাষের উন্নতি করার এক টা প্রচেষ্টা শুরু হয় যতদূর পর্যন্ত শ্রম পুঁমিকে প্রতিস্হাপন করতে পারে ততদূর পর্যন্ত। সেভাবেই প্রায় দশ লক্ষ একর উদ্বৃত্ত জমি বি তরণের ফলে ভূমিহীন প্রান্তিক চাষীরা এই অগ্রগতিতে যোগ দেয়। ফলে ১৯৮২-১৯৮৩ থেকে ১৯৯২ - ১৯৯৩ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কৃষির অগ্রগতি বছরে প্রায় শতকরা ৫ /
৬ ভাগ হতে থাকে যা গত ১০০ বছরে হয়নি। কিন্তু নববইয়ের মাঝামাঝি থেকে অগ্রগতির হার শ্লথ হতে শুরু করেছে এবং কিছু অর্থনীতিবিদদের আশঙ্কা যে এররেখাচিত্র এবার সমতল হয়ে যাবে।

ফ্লাউড কমিশন ১৯৪০ সালে জমিদারি প্রথা তুলে দেবার ও বর্গাদাররের রায়তী স্বত্ব দেবার সুপারিশ করে গেছে। কিন্তু নথিভুক্ত

না হলে কাকে রায়তী সুত্ব দেওয়া হবে তা নিয়ে সংশয় থেকে যেতে পারে। কিন্তু এখন যখন ১৬ লক্ষ বর্গাদার নথিভুক্ত হয়ে গেছে তাদের রায়তী সুত্ব দিতে না পারার কোনও কারণ নেই। কিন্তু তা দেওয়া হবে না কারণ এটা মধ্যে বা উচ্চ চাষীদের স্বার্থর পরিপন্থী। গত ২৬ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি রায়তী সুত্ব না দিয়ে থাকে তাহলে আগামী ২৫ বছরেও যে এরা এটা দেবে তা মনে হয় না। মালিকানা না পেলে জমির স্থায়ী উন্নতি করা সম্ভব নয়। আজ না মালিকের ইচ্ছা আছে না বর্গাদারের ক্ষমতা আছে। বর্গাদার জমির মালিক হলে সেই জমি বন্ধক হিসেবে ব্যবহার করে দীর্ঘ পর্বের উন্নতিকরণ ঋণ (Long Term Land Improvement Loan) পেতে পারে । তা পেলেই কিন্তু আর একটা জোয়ার আসতে পারে।

আরও একটা কারণ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানিক কৃষি ঋনের অভাব। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রীর মতে এ রাজ্যের বাৎসরিক কৃষি ঋণের প্রয়োজন ১০,০০০ কোটি টাকার। কিন্তু প্রতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়া যায় মাত্র কম বেশি ৮০০ কোটি টাকার । খারাপ credit-deposit rate দেখিয়ে কেন্দ্র কেন্দ্র করে চিৎকার করে ব্যাপারটাকে গুলিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। সমবায়ের মাধ্যমে যেখানে RBI / NABARD direct credit line আছে তাকে মজবুত করার প্রচেষ্টা গত ২৫ বছরে করা হল না কেন ?
যদি মাত্র ৮০০ কোটি টাকা প্রতিষ্ঠানিক ঋণ হয়, তাহলে বাকি ৯২০০ কোটি টাকা ব্যক্তিগত উৎস থেকে আসছে। সেই উৎস চিরাচরিত সাহুকার ছাড়া উচ্চ চাষি, যাদের হাতে গত ১৫ - ২০ বছর প্রচুর টাকা এসেছে, তারাই নিশ্চয়ই এই ঋণ দিয়ে থাকে। তারাইতা পঞ্চায়েত ও গ্রামে বামফ্রন্টকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সত্যিকারের সমবায় আন্দোলন করে তাদের ব্যবসায়ে হাত দেবার সাহস কার আছে ? কিন্তু এই অবস্থা যদি শুধরানো না যায়, কৃষির অগ্রগতি প্রতিহত হবে। এবং হতে আরম্ভ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে একটি প্রধান অসুবিধা হচ্ছে জোতগুলির ক্ষুদ্রাতিকরণ (fragmentation of holding)। হরেকৃষ্ণ কোনার বা বিনয় চৌধুরী কেউ জমির একত্রীকরণের (consolidation of holding)। পক্ষে ছিলেন না। অথচ একত্রীকরণ না হলে ভালোভাবে প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব নয়। প্রতাপ সিং কায়রোঁ জোর করে পাঞ্জাবে একত্রীকরণ করেছিলেন বলে এত তাড়াতাড়ি ওখানে সবুজ বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল। বাম নেতাদের ধারণা যে জমি একত্রীকরণ করলেই ছোট ও প্রান্তিক চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ধারণার যৌক্তিকতা নেই তা নয়। তবে তাদের এরকম ক্ষতি যাতে না হয়, তার জন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার আইনে বলা আছে যে, consolidation of holding-এর প্রথমত এক হেকটর পর্যন্ত জমির মালিকদের জন্য করা হবে। এদের জমি একত্রীকরণ হয়ে গেলে যদি বড় চাষিরা একত্রীকরণ করতে চায়, তাহলে তাদের করা হবে। প্রথমেই যদি ছোট জমিগুলো একত্রীকরণ করা হয় তাহলে বড় চাষিরা পরে তাদের ঠকিয়ে ভালো জমি হস্তগত করতে পারবে না। আইনের এ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাবে এ-কাজ পশ্চিমবঙ্গে হবে না। ফলে কিছুদুর যাওয়ার পর কৃষিতে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ আর সম্ভব হবে না। ফলে বৃদ্ধির হারও পড়ে যাবে।

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে জমি ব্যবহার (land use) সম্পর্কে কোনও সুষ্ঠু নীতি নেই। যেখানে সেখানে ইঁটের ভাটা ও বালির খাদ হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪-পরগণার কিছু জায়গায় গেলে মনে হয় moonscape দেখছি। ভালো সুন্দর চাষযোগ্য জমিকে ক্ষতবিক্ষত করে যত্র তত্র ইঁট ভাটা করা হয়েছে। যেখানে ইঁট ভাটা হয়, সেখানে চাষ করা সম্ভব নয়। ইঁট ও বালির প্রয়োজন আছে। তার জন্য কি পরিবেশ সহায়ক যুক্তিগ্রাহ্য নীতি প্রণয়ন করা যায় না ? দক্ষিণ ২৪ পরগণায় প্রচুর মজে যাওয়া নদী খাল আছে। সেগুলোর মধ্যে ইঁটের ভাটা করলে নদীটার সংস্কারও হয়ে যায় এবং পাশের চাষের জমি নষ্ট হয় না। এর জন্য বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ও পরিকল্পনা করা সম্ভব, যদি ইচ্ছা থাকে। হুগলি জেলায় সরস্বতী নদী লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু শুনেছি satellite imagery -তে নাকি ঐ নদীর খাত বোঝা যায়। যদি তাই হয়, তাহলে জিটি রোডের দুধারে বালি খাদ না করে ঐ নদীর খাত অনুযায়ী খাদ করলে নদীকেও পুনরুজ্জীবিত করা যায় এবং জিটি রোডকে ধবংসের হাত থেকে বাঁচানো যায়। উত্তরবঙ্গের নতুন চা বাগান ও দক্ষিণবঙ্গের চিংড়ির ভেড়ি তো মাস্তান যার জমি তার এই নীতিতে চলছে। সরকার কোথাও আছে বলে তো মনে হয় না। জমি ব্যাবহারের ক্ষেত্রে এ রাজ্যে এক নীতিহীন নৈরাজ্য চলছে। সরকার এ ব্যাপারে কিছুই ভাবছে না। সিভিল সমাজ কী ভাবছে তা আমার জানা নেই। ভবিষ্যতে কৃষিযোগ্য জমি সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে হলে একটা বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিগ্রাহ্য পরিবেশ সহায়ক জমি ব্যবহার কার্যক্রম তৈরি করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। যাঁরা পরিবেশ নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের এ বিষয়ে অগ্রণী জনমত গঠন করার দায়িত্ব আছে।

বিশ্বায়ন ঃ বামপন্থীদল ও এনজিও

প্রদীপ বসু

:::::

তত্ত্বগতভাবে বর্তমান লেখক মার্কসবাদ ও উত্তর আধুনিক তত্ত্বের আলপচারিতায়, আদান-প্রদানে বিশ্বাসী।মার্কসবাদ নারীমুক্তির লড়াই লড়ে। বর্ণবৈষম্যের বিরোধী, জাত পাতের সংগ্রামে দলিতের পাশে। কিন্তু প্রধান জোরটা সে দেয় অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধ শ্রেণীসংগ্রামে দলিতের পাশে। অর্থনৈতিক অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না তা নয়। কিন্তু সে গুরুত্ব দেয় নতুন সামাজিক আন্দালনগুলোর ওপর, লিঙ্গ বৈষম্য, পরিবেশ দূষণ, বর্ণবৈষম্য ইত্যাদির প্রতিরোধ। বর্তমান লেখক অনুভব করে শ্রেণীসংগ্রামের সাথে নতুন সামাজিক আন্দোলনকে মেলাতে। আর এই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বামপন্থী দলের সাথে এনজিও-র হাত মেলানোর প্রশ্ন। আজকের পশ্চিমবঙ্গে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের মুখে দাঁড়িয়ে, এইকথোপকথন ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয়। যদিও মার্কসবাদ মানেই শুধু বামপন্থী দল নয়, সে ট্রেড ইউনিয়ন, কৃষক সংগঠন এমনকি সাধারণ গণ-সংগঠনকেও সংগ্রামের হাতিয়ার ভাবতে পারে। তবুও তার চোখে কমিউনিস্ট পার্টিসংগঠনের বিশেষ তাৎপর্য স্বীকৃত। আবার এনজিও মানেই তা উত্তর আধুনিক তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে তারকোনো মানে নেই। তবু এনজিও -র কাজকর্ম প্রথাগত বামপন্থী ঘরানা থেকে অনেকটাই আলাদা এটাও তো সত্যি। তাদের স্বতঃস্ফূর্ততা, শিথিল স্থানিক সংগঠন, তাৎক্ষণিক লক্ষ্য তাদের উত্তর আধুনিক তত্ত্বের কাছে বেশি প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। উল্টোদিকে অনেক এনজিও কর্মীই উত্তর আধুনিক ভাবনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ, অন্তত কিছুটা। বামপন্থীদল ও এনজিও-র কথোপকথন তাই এত মূল্যবান এত গুরুত্বপূর্ণ।

:

অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও অসংখ্য এনজিও সক্রিয় আর এইসব এন. জি. ও ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক আছে। এরা অর্থ পায় কোথা থেকে ? এদের কাছে বিদেশী ফান্ডথেকে টাকা আসে না ? নেপথ্য কারণ কী ? বিদেশী রাষ্ট্র, সরকার, বহুজাতিক সংস্থা (MNC), অর্থলগ্নী সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কী স্বার্থ যেতারা এনজিওদের পেছনে অকাতরে টাকা ঢালছে ? তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ? শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী দেশের সরকার কি বহুজাতিক সংস্থা বা বিশ্বব্যাঙ্ক নিশ্চয়ই বিনাস্বার্থে টাকা দেয় না, তারা কেউ রাজা হরিশচন্দ্র নয়,দানসাগর নয়। যীশুখ্রীষ্টও নয় যে তোমার প্রতিবেশীর দু:খে কাতর হয়ে ঝাঁপিয়ে পড় বলবে। এনজিওদের পেছনে তাদের এই ঢালাও মদতদানের রাজনৈতিক চরিত্র কী ? পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা এ প্রশ্ন তুলেছেন যে এনজিওগুলো শোষিত নিপীড়িত মানুষের মধ্যেকার ক্ষোভকে, বঞ্চনার বোধকে প্রতিরোধ ও শ্রেণীসংগ্রামে উন্নীত না করে বরং স্ট্যাটাস কুওকেই আর একটু গ্রহণযোগ্য, নমনীয় ও সহনীয় করে তুলতে চেষ্টা করে। কোনো কোনো বামপন্থী দল এনজিওগুলোকে সাম্রাজ্যবাদের দালাল পুঁজিবাদের ছদ্মবেশী মুখপত্র, বহুজাতিক সংস্থার গোপন বেতনভূক ইত্যাদি বলে গাল দিয়েছে। অবশ্য বিদেশি ফাণ্ডের টাকা নেওয়া নিয়ে অধ্যাপক কল্যান সান্যাল পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন। রাষ্টও তো বিদেশী অর্থ সাহায্য নিয়ে থাকে। সে টাকা শুধু রাষ্ট্রের সংস্থাগুলোর মারফত খরচ হয়। সেটা যদি পবিত্র নিষ্কলুক তাহলে এনজিও -র টাকায় এত কলঙ্ক কিসের? রাষ্ট্রের মাধ্যমে যে টাকা খরচ হয় তাতে পকেট ভরে প্রভাশালী অভিজাতদের। গরীবের নিচুতলা পর্যন্ত তা আর পৌঁছোয় না। তা সে টাকা এনজিও-র মাধ্যমে গেলে গরীবদের ভাগে আরও কম পড়বে এমনটা ভাবার কোনো কারন আছে কি ?

:

হ্যাঁ, এনজিওর টাকা খরচের হিসেবে স্বচ্ছতা নিয়ে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার গণতন্ত্রীকরণ বা জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে দাবি তোলা যেতেই পারে। কিন্তু সে দাবি তো সর্বাঙ্গে দুর্নীতির ঘায়ে ভরা ভারতীয় রাষ্ট্রের এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধেও তোলা হয়েছে। তাহলে রাষ্ট্রের চেয়ে এনজিও খারাপ কিসে? কল্যান সান্যাল আর একটা কথাও বলেছেন। আজকে কি আর আগের মতো অর্থনীতির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাগাভাগি করা খুব সমীচীন হবে? এখন বিশ্বায়নের যুগে একটা অখণ্ড গ্লোবাল অর্থনীতির উদ্ভব ঘটেছে। জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে উৎপাদনের ক্রিয়াকলাপ সর্বত্র ছড়িয়ে যাচ্ছে। উৎপন্ন উদ্বৃত্ত ছুটে যাচ্ছে চতুর্দিকে। এই প্রবাহ ক্রমশ : তার ভূখণ্ডগত চরিত্র হারাচ্ছে, 'স্তন্দ্ব-ব্ধন্দ্বজ্জনন্দ্রস্জন্ত্রপ্তুনস্ত্রন্দ্বস্তু' হয়ে পড়ছে। ফলে জাতীয় আয় ও উৎপাদনশীল সম্পর্কের পুনর্বন্টনের যে রাজনীতি তাকে নতুন করে সংজ্ঞা দান করা প্রয়োজন। বিশ্বায়িত পুনর্বন্টনের রাজনীতি হিসেবেইবোধহয় তাকে এবার ভাবতে হবে। বিশ্বায়ন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা অবশ্য এত গভীরভাবে ভাবতে অনাগ্রহী । একথা সত্যি বিশ্বায়নের পুঁজিবাদী বিষ ও তার কুফল নিয়ে মার্কসবাদীরা যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও তথ্যবহুল বিশ্লেষণ রেখেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তা যে জটিল ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনছে সেটার দিকে না তাকালেই তাকে আটকানো যাবে ভাবছেন। বিশ্বায়নের প্রতি এনজিওদের মনোভাব নিয়ে প্রশ্ন তোলার সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলো এই পরিবর্তনের গভীর অভিঘাত ও নতুন পরিপ্রেক্ষিতকে ভুলে যেতে পারলেই যেন বাঁচে।

:

অনেক যথার্থ প্রশ্ন সত্ত্বেও এনজিওদের সবটাই বুর্জোয়াদের চক্রান্ত বলা যাবে না। পুরোটাই ধাপ্পাবাজি বামধ্যবিত্ত বাবু-বিলাস নয়

। যাঁরা গোঁড়া অন্ধ চোখে জগতটাকে দেখেন তাঁরা অবশ্য এমনটাই ভাববেন। অতি - বিপ্লবীবায়না থেকে তাঁরা অনেকরকম বালখিল্যপনা করে লেনিন যার তীব্র সমালোচনা করেছেন। অতি - বিপ্লবী ছুৎমার্গ থেকে তাঁরাবলেন, এনজিও থেকে সাবধান। পশ্চিমবাংলার উত্তপ্ত বাম রাজনীতিতে জল ঢালতে এদের আবির্ভাব। পেছনে বিদেশী ডলার - পাউন্ড- ডায়েশ্চ মাক- (এখন) রুবল - এর গন্ধ। এদের বয়কট কর। কোনো পথভোলা বামপথিক এনজিও সম্মেলনে কি সংগঠনে যুক্ত হয়ে পড়লে এঁরা শিউরে ওঠেন। গেলগেল রব তোলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে কেউ কোনো অভিসন্ধি নিয়ে কিছু শুরু করলেই যে তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অনুযায়ী ফলাফল ঘটবে তার কোনো মানে নেই। উত্তর আধুনিকদের লেখায় এনিয়ে অনেক কচকচি হয়ে গেছে। ক্ষমতাবান যা কিছু আশা করে কোনো প্রক্রিয়া বা সংগঠন শুরু করলেও ফলাফল সেরকম নাও হতে পারে। সমগ্র প্রক্রিয়া সমগ্র সংগঠন, তাদের কর্মকাণ্ড পরিণামের ওপর ক্ষমতাবানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে এটা ভাবা ভুল। এমন হতে পারে যে একটি এনজিও গঠনের পেছনে উদ্যোগ নিল, অর্থ জোগালো কোনো বিদেশী রাষ্ট্র, যার ভাবগতিক বিশেষ সুবিধের নয়। কিন্তু ঐ এনজিও যুক্তহলেন বহু কর্মী যাঁরা একদা হয়তো প্রথাগত বামপন্থী ছিলেন। কি নকশালপন্থী। কেউ আজও মার্কসবাদী। কেউ উত্তর আধুনিক চিন্তায় প্রভাবিত। তাঁদের যৌথ প্রয়াসে ঐ এনজিও কিছু ভালো কাজ করতেও তো পারে । কিছু সমাজসেবা কিছু সংস্কার, কিছু সাক্ষরতা, শিশুশ্রম শোষণের বিরোধিতা, যৌনকর্মীদের সংগঠিত করা এমনকি সমাজ - চেতনার প্রসার ঘটাতেও পারে। পশ্চিমবঙ্গে একদা বামপন্থী পরে গান্ধীবাদী পান্নালালা দাশগুপ্তর টেগোর সোসাইটির ফর রুবাল ডেভেলপমেন্ট সক্রিয়। তার ছত্রছায়ায় অথচ পৃথকভাবে সুন্দরবনের রাঙ্গাবেলিয়াতে তুষার ও বীণা কাঞ্জিলাল গড়ে তোলেন মহিলা সংগঠন ও তৃণমূলে গ্রাম ও পাড়াভিত্তিক পরিকল্পনার নমুনা। স্বাস্থ্যের কাজ করার জন্যে সমীর চৌধুরীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে চাইল্ড ইন নিড্ ইনস্টিটিউট (CINI)। তারা গ্রামে স্বাস্থ্যকর্মী গড়তে কাজ করেছে। স্বেচ্ছায় রক্তদান আন্দোলনের জন্য তৎপর দেবব্রত রায়দের অ্যাসোসিয়েশান অফ ভালানটারি ব্লাড ডোনারস (AVBD)। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যেন মিত্রের নেতৃত্বে বেঙ্গল সোসাল সার্ভিস লিগ (BSSL) বহুদিন ধরে কাজ করেছে। সাক্ষরতা অভিযান আরম্ভ হওয়াতে তারা স্টেট রিসোর্স সেন্টার হিসেবে চিহ্নিত। তথ্য সরবরাহও ডকুমেন্টেশানে অন্যান্য সংগঠনদের সাহায্য করেছে অর্ধেন্দু শেখর চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশান এণ্ড সার্ভিস সেন্টার (DRCSC)। হস্তশিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা করতে চান তাঁদের কিছুটা হলেও সহায়তা করেছে বিক্রম ও নীলা সেন পরিচালিত স্বয়ম্ভর। এদের অনেকেব. ই অনেক কাজকর্মনিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু সবটাই শয়তানি এমন কথা ভাবার মধ্যে সেই চিরাচরিত বামপন্থী ঔদ্ধত্য ও সবজান্তাভাবটাই কি প্রকট নয়? আমরা বামপন্থীরাই সর্বহারার অগ্রণী বাহিনী, সবকিছু বুঝি আমরাই, বামপন্থীদল - অনুমোদিতবা বামফ্রন্ট সরকারের পৃষ্ঠাপোষকায় গঠিত নয় যে উদ্যোগ তা আসলে কিসের ধান্দাবাজি সব জানি। পশ্চিবঙ্গের আন্দোলনমুখী কাজ করার ব্যতিক্রমী সংগঠন জন সংহিত কেন্দ্র (JSK) গড়ে তোলেন অনুরাধা তলওয়ার ও স্বপ্ন গাঙ্গুলি। এদের প্রধান কাজ ছিল ক্ষেতমজুরেদর অধিকার নিয়ে তাঁদের সংগঠিত করা। গ্রামাঞ্চলে মহিলা নির্যাতন নিয়ে কাজ করছে হাওড়াজেলার PRIA-
কলকাতার দুঃস্থ মহিলাদের সঙ্গে বহুদিন কাজ করেছেন উইমেনস কো - অর্ডিনেশন কাউন্সিল (WCC)। এরা অল বেঙ্গল উইমেনস ইউনিয়ন (ABWU)। সাম্প্রতিককালের কানোরিয়া কারখানায় শংকর গুহ নিয়োগীর সহকর্মী প্রফুল্ল চক্রবর্তীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা শ্রমিক আন্দোলনের উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিকল্প শ্রমিক সংগঠন, শ্রমিকদের নিজস্ব নেতৃত্বে আন্দোলনের ও আলোচনার ফোরাম হয়ে উঠেছিল নাগরিক মঞ্চ। এসব কাজকর্মের সবটাইকি চক্রান্তমূলক নাকি সমাজের নিপীড়িত মানুষদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক ? প্রথাগত বামপন্থী ও বিপ্লবী বামপন্থী উভয়েরই যুক্তি, সংস্কারধর্মী কাজে মন দিলে শোষিত মানুষ আর বিপ্লবের কথা ভাবেব না। এটা ঠিকই সংস্কারধর্মী কাজের সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরতে হবে। সার্বিক ও আমূল সমাজ পরিবর্তনের কথা বলতে হবে। সে চেষ্টাএকান্তই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু প্রথমত, কোনোদিন যে বাবুটি গরীব - গুর্বো দৈনন্দিন সমস্যায়রইল না তার কাছে বিপ্লবের গল্প লোকে শুনবে কেন ? দ্বিতীয়ত, সংস্কারমূলক কাজগুলোয় যুক্ত থাকার মধ্যে দিয়ে অসংগঠিত সাধারণ মানুষ সংঘবদ্ধ হয়, আত্মবিশ্বাস পায়, চারপাশের অন্যায়ের অসহায় বলি আর না হয়ে চারপাশকে বদলানো যায় এটা বুঝতে থাকে, সংঘবদ্ধ আত্মশক্তির আস্বাদ পায়। সেটা সমাজ পরিবর্তনের লড়াইকে বরং সাহায্যই করবে। অতি সম্প্রতি খাল - পাড় থেকে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ আর্সেনিক দূষিত জল, রাজ্যের ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া স্বাস্থ্যব্যবস্থা ও সরকারী হাসপাতালের ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে কিছু এনজিও সরব হয়েছে। ডঃ কুণাল সাহাদেরে পিপল ফর বেটার ট্রিটমেন্টচিকিৎসায় গাফিলতি নিয়ে প্রতিবাদ গড়ে তুলেছে । সোনাগাছি প্রজেক্ট যৌনকর্মীদের নিয়ে কাজ করছে দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি। সক্রিয় দুর্বারের সাংস্কৃতিক শাখা কোমলগান্ধার। স্থিতাবস্থার রাজনীতিকে অনেক এনজিও আক্রমন করেছে। কায়েমী স্বার্থের ধান্দাবাজী ও নোংরা ছককে ঘেঁটে দিয়েছে। উন্নয়নকে রাজনীতি - বিহীন করে তোলার চক্রান্তকে অন্তর্ঘাত করেছে। তার একান্তভাবে রাজনৈতিক চরিত্রকে উদঘটিত করেছে। কল্যান সান্যাল লিখেছেন - “….there are numerous instances where NGOs have hit the limit of the status quo and unsettled the network of vested interests. They have subverted the project of depoliticalisation of development …” সম্প্রতি বিহারের শব্দ গাঁওতে সরিতা ও মহেশ কান্তকে প্রতিবাদী এনজিও করার জন্যে যেভাবে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তাতে এই কথার সত্যতাই প্রমাণিত হয়। বামপন্থীরা যদি জেদ করে একই কথা বলে বলেন এনজি মাত্রেই স্থিতাবস্থার দালাল তাহালে তাঁরা সবচেয়ে সহজ কাজটাই করে দায়িত্ব এড়াবেন। বাস্তব পরিস্থিতি বাস্তব বিশ্লেষণ, দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সব

কিছুতে বিচার এসব করা অনেক কঠিন কাজ, জটিল কাজ। মাথায় অনেক দায়িত্ব নিতে হয়। সাদা - কালোর বাইনারিতে ফেলে দিলে চলে না। ধূসর এলাকাকে বুঝতে অনেক সূক্ষ্ম পার্থক্য ও বহুমাত্রিকতাকে নজর দিতে হয়। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে ডবলিও. টি. ও-র স্নেহধন্য বাজার -ভিত্তিক পুঁজিবাদী এই বিশ্বায়ন পৃথিবীর মানুষের অনুভূতি মনন চাহিদা তাগিদ রুটি সংস্কৃতি নিজস্বতা সৃজনশীলতা ও নৈতিকতাকে বাজারের ছাঁচে ঢেলে নিতে সচেষ্ট । কিন্তু তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতেও জন্ম নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অনেক এনজিও। যতই বাড়ছে উচ্ছেদ, খালপাড় থেকে উচ্ছেদ, বড় রাস্তা বানানোর জন্যে, নতুন নগরীর পত্তনের কারণে, বহুতল বাড়ি নির্মানের উদ্দেশ্যে, ততই নতুন নতুন এনজিও দেখা যাচ্ছে। পরিবেশ দূষণের প্রশ্নে, জীবিকা হারানোর প্রতিবাদে গড়ে উঠেছে এনজিও। এটাও খুব লক্ষণীয় যে যেসব মানুষ আজও বিচ্ছিন্ন, অসংগঠিত আত্মবিশ্বাসহীন, যাঁরা এখনও প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত নন, তাঁদের জন্যেও বিকল্পের সন্ধান চালাচ্ছে এনজিও। নতুন নতুন সামাজিক উদ্যোগ, নতুন ধরণের ঐক্যবোধ, নতুন করে সমষ্টিগতভাবে আত্মসত্তার নির্মাণ, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার নতুন সংজ্ঞা গড়ে তোলার প্রয়াস তাদের মধ্যে। মোহিত রায় লিখেছেন, ''...অসংগঠিত মানুষের কাছেপৌঁছোছেন এন. জি. ও-রা। বামপন্থী কচকচি ছেড়ে নারী, পরিবেশ, শিশু শ্রম, ক্ষুদ্রঋণ বিভিন্ন নতুন ভাবনা নিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছেন এন.জি. ও-রা। দেড়শ বছর আগে কমিউনিস্ট ইস্তাহারে কার্ল মার্কস এসব খুচরো সংস্কারকদের ব্যঙ্গকরেছেন কারণ তারা সমাজ পরিবর্তন চায় না, তারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজ পরিবর্তনের বিরোধী।... কিন্তু মার্কস পরিবর্তনে বিশ্বাস করতেন, এখন বেঁচে থাকলে তিনি দেখতেন দেশে সংগঠিত শ্রমিক/কর্মচারীরা হয়ে উঠেছে আর এক মাফিয়া, সুবিধাভোগী শ্রেণী। তার নেতারা দুর্নীতিগ্রস্ত ক্ষমতালোভী, পেশাদার বিপ্লবী-রা হচ্ছেন সরকারী অর্থপুষ্ট, অকর্মণ্য কর্মচারীরা অধ্যাপক । তিনি সম্ভবত : ইস্তেহার সংশোধন করতেন''। এনজিও যদি অবহেলিত পদদলিত মানুষদের মধ্যে এতটুকু আত্মবিশ্বাসও জাগিয়ে তোলে বিদেশী সরকার বা বহুজাতিক সংস্থা তাতে খুশি হবে না নিশ্চয়ই। কিন্তু এনজিও -কে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে তারা নাও পারতে পারে। এনজিও এমন একটি ক্ষেত্র (Site) যেখানে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী শক্তির দড়ি টানাটানি চলা সম্ভব। চলাটাই স্বাভাবিক। বিদেশী রাষ্ট্র বা সরকার, বহুজাতিক সংস্থা (MNC)। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, পুঁজিপতি, আই এম এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক WTO, সি আই এ-র মতো গোয়েন্দা সংস্থা থেকে শুরু করে গান্ধীবাদী, বামপন্থী কর্মী মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী, উত্তর আধুনিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, উদারনীতিক, হিন্দু মুসলিম বা খ্রীষ্টান মৌলবাদী, গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ, বিপ্লবী নকশালপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ, নিছক সমাজসেবায় আগ্রহী লোক, নারীবাদী, নিম্নবর্গ নিয়ে ভাবুক দরদী, এমনকি নিছক চাকরি করতে আসা যুবক - যুবতী --- এরকম অনেক শক্তির টানা - পোড়েন ও দরকষাকষি চলার ক্ষেত্র হতে পারেএন. জি. ও। একেকটাতে একেক ধরণের শক্তির প্রাধান্য, কখনও বা একাধিক শক্তির, কখনও প্রাধান্য বদলায়, কখনও পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলির প্রায় সমান ক্ষমতা। আগে থেকে ছক কষে আছে অনেকেই। ফন্দি - ফিকির কমনেই কিছু। কিন্তু ঐসব ছক, ফন্দি অনুসারেই যে এনজিও চালিত হবে এমন ভাবা ছেলেমানুষি। ইতিহাসকে ঠিক এতটাচক্রান্তমূলক, নিয়ন্ত্রিত, সুপরিকল্পিত ভাবার দিন গেছে। শুধু যে উত্তর আধুনিক তত্ত্বে এরকম অনিশ্চয়তার দু-প্রান্ত খোলা ছাড়া - ছাড়া ভাসা - ভাসা, ছেদ - বহুল, অসঙ্গতিময় ইতিহাস চিন্তা গুরুত্ব পেয়েছে তাতো নয়। গোঁড়া ননএমন অনেক মার্কসবাদীর ভাবনাতেও দেখা যাচ্ছে শক্তিগুলোর সংঘাতের অনিশ্চিত ফলক বোঝার চেষ্টা। ইতিহাসের একমাত্রিক অমোঘ নিয়তির বিধানকে এবার একটু ভুলে থাকা দরকার। কারণ বাস্তবটা অনির্ণেয়, অনির্দেশ্য পথে চলমান। পূর্ব - স্থিরীকৃত অভিমুখ তার নেই। বিভিন্ন শক্তির টানা - পোড়েন স্থির করে দেয় তার দিক্ - নির্দেশ।

:

পশ্চিমবঙ্গের অনেক বামপন্থী প্রায়শ প্রশ্ন তোলেন এনজিওগুলো বিশ্বায়নের চালিকাশক্তিগুলির ধামাধরা। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের এরা দালাল মাত্র। কিছু কিছু এনজিওর ক্ষেত্রে কথাটা সত্য। এনজিও - দের মধ্যেকার কিছু কিছু শক্তিরচরিত্র বিশ্লেষণকরলে এমন সিদ্ধান্তেই পৌঁছোতে হয় বৈকি। এ নিয়ে গবেষণা, অনুসন্ধান, লেখালেখি বামপন্থী শিবিরে কিছু কম হয়নি। কিন্তু এনজিও-র মধ্যে অনেক বিকল্প শক্তির উপস্থিতিকে অস্বীকার করলে ভুল হবে। ঐসব শক্তির চরিত্র সামাজিকভাবে ইতিবাচক, সম্ভাবনাময়। তারা প্রভুত্ব-বিরোধী, বহুত্ববাদী, কর্তৃত্ববাদের শত্রু, ফলে গণতন্ত্র প্রসারের পক্ষে অনুকূল। কিছু এনজিও অনেক নতুন বিষয়কে তুলে ধরেছে একথা তো অস্বীকার করা যায় না। অর্থনৈতিক শোষণ ও শ্রেণীগত নিপীড়নকে মার্কসবাদ তুলে ধরেছে। আবার উত্তর আধুনিক তত্ত্ব দমনপীড়নের এমন অনেক ক্ষেত্রকে উন্মোচিত করেছে যেগুলোকে মার্কসবাদ গুরুত্ব দেয়নি। মার্কসবাদ যেমন শ্রেণীসংগ্রাম কমিউনিস্টপার্টিও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ওপর বিশেষ নজর দেয়। উত্তর আধুনিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে নতুন সামাজিক আন্দোলন এবং এনজিওগুলো। বিশ্বায়নের মধ্যে দাঁড়িয়ে এনজিওগুলো প্রশ্ন তুলেছে মানুষের জীবন বড় না বহুজাতিক সংস্থাগুলোর মুনাফা বড় ? বাজার সর্বস্ব বিশ্বায়নের বিকল্প সম্ভব নয় কি ? সিনেমা টিভি - রেডিও - সংবাদপত্র - ইনটারনেট - ভারচুয়াল রিয়ালিটি বিজ্ঞাপন - স্যাটেলাইট- ভিডিও গেম - ই মেল - চ্যাটের জগত গণ - মাধ্যমের কুহক শক্তি আর বিপুল ক্ষমতাতন্ত্র কি আমাদের রুচি চাহিদা তাগিদ সংস্কৃতিকে সৃষ্টি করে চলবে ? মানুষের নিজস্ব ও স্বয়ংশাসিত সংস্কৃতির অস্তিত্ব কি তবে বিপন্ন? খাদ্যের ওপর তার ব্যবহারকারী অধিকারর বড় না কি খাদ্য - ব্যবসায়ীদের স্বার্থ বড় ? রাজনৈতিক আন্দোলনকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলো কি চিরকাল অবহেলিতই থেকে যাবে? লিঙ্গগত ও ভাষাগত বৈষম্যের বলি প্রান্তিক মানুষদের স্বাধিকার, উপজাতিদের দাবি - দাওয়া মনোযোগ পাবে কি কোনও দিন ? জল, জমি ও জঙ্গলের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে যেসব মানুষ, যারা বেঁচে অ

াছে এরইমধ্যে যারা ব্যবহার করছে এদের , তাদের স্বার্থ ও অধিকার স্বীকৃতি পাবে কবে? তাদের চেয়ে কেন বড় হয়ে দেখা দেবে জ ল, জমি ও জঙ্গল নিয়ে বেড়ে ওঠা বাণিজ্যিক স্বার্থ? বিশ্বায়নের নীতি যদি অবাধ প্রতিযোগিতা তাহলে আমেরিকা ও ব্রিটেনে বিজে নস আউটসোর্সিং নিয়ে কোলাহল কেন? বিশ্বায়ন চলবে আর জাতি - রাষ্ট্রও আগের মতোই সার্বভৌম থাকবে তা কি করে হবে? বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় পণ্যের গুণগত মান হবে বিচার্য। যার মান যত উন্নত সেই পণ্য তত বাজার পাবে, মুনাফা লুটবে। কিন্তু ডারউইনের যোগ্যতমের উদ্বর্তন (survival of the fittest) - এর এই বিশ্বায়িত তত্ত্বে দুর্বলদের কী হবে? বৃদ্ধ, অসুস্থ, প্রতিবন্ধী শুধু নয়, যারা গরীব, অশিক্ষিত, প্রান্তিক মানুষ প্রশিক্ষ ণ - বঞ্চিত, প্রযুক্তি-নিরক্ষর, তথাকথিত নিচু জাতের, দলিত, নিম্নবর্গ নারী, যৌনকর্মী, উভলিঙ্গ, পথশিশু, উদ্বাস্তু, খালধারের ঝুপ ড়ির মানুষ, ফুটপাতের অসংগঠিত হকার, অসংগঠিত শ্রমিক, ছিন্নমূল কৃষক, অদিবাসী? তাদের সামাজিক সুরক্ষা, ভবিষ্যতের নিরা পত্তা কোথায় ? স্বল্প সঞ্চয়ের সুদ কমে যদি মধ্যবিত্তেরই মাথায় হাত, তাহলে এসব নিম্নবিত্তের হাল কী হবে? পণ্যের গুণমান কদর পাবে ভাল কথা। কিন্তু যারা দীর্ঘ কাল ধরে শোষিত, একদা উপনিবেশ, সেই সব কৃষিপ্রধান গরীব তৃতীয় বিশ্বের দেশ তো আগে থে কেই পিছিয়ে পড়া তাদের প্রযুক্তি নিম্নস্তরের, পুঁজি আর তার মেধা আমেরিকায় রপ্তানি হয়ে যায়। তার মেশিনের মান নিচু। তাহে ল তার পণ্যের গুণমান উঁচু হবে কী করে? বিশ্বায়নকে ঘিরে এসব প্রশ্ন কিন্তু শুধু বামপন্থীরাই তোলেন নি, অনেক এনজিও -র মধে ্য থেকে একই প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা গেছে। হয়তো বিশ্বায়নের সর্বব্যাপী অক্টোপাসের জাল বামপন্থী দল থেকে এনজিও সকলের গ লাতেই কঠিন ফাঁস হয়ে উঠবে। আর সেখানেই যৌথ আন্দোলনের সম্ভাবনা জন্ম নিচ্ছে ভ্রূণ আকারে। এই মুহূর্তে এনজিও উত্তর আধুনিক ভাবুক, নয়া সামাজিক আন্দোলন (New Social Movements)--এসব থেকে বিশ্বের নানা প্রান্তে নতুন নতুন আওয়াজ উঠছে পশ্চিমী আধুনিকতার প্রভুত্ব ও ক্ষমতার স্বরূপ আজ উন্মোচিত, ভারী শিল্পায়ন বাজার ও বিপণন ভিত্তিক এ দুনিয়ার বিকল্প দুনিয়া গড়তে হবে। বড় শিল্পের বদলে চাই ছোট শিল্পের বি কাশ। কুটির শিল্প, গ্রামীণ শিল্প, স্ব - নিযুক্তি, স্বয়ংভরতা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। বড় বড় বাঁধ নয়, চাই ছোট বাঁধ। বিশ্বা য়নের কাঠামোর মধ্যে একটা বড় প্রবণতা হল হোমোজেনালাইজেশান। যদিও একে দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখে বহু জাতিক সংস্থা বিশ্বজোড়া ভোগ সে বৈচিত্রের গলা টিপে ধরতে বাধ্য। কোকাকোলার, পেপসির বিজ্ঞাপনে আদিবাসী মানুষের রুচি - সংস্কৃতির স্বীকৃতি আছে। কিন্তু পণ্যটাতো সেই কোকাকোলা কি পেপসিই। মার্কিনি গণতন্ত্রকে ইরাকে, আফগানিস্তানে, সিরিয়াতে, কিউবা ও উত্তর কোরিয়ায়, ইরান, লেবানন, লিবিয়ায় রপ্তানি করতে উঠে পড়ে লেগেছে বিশ্বায়ননের মাতববররা। প্রয়োজনে নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করে অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করতেও তার আটকাবে না। ম্যাকডোনাল্ডের চিকেন ঠ্যাং চিবোও, মার্কিন - অস্ত্র কেনো, বুশের মডেলে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা ভোগ করো, এসো, বিশ্বায়িত হও। এই হোমোজেনাইজেশনের বিরুদ্ধে উত্তরআধুনি ক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ইজেশনের বিরুদ্ধে উত্তর আধুনিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এনজিও কর্মীরা যে বামপন্থীদের পাশে দাঁড়াবে ন সে সম্ভাবনা কিন্তু দিনকে দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বামপন্থী পশ্চিমবঙ্গেও যে বিশ্বায়ন আমরা এখন দেখছি তার প্রধান চালিকা শক্তি হল বিশ্বায়িত পুঁজি (Global capital)। আফগানিস্থান ও ইরাকের যুদ্ধ, কোরিয়া, সিরিয়া, ইরান, কিউবার উদ্দেশ্যে হুমকি দেখায় এই বিশ্বায়নেবলপ্রয়োগ বিশেষ ভূমিকা। বিশ্বায়নে নিজের স্বার্থ বাধা পেলে একমাত্র সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চোখ বুজেঘুমোবে একথা ভাবার কোনো কারণ সত্যিই নেই। কিন্তু এর সাথে সাথে এটাও বোঝা দরকার যে এই বিশ্বায়নে বিশ্বায়িত পুঁজি, বহুজাতিক পুঁজি সবটাই বলপ্রয়োগের ওপর নির্ভর করে নেই। একই সাথে সে মানুষের মনন-রুচি, সংস্কৃতি, চাহিদা অভাব বোধ, কামনা - বাসনা, স্বপ্ন নির্মান করে । ক্ষমতার পেছনে শাসিতের সম্পত্তি নির্মাণ করে। গেঁথে তোলে মতাদর্শগত আধিপত্য (Ideological hegemony)। গ্রামশির তত্ত্বে আমরা এর চিত্তাকর্ষক ব্যাখ্যা পাই। হেজিমানিকে বাদ দিয়ে বলপ্রয়োগ বা প্রভুত্ব (demination) স্থায়ী, মজবুত ও সাশ্রয়ী হয় না। বাঙালীর আকাঙ্খা ও স্বপ্ন আজ অনেকটাই বিজ্ঞাপন, টিভি, সিনেমা, কেবলটিভির মাধ্যমে পণ্যভিত্তিক, পশ্চিমী আধুনিকতাবাদী, উন্নয়ননির্ভর, শিল্পায়নমুখী, ভোগবাদী হয়ে উঠেছে। আরও পণ্য, আরও ভোগ, কালার টিভি, ফ্রিজ, ঝকঝকে মোটরবাইক, চকচকে গাড়ি, বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, ওয়াশিং মেশিন, এ. সি। এগুলো মানেই উন্নতমানের জীবন, যাপনের উৎকর্ষ। এগুলোর মধ্যেই জীবনের সার্থকতা, অর্থপূর্ণতা। পুঁজিবাদী বাজার ও বিশ্বায়ন এই জীবনবোধকে আমাদের মধ্যে সংক্রামিত করছে। পশ্চিমবঙ্গে গত ২৬ বছরের বামফ্রন্টের নিরবচ্ছিন্ন শাসন সত্ত্বেও। প্রথাগত সরকারমুখী নির্বাচনসর্বস্ব বামফ্রন্টের নেতাদেব . সুচতুর সুবিধাবাদী ঝোলাতে পুঁজিবাদ - বিরোধী বস্তাপচা ধারহীন আড়ম্বরপূর্ণ শ্লোগান যেমন আছে তেমনি ভোগবাদী জীবনবোধ ও সেখানে বহু ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। অন্যদিকে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের ফলে হিসেবে বন্ধ কারখানার বহু শ্রমিক আত্মঘাতী। তাদের স্ত্রী, শিশু - সন্তান অনাহারে মরছে। আসলে আজকের বিশ্বায়নের সঙ্গে জড়িয়ে আছেবুশের আমেরিকা, বহুজাতিক সংস্থাগুলো, একচেটিয়া পুঁজির আগ্রাসন, বিশ্বব্যাঙ্ক সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ আই এম এফ ও সর্বোপরি W. T. O.। অর্থনৈতিক ও শ্রেণীগত শোষণ, পুঁজিবাদী লুন্ঠনের এই বিশ্বব্যাপী আয়োজনে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদে যে ক্রমশ : নতুন শক্তিসঞ্চারিত হবে একথা বলাই বাহুল্য। প্রথাগত বামপন্থী আন্দোলনে ভাঁটা সৃষ্টি হয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বিশ্বায়নের অর্থনীতির ভয়াবহ পরিণামে তৃতীয় বিশ্বে দারিদ্রও হাহাকার ব্যাপকতর হয়ে উঠবে। লক্ষলক্ষ শ্রমিক ও কৃষকের বেকারত্ব, বুভুক্ষা শ্রেণীসং

গ্রামে জোয়ার আনবে এটা আশা করাটা আর স্বপ্নবিলাস নয়। ইতি মধ্যেই তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে ছাঁটাই, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, মজুরি হ্রাসের বিরুদ্ধে ধর্মঘট, বিক্ষোভ আন্দোলনছড়িয়ে পড়ছে। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে বা মফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন থাকলে কি হবে সে তো বিশ্বায়নের পুঁজিবাদী শোষণকে ঠেকাতে পারবে না, বরংগদীতে থাকতে গেলে তাকে বিশ্বায়নের যন্ত্র হয়ে উঠতে হবে। ফলে পশ্চিমবঙ্গেও দারিদ্র্য ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে অচিরেই গড়ে উঠবে তীব্র শ্রেণীসংগ্রাম। এই পরিপ্রেক্ষিতকে মাথায় রেখে আমরা ভাবতে চাই এক নতুন মেলবন্ধনের কথা। শ্রেণীসংগ্রামের সাথে নতুন সামাজিক আন্দোল নগুলোর, বামপন্থী দলের সাথে এনজিওর, ছাঁটাই-বিরোধী বিক্ষোভের সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনের, মার্কসবাদী তত্ত্বের সাথে উত্তর আধুনিক ভাবনার।

:

সন্দেহ নেই এমনকি বামফ্রন্ট - শাসিত পশ্চিমবঙ্গেও বেশ কিছু মানুষ প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ। প্রথাসি দ্ধ রাজনীতিতে এমনকি নির্বাচনে অংশ নিতেও অনেকে অনাগ্রহী। কংগ্রেস কি তৃণমূল, এমনকি বামপন্থী দলগুলোর ওপরে অনেক আস্থা হারিয়েছে। মাঝখান থেকে সুপ্ত ও গভীর মুসলিম - বিদ্বেষকে খুঁচিয়ে উগ্র হিন্দুসাম্প্রদায়িক বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আর বিজেপি সমর্থন বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর যে নিজেদের সুবিধাবাদ, গদীর লোভ, ধান্দাবাজি, ভোট - সর্বস্ব রাজনীতি, দলীয় সংকীর্ণতা ও স্বজনপোষণ ছেড়ে নিপীড়িত সাধারণ মানুষের জন্যে সত্যিই কিছু করবে সেরকম আশ া আর বেশি লোক করে না। রাজনৈতিক দলের সাম্যনীতির প্রতি শ্রদ্ধা কই? যতই পরিচ্ছন্ন দুনীতিমুক্ত দলীয় নীতির কথা বলা হো ক না কেন, রাজনীতিতে স্বচ্ছতা কোথায়? জনসাধারণের সঙ্গে পার্টির, নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাধারণ কর্মীদের , পার্টি আমলাতন্ত্রের সা থে অসংগঠিত মানুষদের, উচ্চ কমিটির সাথে নীচু তলার কমিটিগুলোর কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে জেলা ও আঞ্চলিক নেতাদের সহ জয়া প্রত্যক্ষ, সরাসরি, অসঙ্কোচ ও বাধাহীন দেওয়া নেওয়া চলে কই? জনগণের প্রতিনিধি বলে তারা নিজেদের দাবি করলেও জন গণের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার চিহ্ন মেলে না। পার্টিগুলো প্রকৃতিগত ভাবেই এত শৃঙ্খলাপরায়ন হতে চায়, একধর্মীতা ঐক্যমত ও সমসত্ত্ব চরিত্র নিয়ে এত গর্ববোধ করে, নিজেদের মতাদর্শগত বিশুদ্ধতার বড়াই করে, মতপার্থক্যকে চেপে যেতে চায়, যে ভিন্নতা ও পার্থক্যকে তারা মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত। উত্তর আধুনিক ভাবনায় যে ভিন্নত্বকে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে তার একটা বড় কারণ মা র্কসবাদী পার্টিগুলোর ঐক্য নিয়ে আদিখ্যেতার প্রবণতা জন্ম নিয়েছে বলে উত্তর আধুনিকতা বিশ্বাস করেন। এমন কি বামপন্থী দল ি নজেকে সবচেয়ে গণতান্ত্রিক বলে দাবি করে তার মধ্যেও দেখা যাবে বহু স্বরের উপস্থিতিকে অস্বীকার করার প্রয়াস।

:

বামপন্থীরা বিশ্বায়নের কুফল নিয়ে কার্যকরী বিরোধিতা ও আন্দোলন গড়ে তোলেন নি। বরং নেহাত গতানুগতিক তাঁদের ব্যাখ্যা ও বিবৃতির পর বিবৃতিদান। পশ্চিমবঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। তার ফলে অল্প কিছু নতুন ক্ষেত্রেকাজের সুযোগ বেড়েছে। কি ন্তু অন্য বেশ কিছু ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ সঙ্কুচিত হয়েছে। অফিসে কারখানায় একটি কম্পিউটার বসানো হলে সেখানে একজন নত ুন কম্পিউটার অপারেটার চাকরি পাবে। স্বভাবতই আর যে ১০/১২ জন কেরাণী বা শ্রমিক কাজ করত তাদের কাজগুলো কম্পিড ্টার করে দেবে। ফলে সেসব লোকের ছাঁটাই অবধারিত। তাছাড়া বিশ্বায়নের তথ্য প্রযুক্তি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামাজিক ও ভাব াদর্শগত সাংস্কৃতিক ও চিন্তনগত ক্ষেত্রেও অনেক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। সম্প্রতি একটি বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অ ধ্যাপকদের হোস্টেলের গল্প শুনছিলাম -- কিভাবে পাশের ঘরের সহকমীর সাথে গল্প না করে একজন তাঁর অবসর সময়ে নিজের ঘরে ক্রমাগত কম্পিউটার চ্যাট করে চলেন। এই নিয়ে প্রচলিত বামপন্থী দলগুলোর ভাবনা খুবই অনুর্বর, একঘেয়ে, বস্তাপচাছকের বাইরে ভাবনা তাঁদের নেই। তাই এসব সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত বলেই তাঁরা খালাস। চতুর্দিকে বিশ্বায়নের ফলে কারখানায় লক আ উট, ভি আর এস কিংবা গোল্ডেন হ্যাডশেক, ছাঁটাই। সরকারের ভর্তুকি বন্ধ। হাসপাতাল, ডাক, পরিবহন, ওষুধ, চিকিৎসা, রাষ্টায় ত্ত শিল্প, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, টেলিকম, হাউজিং সর্বত্র বেসরকারীকরণের উদ্যোগ। হাজার হাজার মানুষের কর্মচ্যুতি, টাকা ব্যয় কে র চলেছে কেন্দ্রের বিজেপির জোট সরকার। এসব অনেক কিছুআগেও ছিল। তবে এখন তা সামাজিক ও মতাদর্শগত বৈধতা নিয়ে আত্মবিশ্বাস ভরে যৌক্তিকতার দাবি তুলে উপস্থিত। আদর্শগত সে বৈধতা নৈতিক সমর্থন, যৌক্তিকতা ও ন্যায্যতা জোগাচ্ছে বিশ্বায় ন। অথচ পশ্চিমবঙ্গের কোনো রাজনৈতিক দলই এ প্রশ্নে ইতিবাচক বিকল্প কিছুর সন্ধান দিতে এখনও পর্যন্ত পেরে ওঠে নি। মানুষে প্রসাসিদ্ধ বামপন্থার থেকে প্রত্যাশা আর করে না।

:

প্রথাগত রাজনৈতিক দলগুলোর সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ তেমন শ্রদ্ধাবান নন মোটেই। ক্ষমতাসীন বামপন্থী দলগুলি বি শেষত প্রথান দল হিসেবে সিপিআই (এম)- মাতববরি, ক্ষমতার একচেটিয়া মালিকানা ভোগ করা,সকলের ওপর কর্তৃত্ব ফলানোর তাঁদের উৎসাহ। অনেকে একথা বলে ফেলেছেন। যে অতীতে কংগ্রেস যেরকম ক্ষমতার মদমত্ত ছিল আজকে দীর্ঘ ২৬ বছর ক্ষমতায় থেকে সিপিএম নেতৃত্বও তা কিছু কম নয়। যতদূর সম্ভব বিকেন্দ্রায়িত করতে হবে। কেন্দ্রের উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী বিজেপি আর তার ধর্মধরা এ রাজ্যের তৃণমূলের থেকে বামপন্থী দলকে যদি স্বতন্ত্র রাজনীতি করতে হয় তাহলে তাকে উত্তর আধুনিক ভাবনার স াথে আদানপ্রদান করতে হবে। আর সেক্ষেত্রে এনজিওগুলোর সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন। পার্টি বা ট্রেড ইউনিয়নের

মতো প্রথাগত বামপন্থী সংগঠনের বাইরেও ভাবতে হবে, এনজিওগুলো সংগ্রামের যে নতুন ক্ষেত্রে (site) সৃষ্টি করেছে সেখানে স ক্রিয় হতে হবে। প্রথাসিদ্ধ ও গতানুগতিক রাজনৈতিক সংগঠনের বাইরে নতুন সামাজিক আন্দোলনগুলি গড়ে উঠছে। নারীর অধি কার নিয়ে লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠছে। পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে পরিবেশবাদী আন্দোলন চলছে। শব্দদূষণ নিয়ে পশ্চিম বঙ্গে কম লড়াই হয়নি। খবরের কাগজে আমরা এ লড়াইয়ের প্রথম শহীদদের কথা জেনেছি। কিছু কিছু এনজিও কলকাতা ও অন্য শহরে দৃশ্যদূষণ রোধে সক্রিয়। দেওয়ালে সুন্দর ছবি আঁকা, সবুজায়ন, বাগান, ফুলগাছ রোপন এসব কাজ করছে কেউ কেউ। পে ট্রলের ধোঁয়া, কারখানার গ্যাস সম্পর্কে সচেতন করছে মানুষকে। বিজেপি সরকারের সদম্ভ পারমাণবিক বিস্ফোরন ও আণবিক দূষ ণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শোনা গেছে কলকাতায়। সেখানে বামপন্থী দল, ট্রেড ইউনিয়ন যেমন ছিল। বিভিন্ন এনজিওর কণ্ঠস্বরও শোন া গেছে। যুদ্ধ - বিরোধী প্রতিরোধ আন্দোলনে বামপন্থী দলগুলোর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বিভিন্ন এনজিও-র অশংগ্রহণ ঘটে ছে। আমেরিকার আফগানিস্থান আক্রমণ ইরাক যুদ্ধ, এমনকি কার্গিল যুদ্ধ নিয়েও প্রতিবাদী আওয়াজ উঠেছে। গুজরাতের মুসলিম - নিধন নিয়ে শুধু বামপন্থী দলগুলির মিছিল নয়, অসংখ্য এনজিও প্রচার পুস্তিকা বার করেছে। গুজরাতের দাঙ্গাপীড়িত এলাকায়, ত্রান শিবিরে গেছে। কেউ কেউ ডকুমেন্টারি ফিল্ম তোলায় ও তার প্রদর্শনে উদ্যোগ নিয়েছে। কেউ অর্থসংগ্রহ করেছে. ধর্ষিতা মুস লিম নারীদের হয়ে মানবাধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছে, আদালতে গেছে। নারীবাদী এনজিওগুলোর ভূমিকা এখানে লক্ষণীয়। প শ্চিমবঙ্গের বানতলা ধানতলায় নারী-লাঞ্ছনা নিয়েও তারা সরব। আবার কলকাতা সহ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অত্যাচারি ত যৌনকর্মীদের নিয়ে সংগঠিত প্রতিরোধ গড়েছে কেউ। এনেছে সচেতনতা, জাগিয়েছে অধিকাররোধ। পুলিশ, মস্তান, মাসি, পাটিব . দাদাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত করেছে তাঁদের । যৌনকর্মীদের মধ্যে এড্স - সচেতনতা এনেছে. তাঁদের শিশুদের লেখাপ ড়ার ব্যবস্থা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে অনেক এনজিও পথশিশু ও অনাথ শিশুদের লেখাপড়া শেখাচ্ছে অভিনয় - আবৃত্তি - গান - অঙ্কনে র শিক্ষা দিচ্ছে। কার্ড তৈরি করে বিক্রি করছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যে জেলায় জেলায় পাঠশাল া চালাচ্ছে কেউ। কেউ স্বনিযুক্তি স্বয়ম্ভরতা, কর্মনিযুক্তির উদ্যোগ নিয়েছে। সমকামী বা উভলিঙ্গদের অধিকার নিয়েও কোনো কো না এনজিও সক্রিয় । এসব এনজি-র পাশে বহু স্থানীয় মানুষ যেমন আছেন তেমনি আবার বিদেশী দাতাসংস্থাও আছে। কারা কীভা ব এই ক্ষেত্রগুলোকে ব্যবহার করবে সেটা অনির্ধারিত। অনেকরকম লড়াই, দরকষাকষি, টানাপোড়েন, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এসব এনজিও তে নিরন্তর প্রবহমান। বিশ্বায়নের এই পশ্চিমবঙ্গে শুচিবায়ুগ্রস্ত বামপন্থীরা এনজিওগুলোকে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ছেড়ে দিয়েনি জদের সতীত্ব অটুট রাখতে চাইলে ভুল হবে। বরং একদিকে তাঁদের উচিত উত্তর আধুনিক ধ্যান - ধারণার সাথে তাত্ত্বিক আদানপ্রদ ান চালানো। অন্যদিকে এনজিও - গুলোতে যোগ দেওয়া, সেখানকার জনবিরোধী শক্তিগুলোকে পরাজিত করা, তাদের গণতান্ত্রিক, বহুত্ববাদী, ভিন্নতামুখী প্রবণতাকে তাদের নিজের মতো করে বাড়তে দেওয়া। যে ভিন্নতা ও বহুত্ব জনসাধারণের স্বার্থ ও অধিকারে ক ক্ষুণ্ণ করে না, কর্তৃত্ব ও দমন চালায় না, ক্ষমতাতন্ত্রের সেবাদাস হয়ে পড়ে না, সেই ভিন্নতা ও বহুত্বকে সম্মান করতে হবে বামপন্থ ীদের। সেখানে অপার্টি, অবামপন্থী, অমার্কসীয় বলে ভিন্ন শক্তি ও মতকে অবজ্ঞা করলে হবেনা।দমন করলে চলবে না। জনসাধারে ণের মধ্যেকার ভিন্ন মতকে, অপর বিশ্বাসকে, বহুত্বকে শ্রদ্ধা করতে হবে আন্তরিকভাবে। শুধু ক্ষমতাদখলের রণকৌশলগত প্রয়োজনে মাত্র নয়। প্রথাগত মার্কসবাদের হোমোজেনাইজেশান নিপীড়িত মানুষের কল্যাণ তো করেই নি, বরং ক্ষমতাতন্ত্র ও কর্তৃত্ববাদের হা তকেই শক্ত করেছে এটা বুঝতে হবে। এনজিও সম্পর্কে বামপন্থীদের সাধারণভাবে যে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও অনাস্থা আছে তাকে প্রশ্র য় দেওয়া যাবে না। বরং এনজিও যে ক্ষমতা - দ্বন্দ্বের মল্লভূমি, রণক্ষেত্রে সেটা খেয়াল রাখা দরকার। একটা রাজনৈতিক দল কি এ কটা ট্রেড ইউনিয়ন, একটা গণ - সংগঠন বা ছাত্র - সংসদ, কৃষকসভা সবই কি ক্ষমতার রণক্ষেত্র নয়? পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগু লোকে সততা ও গুরুত্ব সহকারে এনজিওর সাথে আলাপচারিতা গড়ে তুলতে হবে। কল্যান সান্যালের সাম্প্রতিক এই মন্তব্যের সা থে আমরা একমত যে, “Only on honest and serious engagement by the leftist parties with the NGOs can open up new terrains of political praxis which will bring into visibility new forms of contestation.’ এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বাস্তব ঐতিহাসিক ঘটনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে বাধ্য। শ্রীসান্যালের উ পরোক্ত বক্তব্যকে স্বপ্নবিলাস বা অবাস্তব চিন্তা বলে যাঁরা হেসে উড়িয়ে দিতে চান না,তাঁদের কাছে সাম্প্রতিক এই ঘটনার তাৎপর্য গভীর, তা সে তিনি মার্কসবাদী হোন কি উত্তর আধুনিক, গ্রামশিপন্থী অথবা নকশালপন্থী। এ বছর (২০০৪) বিশ্বায়ন বিরোধী ওয় ার্ল্ড সোসাল ফোরামের সম্মেলন হল মুম্বইতে ১৬ থেকে ২১ জানুয়ারি। ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের বাজারমুখী বিশ্বায়নের সূত্রায . ণে আস্থাহীন মানুষ বরং সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা বলে ২০০১ সালে ওয়ার্ল্ড সোসাল ফোরামের আয়োজন করে। ব্রাজিলের ে পার্তো আলেগ্রে শহরে প্রথম ৩টি বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শুরু হয় আঞ্চলিক ফোরাম। এবার মুম্বইতে তার ৪র্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধ ও বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে যে সব সংগঠন বা গোষ্ঠী সরব তারই এতে যোগ দিয়েছে।

:

আশার কথা এটা যে, রাজনৈতিক দল নয়, থাকবে গণ - সংগঠন -- এই শর্ত মেনে এই ফোরামে উপস্থিত সিপিআইএবং সিপিআই এম। বিশ্বায়ন - বিরোধিতার এঁরা ফেরামের সাথে গলা মিলিয়েছেন। অনেক রকম মত - পার্থক্য থাকলেও এবং তাঁদের শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গে অনেক এনজিও-র প্রতি তাঁরা দুর্ব্যবহার করলেও এই ফোরামে যোগদান তাঁদের তরফ থেকে একটা ইতিবাচক নমনীয়

তার পদক্ষেপ। এই ফোরামে আরও গেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভনামের একটি জোট। বামফ্রন্ট শাসনাধীন পশ্চিমবঙ্গ যে আল াদা কিছু নয় এই বলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির চারটি ক্ষেত্রে সরকারের বাজারভিত্তিক বিশ্বায়নের নীতির প্রভাব নিয়ে প্রচার করতে গেছেন তাঁরা। সেই চারটি ক্ষেত্র : নগরায়ণ ও উচ্ছেদ, গ্রামীণ অর্থনীতি, শিল্পনীতি, স্বাস্থ্য - শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয় হ্রাস। সংহ ত ও প্রতিরোধ মঞ্চ কানোরিয়া --- চাবাগান - ট্যানারি ও অন্য বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে ভাঙন দুর্গতদের নিয়ে গিয়েছেন। ে গছে নাচ, গান, নাটক, ভিডিও। সংলাপ ও জবালার শিশুশিল্পীরা, গানের দল ইপিল। রাজনৈতিক দল আর এনজিওগুলোরএই সা মান্য আদানপ্রদান ভাল। এতে ছুৎমার্গ কমবে, বামপন্থীদের জাত যাবার ভয় কমবে। শ্রেণীসংগ্রাম আর নতুন সামাজিক আন্দোলনে র পরস্পরের মধ্যে চেনাপরিচয় হবে। সেটাই বা আজ কম কি? কে বলতে পারে এভাবেই একদিন ধীরে ধীরে বিকল্প রাজনৈতিক প্র ক্রিয়া হয়তো শুরু হবে, বামপন্থী পার্টি ও এনজিও--- উভয়ের মধ্যেই কর্তৃত্বপরায়নতা কমছে, সমতা- শুরু হবে, -- স্বচ্ছতা বাড়বে, ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা, বহুত্বের প্রতি মর্যাদা, সহণশীলতা, অপরের প্রতি দায়বদ্ধতা, ক্ষমতাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বৃদ্ধি পাবে। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে বিশ্বায়ন যদি জাতি - রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে দুর্বল ও ভেদ্য করে তোলে, বিশ্ব পুঁজির বিজয়রথ যদি জাতি - রাষ্ট্রের সীমান্তকে অবলীলাক্রমে টপকে যায়, তাহলে তার বিপরীত শিবিরেও জন্ম নিচ্ছে ওয়ার্ল্ড সোসাল ফোরামের মতো সংগ ঠন যা বিশ্বব্যাপী অজস্র এনজিও নিয়ে গড়ে উঠেছে যা একইভাবে জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানাকে অতিক্রম করে অসংখ্য প্রতিরোধ সংগ্র ামের এক বিশ্বায়িত মঞ্চের আবির্ভাবপর্বকে চিহ্নিত করছে। বামপন্থীদের কাছে এই মুর্হূর্তটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে, ডাবলিউ এস এফের কাছে যেতে হবে, এনজিওগুলির সাথে গড়ে তুলতে হবে আদানপ্রদান,কথোপকথন, আপালচারিতা। মুম্ব ইতে ওয়ার্ল্ড সোসাল ফোরামের সম্মেলনে বিকল্প বিশ্বায়নের মঞ্চে সীমিত ও দ্বিধাজড়িত হলেও একধরণের মেলবন্ধনের প্রয়াস বাত স্ব তাগিদেই গড়ে উঠেছে। সে মেলবন্ধন বামপন্থী দল ও এনজিওগুলোর মধ্যে। বামপন্থী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলোর সাথে বর্ণবৈচিত্র্যময় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর আলাপচারিতা এই উদ্বোধন শুধু মাত্র নয় ঐতিহাসিকভাবে প্রয়োজনীয়। ১৮ই জানুয়ারি প্রকাশিত একটি সংবাদ অনুযায়ী কিছুদিন আগে সিপিআইএম দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসকে জিজ্ঞেস করা হে য়ছিল, মেধা পটেকর, অরুন্ধতী রায়দের আন্দোলনও তো গরীব মানুষদের নিয়েই। তাহলে বামপন্থীরা তাঁদের সঙ্গে হাত মেলান না কেন? অনিলবাবু উত্তর দেন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক দলের মেলবন্ধন অসম্ভব। কিন্তু মুম্বইতে ওয়ার্ল্ড সোসাল ফোরামের মঞ্চে সেই অসম্ভবই সম্ভব হতে চলেছে। শ্রমিক ইউনিয়নগুলি থাকলেও এতদিন মূলত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠকরাই বিশ্ব সা মাজিক মঞ্চের অরাজনৈতিক চেহারাকে ধরে রেখেছিল। এবার সেই মঞ্চে বামপন্থীরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। গতকাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠ ানে সমভানেত্রী ছিলেন লক্ষ্মী সায়গল ও বক্তাদের মধ্যে শাবানা আজমি, দুজনেই সি পি এমের ঘরের লোক বলে পরিচিত। তাছাড় া এই কদিনে এখানে বিভিন্ন বিষয়ে দফায় দফায়যে আলোচনাচক্রের আয়োজন হয়েছে, সেখানেও বক্তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন ি সপিএমের প্রকাশ কারাত, সীতারাম ইয়েচুরি, বৃন্দা কারাত, প্রভাত পট্টানায়ক, উৎসা পট্টানায়, অভিজিত সেন, জয়তী ঘোষের। দি ল্লর জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বামপন্থী অধ্যাপকই এখানে হাজির। রয়েছেন সিপিআইয়ের এ বি বর্ধন।, ভি রাজা- ও আহ্বায়ক কমিটির অন্যতম কর্তাব্যক্তি হিসাবে রয়েছেন সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বরদারাজন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছেন চিত্তব্রত মজুমদার ও শ্যামল চক্রবর্তী। তবে সম্মেলনের শর্ত মেনেই এঁরা কেউই দলীয় পরিচিতিতে আসেন নি, এসেছেন ট্রেড ইউ নিয়ন বা অন্যান্য গণসংগঠনের প্রতিনিধি হিসাবে। সিপিএম সাংসদ নীলোৎপল বসু এসেছেন। তাঁর দায়িত্ব সামাজিক মঞ্চের সংসদ ীয় কমিটি গঠন করে তার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের সদস্যদের জড়ো করা (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮.০১.২০০৪)। এখ ানে আরও লক্ষনীয় যে এবারই প্রথম কিউবা, ভিয়েতনাম এবং ইউরোপে মোট ২২টি কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি এই সম্মেলনে ড ুপস্থিত। নিজেদের বক্তব্য জানাতে তাঁরা একটি আলোচনাচক্রও করেছেন। তার শিরোনামা--- সমাজতন্ত্রের সামনে আজকের দিনে র চ্যালেঞ্জ। তার সভাপতি সিপিআই-এর সাধারণ সম্পাদক এ. বি. বর্ধন। আবার পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নেতা কানু সান্যালের সহযে াগী সুবোধ মিত্ররা অনেকেই দল বেঁধে সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছেন। এতদিন এনজিও সম্পর্কে বিরূপ থাকলেও এবার কেন মত বদ লাচ্ছে বামপন্থী দলগুলি? এবার প্রশ্নের জবাবে সিপিএম দলের লোকসভা সদস্য নীলোৎপল বসু বলেন, পুরনো মানসিকতা আঁকে ড় থকার প্রশ্ন ওঠে না। পাশাপাশি, সিপিআইয়ের ডি রাজা ও পল্লব সেনগুপ্তের মন্তব্য, এতবড় একটা আয়োজন হচ্ছে, সেখানে স্বে চ্ছাসেবীদেজর হাতে সব ছেড়ে দিলে পুরোটাই ভুল পথে চলে যাবে। গোটা আন্দোলনটাই মাঠে মারা যাবে। তাই কমিউনিস্টরা নি জেদের কথা বলতে এখানে হাজির । বিশ্বায়নের বর্তমান চেহারার পরিবর্তে বিকল্প বিশ্বায়ন সম্ভব --এই শ্লোগান নিয়েই এবারের স ম্মেলন শুরু হয়েছে। বামপন্থীরা তার সঙ্গে যোগ করতে চান একটাই কথা --- সমাজতন্ত্রই সেই বিকল্প। এতদিন দূরে থাকার পরে বামপন্থীদের এই সামাজিক মঞ্চে হাজির হতে দেখে ম্যাগসাইসাই পুরস্কার বিজয়ী স্বেচ্ছাকর্মী অরুণা রায় মনে করেন, একসঙ্গে কা জ করার এই আগ্রহ নিঃসন্দেহে ভাল ব্যাপার। রাজনীতির বর্তমান সংস্কৃতির বদল হওয়াই দরকার। সুজিত সিনহার একটি মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক--- সত্যি বলতে গেলে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গেও এরকম দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক এনজিও - দের। ... সমস্যাটা হচ্ছে ে য বামপন্থী দলের সাম্য, ন্যায় ইত্যাদি আদর্শের সঙ্গে এনজিও - দের আদর্শের অনেক মিল। অথচ তাদের সঙ্গে তাত্ত্বিক স্তবে দ্বন্দ্ব স াংঘাতিক...। এনজিও নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন বামপন্থী দলগুলোর অস্বস্তির একটা কারণ হল, বামপন্থী দল চায় দরিদ্রদের হাে ত সম্পদ বন্টনে রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে। কিন্তু এনজিওদের ঘোষিত লক্ষ্য হল রাষ্ট্রকে এড়িয়ে সমাজের প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে

ানো। তার ওপর আবার এনজিওগুলো বিদেশী ফাণ্ডের টাকা পায়। অথচ বামপন্থী দলগুলো কেন বোঝে না রাষ্ট্রকে এড়িয়ে কাজ করতে চাওয়া মানেই পুঁজিবাদের দালালি করা নয়। কিছু এনজিও তেমন কাজ করলেও অনেকেই তা নয়। সকলেই তারা নয়া উদারবাদী কি বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বা বিশ্বায়নের প্রসাদ- লোভী নয়। রাষ্ট্রের মাধ্যমে সম্পদ পুনর্বন্টনের পথই কি একমাত্র পথ? কল্যান সান্যাল লিখেছেন ১৫ বছব আগে হলেও এসব কথার একটা মানে হতো। কিন্তু আজ তাতে যুক্তির ধার অনেক কম। কারণ বিশ্বায়নের চাপে পুনর্বন্টনের রাজনীতির ক্ষেত্রে হিসেবে জাতি - রাষ্ট্র ক্রমাগত তার স্বাতন্ত্র্য হারাচ্ছে। ফলে রাষ্ট্র - পন্থী রাজনীতির প্রথাগত রূপটি কার্যকারিতা হারাচ্ছে। বিশ্বায়নের হাতে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারও যে কতটা অসহায় তা আজ সুস্পষ্ট। শ্রী সান্যাল লিখেছেন - "West Bengal is a glaring example of the predicament of a government that is committed to redistribution but finds itself haplessly straight – jacketed by the imperatives of globalization." স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে রাষ্ট্রপন্থী রাজনীতির বাইরে কোনো বিকল্প আমরা খুঁজবো না কেন? বিশেষত রাষ্ট্র - কেন্দ্রীক রাজনীতির জন্যে মূল্য তো কম দিতে হচ্ছে না। এ খেলা গ্রাস করে নিতে পারে সব কিছু। এমনভাবে যে বাস্তব রাজনীতির দোহাই দিয়ে সবচেয়ে সুবিধাবাদী নীতিও অনুসরণ করতে হয়। সেটা বোঝার ক্ষমতা তখন লোপ পায়। সেটা হচ্ছে আজ পশ্চিমবঙ্গের শাসক বামদলগুলির বেশ কিছু নেতার ক্ষেত্রে প্রাক্‌নির্বাচনী জোট বাঁধার লক্ষ্যে, যে কোনো মূল্যে ক্ষমতার ছিটে - ফোঁটা প্রসাদ লাভের লোভে, ভোটে জেতার একমাত্র মন্ত্রটি জপতে তাঁরা সরে গেছেন গণ - আন্দোলনের পথ থেকে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি দেখিয়ে দিচ্ছে রাষ্ট্রের ক্ষমতার খেলা দেখে দেখে লোকের মনে অশ্রদ্ধা জন্মে গেছে। এনজিওগুলো যে রাষ্ট্র - বিরোধী কি রাষ্ট্র - বহির্ভূত একটা ভূমি (space) চাগিয়ে তুলছে তার কারণ এটা নয় যে তারা গ্লোবাল পুঁজির দাস কি বিদেশি ফান্ডে বেতনভোগী চর। বরং লোকের মনের ঐ অশ্রদ্ধা অনাস্থাই এনজিওগুলোর রমরমা বাড়িয়ে তুলছে। পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনৈতিক দলগুলো তাদের ভোটের খেলা খেলতে খেলতে নিজেদের অজান্তেই কখন ঐ অনাস্থার শিকার হয়ে পড়েছে। শূণ্যস্থান ভরতে আসছে এনজিও। আর সেটা অবশই একটা সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক স্থান বা ভূমি যেখান থেকে বামদলগুলো অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শ্রীসান্যালের মতে তা, বামদের ব্যর্থতার উল্টোপিঠ হল এনজিও-কারণ রাজনৈতিক দলগুলো যেখানে ব্যর্থ সে জায়গায় এনজিওরা অবশ্যই মুক্তিদাতা নয়। কিন্তু তাদের উদ্ভব ও প্রভাব দলগুলোর ব্যর্থতাকেই প্রকট করে তুলছে। পরস্পরের প্রয়োজনেই আজ তাদের পরস্পরের কাছেআসতে হবে।

:

এ প্রসঙ্গে সৌমিত্র বসুর মন্তব্য উল্লেখযোগ্যঃ এন জি ওদের মূলত দুটো ভাগে দেখা যায়। একদল শুধু আয়ের উৎপাদন অর্থাৎ income Generation -এর জন্যে কাজ করে... আর একটি এন. জি. ও গোষ্ঠী আন্দোলনের পথে মানুষকে সংগঠিত করে থাকে, অর্থাৎ একদল মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে কিছুটা লড়াই করে অর্থাৎ যাকে বলে Empowerment thorough entitlement, এর পথ ধরে এগোয়...আন্দোলনের পথে হাঁটার গোষ্ঠীভুক্ত সংগঠনগুলোর সংখ্যা কম, রেন্তঁও ক্ষমতাও কম কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব ফেলতে পারছে। মেধা পটেকর সুন্দরলাল বহুগণা বা বাবা আমতে অনেক জনসংহত বেশি কার্যকরী ও জনউন্মেষের পথে দেশকে সাহায্য করেছে। এই শেষোক্ত গোষ্ঠীর মধ্যে আবার ... একটি ছোট্ট অংশ আছে যারা শ্রেণী প্রশ্নটিকে ধরে রাখতে বলে এবং শ্রেণী প্রশ্নে গণসংগঠন গড়ে তোলে। এই অংশে শক্তিগুলো ভারতীয়জনগণতান্ত্রিক লড়াইয়ের অঙ্গনেই বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোর বন্ধু ও সহযোদ্ধা শক্তি।

:

জনযুদ্ধ, এমসিসি, অন্য কিছু নকশালপন্থী গোষ্ঠী WSF-এর সম্মেলনের কাছেই মুম্বাই রেজিস্টান্স (MR 2004) -এর সমালোচনা করেছে। সেখানে প্রায় ৩০০ গণসংগঠনকে সমান রেখে তার WSF-এর সমালোচনা করেছেন। WSF-এর মধ্যেকার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরোধীতা করতে তো হবেই। কিন্তু WSF-এর মঞ্চকে তাদের হাতে ছেড়ে চলে যাওয়া ঠিক হবে না হয়তো। WSF-এর মঞ্চে ঢুকে সেখানে বিতর্ক তুলে কথোপকথন চালিয়েই বোধহয় জনগণের স্বার্থে সংগ্রামকে জোরদার করা সম্ভব। মুম্বাইয়ের এই বিশ্ব সামাজিক মঞ্চের চতুর্থ সম্মেলনে এই প্রথম বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি অংশ নিয়েছে যদিও তাদের সাথে এনজিওগুলির রীতিমতো বিত র্ক চলেছে। এই বিতর্ক অবশ্য অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। কল্যান সান্যাল যথাযথই মন্তব্য করেছেন, "It is the first time that the leftist political parties have participated in the meeting, although not as official representatives, and engaged in debates with non – party organizations. This engagement was long overdue" । এই বিতর্কে অংশগ্রহণ কি বামপন্থী দলের দুর্বলতার লক্ষণ? নিম, হলুদের বিদেশি পেটেন্টের বিরুদ্ধে ও জিনি প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি কৃষিবীজের অপকারিতা নিয়ে বোঝাতে প্রতিরোধ আন্দোলন করে বিখ্যাত বন্দনা শিবা একটু ব্যঙ্গের সঙ্গে বলেছেন, রাজনীতির ময়দানে বিজেপির কাছে কোনঠাসা বামপন্থীরা এখন দিশাহারা। তাই এবার তারা সামাজিক আন্দোলনে আসছে। কিন্তু উল্টো দিকটা শ্রীমতি শিবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সাংগঠনিক শক্তি ও জনসমর্থন হ্রাস পেয়েছে বলেও যদি বামপন্থী দলগুলো

র আজ বিশ্ব সামাজিক মঞ্চের সম্মেলনে যোগ দিয়ে থাকে, তাহলে একইসাথে একটা তাদের মতাদর্শগত শক্তিবৃদ্ধিরও লক্ষণ। গোঁড়ামিকে জয় করে কিছুটা নমনীয়তাও যদি তারা দেখাতে পারে, উদামনস্কতা, সহনশীলতা ও আলাপচারিতার মনোভাব গ্রহণ করতে পারে তাহলে সেটা অবশ্যই তাদের চিন্তন - মননের বিকাশের চিহ্ন, নতুন করে ভাবতে পারার শক্তি, আত্মবিশ্বাসের পরোক্ষ প্রকাশ, পরিস্থিতির পরিবর্তনকে বোঝার ও পরিস্থিতিকে বদলানোর সাহসী পদক্ষেপ।

:

--ঃ যেসব প্রবন্ধ ও গ্রন্থ থেকে অবাধে সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ--

১. Stephen K white, Political theory and Post modernism, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

২. সুজিত সিনহা, ...বিকল্পের সন্ধান ও এন জি ও, চেতনা ৬,২ (২০০১)।

৩. মোহিত রায়, সেয়ানে সেয়ানে / বিপ্লবী বনাম এনজিও, চেতনা, পূর্বোক্ত।

৪. সৌমিত্র বসু, .. এনজিও আসলে কী ? শত্রু বন্ধু না অন্য কিছু, চেতনা, পূর্বোক্ত।

৫. Linda Hutcheon, The Politics of Postmodernism, Routledge, London & New York, 1989.

৬. রংগন চক্রবর্তী, ..এত মত নিয়ে পথ হারাব কি ঃ জানি না, পথ খোঁজা চলছে.., আনন্দবাজার পত্রিকা, ২২- ০১-২০০৪।

৭. শাশ্বতী ঘোষ, অন্য দিশার খোঁজে, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২০ ০১, ২০০৪.

৮. Kalyan Sanyal, 'Stealing the state's show', The Telegraph, 16.02.2004.

9. ' The Economic and Politics of the world Social Forum' : Lessons for the Sruggle against 'Globalisation', Aspects of India's Economy, no. 35 Research Unit for Political Economy.

10. The Telegraph, 19.01.2004

১১. আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯-০১-২০০৪, ২০-০১-২০০৪, ১৭-০১-২০০৪, ২৪-০১-২০০৪

১২. Subhanlal Dutta Gupta, Marxism and Postmodernism: Confrontation or Dialogue? Society and change, Calcutta, Booklet.

অ-রাজনীতিকরণের রাজনীতি

জয়ন্ত কুমার ঘোষাল

চোখ বুজলেই দুটো ছবি চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে। প্রথম ছবিটা বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার। তৎকালীন সেন্ট পিটার্সবুর্গের রাস্তায় দৃপ্তভঙ্গিতে মিছিলে হাঁটছেন জনকয়েক মানুষ। স্লোগান ছিল দুনিয়াটা তাঁরা বদলাবেনই। আশপাশের লোকজন হয়তো হাসছিল। সেই হাসিকে মিথ্যে প্রমাণ করে কয়েকবছরের মধ্যে সংগঠিত হল মানবসভ্যতার ইতিহাসের সবচেয়ে যুগান্তকারী বিপ্লব। পরের ছবিটা আমার মত অনেকে দেখেছেন দূরদর্শনের পর্দায় বা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে। প্রায় পঁচাত্তর বছর কমিউনিস্ট শাসনে কাটানোর পর সেই সোভিয়েত ইউনিয়নে একের পর একভেঙে দেওয়া হচ্ছে মার্কস লেনিনের মূর্তি। সরকারি দপ্তর থেকে টেনে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে লাল পতাকা। তিরিশ কোটির বেশি মানুষের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নে সে সময় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল তিন কোটির উপর,বিভিন্নগণসংগঠনের সদস্য ধরলে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন মানুষের সংখ্যাটা ছিল বিশাল। অথচ কেউ একটা গলা তুলে প্রতিবাদ জানাল না। সর্বোপরি রাষ্টক্ষমতায় ছিল সে দেশের কমিউনিস্ট পার্টি। সোভিয়েত ইউনিয়নের আগে পূর্বইউরোপের অন্যান্য দেশগুলিতে একই অবস্থা। পার্টিগুলি প্রথমে বাধ্য হয়েছে নিজেদের নাম পাল্টাতে, তারপরে গোটা সরকারি ব্যবস্থাটা পাল্টে গেল। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ মনের যন্ত্রণা নিয়ে গুমরে মরে।

চলে আসা যাক নিজের ঘরে। ১৯৬৭। প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা নির্বাচনের পর নানা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এসে গঠিত হয়েছে। আগের রাজনৈতিক ইতিহাস যাদের মনে আছে, তাঁরা জানেন কিভাবে নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে কংগ্রেস বিরোধী পরস্পর যুযুধান দুই ফ্রন্ট জনগণের চাপে একসঙ্গে মিলে মন্ত্রীসভা তৈরি করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৭৭। কেন্দ্রে একদলীয় শাসনের অবসান ঘটল নির্বাচনের ফলাফলে। অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার রক্তাক্ত অন্ধকারময় দিনগুলি পেরিয়ে নতুন অবস্থা তৈরির কৃতিত্ব যদি কাউকে দিতে হয়, তা দিতে হবে ভারতের জনগণকে। একেবারে হালফিলের ২০০৪ নির্বাচন। মানুষের রাজনৈতিক সচেতনার পরিচয় আবার পেলাম।

মানুষ সচেতনভাবে নিজের মনের মধ্যে নিজের মত করে লালন করে রাজনীতির ধারণা। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণাকে পোষণ করে অগ্রণী ভূমিকা নেয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ তার অঙ্গ। মানুষের যেসব মানসিকতা, তেজস্বিতা, ভাবোদ্দীপনা, মেজাজ ও মূল্যবোধের সমষ্টি যখন কোনও জাতি বা জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক আচার বিচার বিশ্বাস আর প্রবণতাকে একত্রিত করে সেটাকে আমরা রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে পারি। আরিস্তোতল এক ধরনের মনোজগতের কথা বলেছিলেন যার প্রতিফলন ঘটে বিপ্লবে কিংবা রাষ্ট্রীয় স্থিতাবস্থার মধ্যে। ইতি হাসবিদ এবং নৃতত্ত্ববিদেরা মানুষের আচরণের পিছনে জাতীয় চরিত্র ও ঐতিহ্যের প্রতিফলনের কথা বলেন। রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে বুঝতে হলে সমাজতত্ত্ব, সামাজিক মনস্তত্ত্ব, পরিসংখ্যান ইত্যাদি জানা বোঝার প্রয়োজন আছে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আবেগ অনুভূতির মিশ্রণে। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ঠিক ভুল, রাজনীতি ক্ষেত্রের ভাল মন্দ - এসব একত্রে মূল্যবোধের ধরন গড়ে তোলার পাশাপাশি পালনীয় রীতিনীতির বা ঔচিত্যের মান ঠিক করে দেয়। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধগুলি রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। আর রাজনীতির প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান, কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত ও যাবতীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিমানুষের অবস্থান নির্দিষ্ট হয়। জনসমাজের নানা মূল্যবোধ দেশের ইতিহাস, সামাজিক গঠন, প্রকৃতি ঐতিহ্য এবং প্রশাসনের কাজকর্মের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রূপায়িত হয়। রাজনৈতিক কাজকর্মকে কোনো কোনো দেশে মানুষ সর্বসম্মতভাবে মেনে নেয়। অনেক দেশে প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে বিপক্ষে নানা পরস্পর বিরোধী শক্তি কাজ করে। শেষপর্যন্ত কোনো একটি ধারায় স্থায়ী যে বিধিব্যবস্থা গৃহীত হয় সেগুলি একটি সংবিধানের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হয়। রাজনৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে বিভিন্ন জিনিসের সঙ্গে সরকারের কাছ থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রত্যাশা থাকে। বিভিন্ন দেশে মানুষের বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের মধ্যে থাকে আইনের শাসন ও সরকারের জনহিতকর কাজকর্মের জন্য প্রত্যাশা। রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোন নিশ্চল মানসিকতা নয়। নতুন নতুন চিন্তাভাবনা, আদর্শ, শিল্পোন্নয়ন, প্রভাবশালী নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব, জনসংখ্যা তথা জনবিন্যাসের পরিবর্তন---এসব নানা কারণে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন হয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি সর্বদা একরকম নাও হতে পারে। একটা বিশাল দেশের অন্তর্গত নানা ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিগত জনসমষ্টি বা জাতির মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমান না হতে পারে। আবার দেশে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির আধিপত্য রয়েছে তার স্রষ্টাহতে পারেন রাজনৈতিক বা সামাজিক নেতারা এবং সেটা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের সংস্কৃতি থেকে আলাদা হতে পারে।

অন্যদিকে মার্কিন মূলুকে একধরনের রাষ্ট্রনৈতিক বিশ্বাস চালু আছে। যার অর্থ হল প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্যের সাংস্কৃতিক মানসিকতা গ্রহণ করে। সংস্কৃতিকরণের এই প্রক্রিয়া একই দিকে প্রবাহিত হয়। তার ফলে একটি সংস্কৃতির মধ্যে

অন্য একটি সঞ্চারিত হয়। এরা পরস্পরের অভিমুখে প্রবাহিত না হওয়ায়, কোনও মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে না। যা বিপজ্জনক বহুত্ব বাদী এক সমাজে। সব মিলিয়ে যেতে পারে সংস্কৃতিকরণের প্রক্রিয়া যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল রাজনৈতিক সংস্কৃতি। তা সমাজ, জাতি, পরিবেশ, জনসংখ্যা, স্থানীয় দেশজ বৈশিষ্ট্য সবকিছু নিয়ে গড়ে ওঠে। কখনই তা স্থিতিশীল নয়, বরং প্রচণ্ড গতিশীল। যা দেশের রা জনৈতিক পটভূমিতেএক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণের মানসিকতা এর সবচেয়ে বড় নিয়ন্তা।

আবার নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় প্রেক্ষিতে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল সম্পর্কে উদাসীন মনোভাব দেখা যায়। রাজনৈতিক চেতনায় সবচেয়ে অনগ্রসব শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে যদি এই মানসিকতা ঢুকে যায় তাহলে বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রবক্তারা নিজেদের সুবিধা অর্জনের জন্য এবং শ্রমজীবী মানুষ যাতে শ্রেণিসংগ্রামের পথে না যায় তার উদ্যোগ নেয়। যে মানসিক অবস্থায় রাজনৈতিক সমস্ত ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, মানুষ সেসব ব্যপারে যে নিরাসক্ত মনোভঙ্গি প্রকাশ করে তাকে আমরা রাজনীতি নিস্পৃহতা বলে থাকি। সমস্ত সামাজিক পরিবর্তনের অভিঘাত ওইসব ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রতিফলিত হয়। সেগুলিকে রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা দেওয়া হয়। সমস্ত সামাজিক উদ্দেশ্য না থাকলেও যদি তার রাজনৈতিক পরিণতি দেখা দেয় তাহলে দুয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। কোনও ব্যবস্থায় যদি সরকারের বিরোধিতাকে বেআইনি করা হয়, তাহলে রাজনীতিতে নিস্পৃহ ব্যক্তি বা সংস্থা তাদের কাজ বেশি করে করেন। কারণ তখন সেটাই হয়ে দাঁড়ায় বিরোধী প্রতিষ্ঠানিকতার প্রতিস্পর্ধী। অবশ্য সেই বিরোধিতার নানা ধরন থাকতে পারে।

মোটামুটি এইরকম এক তাত্ত্বিক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্যে গত সিকি শতাব্দীর বেশি সময় ধরে চর্চিত অরাজনীতিকরণের বিষয়টি আলোচনার জন্য হাজির করা যেতে পারে। তবে এ প্রসঙ্গে একটি স্মরণীয় রাজনীতি সচেতনতার জন্য যার অহংকার দীর্ঘদিনের সেখানে অরাজনীতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার প্রথম এবং প্রধান কৃতিত্ব এই সিকি শতাব্দীর অধিক পর্বের নিরবচ্ছিন্ন শাসনের কৃতিত্বের দাবীদার প্রধান শাসক দলের।

মানুষের অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ কিছু বিষয় রয়েছে যার ওপর রাজনীতির জগতে অযোগ্য মানুষদের অযথা হস্তক্ষেপকে তারা ভাল চোখে নেন না। সাধারণ প্রশাসন --- মানুষ এখানে নিরপেক্ষতাও ন্যায়বিচার আশা করে,শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুলিশি ব্যবস্থা ---এ ধরনের যেসব বিষয় সাধারণ মানুষ যাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকেন রাজনীতি জগতের মানুষের ব্যাপক অনুপ্রবেশকে সাধারণ মানুষ অন্যভাবে দেখে থাকেন। কারণ হিসাবে বলা যায় এই ধরনের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা সাধারণত দলানুগামী হন এবং কাজের রূপায়ণে দলীয় স্বার্থের দিকটায় তাঁদের জোর পড়ে। অথচ কাজের সফল রূপায়ণ, মানুষের সামান্য কিছু উপকার করা যে প্রসারিত উদার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরপ্রত্যাশা করেন মানুষ বা তার প্রয়োজন রয়েছে এ সবের জন্য তার পরিচয় পাই না। স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের অবস্থার কি উন্নতি হয়েছে আমরা প্রতিনিয়ত চোখের সামনে দেখছি। কিন্তু যেটা দেখতে পাই অথচ বুঝতে চাই না, ঘটে যাওয়া সেই বিষয়টি হল দেশের স্বাধীনতার পর এক ভাড়াটে শ্রেণি, সমাজ বিজ্ঞানীদের ভাষায় রেন্টাল ক্লাস এর আবির্ভাব হয়েছে জাতীয় জীবনে। অসাধু পেশাদার রাজনীতিক, দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা, অসৎ বড় ব্যবসায়ী ও মাফিয়ারা এই শ্রেণির। দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রণ এদের হাতে।। এদের অশুভ যোগাযোগ এক বিরাট বিপর্যয় ডেকে এনেছে সমস্ত ক্ষেত্রে। মানুষ এদের প্রবল এবং অশুভ অস্তিত্বকে প্রতি মূহূর্তেউপলব্ধি করতে পারলেও কিছু করতে পারে না। কারণ সর্বশক্তিমান রাষ্ট্র যাকে দেখা যায় না, ছোঁয়া যায় না, শুধু যারভয়ংকর অস্তিত্বকে রাষ্ট্রের অধিবাসীরা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করতে পারেন, সেই রাষ্ট্রশক্তি এদের পেছনে রয়েছে। সাধারণ নাগরিক হাজার অসুবিধায় পড়লেও রাষ্ট্রের কাছে সুবিচার পাবে না, নিরাপত্তার আশ্বাস পাবেন না। স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিমানুষ নিজেকে কিছুটা ভয়ে কিছুটা ঘৃণায় গুটিয়ে নেন। রাজনীতির কলুষিত অঙ্গন থেকে সরে দাঁড়ান। অরাজনীতিকরণের প্রক্রিয়াটি শক্তিশালী হয়।

শিক্ষা মানুষের কাছে অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি বিষয়। শিক্ষাকে নিয়ে রাষ্ট্র মানুষের মনে যে মিথ তৈরি করে তাতে মানুষের চোখে শিক্ষা অত্যন্ত শ্রদ্ধার আসনে থাকে। শিক্ষা নিয়ে রাজনৈতিক চাপান উতোর মানুষের মনে রাজনীতি সম্পর্কে এক ঘৃণার মনোভাব গড়ে তোলে। পশ্চিমবঙ্গে গত পঁচিশ বছরের বেশি সময় ধরে শিক্ষাজগতের উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে কার্যত অশালীন এক দলীয় নিয়ন্ত্রণ শিক্ষার ক্ষেত্রে যা কিছু অসাফল্য তার জন্য রাজনীতিকে দায়ী করার পাশাপাশি রাজনীতি সম্পর্কে ঘৃণাকেও জাগিয়ে তুলেছে। এ রাজ্যে শিক্ষার সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অজস্র নিদর্শন রয়েছে। মানুষ তাকে মোটেই ভাল চোখে নেননি। সে কারণে এ রাজ্যের শিক্ষার গৈরিকীকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছাপ ফেলতে পারে না। গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। শিক্ষায় দলীয় আধিপত্যের ব্যাপারে রাজ্যের মানুষের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ থেকে উচ্চ শিক্ষা সংসদ পর্যন্ত সর্বস্তরে দলানুদাসদের বসানো হয়েছে। যোগ্যতার কোন নিরিখ কেউ জানে না। একে শিক্ষার অঙ্গনে রাজনীতির কলুষিত হাতের ছোঁয়া বলে মনে করেছেন রাজ্যবাসী।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিষয়টি ধরা যাক। যে রাজনৈতিক একাগ্রতা, দৃঢ়তা এই কাজটির সাফল্যের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন আমাদের শাসক দলগুলির মধ্যে তার একান্ত অভাব। এ রাজ্যেও তার ব্যতিক্রম নয়। ফলে সাক্ষরতা প্রসারের কাজে তেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসেনি। এ বিষয়ে সরকারি পরিসংখ্যানের সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতার গরমিল অনেক। শিক্ষাক্ষেত্রে কি যে ঘটনা ঘটছে তা বোঝার জন্য সাম্প্রতিককালে দুই প্রাক্তন উপাচার্যের কাণ্ডকারখানার উল্লেখ যথেষ্ট। তবে একটা বিষয় একজন জালিয়াতি করার

জন্য জেল খাটেন, অন্যজন প্রধান শাসক দলের ও রাজ্যের সরকারি প্রধানের আশ্রয়ে থেকে জালিয়াতি করেও বহাল তবিয়তে বুক ফুলিয়ে বেড়ান আর এসব দেখে বিবেকবান মানুষ নিজেদের রাজনৈতিক নোংরামো (তাঁদের ভাষায়) থেকে দূরে সরিয়ে নেন। দ লীয় অফিস থেকে ঠিক হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। যোগ্যতার চেয়েও দলীয় আনুগত্যের প্রশ্নটা বড় সেখানে।

রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা নাটকে শিবতরাই আর উত্তর কূটের মানুষদের মনে আছে তো! সমাজবিজ্ঞানীরা তো একধরনে মানুষদের ভাগ করেছেন পিপল আর ক্রাউড হিসাবে। উভয়ের স্বরূপ লক্ষণে অনেক ক্ষেত্রে মিল থাকলেও বুনিয়াদে অমিল অনেক। শিবতরা ই আর উত্তর কূটের মানুষ এই পিপল আর ক্রাউড-এর নিদর্শন। একদল সরল সাদাসিধে মানুষ ক্ষমতালোভী রাজনীতিকরা যাদে র সরলতার সুযোগ নিয়ে প্রতারণা করে। ক্রাউড এর লক্ষণের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের অন্ধ আনুগত্য ক্ষমতার কেন্দ্রের প্রতি। বি চারবোধহীন আনুগত্যের নিদর্শন রেখে এরা শাসকদের অনুগ্রহভাজন হতে চান। সংশয়, জিজ্ঞেসা এদের মনের মধ্যে ঠাঁই পায় না। শেকসপিয়ারের জুলিয়াস সিজারনাটক স্মরণ করা যেতে পারে। এদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর ডাকে মাঠে ময়দানে যাঁরা ভিড় জ মান, এই ক্রাউড গোত্রভুক্ত করা যেতে পারে তার বেশিরভাগ অংশকে। আসলে এই রাজনীতির ব্যবস্থায় পিপল এর স্থান নেই। বি শাল সংখ্যক পিপল, জানেন বোঝেন যাঁরা, নিজেদের সরিয়ে রাখেন নানাধরনের রাজনৈতিক উতোরচাপান থেকে। বছরে একবার বা দুবার নিয়মমাফিক বা সংস্কারবশত তথাকথিত পবিত্র কর্তব্য পালন করে আসেন নির্বাচনের বুথে গিয়ে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে ক্রমশ মুখ সরিয়ে নিচ্ছেন সুশীল সমাজের বাসিন্দারা। বিষয়টির প্রতি তাঁদের বীতশ্রদ্ধতাও প্রকাশ পাচ্ছে। আশংকাটা এইখানে যে বিকল্প কিছুর সন্ধান মানুষ এখনও পাননি। ফলে এক ভয়াবহ রাজনৈতিক শূন্যতা সৃষ্টি হতে চলেছে।

রাজনৈতিক শূন্যতা বলতে আমরা জনগণ বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলছি। বুর্জোয়া গণতন্ত্রে জনগণের যেটুকু অংশগ্রহ ণের সুযোগ রয়েছে সেটুকুও আর থাকছে না। বলা ভালো সচেতন মানুষ যাঁরা রাজনীতির মধ্যেসামান্যতম আদর্শবাদের আর কিছু অবশিষ্ট দেখেন না তাঁরা নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর আখড়ায় ভিড় জমাচ্ছেন ক্রাউডেরা। এদের দিয়েই ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরাফেরা করা রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের কাজ হাসিল করে। আমাদের দেশে স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক রাজনী তির যে কাঠামোগত বিন্যাস--- পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট---তার থেকে বিচ্ছিন্নতা ঘটে গেছে ভারতীয় পিপল -এর। বছর দুয়েক আগে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালনামে একটি সংস্থা তার রিপোর্টে জানিয়ে ছিল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের সামান্যতম বিশ্বাসযোগ্যতা নেই জনগণের চোখে।

রাজনৈতিক দলগুলোর এক ঢিলেঢালা ভাবের সুযোগে দলে ঢোকে সমাজবিরোধীরা। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ণের যে প্রক্রিয়া সত্তর দ শকের মাঝামাঝি শুরু হয়েছিল আজ তা শাঁসে জলে বেড়ে উঠে রাজনীতি ও দুর্বৃত্তগিরিকে একাকার করে দিয়েছে। দুষ্কৃতী ও দুষ্কর্ম আজকের রাজনীতিতে যেভাবে অনুপ্রবেশ করেছে তা সুস্থ বিকাশের পথে বাধা। তা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিকাশ যাই হোক না কে কন। আমাদের দেশে নানা পর্যায়ে --পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত কমপক্ষে দশ শতাংশ প্রতিনিধি নানাধরনের দুষ্কর্ম ও দুষ্কৃতীদে র সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এ তথ্যকে সরকারও অস্বীকার করতে পারে না। দেশের সংসদে দাগী মন্ত্রী, বিধায়কদের উপস্থিতি তো ভাব তীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাহাত্ম্যাকে প্রকাশ করে চলেছে প্রতিমুহূর্তে। পঞ্চায়েত ও বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গুলিতে এদের রম রমা নানাভবে। এরা এদের পরিচালনাকে প্রভাবিত করে। দুষ্কৃতীরা নির্বাচনে হিংসাত্মক কাজকর্ম, বুথ দখল, রিগিং, ভোটদাতাদের ভোট দিতে না দেওয়া, ব্যালট বাক্সে কারচুপি, এখন ভোটের মেশিনের অপব্যবহার করে একদিকে যেমন মানুষকে আতঙ্কিত করে তেমনি বীতশ্রদ্ধও করে তোলে। বিরোধী প্রার্থীকে নির্বাচনে লড়তে না দেওয়ার জন্য ভয় দেখানো, খুন, জখন, নিখোঁজ করারও বিত স্র ঘটনা ঘটে। সমস্ত রাজনৈতিক দল কমবেশি এইসব দুষ্কৃতীকে কাজে লাগায় এবং দুষ্কৃতীরাও নানাভাবে রাজনৈতিক দলের প্রত্য ক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা পায়। ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যে তো বটেই, সাতাশ বছর বামশাসিত এ রাজ্যও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নে ই। অথচ রাজনৈতিক নেতারা এ ধরনের নানা কমিশন বসান। আবার কমিশনের রিপোর্টে তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু লেখা হলেই চেপে দেবার ব্যবস্থা করেন। জনগণেরটাকায় বসানো কমিশনের এই পরিণতি মানুষকে রাজনীতি বিরোধী করে তোলে।

তবু রাষ্ট্রের ওপর মানুষের বিশ্বাস ভরসা অনেক। এর পেছনে মানুষের একধরনের অসহায়তা প্রকাশ পায়। আমাদের রাজনৈতিক সমাজ তার নিজস্ব অপরিপক্কতার কারণে নাগরিক সমাজের ওপর তার অশোভন আধিপত্যবিস্তার করে চলেছে। উন্নত গণতান্ত্রিক সমাজে নাগরিক বা সুশীল সমাজ যে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেয় আমাদের দেশে তা অনুপস্থিত। সবচেয়ে বড় কারণ হল এদেশে নাগরিক সমাজ তেমনভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। ঔপনিবেশিক আধারে তার জন্ম ও বিকাশ। আর ঔপনিবেশিক আধিপত্যের ছত্রছায়ায় অ ামাদের রাজনৈতিক সমাজের যে বিকাশ ও বৃদ্ধি তা খঞ্জ ও খর্ব। স্বাধীনতাউত্তর আবাধউপনিবেশের বাস্তবে কি রাজনৈতিক সমাজ, কি নাগরিক সমাজ কারও কাছে সুস্থ চিন্তা পাওয়া যায় না। নাগরিক সমাজ ও রাজনৈতিক সমাজের মধ্যে যে বোঝাপড়া সামগ্রিক ভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবহার অগ্রগতি ঘটায়, তা এদেশে নেই। সে কারণে নাগরিক সমাজের সদস্যরা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে করতে পারে ন না। অথচ তার উপর নির্ভরশীলতা বেড়েই চলে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত এদেশেও রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী চরিত্র ক্রমশ প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে। সাধারণ মানুষের নির্ভরতার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের আধিপত্য চাপিয়ে দিচ্ছে। রাষ্ট্র পরিচ ালনার দায়িত্বে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থন রয়েছে এ কাজে। ফলে মানুষ সুবিচার না পেলেও কোথাও যেতে পারে না। ফল হতাশা। নাগরিক সমাজকে গ্রাস করে এই সর্বগ্রাসী হতাশা।

এ রাজ্যে যে দলতন্ত্র সবকিছুর ওপর তার আধিপত্য কায়েম করেছে তার কুৎসিত চেহারা মানুষকে এক ভয়ানক অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। দল ও সরকার গ্রাস করেছে সমাজকে, সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর তার প্রভাব বিস্তার করেছে স্বনামে ও বেনামে। ফলে মানুষ ক্রমশ তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। আগে পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন ক্লাব, প্রতিষ্ঠান ছিল। এরা নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা করত, পাড়ায় মানুষের বিপতে আপদে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সাধারণভাবে মাঝারিমানের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা এইসব ক্লাব ইত্যাদি করত। পড়াশোনায় ভালো ছেলেরাও নিজেদের জড়াত। তাদের পেয়ে ক্লাবগুলোর যেমন লাভ হত, তে তমন পাড়ার মানুষ, এলাকারমানুষও আনন্দ পেতেন। এইসব নানাধরনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে পরবর্তীকালে নানা বিষয়ে যোগ্যরা বৃহত্তরপ্রেক্ষিতে নিজেদের ঠাঁই করে নিত। এমনকি রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র যুব সংগঠনে ক্যাডারদের একটা বড় অংশ যেত এসব জায়গা থেকে নিজস্ব একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে। অথচ ক্লাব সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেল ত না। দলে যোগদানের বিষয়টি ব্যক্তিগত স্তরে থাকার জন্য সাধারণ মানুষের চোখে ক্লাবগুলি রাজনৈতিক দলের ঘাঁটি বলে মনে হত না। পাড়াভিত্তিক সিভিল সোসাইটির নিজস্ব একটা প্যাটার্ন ছিল আমাদের দেশে।

অবস্থাটা পাল্টাতে শুরু করল সত্তরের দশক থেকে। ৬৯ এ রাজনৈতিক দলগুলির পাড়া দখলের অভিযান শুরু হল। এলাকা থেকে বিরোধী দলগুলোকে খেদানো হল। কোনো দলই সে ব্যাপারে ধোয়া তুলসীপাতা নয়। ফলে ব্যাপকভাবে সিভিল সোসাইটির ধরনটা ভেঙে পড়ল। অথচ নতুন ধরনের কিছু গড়ে উঠল না। বন্ধ হয়ে এল ক্লাব প্রতিষ্ঠানগুলির নিজস্ব কাজকর্ম। এবং চরম বেদনার কথা হল সেগুলি হয়ে গেল পাড়ার রাজনৈতিক দাদাদের বাতস্য দাদাদের হুকুম তামিলের আখড়া। পশ্চিমবঙ্গের তিনটে মফস্‌সল শহরের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ আছে। দেখেছি কি ভাবে নামি পুরনো ক্লাব গুলি নিজেদের কাজকর্ম শিকেয় তুলে স্থানীয় ক্ষমতাবানদের হাতে পুতুল হচ্ছে। ভোটের দিন আসল কাজের জন্য কালার টিভি, দামি ক্যারামবোর্ড কিনে দিয়ে, বেআইনিভাবে ক্লাব ঘরের পাকা বাড়ি তৈরি করে দিয়ে রাজনীতির দাদারা হাতে রাখেন পাড়ার উঠতি ছেলে ছোকরাদের। যাদের মূল কাজ বছরেও ই একটা বা দুটো দিন। এদের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো কার্যত এক মোড়লতন্ত্র কায়েম করে যার সঙ্গে রাজনীতির, যা সমাজ বদলের স্বপ্ন দেখায়, তার সম্পর্ক নেই। পাড়ার খেলার মাঠ দখল করে নেয় প্রোমোটর, জলা বুজিয়ে দেয় রাজনৈতিক দাদার যোগসাজশে। কলেজগুলো যেখানে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে থেকে ভবিষ্যতের রাজনীতিকরা উঠে আসতো তা এখন গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। বহু ছাত্র -ছাত্রী চূড়ান্ত বেনিয়মি কোনও কাজ করার জন্য বা অন্যায় সুযোগ নেবার জন্য ছাত্র সংগঠনের সদস্য হয়। ছাত্র ইউনিয়নগুলো কোনও সৃষ্টিশীল কাজকর্মে আর তেমনভাবে মেতে উঠতে পারে না। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া দলীয়নির্দেশ তাদের স্বতঃস্ফূর্ততাকে পদে পদে আটকে দেয়। রাজনীতির--- সে কি সরকারি পক্ষ কি বিরোধীর পক্ষ--- আঙিনায় নতুন মুখ আর দেখা যায় না। এই সুযোগে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নানা ধরনের কর আরোপ করে ছাত্রদের উপর, অন্যায় হুকুম জারি করে। জানে ছাত্র ইউনিয়ন আর প্রতিবাদ করতে পারবে না। সামান্য যেটুকু করবে তা নিতান্ত লোক দেখানো। দু একজন হয়তো ইউনিয়নকে ধরে ব্যক্তিগত স্তরে কিছু সুবিধে নেবে। এদের মধ্যে ক-জন ভবিষ্যতে রাজনীতির আঙিনায় ঢুকবে তা না ভেবেই বলা যায়। শ্রমিকরাও একই ভাবে মুখ ফিরিয়েছেপ্রতিষ্ঠিত ইউনিয়নের নেতৃত্ব থেকে। কৃষি শ্রমিক তার মজুরি বৃদ্ধির লড়াইতে দেখে যে রাজনৈতিক নেতা তাকে উস্কানি দিলেন (সচেতন ভাবে কথাটা প্রয়োগ করা হল), তাঁর সঙ্গে মজুরি ফাঁকি দেওয়া জমির মালিকের গভীর দোস্তি। হয়তো বা দুজনেএকই দলের সদস্য, সমর্থক। পুঁজিবাদী সমাজে যে তীব্র শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিসচেতনতা ছাত্র, যুব, শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী --- এক কথায় নামাস্তরের মধ্য ও নিম্নবর্গের মানুষের মনে রাজনীতি সচেতনতা জাগাতে পারে, যে নিরবচ্ছিন্নশ্রেণিসংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তীব্র রাজনৈতিক সচেতনতা জন্মায়, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ এর পর প্রধান শাসকদল রাষ্ট্রক্ষমতা বজায় রাখা তথা গদিতে আসীন থাকার স্বার্থে তাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। শাসকফ্রন্টের অন্যান্য দলগুলি নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেবার জন্য মাঝে মধ্যে আন্দোলনের হুমকি দিলেও বড় দলের চাপে পিছু হটে। প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক মিত্র তাঁর আত্মজীবনী আপিলা চাপিলা-য় লিখেছেন কিভাবে রাজ্যের প্রথম বাম মুখ্যমন্ত্রী যিনি দীর্ঘকাল একটানা গদিতে থাকার রেকর্ড করেছেন, বিভিন্ন আন্দোলনের জঙ্গিরূপকে অপছন্দ করেছেন। বিভিন্ন আন্দোলনের রাশ টেনে ধরছিলেন বলে তিনি মনে করেছেন। মন্ত্রীসভায়থাকার সুবাদে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন বিষয়টিকে। ফলত সংগ্রামরত শ্রমিক কৃষক যেমন নিজেদের জীবনাভিজ্ঞতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে আন্দোলনের পথ থেকে তেমনি আন্দোলন সম্পর্কে তাঁদের মনে গড়ে উঠেছে এক নির্লিপ্ত মনোভাব। পাশাপাশি অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা দেখেছেন শ্রমিক কৃষক সম্মেলনে যে মন্ত্রী আগুন ঝরানো ভাষন দেন সংগ্রামের সময় তাঁর ভূমিকা গদির পক্ষে না সংগ্রামীদের পক্ষে অনেক উদাহরণ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে যায়। এ ধরনের কাজকে শাসকদলের পক্ষ থেকে উৎসাহিত করা হয়। আংশিক এবং অস্থায়ী সুবিধা পাওয়ার জন্য মৌলিক স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া যাকে আমরা সুবিধাবাদ বলি এর গর্ভে জন্ম হয় অর্থনীতিবাদের। আর সুবিধাবাদীরা সবসময় এবং সর্বত্র স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে দেয়।

সন্ত্রাসের সামাজিকীকরণ এ রাজ্যের মানুষের মধ্যে অরাজনীতিকরণের বিষয়টিকে শক্তিশালী করেছে। এর অর্থ নিশ্চয় এই নয় যে রাজনীতির দূর্বৃত্তায়ণের দিক থেকে অগ্রসর বিভিন্ন রাজ্য যেমন বিহার, উত্তর প্রদেশ বা অন্যত্র রাজনৈতিক সন্ত্রাস নেই। সে সব রাজ্যে সন্ত্রাসের ভয়াবহতা এক ধরনের বিশেষত উচচবর্গ যেভাবে নিম্নবর্গের উপর তার সন্ত্রাস চালায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সে ধরে

নর সন্ত্রাস কম। যদিও এলাকা দখল নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক সংঘর্ষ, রাজনৈতিক হত্যার মাধ্যমে মানুষকে সন্ত্রস্ত ক রার প্রচেষ্টা, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে ভয় দেখিয়েস্তব্ধ করা ব্যাপকভাবে রয়েছে। চাপা সন্ত্রাস যাকে চোখে না দেখলেও প্রতি মুহূর্তে উপ লব্ধি করা যায়, এখানে বিদ্যমান। এলাকার প্রধান রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা যিনি তাঁর কথাই শেষ কথা। সাধারণ মানুষের মতামতের কোনও মূল্য নেই। সব ব্যাপারে তিনি যেমন শেষ কথা বলবেন, তেমনি মানুষের নানা ব্যাপারে তাঁর উপর নির্ভরশীল ক রে তুলবেন। ছেলেমেয়ের স্কুল কলেজে ভর্তি, হাসপাতালে ভর্তি, থানায় যাওয়া, সব ব্যাপারে তিনি এবং তাঁর বাহিনী সাহায্যের জ ন্য প্রস্তুত। কার্যত গ্রাম্য মোড়লতন্ত্রের বিশ একুশ শতকীয় সংস্করণ। এ রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলির কালচার আসলে এই মোড়ি লর কালচার। মার্কসবাদী, অ-মার্কসবাদী সবাই এই পথের পথিক।

এর পাশাপাশি রাজ্যের প্রধান শাসকদল বিভিন্ন সময়ে সমাজের কোনো কোনো অংশের বিরুদ্ধে গণঘৃণা বা বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে ন নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য। প্রাক সাতাত্তর পর্বে এ রাজ্যবাসীর অভিজ্ঞতায় যাতেমন ছিল না। আমাদের সামনে অন্ত ত তিনটি অভিজ্ঞতা রয়েছে। শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা পঁয়ষট্টি থেকে ষাট এ নিয়ে আসাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার এবং প্রধান রাজনৈতিকদলের কর্মীরা সমবেতভাবে মানুষের মধ্যে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ঘৃণার পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। রাজ্যের সবচেয়ে বড় শিক্ষক সংগঠন, যারা ওই রাজনৈতিক দলের শাখা, তারা শিক্ষকদের কোনও সহায়তা করলেন না। কিংবা প্রতিবাদ প র্যন্ত করলেন না। একই পদ্ধতি তারা নিয়েছেন প্রাইভেট ট্যুইশনি বন্ধের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষকদের মধ্যে ঘৃণা ছড়ি য়ে। সত্তরের দশকের কালো দিনগুলিতে মস্তানরা শিক্ষককে হত্যা করেছে, অপদস্ত করেছে। কিন্তু তাদের সেই কাজের বিরুদ্ধে মানু ষের তীব্র ক্ষোভ ছিল। মানুষ সুযোগ পেয়েই তার প্রতিবাদ করেছে। আর এখন মানুষের মনের মধ্যে শিক্ষক সম্প্রদায় সম্পর্কে ঘৃণা জাগানো হল। চরম অপমানিত শিক্ষকেরা এরপরও সেই দলের শিক্ষক সংগঠনে থাকলেও থাকাটা যে মোটেই আন্তরিক নয় তা বোঝা কঠিন নয়।

চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে একইভাবে বিভিন্ন সময়ে প্রধান শাসকদলের পক্ষ থেকে পরিকল্পিতভাবে সামাজিকঘৃণার আবহাওয়া গড়ে তোলা হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টাকে বোধ হয় এভাবে বলা যায় সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে,বিশেষ করে চাকুরিজীবী বা রোজগে রে অংশের সঙ্গে অন্যান্য অংশের লড়াই বাধিয়ে দিয়ে ঘোলা জলে মৎস্য শিকারের চেষ্টা অর্থাৎ রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার উদ্যো গ। সমস্ত সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ এদেশেররং বেরঙের শাসকগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষের মধ্যে গন্ডগোল বাধা নোর যে প্রয়াস তা এ রাজ্যের প্রধান শাসক দলেরও খেলা। উস্কানি দিতে গিয়ে এ রাজ্যের শাসকবর্গ যে কাজটি করেছেন তা হল র াজনীতি বা রাজনীতিকদের সম্পর্কে মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলা।

দেশের সব রাজনীতিক দল চায় রাজনীতি থেকে সাধারণ মানুষ দূরে থাকুক। রাজনীতি বলতে আমরা শ্রেণি রাজনীতি সচেতন মান ুষ এই পুঁজিবাদী সমাজের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ সংগঠিত করবে, সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাবে--- পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরাফেরা করা রাজনৈতিক দলের তার কাম্য নয়। রাজনীতি নিস্পৃহ মানুষের নীরবতা বরং তাদের কাছে অনেক স্বস্তিদা য়ক। এই নৈঃশব্দ্যের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেসাহায্য করে। রাষ্ট্রের পরিচালক মণ্ডলীরও এটা কাম্য। পৃথিবীর সবদেশে সমাজ গণতন্ত্রীরা এ ধরনের ভূমিকা পালনকরে কার্যত শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। এখানেই লুকিয়ে র য়েছে গত সাতাশ বছরে সচেতনভাবে শাসক দলের চর্চিত অরাজনীতিকরণের রাজনীতি।

পুঁজিবাদী শাসন শোষণে জর্জরিত মানুষ তার নিজস্ব কায়দায় অরাজনীতিকরণের এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রক্রিয়াকরণের বিরুদ্ধে প্রি তবাদ জানায়। কারণ তাঁরাই তো আসল বীর। এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এই সময় সংগ্রামে জয় অর্জন প্রায় অসম্ভব। তাই নিরন্তর সংগ্রামে লেগে থাকাটাই বড়। রণজয়ী নয়, রণে আছি তবু মেতে...। মানুষ এই অরাজনীতিকরণের রা জনীতিকে সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে তাঁদের প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপে মন্তব্য করেন। বাংলা কথাসাহিত্যের অ ঙ্গনে এক নতুন চরিত্রের আবির্ভাব হয়েছে --লোকাল কমিটির মেম্বার। সরকার বিরোধী সংবাদপত্রের বিক্রি দেখলে ঈর্ষা হয়। সম্ প্রতি একটি পরীক্ষায় গভীর জলের মাছ এই প্রবচনটি দিয়ে বাক্য রচনা করতে দেওয়া হয়েছিল। দুশো জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দেড় শতাধিক পরীক্ষার্থী লিখেছেন--- রাজনীতিকরা গভীর জলের মাছ, এদের বিশ্বাস করা যায় না। প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির প্রতি সুতীব্র ঘৃণা যদি এটা না হয়, তবে আর কোনটা হবে? আপাতত মনে হয় মানুষ এভাবেই তার প্রতিবাদ জানাবেন যতদিন না সেই শক্তির আবির্ভাব হয় যারা মানুষের প্রতিবাদের ভাষাকে সংগঠিত করে চালনা করবেন সঠিক রাজনৈতিক লক্ষ্যে যা শুধু পাইয়ে দেবার ম ধ্য সীমাবদ্ধ না থেকে মানুষকে তার শোষণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার প্রয়াস করবে।আর সময় যখন ডাকিনীর মন্ত্র পড়ে তখন মানুষ কে যেভাবেই পারো জাগিয়ে রাখাই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কর্তব্য।

গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদ

অরুন্ধতী রায়

অনুবাদ: অনুপ চৌধুরী

নব উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক নব - ফ্যাসিবাদ

কয়েকদিন আগে এক তরুণ কাশ্মীরি বন্ধু আমাকে কাশ্মীরের মানুষের জীবন সম্পর্কে বলেছিলেন। বলেছিলেন রাজনৈতিক অসততা ও সুবিধেবাদের ফাঁদ, নিরাপত্তাবাহিনীর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে, বলেছিলেন এমন এক সমাজের কথা যা সন্ত্রাসে সংপৃক্ত, যেখানে জঙ্গি, পুলিশ, গোয়েন্দা বাহিনী, সরকারি চাকুরে, ব্যবসায়ী, এমনকি সাংবাদিকরাও পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে, আর ক্রমশ পর, একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে যাচ্ছে। সীমাহীন হত্যা, বেড়ে - ওঠা - ওঠা ''নিখোঁজ'' এর তালিকা, ফিশফশানি, ভয়, অমীমাংসিত গুজব, আর বাস্তবিক যা ঘটে চলেছে, কাশ্মীরিরা যা জানে এবং কাশ্মীরে যা ঘটেছে সে - সম্পর্কে বাকি আমাদের যা জানানো হয় এ দুয়ের ভেতবের চূড়ান্ত নির্বোধ বিরোধ -- তিনি বলছিলেন এসবের মধ্যে বসবাসের অভিজ্ঞতার কথা। তিনি বলছিলেন 'কাশ্মীর কারবারের ব্যাপার ছিল। এখন তা একটা উন্মাদাগার।'

তাঁর ঐ মন্তব্যটি সম্পর্কে আমি যতই ভেবেছি ততই আমার মনে হয়েছে সমগ্র ভারত সম্পর্কেই এটা যথার্থ একটা কথা। সন্দেহ নেই, কাশ্মীর এবং উত্তর - পূর্ব ভারত সেই উন্মাদাগারের দুটি আলাদা আলাদা বিপদজনক ওয়ার্ড হিশেবে গণ্য হবে। কিন্তু হৃদ্‌ভূমিতও জ্ঞান এবং তথ্যের মধ্যে যে ফারাক, যা আমরা জানি এবং যা আমাদের বলা হয়, যা অজানা এবং যা নিশ্চিত বলে চালানো হয়, যা গোপন রাখা হচ্ছে ও যা প্রকাশ করা হচ্ছে, সত্য ঘটনা ও আন্দাজ, 'বস্তুগত' জগৎ আর কল্পিত জগত - এসবের মধ্যে যে ব্যবধান--- তা সীমাহীন অনুমান আর উর্বর উন্মাদনার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এ হলো একটা বিষাক্ত পাঁচন যা অল্প আঁচে ফোটানো হচ্ছে, নাড়া হচ্ছে, আর সবচেয়ে কুৎসিত, ধবংসাত্মক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে।

যখনই কোনো তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা' ঘটে তখনই, নামমাত্র অনুসন্ধান করে কিংবা অনুসন্ধান না করেই সরকার দোষীদের সাব্যস্ত করতে অত্যুৎসাহী অতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। গোধরাতে সবরমতী এক্সপ্রেসে আগুন লাগানো, ১৩ ডিসেম্বর পার্লামেন্ট ভবনে আক্রমণ, অথবা চিত্তিসিংপুরায় তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদীদের' দ্বারা শিখ - হত্যা ---এগুলো তার মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত যা বড় আকারের সংবাদ - শিরোনাম পেয়েছে। আর এসব ঘটনায় যা সম্ভাব্য প্রমাণ হিশেবে সামনে আনা হয়েছে তা অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলে ধরে এবং তাই তড়িঘড়ি বিষয়গুলোকেঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গোধরার ঘটনাটাই ধরুন, যখনই ঘটনাটা ঘটল তৎমুহূর্তেই স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষনা করে দিলেন এটা আই এস আই -এর ছক। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বলল মুসলমানদের একটা দল পেট্রোল বোমা ছুঁড়ে কাজটি করেছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্র দেওয়া হল না। অনন্ত আন্দাজের ব্যাপার থেকে গেল। যে যা বিশ্বাস করতে চায় বিশ্বাস করল। কিন্তু ঘটনাটা অসূকভাবে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততাকে চাবকে জাগিয়ে তুলল।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাটি ঘিরে আমেরিকা সরকার অনেক মিথ্যে ও ভুল - তথ্যের জন্ম দিয়েছিল একটা নয়, দুটো দেশকে আক্রমণ করার লক্ষ্যে। ঈশ্বর জানেন তার ভাঁড়ারে আর কী লুকোনো আছে!

ভারত সরকারও সেই একই কৌশল ব্যবহার করছে - অবশ্য তার লক্ষ্য কোনো অন্য দেশ নয়, নিজের দেশের মানুষ। গত দশকে পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে মৃত মানুষের সংখ্যাটা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। সাম্প্রতিককালে বোম্বের পুলিশকর্মীরা সংবাদমাধ্যমে খোলাখুলিই বলেছেন 'নির্দেশ' মেনে তাঁরা কত 'দুর্বৃত্ত'কে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। অন্ধ্রপ্রদেশ জানিয়েছে এক বছরে ২০০ জন 'চরমপন্থীর ' 'এনকাউন্টারে' মৃত্যুর কথা। কাশ্মীরের অবস্থাটা প্রায় যুদ্ধ - পরিস্থিতির মতো, সেখানে ১৯৮৯ থেকে এখন পর্যন্ত ৮০,০০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ সেখানে 'নিখোঁজ'। নিখোঁজ মানুষদের অভিভাবকদের সমিতির (APDP) তথ্য অনুসারে ২০০৩ সালেকাশ্মীরে ৩০০০ মানুষ নিহত হয়, যার মধ্যে ৪৬৩ জন সেনাবাহিনীর লোক। 'শুশ্রূষার স্পর্শ' এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০০২ সালের অক্টোবরে মুফতি মহম্মদ সঈদের সরকার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকে, এ পি ডি পি-র তথ্য অনুযায়ী, ৫৪ জন জেলবন্দীর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এই অতি - জাতীয়তাবাদের যুগে যতক্ষণ দুর্বৃত্ত, সন্ত্রাসবাদী, বিদ্রোহী বা চরমপন্থীর লেবেল সেঁটে মানুষকে হত্যা করা যাবে ততক্ষণ হত্যাকারীরা জাতীয় স্বার্থের রক্ষক হিশেবে সদর্পে বিচরণ করতে পারবে এবং কারো কাছে কোনো উত্তর দেবার দায় তারা স্বীকার করবে না।

মানুষকে হয়রানি ও সন্ত্রস্ত করার দিকে ভারত রাষ্ট্রের ঝোঁকটি পোটা আইনের (Prevention of Terrorism Act.) দ্বারা অনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছে। দশটি রাজ্যে এই আইন জারি হয়েছে। পোটার বিষয়ে খুব দ্রুত চোখ চালিয়ে দেখলে আপনি বুঝবেন আইনটি অত্যন্ত কড়া এবং সর্বব্যাপী। আইনটি এমন বহুমখী এমন সর্বসঞ্চারী যে এটি যে-কারোর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যায় -- বিস্ফোরক সমেত ধৃত কোনো আল - কায়দার কর্মী থেকে শুরু করে কোনো আদিবাসী যিনি নিমগাছের তলায় বাঁশি বাজাচ্ছিলেন অথবা আপনি বা আমি সকলেই এই আইনের আওতায় চলে আসতে পারি। সরকার যা চাইবে তা-ই হতে পারবে--- পোটার মাহাত্ম্য হল এই। যারা আমাদের শাসন করছে আমরা তাদের সম্মতির ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছি। তামিলনাড়ুতে সরকারের

সমালোচনাকে শ্বাসরুদ্ধ করার জন্য পোটা ব্যবহার করা হচ্ছে। ঝাড়খণ্ডে ৩২০০ জন মানুষ - যাঁদের বেশির ভাগ আদিবাসী - মাওবাদী হওয়ার অপরাধে তাঁদের নামে পোটার অধীনে এফ আই আর করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের পূর্বাংশে যাঁরা জমি থেকে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আর বেঁচে থাকার অধিকারের দাবিতে প্রতিবাদ করছেন এই আইন তাঁদের দমিয়ে রাখার উদ্দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। গুজরাত ও মুম্বাইএ এটা প্রায় সর্বাত্মকভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০০২ সালের পর গুজরাতে রাজ্য সরকারের মদতপুষ্ট পরিকল্পনায় ২০০০ মুসলমানকে হত্যা করা হয়েছে, ১,৫০,০০০ মানুষকে গৃহছাড়া করা হয়েছে এবং ২৭৮ জনকে পোটার অধীনে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর ভেতর ২৮৬ জন মুসলমান আর মাত্র একজন শিখ! পুলিশি হেফাজতে যে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় পোটা আইনে তা বিচারের প্রমাণ হিশেবে গণ্য হয়। ফলে পোটা - রাজত্বে পুলিশি অনুসন্ধানের জায়গা নিয়েছে পুলিশি নির্যাতন। এতে ফলটা পাওয়া যায় দ্রুত, সরকারি ব্যয় হয় কম, এবং ফল পাওয়া যায় নিশ্চিতভাবেই।

গত মাসে পোটার পিলস্ ট্রাইবুনালে আমি একজন সদস্য হিশেবে উপস্থিত ছিলাম। আমাদের এই চমৎকার গণতন্ত্রে কী ঘটছে সে সবের মর্মান্তিক সাক্ষ্যগুলি দু-দিন ধরে আমরা শুনলাম। আপনারা নিশ্চিন্ত হোন আমাদের পুলিশ - স্টেশনগুলোতে সবই সম্ভব : জোর করে মানুষকে মূত্রপান করানো থেকে শুরু করে, নগ্ন করা, হেনস্থা করা,ইলেকট্রিক শক দেওয়া , সিগারেটের ছাঁকায় পুড়িয়ে দেওয়া, পায়ুতে লোহার রড প্রবেশ করানো, ঘুষি - মেরে লাথি মেরে মৃত্যু পর্যন্ত সবই সেখানে হয়।

পোটা আদালত জনসাধারণের নজরদারির জন্য খোলা নয়। যতক্ষণ না দোষ প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষণ একজন মানুষকে নিরপরাধ বিবেচনা করতে হবে - ফৌজদারি মামলায় এই স্বীকৃত বিধিটি পোটায় উল্টে যায়। পোটার অধীনে আপনি যতক্ষণ না নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারছেন ততক্ষণ আপনি ছাড়া পাবেন না। -- যদিও আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগটা সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়ের করা হবে না। প্রকরণগতভাবে আমরা এই দেশে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। পোটার দুর্ব্যবহার হচ্ছে এমন ভাবাটা সরলতামাত্র। ব্যাপারটা বরং উল্টো। যে কারণে এই আইন তৈরি হয়েছে যথার্থভাবে সেই কারণেই তা ব্যবহৃত হয়। অবশ্য মালিমথ কমিটির সুপারিশ মানলে শীঘ্রই পোটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে মনে হবে। মালিমথা কমিটি সুপারিশ করেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ ফৌজদারি আইনকে পোটা - ব্যবস্থার পথে নিয়ে আসা দরকার। তাহলে কোথাও কোনো ফৌজদারি অপরাধী থাকবে না। থাকবে শুধু সন্ত্রাসবাদীরা। ব্যাপারটা বেশ নির্জলা।

আজ জম্মু ও কাশ্মীরে এবং উত্তর - পূর্ব ভারতের অনেকগুলো রাজ্যে সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতার আইন (Armed Forces Special Powers
Act) শুধু সেনাবাহিনীর অফিসারদের নয়, জুনিয়ার কমিশনড অফিসার এবং নন-কমিশনড অফিসারদেরও অনুমোদন দিয়েছে যে তারা কোনো ব্যক্তি সরকারি নির্দেশ অমান্য করছে বা অস্ত্র বহন করছে এমন সন্দেহ করলে তার ওপর বল প্রয়োগ করতে পারে (এবং এমনকি মেরে ফেলতেও পারে)। শুধু সন্দেহের বশে! ভারতে যারা বাস করেন তারা জানেন পরিণতিটা কোন্ দিকে এগোয়। নিরাপত্তা কর্মীদের দ্বারা নির্যাতন, নিখোঁজ হওয়া, অন্তরীণ অবস্থায় মৃত্যু, ধর্ষণ ও গণধর্ষণের যে -সব তথ্য প্রকাশিত সেটাই আপনার রক্তকে শীতল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এসব সত্বেও আন্তর্জতিক গোষ্ঠী এবং নিজের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে ভারত যে আইনসিদ্ধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায় --- সেটাই তার জয়।

১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনকে মোকাবিলা করার জন্য লর্ড লিনলিথগো যে অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন, সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতার আইনটি তারই কঠিনতর রূপ। ১৯৫৮ সালে মণিপুরের কোনো অঞ্চলকেযখন উপদ্রুত এলাকা হিশেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তখন সেখানে আইনটি ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৬৫তে মিজোরাম তখনও আসামের অন্তর্গত, সমস্ত মিজোরামকে উপদ্রুত ঘোষণা করা হল। ১৯৭২ সালে আইনটি ত্রিপুরা অবধি তার সীমা বাড়াল। ১৯৮০ তে সমগ্র মণিপুর উপদ্রুত বলে ঘোষিত হল। এরকম পীড়নমূলক পদক্ষেপ যে আসলে উল্টো প্রতিক্রিয়া জাগাচ্ছে এবং কেবল মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলছে তা বোঝার জন্য কি আর অন্য কোনো প্রমাণের প্রয়োজন আছে?

মানুষকে দমিয়ে রাখার, নিশ্চিহ্ন করে দেবার এই অসমীচীন আগ্রহের সঙ্গে মিশেছে, যে-সব মামলাগুলোয় যথেষ্ট প্রমাণ আছে সেগুলোর তদন্ত করার এবং নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে ভারতরাষ্ট্রের নেহাৎই গোপন অনাগ্রহ। ১৯৮৪ সালে দিল্লীতে ৩০০০ শিখ-নিধন, ১৯৯৩ সালে বোম্বেতে এবং ২০০২ সালে গুজরাতে মুসলমান নিধন, কয়েকবছর আগে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভাপতি চন্দ্রশেখরের হত্যা, বারো বছর আগে ছত্রিশগড় মুক্তি মোর্চার শঙ্কর গুহ নিয়োগীর হত্যা এ সবের কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। যখন রাষ্ট্র আপনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান তখন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যাবলি এবং অপরাধের নিশ্চিত প্রমাণবলি - কোনোকিছুই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে না।

এরই মধ্যে বড়ো বড়ো খবরের কাগজের পাতা থেকে অর্থনীতিবিদরা উল্লসিত স্বরে আমাদের জানাচ্ছেন গড় জাতীয় উৎপাদন (GDP) বৃদ্ধির হার অভূতপূর্ব, অতুলনীয়। দোকানগুলো ভোগ্যপণ্যে উপচে পড়ছে। সরকারিগুদামগুলোতে খাদ্যশস্য উপছে পড়ছে। আর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনাহার ও অপুষ্টির সংবাদ আসছে। তবু সরকারর ৬৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য গোলাঘরে পচতে দিল। ভারতের গরিব মানুষদের দিতে নারাজ ভারতসরকার ১২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশে রপ্তানি করল এবং ভর্তুকিপ্রাপ্ত দামে বিক্রি করল। বিখ্যাত কৃষি - অর্থনীতিবিদ উৎসপট্টনায়েক সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত এক শতকে ভারতে খাদ্যশস্যের প্রাপ্তি

খাদ্যশস্য গ্রহণের হিশেব করছেন। তাঁর হিশেব অনুযায়ী ১৯৯০ এর গোড়ার দিক থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত এখানে খাদ্যশস্য গ্রহণের পরিমাণ যাহয়েছে সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন পরিমাণের থেকেও কম, এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বাংলায় যে দুর্ভিক্ষ ৩০ লক্ষ মানুষ অনাহারে মারা যায় সে - সময়ও ভারতবাসী এর বেশি খাদ্যশস্য গ্রহণ করত। অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের কাজ থেকে আমরা জেনেছি গণতন্ত্র অনাহারে মৃত্যুকে দয়া দেখায় না। 'স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমে' যে বিরূপ সমালোচনা বেরয় গণতন্ত্র বরং তাকে আক্রমণ করতে চায়।

সুতরাং অপুষ্টির বিপদজনক মাত্রা এবং চিরস্থায়ী ক্ষিধে আজকের দিনে প্রত্যাশিত আদর্শহিশেবে বিবেচিতহয়। তিন বছরের নিচের ৪৭ শতাংশ ভারতীয় শিশু অপুষ্টিতে ভোগে, ৪৬ শতাংশের বাড় বন্ধ হয়ে গেছে। উৎস পট্টনায়েকের লেখায় প্রকাশ ভারতের গ্রামের ৪০ শতাংশ মানুষ যে পরিমাণ খাদ্যশস্য খেতে পায় সেটা আফ্রিকার সাহারার নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির মানুষদের সমান। ১৯৯০ এর গোড়ার দিকে গ্রামের একটি পরিবার যে পরিমাণ খাদ্যশস্য পেত এখন তারা তার থেকে বছরে প্রায় ১০০ কেজি কম খাদ্য পায়। স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত সময়ে গ্রাম ও শহবের আয়ের বৈষম্য গত পাঁচ বছরে সবচেয়ে মারত্মক বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিন্তু ভারতের শহরগুলোর যেখানেই আপনি যান---দোকান, রেস্তোরাঁ, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, জিমনেশিয়াম, হাসপাতাল---সর্বত্রই আপনি দেখবেন টিভির পর্দায় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যেই সত্যি হয়ে উঠেছে। ভারতের উদয়, ভালো থাকার অনুভব। শুধু আপনাকে কান বন্ধ করে রাখতে হবে যখন কারো পাঁজরে পুলিশের বুটের ভয়ঙ্কর মচ্‌মচ্‌ শব্দ শুনবেন, শুধু হতকুৎসিত স্থান বস্তি থেকে রাস্তার শতছিন্ন ভগ্ন মানুষগুলির থেকে আপনার দৃষ্টি উপরে তুলে রাখতে হবে, আর তাহলেই আপনি স্বস্তিকর একটা টিভির পর্দা খুঁজে পাবেন, আর অন্য একটা সৌন্দর্যের জগতে পৌঁছে যাবেন। বলিউডের চিরস্থায়ী তলপেট দোলানো নাচ - গানের জগৎ, চিরস্থায়ী সুবিধেপ্রাপ্ত চিরস্থায়ী সুখী ভারতীয়রা তিন - রঙা পতাকা দোলাচ্ছে আর ভালো থাকা অনুভব করছে। বলা কঠিন হয়ে পড়ছে দিনের পর দিন কোন্‌টা বাস্তব আর কোন্‌টা অলীক। পোটার মতো আইনগুলো টিভির মতো দরিদ্র, ঝামেলাবাজ, অবাঞ্ছিত মানুষদের আপনি শুধু সুইচ টিপেই মুছে ফেলতে পারেন।

নতুন ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ভারতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। একে কি নব- বিচ্ছিন্নতাবাদ বলব? এ হল পুরনো বিচ্ছিন্নতাবাদের উল্টো। এই বিচ্ছিন্নতাবাদের চরিত্রটা এমন--- যেখানে মানুষ একেবারে ভিন্ন অর্থনীতির অংশ হয়ে, ভিন্ন দেশ ভিন্ন গ্রহর অংশ হয়েও একসঙ্গে থাকার ভান করে। এই বিচ্ছিন্নতা এমনই যে এখানে তুলনামূলকভাবে জনসাধারণের একটা ক্ষুদ্র অংশ বিপুল পরিমাণ অর্থের অধিকারী হয়- তারাই জনসাধারণের বৃহৎ অংশকে বাদ দিয়ে জমি নদী জল স্বাধীনতা নিরাপত্তা মর্যাদা মৌল অধিকারসমূহ, এমনকি প্রতিবাদের অধিকারও ভোগ করতে পারে। এই বিচ্ছিন্নতার আকারটি উল্লম্ব, অনুভূমিক নয়, আঞ্চলিক নয়। এটাই হল সত্যকার কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস--- সেখানে উদয় ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন, যেখানে ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ইন্ডিয়া দ্য পাবলিক এন্টারপ্রাইজ থেকে আলাদা।

এটা হল এমন এক বিচ্ছিন্নতা যেখানে রাষ্ট্রের গড়ে তোলা উপরিকাঠামো, উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় সম্পদসমূহ --জল, বিদ্যুৎ, পরিবহন, দূর - সংযোগ প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ---এসব যা কিছু ভারতরাষ্ট্র তার জিম্মায় রেখেছিল, সে যে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে তাদের বিশ্বাসে ভর করে, এসব সম্পদ যা দশকের পর দশক ধরে জনসাধারণের অর্থে গড়ে উঠেছে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে--- সেগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানায় বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। ভারতে -- ৭০ কোটি মানুষ--গ্রামে বসবাস করেন। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করে তাঁদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয়। তাই প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ কেড়ে নিয়ে ব্যক্তি মালিকানার কোম্পানিগুলোর কাছে বেচে দিলে বর্বরোচিত মাত্রায় তাঁদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাঁদের দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

অল্প কিছু কর্পোরেশন এবং অবশ্য বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থাগুলি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের মালিকানা দখলের দিকে এগোচ্ছে। কম্পানিগুলোর বড় বড় অফিসাররা এই দেশকে নিয়ন্ত্রণ করছে--- এ দেশের উপরিকাঠামো এবং ব্যবহারযোগ্য সম্পদ, এর সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকগণ সবই তাদের অধীন, জনসাধারণের কোনো অধিকারই এখানে নেই। তাঁরা সম্পূর্ণভাবে গণনার অতীত--- আইনগতভাবে, সামাজিকভাবে, নৈতিক ও রাজনৈতিক কোনোভাবেই তাঁরা গণ্য হন না। যাঁরা বলেন এইসব বড় বড় অফিসারদের কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীদের থেকেও ক্ষমতাশালী তাঁরা জানেন তাঁরা আসলে কী বলতে চাইছেন।

এর অর্থনৈতিক নিহিতার্থের কথা ছেড়েই দিন --- রহস্যময়, দক্ষ, অত্যাশ্চর্য ইত্যাদি বলে যদি তার পঞ্চমুখ প্রশংসা করাও যায় (যা আসলে কার যায় না)---এর রাজনীতি কি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য? যদি ভারত রাষ্ট্র অল্প কয়েকটি কর্পোরেশনের কাছে নিজের দায়িত্বভার বন্ধক দিতে চায় তাহলে যে ভোটসর্বস্ব গণতন্ত্রের নাটক এই এখন আমাদের চারপাশে তীক্ষ্মস্বরে নিজেকে জানান দিচ্ছে তা কি সম্পূর্ণ অর্থহীন? অথবা এর একটা ভূমিকা তখও থেকে যাবে?

মুক্ত বাজারের (যা আসলে কোনোমতেই মুক্ত নয়) জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং ভীষণভাবেই প্রয়োজন। ধনী ও দরিদ্রের ভেতর বৈষম্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গরিব দেশগুলোর রাষ্ট্র গরিবদের জন্য কাজকর্ম কমিয়ে দেয়। কর্পোরেশনগুলো প্রচুর মুনাফার যে 'পিরিতের বোঝাপড়ার' জন্য ছোঁকছোঁক করে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাষ্ট্রযন্ত্রের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সেই বোঝাপড়ার নিষ্পত্তি হওয়া এবং সেই পরিকল্পনা কার্যকরী করা সম্ভব নয়। আজকের দিনে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির বিশ্বায়নের প্রয়োজনে দরিদ্রতর দেশগু

লাতে অনুগত দুর্নীতিগ্রস্ত স্বৈরাচারী সরকারের প্রয়োজন পড়ে, তাহলেই সেই দেশগুলোকে জনবিরোধী সংস্কার কাজে বাধ্য করানো যায়, সেখানের বিদ্রোহ শান্ত করা যায়। একেই বলা হয় 'বিনিয়োগের ভালো পরিবেশ তৈরি করা।'।

এই নির্বাচনে যখন আমরা ভোট দেব তখন আসলে আমরা বেছে নেব কোন্ রাজনৈতিক দলটি রাষ্ট্রের দমনমূলক পীড়নমূলক ক্ষম তাকে বিনিয়োগ করতে পারবে।

ভারতে এই মুহূর্তে আমরা একদিকে নব - উদারনৈতিক ধনতন্ত্র এবং অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক নব-ফ্যাসিবাদের বিপদজনক বিপরীত স্রোতের সঙ্গে সমঝোতা করে চলেছি। যদিও ধনতন্ত্র এখনো সম্পূর্ণভাবে তার জেল্লা হারায় নি তাই ফ্যাসিবাদ শব্দটা ব্যবহারে কখ নো কখনো আপত্তি ওঠে। শব্দটি কি আমরা আলগাভাবে ব্যবহার করছি?আমরা কি আমাদের পরিস্থিতিটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখি ছ? আমরা নিত্যদিন যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছি তাকে কি ফ্যাসিবাদ আখ্যা দেওয়া চলে?

যখন একটা সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ২০০০ মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পরিকল্পনাকে কম - বেশি খোলাখুলিভাবে স মর্থন করে, তা কি ফ্যাসিবাদ? যখন সে সম্প্রদায়ের নারীদের প্রকাশ্যে ধর্ষণ করা হয় এবং জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়, সেটা কি ফ্যাসি বাদ? এসব ঘটনার জন্য যাতে কেউ শাস্তি না পায়, শাসক সম্প্রদায় যখন সেদিকে নজর রাখে, তখন সেটা কি ফ্যাসিবাদ? যখন ১, ৫০০,০০০ মানুষকে গৃহছাড়া করা হয়, তাদের বিচ্ছিন্ন কোণ - ঠাসা করে রাখা হয়, অর্থনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে বয়কট ক রা হয়--- সেটা কি ফ্যাসিবাদ? যে সাংস্কৃতিকসংঘটি সারা দেশে ঘৃণা ছড়িয়ে দিতে চায় তারা যখন তাদের কাজে প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রম ন্ত্রী আইনমন্ত্রী বিলগ্নীকরণমন্ত্রীর সম্মান ও প্রশংসা দাবি করে, সেটা কি ফ্যাসিবাদ? যখন প্রতিবাদকারী চিত্রশিল্পী লেখক বিদ্বান ও চি ত্রপরিচালকতাঁদের প্রতিবাদের জন্য অপমানিত হন, হুমকি শোনান, যখন তাঁদের শিল্পকর্মকে পুড়িয়ে দেওয়া, নিষিদ্ধ বা ধবংস করা হয়--- তখন সেটা কি ফ্যাসিবাদ? যখন একটা সরকার বিদ্যালয়ের পাঠ্য ইতিহাস বইতে খেয়ালখুশি মতো পরিবর্তনের জন্য হুকুম নামা জারি করে, সেটা কি ফ্যাসিবাদ? যখন দাঙ্গাবাজেরা প্রাচীন ঐতিহাসিক নথি রক্ষণাগারগুলি আক্রমণ করে, পুড়িয়ে দেয়, যখ ন ছোটখাটো প্রত্যেক রাজনৈতিক নেতা মধ্যযুগের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদহওয়ার ভান করে, যখন ভিত্তিহীন জনশ্রুতির ওপর নি র্ভর করে কষ্টার্জিত পাণ্ডিত্যকে নস্যাৎ করে দেওয়া হয়, সেটাকি ফ্যাসিবাদ? যখন খুন ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গাবাজদের বিচারে ঘটনাগুলো ক্ষমতাসীন দল ও তার মজুত করা পোষা বুদ্ধিজীবীরা এই বলে উপেক্ষা করে যে এগুলো বহু শতাব্দী আগের কোনো স ত্যি বা কাল্পনিক ঐতিহাসিকভুলের প্রতিক্রিয়া--- তখন সেটা কি ফ্যাসিবাদ? যখন মধ্যবিত্ত শ্রেনী এবং পয়সাঅলা লোকেরা এক মু হূর্ত দাঁড়িয়ে 'ছিঃ ছিঃ' বলে, আর তারপর যেমন ছিল তেমনভাবেই জীবন কাটিয়ে যায়--- সেটা কি ফ্যাসিবাদ? যিনি এ সমস্ত কাে জর সম্পাদকের ভূমিকা গ্রহণ করছেন, সে প্রধানমন্ত্রীকে যখন বিজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক ও দূরদর্শী বলে প্রশংসা করা হয়, তখন আমরা কি পূর্ণ - প্রস্ফুটিত ফ্যাসিবাদের ভিত্তি স্থাপন করছি না?

শোষিত ও নির্জিত মানুষদের ইতিহাসে বড় অংশ এখনও পঞ্জীবদ্ধ করা হয় নি এটা সত্য, আর সেটা শুধুমাত্র সবর্ণ হিন্দুদের ক্ষেত্রেই খাটে না। যদি কোনো ঐতিহাসিক ভুলের প্রতিশোধ নেবার রাজনীতি আমাদের অভিপ্রেত পথ হয়, তাহলে ভারতের দলিত ও অ াদিবাসীদের নিশ্চয় অধিকার আছে খুন অগ্নিসংযোগ এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন ধবংসের পথ বেছে নেবার?

রাশিয়ার মানুষেরা বলেন অতীত সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। ভারতে বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাস বইয়ের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি কথাটা কতখানি সত্য। এখন সমস্ত 'ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষরা' প্রত্যাশা করছেন বাবরি মসজিদের নিচে যে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য হচ্ছে তাতে নিশ্চয় রাম মন্দিরের ধবংসাবশেষ পাওয়া যাবে না। কিন্তু এটা যদি সত্যি হয় যে প্রত্যেকটি মসজিদের নিচে এ কটা করে হিন্দু মন্দির আছে, তাহলে মন্দিরটির নিচে কী আছে? সম্ভবত অন্য কোনো হিন্দু মন্দির, অন্য কোনো ঈশ্বরের। সম্ববত কে ানো বৌদ্ধস্তূপ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো আদিবাসী থান। সবর্ণ হিন্দুত্বের থেকে ইতিহাসের শুরু হয় নি, হয়েছে কি? কত গভীে র আমরা খুঁড়ব? কতখানি ওলটপালট করব? যে মুসলমানেরা সামাজিকভাবে, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিকভাবে এক অবিচ্ছেদ্য ভার তের অংশ, কেন তাদের বহিরাগত, আক্রমণকারী বলে নিষ্ঠুর লক্ষ্যে পরিণত করা হবে? আর যে- দেশটা দু-শতাব্দী ধরে আমাদের উপনিবেশ করে রেখেছিল, সেই দেশের সরকারের সঙ্গে এ দেশের সরকার ভারতের উন্নয়ন প্রকল্পে সাহায্য পাবে বলে বাণিজ্যিক রফা ও চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যস্ত থাকবে? ১৮৭২ থেকে ১৮৯২---সেই মহা - দুর্ভিক্ষের সময়ে যখন ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরছিল, তখনও ব্রিটিশ সরকার ইংলন্ডেখাদ্য ও কাঁচামাল রপ্তানি অব্যাহত রেখেছিল। ঐতিহাসিক তথ্য বলছে সে - সময় ১ কোটি ২০ লক্ষ থেকে ২ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। সংখ্যাটা প্রতিশোধের রাজনীতির উপযুক্ত, নয় কি? অথবা প্রতিহিংসাট া কেবলই মজার যদি প্রতিহিংসার বলি যারা তারা হতদরিদ্র হয়, যদি সহজেই তাদের লক্ষ্যবস্তু বানানো যায়।

সফল ফ্যাসিবাদ একটা কঠিন কাজ হাতে নিয়েছে। আর তাই বিনিয়োগের উত্তম পরিবেশ বানানো হচ্ছে।

ব্যাপারটা বেশ আগ্রহের : ভারতের সেই সময়কার অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং যখন মুক্ত- অর্থনীতির জন্য ভারতের বাজার প্রস্তুত কর ছেন, তখন লালকৃষ্ণ আদবানী তাঁর প্রথম রথযাত্রায় সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগের তেলসিঞ্চন করছেন এবং নব - ফ্যাসিবাদের জন্য আমাদের প্রস্তুত করছেন। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে দাঙ্গাবাজরা বাবরি মসজিদ ধবংস করেছিল। ১৯৯৩ সালে মহারাষ্ট্রের ক ংগ্রেস সরকার এনরনের সঙ্গে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি সই করল। ভারতে ব্যক্তিগত মালিকানায় এটাই প্রথম বিদ্যুৎ প্রকল্প। সর্বনাশা ব লে প্রমাণিত এনরণ চুক্তি ভারতে বেসরকারি যুগের সূত্রপাত ঘটাল। এখন কংগ্রেস যখন সীমারেখার বাইরে থেকে চেঁচামেচি করল

, বিজেপি তখন লাঠিটি কেড়ে নিয়েছে। সরকার এখন দু-হাতে অসাধারণ তাল দিচ্ছে। একহাতে যখন সে জাতীয় সম্পদের বড় বড় চাঙরগুলো বেচেদিতে ব্যস্ত, তখন অন্য হাতে, মনোযোগ ঘুরিয়ে দেবার জন্য, শেয়াল কুকুরের মতো চেঁচামেচি করে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের সমবেদত সঙ্গীত গাইছে। একদিকের নির্মম নিষ্ঠুরতায় প্রত্যক্ষভাবে মদত দিচ্ছে অন্যদিকের উন্মত্ততাকে।

অর্থনৈতিকভাবেও এই দ্বৈত সঙ্গীত বেশ বাস্তবোপযোগী আদর্শ। নির্বিচার বেসরকারিকরণে উদ্ভূত বিশাল মুনাফার (এবং 'ভারত উদয়' এর সঞ্চিত সুদ) একটা অংশ হিন্দুত্ববাহিনীর আর্থিক সহায়তার জন্য খরচ করা যাচ্ছে---রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল এবং আরো অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও ট্রাস্ট যারা বিদ্যালয়হাসপাতাল ও সমাজ সেবার কাজ করছে তারা এখান থেকে অর্থ সাহায্য পাচ্ছে। আর এসবের ভেতরে সারা দেশ জুড়ে আছে হাজার হাজার শাখা। একদিকে তাদের ছড়ানো ঘৃণা, আর অন্যদিকে বাণিজ্যিক বিশ্বায়ন পরিকল্পনায়যে নির্মম দারিদ্র্য ও বঞ্চনা দেখা যাচ্ছে তার ফলে উদ্ভূত অনিয়ন্ত্রণসাধ্য হতাশা---এ দুয়ের মিশ্রণে গরিবের ওপর গরিবের সন্ত্রাসে মদত দেওয়া যাচ্ছে--- একটা নিখুঁত ধোঁয়ার পর্দা তৈরি করা যাচ্ছে যার আড়ালে ক্ষমতার কাঠামোটিঅটুট ও অপ্রতিস্পর্ধী থেকে যেতে পারছে।

অবশ্য, শুধু মানুষের হতাশাকে সন্ত্রাসের দিকে ঠেলে দেওয়াটাই সবসময় যথেষ্ট নয়। বিনিয়োগের উত্তম পরিবেশ তৈরি'র জন্য মাঝেমধ্যে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপেরও দরকার পড়ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানরত নিরস্ত্র মানুষদের ওপর, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যারা আদিবাসী,পুলিশ বারবার গুলি চালিয়েছে। ঝাড়খণ্ডের নাগরমারে, মধ্যপ্রদেশে মেহন্দিখেদায়, গুজরাতের উমরগাঁওয়ে, উড়িষ্যার রায়গর ও চিলিকায়, কেরালার মুথাঙ্গায়--- মানুষকে হত্যা করা হল।

প্রায় সব ক্ষেত্রেই যাঁদের ওপর গুলি চালানো হল তড়িঘড়ি তাঁদের জঙ্গি (পি ডলবিউজি, এমন সি সি, আই, এল টি টি ই) আখ্যা দেওয়া হল। পীড়ন বেড়েই চলেছে---জম্বুদ্বীপ কাশীপুর মইকঞ্জে।

যখন বলিরা আর বলি হতে রাজি নয় তখন তাঁদের বলা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী এবং তাঁদের সেরকমভাবেই মোকাবিলা করা হচ্ছে। অসম্মতির রোগে পোটা হচ্ছে সেই অ্যান্টিবায়োটিক যা দিয়ে নানা রোগ সারানো যায়। এই যুদ্ধও সন্ত্রাসের যুগে মানুষের অধিকার সুরক্ষা বৃদ্ধির পক্ষে এ বছর রাষ্ট্রপুঞ্জে ১৮১টি দেশ ভোট দিয়েছিল। এমনকি আমেরিকাও এর পক্ষে ভোট দিয়েছিল। ভারত বিরত থেকেছে। পূর্ণমাত্রায় মানুষের অধিকারসমূহে আক্রমণ হানার জন্য রঙ্গমঞ্চ তৈরি।

ক্রমশ হিংস্র রাষ্ট্রের আক্রমণকে তাহলে সাধারণ মানুষ প্রতিরোধ করবে কিভাবে?

অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনের ক্ষেত্রটা আজ দুর্বল হয়ে পড়েছে। দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে, অজস্র অহিংস গণপ্রতিরোধ সংগ্রাম একটা দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে, এবং তারা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করছে, এখন তাদের পথ পরিবর্তনের দরকার। পথ কি হবে সে নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর বিরাট মেরুকরণ ঘটেছে। কিছু মানুষ ভাবছেন সশস্ত্র সংগ্রামের পথটাই এমমাত্র খোলা। অন্যেরা উপলব্ধি করতে শুরু করছেন নির্বচনী রাজনীতিতে তাঁদের যোগ দেওয়া দরকার--- ব্যবস্থার ভেতর প্রবেশ করে দরকষাকষি করতে হবে। (কাশ্মীরের মানুষদেরও কি এই একই বেছে নেওয়ার সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে না?) যেটা মনে রাখা দরকার পদ্ধতির এই আমূল পার্থক্য সত্ত্বেও দুটো পক্ষই একটা বিশ্বাসে আস্থাশীল (নিষ্ঠুরভাবে বললে যা বলা যায়) --- যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।

এই বিতর্কটাই ভারতের এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক। এই বিতর্ক থেকে যা বেরিয়ে আসবে তা ভালোহোক আর মন্দই হোক---এ দেশের জীবনযাত্রার গুণগত মান বদলে দেবে। বদলে দেবে সবার। ধনী দরিদ্র গ্রামীণ শহুরে - সবার।

সশস্ত্র সংগ্রাম রাষ্ট্রের প্রচণ্ড গতির সন্ত্রাসকে আহ্বান করে আনে। কাশ্মীর ও উত্তর - পূর্ব ভারতে আমরা যেমন ফাঁদ বিস্তার হতে দেখেছি।

তাহলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেমন পরামর্শ দিচ্ছেন কি সেটা করব? অসম্মতি ত্যাগ করে নির্বাচনী রাজনীতির কলহে প্রবেশ করব? লোক দেখানো নাচনকোঁদনে যোগ দেব? যোগ দেব সেই তুমুল পারস্পরিক অর্থহীন কাদা ছোড়াছুড়িতে যার উদ্দেশ্য আসলে ভেতরে ভেতরে পরস্পরের মধ্যে যে প্রায় চরম বোঝাপড়া আছে তাকে আড়ালকরা? ভোলা যায় না যে প্রত্যেকটি বড় বড় ব্যাপারে --- পারমাণবিক বোমা, বড় বাঁধসমূহ, বাবরি মসজিদ বিতর্ক এবং বেসরকারিকরণে কংগ্রেস বীজ বুনেছে আর বিজেপি সেই কুৎসিত ফসল ঝেঁটিয়ে ঘরে তুলেছে।

এর অর্থ এই নয় যে লোকসভার কোনো গুরুত্ব নেই এবং নির্বাচনকে অস্বীকার করা দরকার। অবশ্যই ফ্যাসিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়া একটা পরিপূর্ণ সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে একটা সুবিধেবাদী সাম্প্রদায়িক দলের পার্থক্য আছে। অবশ্যই যে রাজনীতি খোলাখুলি ভাবে গর্বিতভাবে ঘৃণা প্রচার করছে তার সঙ্গে, যে রাজনীতি সুকৌশলে মানুষকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে তার তফাৎ আছে।

এবং অবশ্যই আমরা জানি একজনের উত্তরাধিকার আমাদের অন্যজনের আতঙ্কের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর এ দুয়ের মাঝখানে আলাদা কোনো বাছাই করার সুযোগ যে থাকতে পারে--- যা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র আমাদের দিতে পারত বলে মনে হয়---এরা দুজন সেই সুযোগটাই মুছে দিচ্ছে। নির্বাচনকে ঘিরে সৃষ্ট এই উন্মত্ততার এই সু - ভিত্তির পরিবেশ যে সংবাদ মাধ্যমের মধ্য-মঞ্চ দখল করে নিচ্ছে তার কারণ প্রত্যেকে এই জ্ঞানে নিরুদ্বেগ যে যে - কেউ জিতুক স্থিতাবস্থা মূলত অপ্রতিস্পর্ধী থাকবে। (লোকসভায়

আবেগমথিত ভাষণের পর কোনো রাজনৈতিকদলেরই নির্বাচনী প্রচারে পোটা বাতিলের প্রস্তাবটি অগ্রাধিকার পায় নি। তারা প্রত্যেকেই জানে একভাবে বা অন্যভাবে এটা তাদের দরকার।)

নির্বাচনের সময় বা বিরোধী পক্ষ থাকার কালে রাজ্য বা কেন্দ্রে কোনো সরকারই, বাম/ দক্ষিণ/ কেন্দ্র/ প্রদেশের, কোনো রাজনৈতিক দলই নব- উদারনৈতিকতাবাদের আওতার বাইরে থাকার ব্যবস্থা করতে পারে না। 'ভেতর' থেকে বাস্তবিকই কোনো আমূল পরিবর্তন হবে না।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি না নির্বাচনী কলহে প্রবেশ করা কোনো বিকল্প রাজনীতি। করি না, তার কারণ মধ্যবিত্ত - সুলভ খুঁতখুঁতে মানসিকতার জন্য নয়---'রাজনীতি হল নোংরা' বা সমস্ত রাজনৈতিক নেতাই দুর্নীতিগ্রস্ত।' করি না, তার কারণ আমি বিশ্বাস করি, কৌশলগতভাবে যুদ্ধটা হওয়া দরকার ক্ষমতার অবস্থান থেকে, দুর্বলতার অবস্থান থেকে নয়।

সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ এবং নব - উদারনৈতিকতাবাদের দ্বৈত আক্রমণের লক্ষ্য হল দরিদ্র ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের (যারা, যত সময় যাচ্ছে, আরও গরিব হচ্ছে)। যখন নব - উদারনৈতিকতাবাদ ধনী ও দরিদ্রের মাঝখানে, ভারত উদয় এবং ভারতের মাঝখানে শক্ত প্রাচীর তুলে দিচ্ছে, তখন কোনো মূলধারার রাজনৈতিক দলের পক্ষে একই সঙ্গে ধনী ও দরিদ্রের স্বার্থের সম্ভবত হতে পারে। একজন সম্পদশালী হিশেবে আমার 'স্বার্থসমূহ' (যদি আমি অভীষ্ট পূরণ করতে চাই) অন্ধ্রপ্রদেশের একজন গরিব কৃষকের স্বার্থের সঙ্গে একেবারেই মিলবে না।

যে রাজনৈতিক দল গরিব মানুষদের প্রতিনিধিত্ব করে সে - দল গরিবই হবে। সে - দলের তহবিল হবে নগণ্য। আজকের দিনে তহবিল ছাড়া নির্বাচনে লড়াই করা সম্ভব নয়। কয়েকজন সমাজকর্মীকে পার্লামেন্ট পাঠানোরব্যাপারটা আগ্রহোদ্দীপক, কিন্তু বাস্তবিক রাজনৈতিকভাবে অর্থময় নয়। ব্যক্তিগত দক্ষতা, ব্যক্তিত্বের রাজনীতিতে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করার প্রক্রিয়ায় কোনো আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে না।

অবশ্য গরিব হওয়ার অর্থই দুর্বল হওয়া নয়। গরীবের যে শক্তি সেটি অফিস বা আদালতের ভেতরে নয়। শক্তিটা বাইরে, প্রান্তরে, পর্বতে, নদী উপত্যকায়, শহরের পথে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে। দরকষাকষিটা সেখানেই করতে হবে। সংগ্রামটা সেখানেই চালিয়ে যেতে হবে।

এখন এই মুহূর্তে ওই ক্ষেত্রগুলো হিন্দু দক্ষিণপন্থীরা দখল করে নিয়েছে। ওদের রাজনীতি নিয়ে যে কেউ ভাবলেই টের পাবেন ওরা সর্বত্র আছে, ওরা প্রচণ্ড কাজ করছে। রাষ্ট্র যখন তার দায়িত্ব ত্যাগ করছে এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা আবশ্যকীয় সরকারি পরিষেবের ক্ষেত্র থেকে তহবিল প্রত্যাহার করছে, তখন সংঘ পরিবারের পদাতিক বাহিনীসেখানে প্রবেশ করছে। তাদের হাজার হাজার শাখার মর্মান্তিক মতবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তারা চালাচ্ছে স্কুল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, দুর্ঘটনা ব্যবস্থাপক কেন্দ্র। ক্ষমতাহীনতা কী --তারা বোঝে। তারা এও বোঝে যে মানুষের, বিশেষত ক্ষমতাহীন মানুষের, শুধুমাত্র নিত্যদিনের বস্তুগত গতানুগতিক জিনিশগুলোর প্রয়োজন আছে এবং আকাঙ্ক্ষা আছে তা নয়, তাদের আবেগমূলক, আত্মমূলক, আমোদপ্রমোদমূলক জিনিশের দরকার। তারা একটু কুৎসিত পাত্র বানাচ্ছে যাতে করে দৈনন্দিন জীবনের ক্রোধ নৈরাশ্য ও অপমান, এবং অন্য এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন পরিবেশন করা যায় এবং এইসব মানবিক আবেগগুলিকে অন্য ভয়াল লক্ষে পরিচালিত করা যায়। এরমধ্যে ঐতিহ্যগত মূল ধারার বামপন্থী দলগুলি এখনও 'ক্ষমতা দখলের' স্বপ্ন দেখে চলেছে, কিন্তুসময়ের দাবিকেস্বীকার করে নিতে তাদের ঘোর অনীহা। তারা নিজদের ভেতর অবরুদ্ধ, এবং এমন এক অগম্য বৌদ্ধিক অবস্থানে সরে গিয়েছে যেখান থেকে তারা যে প্রত্নভাষায় তর্ক করে অতি অল্প মানুষেরই তা বোধগম্য হয়।

সংঘ পরিবারের প্রচণ্ড আক্রমণের প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠতে পারছে শুধু অল্প কয়েকটি তৃণমূলস্তরের প্রতিরোধ আন্দোলন। 'উন্নয়নের' সাম্প্রতিক মডেলগুলি মানুষকে যেভাবে অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, মানুষের ওপর সন্ত্রাস নামিয়ে আনছে--- এই আন্দোলনগুলি তারই প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই আন্দোলনগুলি একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং (যদিও তাঁদের নামে নিরন্তর অভিযোগ করা হয় তাঁরা বিদেশি টাকা পান, তাঁরা বিদেশি এজেন্ট) তাঁরা প্রায় বিনা অর্থে কাজ করে চলেছেন এবং তাঁদের সম্পদ বলতে একেবারেই কিছু নেই। আগুনের বিরুদ্ধে তাঁরা চমৎকার লড়াই করছেন, তাঁদের পিঠ ঠেকেছে দেয়ালে। কিন্তু তাঁরা মাটিতে কান পেতে রয়েছেন। কঠোর বাস্তবতার স্পর্শে আছেন তাঁরা। যদি তাঁরা একত্রিত হতে পারেন, যদি তাঁরা সমর্থন পান এবং শক্তি সঞ্চয় করতে পারেন, তাহলে গণ্য হবার মতো একটা বল হিশেবে তাঁরা একত্রিত হতে পারেন, তাঁরা বেড়ে উঠতে পারেন। তাঁদের যুদ্ধ, যখন লড়াই হবে--- একটা আদর্শ যুদ্ধ হয়ে উঠতে পারবে--- অনমনীয় মতান্ধ যুদ্ধ হবে না।

এই সময়, যখন সুবিধেবাদকেই সব মনে হচ্ছে, যখন প্রত্যাশা পরাজিত, যখন সবকিছুই বিশ্বাসহীন বাণিজ্যিক রফায় পর্যবসিত হচ্ছে, তখন আমাদের স্বপ্ন দেখার সাহস রাখা দরকার। রোমান্সকে পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন। ন্যায় বিচার স্বাধীনতা ও মর্যাদার ওপর আস্থা রাখা রোমান্স। প্রত্যেকের জন্য সাধারণ ক্ষেত্রটা আমাদের খুঁজে বের করা দরকার -- আর তা করতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে এই বিশাল প্রাচীন যন্ত্রটি কিভাবে কাজ করে চলেছে--- কে এর পক্ষে আর কে এর বিপক্ষে কাজ করছে। কে খরচ করছে আর কে মুনাফা নিচ্ছে।

সারা দেশ জুড়ে যে অনেক অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন বিচ্ছিন্নভাবে একটামাত্র বিষয় নিয়ে লড়াই করছে, তাঁরা উপলব্ধি করছেন

স্থান - কালের ওপর নির্ভরশীল তাঁদের বিশেষ স্বার্থের রাজনীতি এখন তেমন আর যথেষ্টনয়। তাঁরা অনুভব করছেন তাঁরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন, তাঁদের আন্দোলন ঈপ্সিত ফললাভে অক্ষম, তবু কৌশলগত ভাবে অহিংস প্রতিরোধকে পরিত্যাগ করার যথেষ্ট কারণ নেই। বরং আত্মবিশ্লেষন করা আত্যন্তিকভাবে দরকার। দরকার দৃষ্টির। আমরা যারা বলছি আমরা গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে চাই--তাঁদের কাজের পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক ও সমানাধিকারের মূল্যবোধকে মান্য করে চলা দরকার। যদি আমাদের লড়াইটা মত অন্ধ হয় তাহলে আমরা আমাদের ভেতরে যে অবিচার সংগঠিত করে চলেছি, ---একে অপরের বিরুদ্ধে, নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে---সেই অবিচারেরসীমা বাস্তবিকই নির্ধারণ করতে পারব না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যাঁরা লড়াই করছে তাঁরা যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে না থাকেন। যাঁরা বাঁধ বা উন্নয়ন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন তাঁরা যেন সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা জাত - পাতের রাজনীতিতে নিজেদের প্রভাব ছড়াতে বিরত না থাকেন --- এমনকি তাঁদের এই মূহূর্তের সাময়িক সাফল্যকে বাদ দিয়েও সেটা করা দরকার। যদি সুবিধেবাদ এবং ফন্দিফিকির আমাদের বিশ্বাসের জায়গাটা দখল করে নেয়, তাহলে মূলধারার রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আমাদের কোনো পার্থক্যই থাকবে না। যদি ন্যায়বিচার আমরা চাই সেটা হবে ন্যায় বিচার এবং সকল মানুষের সমান অধিকার---শুধু বিশেষস্বার্থের সংস্কার নিয়ে বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠীর জন্য নয়। এখানে কোনো সমঝোতা চলবে না।

আমরা অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনকে ভালো আছি-র রাজনৈতিক নাট্যে রূপান্তরিত করেছি---- যারা সার্বাধিক সাফল্য প্রচার মাধ্যমের করে খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি, এবং ন্যূনতম সাফল্যের কথা যদি বলা হয় তাহলে বলাদরকার আন্দোলনটাই উপেক্ষিত হয়েছে।

আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার, প্রতিরোধের কৌশল সমূহ নিয়ে জরুরি আলোচনার দরকার, সত্যিকারের যুদ্ধে নামা এবং সত্যিকারের ক্ষতিসাধনে তৎপর হওয়া দরকার। আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন ডান্ডিঅভিযান কেবলমাত্র সুন্দর রাজনৈতিক নাটক ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতিকে তা ভেতর থেকে আঘাত হানতে চেয়েছিল।

রাজনীতির অর্থটি আমাদের পুনর্নির্ধারণ করতে হবে। নাগরিক সমাজের অসরকারিকরণে'র তৎপরতা আমাদের ঠিক উল্টো পথে চালিত করে। তা আমাদের রাজনীতিবিমুখ করে। তা আমাদের আনুকূল্য ও স্বহস্তদানের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। আইন অমান্যের অর্থটা আমাদের নতুন করে ভাবা দরকার

হয়ত আমাদের দরকার লোকসভার বাইরে একটা নির্বাচিত ছায়া পার্লামেন্ট, যার সমর্থন ও সম্মতি ছাড়া সত্যি - পার্লামেন্ট সহজে কাজ করতে পারবে না। সেই ছায়া পার্লামেন্ট যা ভূমিতলের প্রতিটি ধ্বনিকে উর্ধে তুলে ধরবে, যেখানে সমস্ত বৌদ্ধিক জ্ঞান ও তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে (মূলধারার সংবাদমাধ্যমে যা ক্রমশ অলভ্য হয়ে উঠেছে)। ভয়হীনভাবে, কিন্তু অ-হিংসভাবে আমরা এই যন্ত্রর অঙ্গহানি ঘটাতে থাকব, যা আমাদের গ্রাস করছে।

আমাদের বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। যদিও আমরা বলছি সন্ত্রাসের বৃত্তটা আমাদেরর ঘিরে ফেলেছে। যে কোনো পথেই পরিবর্তনটা আসবেই। হতে পারে সে - পথ রক্তাক্ত, হতে পারে সে - পথ সুন্দর।

১। লেখক এখানে Non-Government Organization -এর অন্দোলনের কথা বলেছেন। মূলে আছে 'Ngo'isation শব্দটি।
অনুবাদ: অনুপ চৌধুরী।

গণতন্ত্রই সমাজের কাম্য পরিবেশ

শিবনারায়ণ রায়

প্রশ্নোত্তর আকারে লেখাটি রচনার জন্য সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সমীর রায়

প্র ঃ :রাজতন্ত্র ও গ্রামীণ নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে দিয়েছে গণতন্ত্র। :এই গণতন্ত্র কী-ভাবে সামাজিক গতির মুখ উন্মুখ করল ?

উ ঃ :গণতন্ত্রের জ্ঞাতার্থ বা connotation বলতে বোঝায় এমন রাষ্ট্র যেখানে শাসন ব্যবস্থা জনসাধারণের হাতে। :অর্থাৎ যেখানে জনসাধারণ সার্বভৌম। :এই অর্থে এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন রাষ্ট্রই গড়ে ওঠে নি যাকে যথার্থ গণতন্ত্র :বলা যায়। :আসলে ক ম বেশি সব দেশেই শাসন ক্ষমতা যাদের হাতে তারা স্পষ্টত ই সে সমাজের ঊর্ধবজন— আমলা, পুলিশ, সেনাবাহিনী, শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার, আইনসভার সদস্য, রাজনৈতিক দল এবং এদের মধ্যেও :তারাই স্পষ্টত উচ্চ সোপানের অধিকারী। :সব মিলিয়ে তারা হয়তো সে দেশের নাগরিকদের শতকরা এক শতাংশের বেশী নয়। :সমাজতান্ত্রিকরা এদেরই বলেন :power elite. যথার্থ গণতন্ত্র :প্রতিষ্ঠার বিকাশের পথে এরাই প্রত্যক্ষ প্রধান অন্তরায়।

::::: তবে এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে গত দু-তিনশ বছরে পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে সাধারণ নাগরিকদের বেশ কিছু ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়েছে এবং ফলে মানব সমাজ গণতন্ত্রের আদর্শের দিকে কিছুটা এগিয়েছে। :গণতন্ত্রের ধারণা বেশ প্রাচীন বটে (গ্রীসের দুজন সেরা দার্শনিক প্লেটো, এ্যারিস্টটল গণতন্ত্রের চরিত্র :নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু ঐ ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন নি)। :তবে এটিকে বাস্তবে রূপ দেবার চেষ্টা শুরু হয় আঠারো শতকে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ফরাসী বিপ্লবের ভিতর দিয়ে । :গণতান্ত্রিক : আদর্শের যেটি মূল দার্শনিক ভিত্তি— অপ্রতিহার্য সর্বজনীন মৌল মানবিক অধিকারাবলীর নৈতিক দর্শন — এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা সেই ভিত্তি স্থাপন করে। :যে-রাষ্ট্র এই অধিকারাবলী মান্য করে সেই রাষ্ট্রই শুধু নাগরিক সাধারণের আনুগত্য প্রত্যাশা করতে পারে।

::::: কিন্তু যাকে 'সামাজিক গতি' বা social mobility বলা হয় গণতান্ত্রিক আদর্শের ঘোষণা তার জন্য যথেষ্ট নয়। :সামাজিক গতির অর্থ সমাজের নিম্ন স্তর থেকে উপর স্তরে ওঠা সহজতর হওয়া। 'সমান্তরাল গতি' ছড়স্ফজন্ত্রগ্ফল্ক্ষপ্ত প্লগ্সন্তপ্তন্দ্ধঞ্জা: অর্থাৎ :স্তরের পরিবর্তন না হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া থেকে এটি স্বতন্ত্র। :সামাজিক গতিকে সম্ভব করে শিল্প বিপ্লব। :এর পলে গ্রামভিত্তিক সভ্যতা থেকে নগর ভিত্তিক সভ্যতার বিবর্তন ঘটে। গ্রামীণ সমাজে প্রত্যেকের স্থান নির্দিষ্ট । ব্যক্তির জীবন এবং সামাজিক রীতিনীতি ও সম্পর্কাদি পরম্পরার দ্বারা পরিচালিত। :শিল্পবিপ্লব গ্রামের মানুষকে শহরে টেনে আনে। পরম্পরা ভেঙ্গে উদ্ভাবনার দিকে উদ্যোগী স্ত্রী-পুরুষকে আকৃষ্ট করে। :প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা ও সম্পর্কাদিতে বিপ্লব ঘটায়। :তার ফলে আবার নতুন এক power elite :গড়ে ওঠে— কিন্তু পরম্পরা সূত্রে তারা প্রাধিকারী নয়। রাজা এবং অভিজাততন্ত্রকে হারিয়ে প্রধান হয়ে ওঠে অভিজাত শ্রেণী। :নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা গণতন্ত্রকে সমর্থন করে। ::কিন্তু যেহেতু তারা কোন অবস্থাতেই নিজেদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর চায় না, তাই তাদের নিয়ত সচেষ্ট :থাকতে হয় যাতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক গতি তাদেরই পরিচালনাধীন থাকে। এ যুগে যে সব রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক বলা হয় সেখানে বাইরের কাঠামো বজায় রেখেই কী করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা পুরোপুরি বজায় রাখা যায় সেটাই power elite - দের বিনিদ্র সাধনা।

প্র ঃ গণতন্ত্রে ব্যক্তির উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির ভূমিকা গণতন্ত্রের রূপায়ণে কী ভাবে ইতিবাচক ও নেতিবাচক রূপলাভ করে ? :নিষ্ক্রিয়তা কাটাবার উপায় কী ?

::::: উঃ :আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা ও ফরাসী বিপ্লবের গণতন্ত্রের আদর্শ ঘোষিত হওয়া সত্বেও এখনও পর্যন্ত যে-কোন দেশেই যথার্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নি; তার একটা কারণ অবশ্যই বুর্জোয়া পাওয়ার এলিটদের উদ্ভব এবং তাদের ক্ষমতার সংরক্ষণ এবং বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিত্য নূতন উদ্ভাবনা। :কিন্তু তার অন্য একটা বড় হয়তো বা প্রধান কারণ হল যে জনগণকে সার্বভৌম বলে ঘোষণা করা হল তাদের ভিতরে অধিকাংশের মনে নিজেদের নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ববোধের অনুপস্থিতি। :বিবর্তনের পথে অন্য প্রাণীদের মতো মনুষ্য প্রজাতির ভিতর যে প্রায় অফুরন্ত সম্ভাবনা নিহিত অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে নানা কারণের সমাবেশে তার বেশীটাই এ তাবৎ বিকশিত হয় নি। :যে জিজ্ঞাসা বৃত্তি, বুদ্ধিশীলতা, স্বাধীনতার ক্ষুধা, উদ্ভাবনার তাগিদ, সহযোগের আগ্রহ, সৃজনের প্রেরণা প্রভৃতি সম্ভাবনা নিয়ে প্রত্যেকটি স্ত্রী-পুরুষ জন্মায় সেগুলি শিক্ষা, দাধনা এবং পরিবেশে পুষ্ট হয়ে উঠলে তবেই মানুষ যথার্থ ব্যক্তিতা অর্জন করে। :ব্যক্তিতা সম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষ শুধু নিজেকে :নয় সমাজকেও বিকশিত করে তোলে। :ব্যক্তিতাসম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষেরে উদ্যোগ ছাড়া কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব, স্থায়িত্ব এবং বিকাশ সম্ভব নয়। :গণতন্ত্রের ভিত্তি যে মানবিক অধিকার ব্যক্তিতাসম্পন্ন মানুষ সে সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন এবং প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। :এ-পর্যন্ত গণতন্ত্রের যতটুকু প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার ঘটেছে তার জন্য এদের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

::::: কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় বিভিন্ন সমাজে মূলত তিন প্রকৃতির মানুষ বিদ্যমান। :এক ধরনের মানুষ নিজেরা ভাবে না। :স্বাধী

ন ভাবে বিচার করে বিকল্পের মধ্যে বাছে না, অন্ধের মতো প্রতিষ্ঠিত পরম্পরার অনুসরণ করে জীবন নির্বাহ করেন । :এশিয়া এবং আফ্রিকার অধিকাংশ মানুষ এখনও এই অর্থে traditional oriented.

:দ্বিতীয় প্রকৃতির :মানুষরাও নিজেরা ভেবেচিন্তে দায়িত্ব নিয়ে পথ নির্বাচন করে না । :তারা বাজারে যখন যা চালু তার অনুসরণ : করে । এদের বলা যায় other

oriented. :এরা বিজ্ঞাপন ও প্রচারের বলি। :ইউরো -আমেরিকায় এবং আমাদের এখানে শহুরে মধ্যবিত্তদের অধিকাংশই দ্বিতীয় দলে পড়ে। :এই দুই প্রকৃতির স্ত্রী-পুরুষের উপর নির্ভর করে যথার্থ গণতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে না। :গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশের জন্য দরকার তৃতীয় প্রকৃতির মানুষ যারা স্বনিয়ন্ত্রিত self-

oriented, অনন্যতন্ত্র । তারাই মানবিক অধিকার বিষয়ে সচেতন এবং তার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী। :যে সমাজে এই প্রকৃতির লোক সংখ্যায় এবং অনুপাতে যত বেশী সেখানেই রাষ্ট্রব্যবস্থায় গণতন্ত্র ততোটা অগ্রসর। :ভোগবৃত্ত স্ত্রী-পুরুষ গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থার নির্ভরস্থল। :নিষ্ক্রিয় মানুষকে গণতন্ত্রের উপযুক্ত নাগরিকে পরিণত করার উপায় নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলা। :এর জন্য চাই অধিকার এবং দায়িত্ব বিষয়ে ব্যাপক শিক্ষার আন্দোলন এবং স্বাধীন সংযোগভিত্তিক সারি সারি সংগঠন ।

::::: প্রশ্ন ঃ :আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রের সমস্যা হিসাবে বড় শক্তির আগ্রাসন ও মাস কালচারের ভূমিকা কী ? :এর থেকে অব্যহতির ইঙ্গিত কী দেওয়া সম্ভব ?

::::: উ ঃ যাকে ''মাস কালচার'' বলা হয় তা যে গণতন্ত্রের কত বড় শত্রু তা নিয়ে আমি বিস্তারিতভাবে আমার ''গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও অবক্ষয়'' প্রবন্ধ গ্রন্থে আলোচনা করেছি। :সম্প্রতি এই বইটির তৃতীয় সংস্করণ দেজ-থেকে প্রকাশিত হয়েছে। :আধুনিক কালে বিভিন্ন প্রভাবশালী প্রচার মাধ্যমের সূত্রে এই ''মাসকালচার'' বা ''গণপিণ্ডের সংস্কৃতি'' সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে । নাচ, গান, পোষাক-আসাক থেকে শুরু করে মানবিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ সবই ক্রমে প্রচার মাধ্যমের দ্বারা নির্দিষ্ট হচ্ছে। এই সব মাধ্যম যে-সব প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিরা নিজেদের কুক্ষিগত করেছেন উত্তর-আধুনিক বিচার বুদ্ধি বিমুখ নীতিবোধহীন জীবনযাত্রার তারাই নিয়ামক।

::::: একদিকে ''মাসকালচার'' যেমন গণতন্ত্রের মানসজমিকে ব্যাধিগ্রস্ত করছে অন্যদিকে জগৎজুড়ে শক্তির কেন্দ্রাভিগ প্রক্রিয়া শুধু গণতন্ত্রের বিকাশকেই ব্যাহত করছে না, মানব প্রজাতির ভবিষ্যৎকেই অনিশ্চিত করে তুলছে। :লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুহূর্তে ধবংস করবার যে ভয়াবহ শক্তি গত পঞ্চাশ বছরে বিভিন্ন দেশের মুষ্টিমেয় মানুষের হস্তগত হয়েছে, ইতিহাসে তার কোন তুলনা মেলে না। : এই আগ্রাসী ধবংস শক্তির বীভৎস রূপ আমরা প্রথম দেখি হিরোসিমা-নাগাসাকিতে। :মার্কিন রাষ্ট্র আজ পৃথিবীতে ধবংস শক্তির সব চাইতে আগ্রাসী ধারক বটে, তবে পারমাণবিক আক্রমণে প্রতিবেশী দেশগুলিকে ধবংস করার শক্তি এখন অন্য বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র অর্জন করেছে অথবা :অর্জন করার পথে। :পরস্পর ধবংস হবার ভয় এ যাবৎ হিরোশিমার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেয় নি। :কিন্তু শক্তির কেন্দ্রীকরণ এবং নানা প্রকৃতির আগ্রাসন ক্রমে বেড়েই চলেছে। ::এই পরিবেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ অবশ্যই উজ্জ্বল ঠেকে না।

::::: এই সংকট থেকে উদ্ধারের কোন অবিলম্বে কার্যকরী পন্থা আমার জানা নেই। আমি শুধু বলতে পারি কেন্দ্রায়ন এবং আগ্রাসনকে অপ্রতিরোধ্য বলে না মেনে নিয়ে আমরা যারা গণতন্ত্রের আদর্শে আস্থাশীল তাদের কর্তব্য দেশে দেশে শক্তির কেন্দ্রায়ন এবং আগ্রাসী :নীতির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা। :এ জন্য দরকার মানবিক অধিকার এবং দায়িত্ব বিষয়ে ব্যাপক শিক্ষার উদ্যোগ এবং সে জন্য সক্রিয় নীতিনিষ্ঠ সহযোগভিত্তিক সংগঠন। :সাফল্যের কোন প্রত্যাভূতি বা নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন পথ দেখতে পাই :না। আইনস্টাইন যখন কী ভাবে যুদ্ধ যথার্থই নিষিদ্ধ করা যায় জানতে চেয়ে ফ্রয়েডকে পত্র লিখেছিলেন তখন ফ্রয়েড কোন কার্যকরী পথ বাতলাতে পারেননি। :(Freud-Civilisation and its Discontent, 1930, Einstein & Freud - Why War 1932)

:প্রশ্ন ঃ বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্রের রূপায়নে রাষ্ট্রসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এবিষয়ে যদি কিছু আলোকপাত করেন।

::::: উঃ :রাষ্ট্রসংঘ প্রথম থেকেই দুই ধরনের অসাম্যের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল। :মহাযুদ্ধের শেষে এক দল ছিল বিজয়ী, এক দল বিজিত। রাষ্ট্রসংঘ গঠনে যারা বিজিত তাদের কোন হাত ছিল না। :সমস্ত কর্তৃত্বই ছিল বিজয়ীদের হাতের মুঠোয়। :দ্বিতীয়ত, বিজয়ীদের মধ্যে যারা প্রধান তারাই শুধু নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্য হবার ফলে সিদ্ধান্ত নেবার আসল ক্ষমতা রয়ে গেল তাদের দখলে। :আপাত দৃষ্টিতে জেনারেল এ্যাসেমব্লির মাধ্যমে গণতন্ত্রের একটা কাঠামো গড়া হল বটে তবে কার্যকরী সামর্থ্য রয়ে গেল নিতান্ত সীমাবদ্ধ ।

::::: রাষ্ট্রসংঘ হবার পর বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে। :বিজয়ীদের মধ্যে দুই বড় সাম্রাজ্যব্যবস্থা — ব্রিটিশ ও ফরাসী — কিছু কালের মধ্যেই বিলুপ্ত হয়। :রুশ সাম্রাজ্য এখন বিলুপ্ত। :ফলে রাষ্ট্রসংঘে এবং বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন রাষ্ট্রের এখন প্রায় একচেটিয়া প্রাধান্য। তবে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি অনেকটা সম্মিলিত হবার ফলে মার্কিন প্রাধান্যের বিস্তারে তারা কিছুটা বাধা দিতে পারছে । :তা ছাড়া আর্থিক দিক থেকে জাপান এবং রাজনৈতিক দিক থেকে কম্যুনিষ্ট চীনও শক্তি হিসাবে আজ মোটেই নগণ্য নয়। :এ সবসত্ত্বেও এটা অনস্বীকার্য যে কী মাস কালচার কী আর্থিক - রাষ্ট্রিক -সামরিক আগ্রাসন সব দিক দিয়েই বর্তমান পৃথিবীতে মার্কিন

রাষ্ট্র প্রধান। :এবং সে রাষ্ট্রের বর্তমানে যিনি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট তিনি এমনি নির্বোধ এবং ক্ষমতামত্ত যে তার পক্ষে একুশ শতকের গোড়াতেই আর একটা মহাযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। :ইরাক আগ্রাসনের ফলে যে নতুন ক্রুসেড সূচিত হবে তার ভয়াবহতা অকল্পনীয়।

::::: গণতন্ত্রের দিক থেকে রাষ্ট্রসংঘের সব চাইতে স্থায়ী এবং প্রধান অবদান হল Declaration of Universal Human Rights. যে ভিত্তির উপরে যথার্থ গণতন্ত্র দাঁড়াবার কথা এই ঘোষণাপত্র তার মহৎ নির্দেশিকা। কিন্তু বহু সদস্য রাষ্ট্র এই ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করে নি। :ফলত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং প্রবর্ধনে রাষ্ট্রসংঘের খুব যে একটা ভূমিকা আছে এখন মনে হয় না।

::::: অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত দেশে দেশে ব্যক্তিগত বা সংগঠিত ভাবে কেন্দ্রায়ন এবং আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের সপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলাই আসল কাজ। :রাষ্ট্রসংঘকে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসাবে উপযোগী হতে হলে তার সংবিধানে ও কর্মপন্থায় ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। :তা নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনার মূল্য আছে। :কিন্তু যে আন্দোলনের উল্লেখ করেছি তা বলশালী না - হওয়া পর্যন্ত সংবিধানের কোন কার্যকরী রূপান্তর সম্ভব নয়।

::::: প্রশ্ন ঃ গণতান্ত্রিক কার্যকলাপে দলীয় শৃঙ্খল এক সমস্যা। :এর সমাধানে মানবেন্দ্র রায়ের ভাবনার কিছু পরিচয় যদি তুলে ধরেন।

উঃ :পশ্চিমে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থাও গড়ে উঠেছে। :এর কারণ প্রথমত, সব সমাজেই বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতা আছে। দ্বিতীয়ত, কোন একটি মাত্র পথেই কোন সমাজের :সব সমস্যার সমাধান মিলবে এ দাবী অবাস্তব এবং অসংগত। :ফলে বিভিন্ন সম্ভাব্য পথের অনুসারকেদের পক্ষে বিভিন্ন দল গড়া স্বাভাবিক। :তৃতীয়ত, কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠী নির্বাচনের ফলে ক্ষমতায় এলে তাদের সংযত রাখবার জন্য প্রতিপক্ষ দল দরকার। :পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল হেরে গেলে শাসনের দায়িত্ব ভার নেবার জন্যও এই প্রতিপক্ষের অস্তিত্ব জবুরি। ::এই সব কারণে প্রথমে পশ্চিমে এবং পরে পশ্চিমের অনুকরণে অন্য দেশেও দলব্যবস্থা (party system) গড়ে ওঠে।

::::: কিন্তু দলতন্ত্র অবশ্যই গণতন্ত্র :নয়। :প্রথমত দল মাত্রই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের চাইতে দলের আংশিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। :দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির বিবেক ও স্বাধীন চিন্তাকে দলীয় নির্দেশের অধীন করে দলব্যবস্থা গণতন্ত্রে র মূল নীতিকেই বরবাদ করে। :তৃতীয়ত, দলে মুখ্য এবং প্রায় একমাত্র উদ্দেশ্য হল ক্ষমতায় আসীন হওয়া এবং ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত না হওয়া। :এ জন্য এমন কোন দুর্নীতি নেই প্রয়োজন হলে দলীয় নেতৃত্ব যার আশ্রয় নিতে সঙ্কোচ বোধ করে। :শুধু ভারতবর্ষে নয়, বিলেতে, ফ্রান্সে, আমেরিকাতে, জাপানে সর্বত্র তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশেই দেখতে পাই ক্ষমতার লোভে রাজনৈতিক দলগুলোতে অনাচারের প্রায় সর্বব্যাপিতা।

::::: মানবেন্দ্রনাথ জীবনের একটা বড় অংশ দলীয় রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন, প্রথমে স্বদেশী গুপ্ত রাজনৈতিক দলের নেতা হিসাবে, পরে কমিন্টার্নের নেতা হিসাবে। :আরো পরে কংগ্রেসের অন্যতম বামপন্থী নেতা হিসাবে। দীর্ঘদিনের :এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি শেষ জীবনে সিদ্ধান্তে আসেন যে সুস্থ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে দলতন্ত্র একটা প্রধান বাধা। তাঁর শেষ পর্যায়ের লেখালেখিতে তিনি দলহীন রাজনীতির তত্ত্বপ্রচার করেন । সংক্ষেপে বলতে গেলে মানবেন্দ্র পরিকল্পনা করেছিলেন এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রধান অংশ একেবারে নীচের তলায় :স্থানীয় সংগঠিত সমাজের হাতেই থাকবে। ::স্থানীয় প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষেরা নির্বাচন করবে স্থানীয় গণসমিতি বা :people's committee. তাদের :হাতেই স্থানীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, পথঘাট, শান্তিরক্ষা, ন্যায়বিচার ইত্যাদি মূল বিষয়গুলি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব থাকবে। :অনেকগুলি গ্রামের স্থানীয় গণসমিতি নির্বাচন করবে জেলার গণসমিতি, জেলার গণসমিতিগুলি মিলে নির্বাচন করবে প্রাদেশিক গণসমিতি। :এইভাবে পিরামিডের আকারে একটি কাঠামো গড়ে উঠবে যেখানে সর্বোচ্চস্তরে জাতীয় সমিতি বা আইন সভার হাতে নির্দিষ্ট অল্প কয়েকটি ব্যাপারে দায়িত্ব থাকবে। যে প্রক্রিয়াটির উপরে মানবেন্দ্র জোর দিয়েছিলেন তা হল ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রতিটি সামূহিক সিদ্ধান্তে সংগঠিত জনগণের কার্যকরী ভূমিকা। :কিন্তু এই বিকেন্দ্রন এবং সংগঠিত জনগণের কার্যকরী ভূমিকা সম্ভব করতে হলে প্রথমেই চাই জনগণের মানস উজ্জীবন। :মানবেন্দ্র একেই বলতেন প্রকৃত রেনেসাঁস। :এটি বিহনে যথার্থ গণতন্ত্র যার তিনি নাম :দিয়েছিলেন Radical Democracy :তার উদ্ভব অসম্ভব ।

::::: প্রশ্ন ঃ গণতন্ত্রে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার জন্য বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। :এই বিকেন্দ্রীকরণের উপকার ও অপকার সম্পর্কে যদি কিছু বলেন ।

গণতন্ত্রে বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে দেশে বিদেশে অনেক মনীশী লিখেছেন। :এই মতবাদের সব চাইতে চরমপন্থী প্রবক্তারা এ্যানার্কিস্ট বা নৈরাজ্যবাদী। :কিন্তু যারা নৈরাজ্যবাদী নয় এমন অনেক ভাবুকও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেছেন এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে খর্ব করে সেই ক্ষমতাকে ছোট ছোট বহু সংগঠনে ছড়িয়ে দেবার সপক্ষে লিখেছেন। প্রুঁধো, ক্রুপট্‌কিন, এলিজে, রেক্লু, এরিকো মানেতেস্তা, রুড লফ রকার এদের কথা বাদ দিলেও বিকেন্দ্রীকরণের সপক্ষে নানা দিক থেকে যুক্তি দিয়েছে শুমেকার, লেভি ষ্ট্রাউস,হেজেল হেন্ডারসন এবং আরো অনেকে । জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে নানা বিভিন্নতা সত্ত্বেও এদেশের অন্তত তিন জন প্রধান ভাবুক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে চেষ্টিত হয়েছিলেন — রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও মানবেন্দ্র রায় ।

::::: বিকেন্দ্রীকরণের একটা দিকের কথা মানবেন্দ্র প্রসঙ্গে আগেই বলেছি। বিকেন্দ্রীকরণের প্রধান ও প্রত্যক্ষ সুবিধা হল তার ফলে সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ সব ব্যাপারে সরকারের উপর নির্ভর করে নাবালক হয়ে বসে থাকে না। :পরস্পরের সহযোগে নাগরিক জীবনের সাধারণ যে সব প্রয়োজন যেমন শিক্ষা , স্বাস্থ্য, বাসস্থান ইত্যাদি তার দায়িত্ব তাদের নিতে হয়। :গ্রামের র্বাচিত প্রতিনিধিরাই যদি ন্যায় বিচারের দায়িত্ব নেয় তা হলে কে যাবে সময় ও অর্থ ব্যয় করে জেলা বা রাজধানীর আদালতে। :বিকেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় স্থানীয় স্ত্রী-পুরুষ যখন স্থানীয় প্রয়োজন এবং সমস্যা মেটানোর ভার নেয় তাদেরও ব্যক্তি হিসাবে বিকাশ ঘটে। :পিরামিডের ধাপে ধাপে সংগঠন যতো ওপরে ওঠে ততো তার দায়িত্বের ভৌগোলিক সীমা বাড়ে তার শক্তির সীমা ততো কমে আসে। :বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম ধাপ ফেডারেশন পরের ধাপ কনফেডারেশন। :পরিণত ধাপ গণসমিতি ভিত্তিক র‍্যাডিকাল ডেমক্রাসী ।

::::: বিকেন্দ্রীকরণের ফলে শুধু ব্যক্তির বিকাশের পথ সুগম হয় না, একটি দেশের মধ্যে বিচিত্র যেসব ভাষা, লোকসংস্কৃতি, ধ্যানধারণা বর্তমান তারাও বিকাশের সুযোগ পায় । :স্থানীয় সমাজের যে মানবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সমসযা বর্তমান স্থানীয় মানুষ তা যেমন জানে, দূরবর্তী রাজধানীর কর্তাদের তেমন ভাবে জানবার তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। :কেন্দ্রাভীমুখি রাষ্ট্র চায় সব কিছুকে পিন্ডিভূত করে তাকে এক ছাঁচে ফেলে শাসনকার্য সহজতর করতে। :ব্যক্তির বিকাশে বা বৈচিত্র্যের পরিস্ফুটনে কেন্দ্রীয় শক্তির কোন আগ্রহ তো নেইই বরং প্রবল বিরোধিতা আছে। :শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের :আর একটা সুফল হল যে তার ফলে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের যুদ্ধ দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে । :কারণ এই প্রক্রিয়ার ফলে রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা অনেকটাই হ্রাস পায়। :এবং নিচের তলা থেকে সমর্থন না পেলে যুদ্ধ যদি বা ঘোষণা :করা হয় চালানো যায় না ।

::::: তবে বিকেন্দ্রীকরণের সমস্যা কম নয় । :প্রথমত, সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ তাদের নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব :বিষয়ে সচেতন ও সক্রিয় না হলে বিকেন্দ্রীকরণ আদৌ কার্যকরী হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র গোষ্ঠিতে পর্যবসিত হওয়া নয়। :যখন অনেক স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠি একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন স্বভাবতই কিছু কিছু দায়িত্বভার কেন্দ্রের হাতে রাখতেই হয় যেমন বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে দেশকে রক্ষা, পররাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক, সারাদেশে একটি সাধারণ মুদ্রা ব্যবস্থা। ::কী কী সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি নিলে কেন্দ্রের এই ক্ষমতার অপব্যবহার অসাধ্য করা যায় তা নিয়ে আরো অনেক বিচার বিশ্লেষণ দরকার।

(প্রশ্নোত্তর আকারে লেখাটি রচনার জন্য সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সমীর রায় —স)

গণতন্ত্রই ব্যক্তির বিকাশের পরিবেশ

ব্যক্তির বিকাশেই গণতন্ত্রের নিশ্চয়তা

সংস্কৃতির ভূমিকা
অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বাক বসন্ত - দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং

প্রকৃতি পরিবেশের সমান অধিকার -- এমন নীতিবোধ থেকেই গড়ে উঠেছিল মৌলিক পরিবেশ - বিজ্ঞান সাহিত্য। ব্যতিক্রমি এই বিজ্ঞান - সাহিত্য বিশ শতকের ছয়ের দশকে এই পৃথিবীতে তুমুল আলোড়ন ফেলে। বলা যায় আধুনিক পরিবেশ চর্চা, পরিবেশ আন্দোলনের স্রষ্টা রাচেল কারসনের এই গ্রন্থ।

তাঁর এই বিখ্যাত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আলো করা বইটি-- দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং, আমাদের হুঁস ফিরিয়ে দিয়েছিল। গত পাঁচের দশক থেকে আমেরিকায় ফলন, আরও ফলনের আশায় দিকে দিকে ক্ষেতে খামারে ছড়ানো হয়েছিল কীটনাশক, রাসায়নিক ডিডিটি। বলা হয়েছিল, ফলনের লাভ অনেকটাই কীট - পতঙ্গ পোকামাকড়ে খেয়ে নেয়। উদ্বৃত্ত ফসল, আরও ফলন, দেশে - বিদেশে বাণিজ্য আরও অর্থনৈতিক মুনাফা এনে দেবে। ক্ষেত - খামারের পরিসর, প্রকৃতির আপন কোল আলো করা সবুজের আহ্বান, কিংবা হলুদ ফসলের অধিকার থেকে শুধুই কর্তৃত্ববান মানুষের। আরও কারও, কোনও জীবপ্রাণের অধিকার যেমন তাতে নেই।

ধরিত্রীর আস্তরণের উর্বর মাটি, খাদ্য ফলনের সম্ভাবনা সমৃদ্ধ। পৃথিবীর ফলবতী বুকে আশ্রয় লাভ করে প্রকৃতি পরিবেশ প্রাণ। কত রকমের উদ্ভিদ, তরুগুল্ম, গাছগাছালি, অরণ্য বেড়ে ওঠে এই মাটিতে। মানুষ যেমন সেই মাটিকে শ্রমসুন্দর জীবনের ছন্দে ফলবতী করে তোলে, প্রায় তেমনভাবেই ক্ষেত মাটির বন্ধু পোকামাকড় জমিকে উর্বর হতে সাহায্য করে। অন্যদিকে ফসলের ক্ষতি করে এমন কীটপতঙ্গ পাখিদের খাদ্য। গাছে গাছে ফল ধরে। মাছেরা নদীতে আপন আনন্দে চলে ফেলে। শস্যভরা ক্ষেতের উচ্ছল - প্রাণ - সঞ্চার যেন পাখিদের ডানায়ও তরঙ্গ তোলে। বসন্ত আসে। নরম হলুদ বিকেলের স্নেহচ্ছায়ায়। পাখিরা কলতানে জানিয়ে দেয়, তাদের সন্তান সম্ভাবনার কথকতা। জীবনে জীবন যুক্ত হয়। বৃহত্তর প্রাণচক্র ঋতুতে আবর্তিত হয়। কাছের লোকালয় জেগে থাকে নানান পশুপ্রাণের আনাগোনায়। ক্ষেতভরা ফসল, কীটপতঙ্গের চলাফেরা, পাখির কলতান, মাছেদের নির্ভার সন্তরণ আর সবুজ সংগীত মাঝে মানুষের যাওয়া আসা। আপাত তুচ্ছ পোকামাকড় থেকে, উচ্চ প্রাণ - প্রকৃতি আর মানুষ, যেন গড়ে ওঠার ছন্দে মেতে ওঠে। একে অপরের পরিপূরক স্বচ্ছন্দময় জীবন সত্যে। যাত্রী, সহযাত্রী -- এমন ভাবনা ও ভাবের ঐক্যই গড়ে তোলে সুষম পরিবেশ জীবন।

আবার আপাত তুচ্ছ কোনো দুর্ঘটনা বৃহত্তর বিপর্যয় সংকেত বহন করতে পারে। বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে সেই সব ঘটনা বিশ্লেষণ করতে হয়। যেমন করেছিলেন রাচেল কারসন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন আমেরিকায় বসন্ত এল; ক্ষেত ভরা ফসল। কিন্তু পাখিরা গান গাইছে কই! এমনকি ঘটল তাদের জীবন আনন্দে? তারা যে গান গাইছে না!

এই প্রশ্ন একজন বিজ্ঞান - সাহিত্যিকের। যিনি প্রত্যক্ষ পরিবেশে বাস করে, অনুসন্ধান করেছেন ওই অবস্থা। পর্যালোচনা করেছেন বিজ্ঞানীর চোখ ও মন দিয়ে। সাহিত্যিকের হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন পরিবেশ - পরিস্থিতির। আর এমন বিপর্যস্ত অমানবিক পরিবেশ অবস্থাকে বিশ্লেষণ ও ব্যক্ত করেছেন এক অনবদ্য ভাষায়, সাহিত্য সৃষ্টি - পথে। এমন দৃষ্টি থেকে সৃষ্টিতে উত্তরণ যিনি অনায়াসে করতে পারেন, তিনিই তো আমাদের পরিবেশ সাহিত্যিক। 'দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং' - এ আসবার আগে রাচেল কারসন - এর জীবনটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

।। দুই।।

আমেরিকার বিখ্যাত প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও পরিবেশ - বিজ্ঞান লেখিকা রাচেল কারসনের জন্ম ১৯০৭ পেনসিলভেনিয়ায়। জন্ হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিদ্যা বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন (১৯২৭)। মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩১-৩৬) প্রাণীবিদ্যা নিয়ে গবেষণাও শিক্ষকতার কাজ করেছেন। ১৯৩৬-৫২, তিনি 'জেনেটিক বায়োলজিস্ট' রূপে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। জীব, প্রকৃতি, পরিবেশসংরক্ষণ বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ 'নিউ ইয়র্কার' প্রভৃতি বিখ্যাত জার্নালে প্রকাশিত হতে থাকে। সামুদ্রিক দূষণ নিয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থ 'দ্য সি অ্যারাউন্ড আস্' (১৯৫২), 'আন্ডার দি সি ওয়লড', 'দি এজ অফ দি সি' -- সামুদ্রিক দূষণের ভয়াবহতা সম্বন্ধে আমাদের প্রথম সজাগ করে তোলে। পরিবেশ সমস্যা ও ইকোলজি চর্চা যখন তেমন কোনও পরিচিত বিষয় হয়ে ওঠেনি, সেই ছয়ের দশকের শুরুতে, তাঁর ইতিহাস সৃষ্টিকারি বই 'দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং' পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মে সাড়া ফেলেছিল।

আমেরিকায় ব্যাপক কৃষি উৎপাদন করতে গিয়ে কীটনাশক রাসায়নিক বিশেষত 'ডিডিটি'-র ভয়ঙ্কর প্রকোপে বহু প্রাণী সম্পদও প্রকৃতির স্বাভাবিক ভাসসাম্য নষ্ট হয়। প্রকৃতি পরিবেশের এই দূষণ সম্বন্ধে এই বইটিই প্রথম সাড়া জাগায় আধুনিক পরিবেশ চেতনা গড়ে তোলে। কৃত্রিম কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহারও নিয়ন্ত্রিত হয়। ভেষজ কীটনাশক প্রস্তুতির দিকে নজর দিতে আরম্ভ করা হয়। পরিবেশের দূষণ ও সংরক্ষণ প্রশ্নে আন্দোলনেরও শুরু হল সেই সময় থেকেই। একাধারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং সাহিত্য কর্মের জন্য, রাচেল কারসন, বহু পুরস্কার লাভ করেন। 'ন্যাশনাল বুক আওয়ার্ড ফর নন ফিকশন্' 'গোল্ড মেডেল অফ নিউইয়র্ক জুলজিকাল সোসাইটি' এবং 'কনসারভেশনিস্ট আওয়ার্ড --- ন্যাশনাল ওয়াইল্ড লাইফ ফেডারেশন' তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আবার আর

একদিকে ‘রয়াল সোসাইটি অফ লিটারেচার’ - এর সম্মানিত ফেলো ছিলেন। ‘ন্যাশলান ইনস্টিটিউট অফ আর্টস অ্যান্ড লেটারস’-এর সদস্য ‘ইু এসফিস স্ট্যান্ডওয়াইল্ড লাইফ সারভিস’ - এর ‘এডিটর ইন চিফ’। এত সব গুণের অধিকারী কারসন যখন এমন বিরল ইকোলজি ট্রাজেডিনিয়ে বইটি লিখলেন স্বাভাবিক কারণেই সম্প্রতি বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ দশটি গ্রন্থ নিয়ে যে ‘হল অফ ফেম’ নির্মাণ করা হয়েছে, তাতে গৌরবের সঙ্গে এই বিজ্ঞান - সাহিত্যটি পূর্ণ মর্যাদায় স্থান পেয়েছে।

মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন পারিবেশিক গৃহবাণীর। আপাত তুচ্ছ কীটপতঙ্গের কথাও ভেবেছিলেন, যেমন ভেবেছিছেনল পাখিদের কষ্ট, কষ্ট নদী কিংবা বনভূমি অথবা কাছের মাটি প্রাণের। এমন তথ্যপ্রাণ ও পরিবেশ চেতনা সমৃদ্ধ বইটির বিভিন্ন পরিচ্ছেদ কখনও রূপকথার ঢঙে, আবার কখনও - বা অভিজ্ঞতা - প্রতিবেদন ছন্দে বিন্যস্ত।

।। তিন।।

১৯৭০ সাল অবধি পরিবেশ সচেতনতা মুখ্যত দূষণ কেন্দ্রিক ছিল। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আবর্জনা, বায়ু দূষণ, রাসায়নিক কারখানা থেকে বেরিয়ে আসা বর্জ্য জলীয় দূষণ, সমুদ্রে জাহাজ থেকে নিক্ষিপ্ত তৈল দূষণ ইত্যাদি। আমেরিকায় ১৯৬৯ সালে প্রথম ‘জাতীয় পরিবেশ নীতি আইন’ (এন.ই.পি.এ.) তৈরি হল। যে কোনও নতুন কলকারখানা পরিকল্পনায় পরিবেশ সংক্রান্ত প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা বাধ্যতামূলক হল। এরপর পরিবেশ সচেতনতা আরও বড় আন্দোলনের রূপ নিল। ১৯৭০ সালে প্রথম পৃথিবী দিবস পালন শুরু হল। ১৯৭২, স্টকহোমে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে স্থানীয় পরিবেশ এবং বিশ্ব পরিবেশ সমস্যাসমূহ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা শুরু হল। পরিবেশ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশমুখি পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা গড়ে উঠতে থাকল। যে কোনও উন্নয়ন ব্যবস্থার যে অর্থনৈতিকও পরিবেশজাত অবস্থায় ভূমিকা থাকে -- এমন ধরনের আলোচনার সূত্রপাত ঘটল সেই প্রথম। এইখান থেকেই বিশ্ব পরিবেশ চেতনা এবং পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয় নিয়ে দিকে দিকে আলোচনা ও প্রয়োগ সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল। দারিদ্র ও পরিবেশ দূষণ এমন প্রসঙ্গও বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

ইউনাইটেড নেশনস-এ পরিবেশ সংরক্ষণে এন জি ও -দের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনাকে বিষে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হল। এই থেকেই ১৯৭২ সালেই জাতি সংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (ইউ এন ই পি) -র কাজকর্ম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ১৯৮৭ সালে ব্রান্ডল্যান্ড রিপোর্ট - এ পরিবেশ সংক্রান্ত ভবিষ্যত কর্ম -আদর্শ ও পরিবেশ সহায়ক জীবন পরিচালনা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা ও চর্চা আরও এগিয়ে এল। ১৯৮৭ সালে ডব্লিউ সি উ ডি, ‘আওয়ার কমন্ পিউটার’ নামে বিস্তৃত রিপোর্ট প্রকাশ করে। এরপ ১৯৯২ সালে, রিও-র বসুন্ধরা সম্মেলন। যেখানে বিশ্বের প্রায় ১৭৮টি রাষ্ট্র, ১০০-রও বেশি রাষ্ট্রনায়ক যুক্ত হয়েছিলেন। পরিবেশ অবস্থার ক্রম অবনতি সামাল দিতে প্রতিটি দেশে কার্যকর ব্যবস্থা, পরিকল্পনার নানা উদ্যোগ, পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, গ্রীনবেঞ্চ প্রভৃতি গড়ে তুলতে হয়। বলা যেতে পারে বাধ্য হতে হয়, কারণ ততদিনে প্রায় প্রতিটি দেশে, কি উন্নত, কি উন্নতিশীলপ্রায় সর্বত্রই আকাশ, বাতাস, জল, মাটি, পথঘাট দূষণ ছায়ায় আক্রান্ত। মানুষ বিপর্যস্ত রোগ মহামারীতে। রিও - তে বসুন্ধরা সম্মেলনে -- অ্যাজেন্ডা ২১,দ্য রিও ডিক্লারেশন -- শপথ নেওয়া হল। প্রাধান্য পেল পরিবেশমুখি জীবন- আচরণ ও উন্নয়ন। তার জন্য দরকার প্রকৃতিমুখি স্থিতিযোগ্য পরিবেশ সংস্কৃতি। দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সামাজিক - অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিস্তৃত করতে দেশে দেশে পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ কাঠামোকেও আরও সুদৃঢ় করা হয়। কিন্তু আইন, সেমিনার, সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় সবটা হয় না। হয় না যে তাও দেখা হয়েছে। ৯২-র পর বায়ুদূষণ, নদীতে সমুদ্রে, মাটিতে দূষণ ভার, আমাদের নিত্যজীবনে আরওযেন বিস্তারিত হয়েছে। আগামী দিনে এই অবস্থা আরও ভয়াবহ, ভয়ঙ্কর হতে পারে এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রযুক্তি ব্যবস্থা, আইনি কাঠামো এবং সরকারি - বেসরকারি নানান ছোট - বড়, সফল - আধা - সফল উদ্যোগ সত্ত্বেও, পরিবেশচেতনাকে সর্বত্রগামী করে গড়ে তোলা যায়নি। পরিবেশ স্বাস্থ্য, বৃহত্তর মানুষের জীবন ধারন ও অবস্থার উন্নতি, তেমনভাবে ঘটানো আজও যায়নি। সত্যি বলতে কি, পরিবেশ রক্ষার দায় ও দায়িত্ব যে ছোট - বড়সমস্ত মানুষেরই আছে এই দায়িত্ব - কথা মানুষের দৈনন্দিনজীবন চেতনায় স্থান পায়নি। কাছের প্রকৃতি পরিবেশের কোনও ক্ষতিসাধন ঘটল কিনা, কোথাও কোনও ঘটনা বৃহত্তর পরিবেশ কিংবা জীবন বিপর্যয় - কেউ ডেকে আনতেচলেছে -- এইসব বিষয়ে এখনও মানুষের বৃহত্তর সচেতনতা কিছু গড়ে ওঠেনি। কাছের বস্তুতন্ত্রকেও মানুষ কিন্তু কখনও গায়ের জোরে, রাজনৈতিক আস্ফালনে অথবা কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থে, আঘাত করেই চলেছে। এমন অবস্থা চলতেথাকলে স্থিতিযোগ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ বান্ধব সংস্কৃতি চিরকালই অধরা থেকে যাবে। ভবিষ্যতের জীবন হতে পারে অস্তিত্বরক্ষারই মহাসংকট।

নানান বাস্তবিক পরিবেশ ব্যবস্থা পরিকল্পনাকে জীবন অভিমুখী করে নিত্যদিনে যেমন যুক্ত করতে হবে, তেমনই পরিবেশ সংস্কৃতিকেও যুক্ত করতেই হবে জীবনযাত্রার আনন্দ পথে। এই যাত্রায় সাহিত্য - সংস্কৃতি, বিজ্ঞান - প্রযুক্তি, আন্তছন্দযুক্ত পথে এসে মিলবে।সাহিত্য - সংস্কৃতি বড় ভূমিকা নেবে বৃহত্তর মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য পুর্নগঠনে আর সামগ্রিক পরিবেশ চেতনার উদবোধনে।

।। চার ।।

পরিবেশ সাহিত্যকে, বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং প্রখর মানবিক অনুভবে বিন্যস্ত করেছিলেন রাচেল কারসন। গভীর অন্তদৃষ্টি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা -- এমন এক প্রতিবেদন শক্তিকে আমাদের সামনে রাখল, যা থেকে কিছু মানুষের হুঁস ফিরে এল। ভুল, আরও বৃহত্তর ভুল থে

কে শস্যক্ষেত্র, নদী, বনভূমিকে চিরতরে নির্বান্ধব হওয়া থেকে রক্ষা করেছিল।

পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ বইটির পরিচ্ছেদ বিন্যাস অত্যন্ত অর্থবহ। 'এ ফেবল্ ফরম টুমরো' দিয়ে আরম্ভ করেছেন। খুব ছোট পরিচ্ছেদ। কিন্তু গভীর বিপর্যয়ের মুখোমুখি করেছেন যেন আমাদের অধ্যায়টির শেষে বলেছেন,

What has already silenced the voices of spring in countless towns in America? This book is an attempt to explain.

নির্বাক বসন্তের কার্যকারণ বলবার আগে পাঠকদের নিয়ে যাচ্ছেন লোককথার মতন কল্পনায়। নীতিগল্পবিশেষের আশ্রয় নিচ্ছেন যেখানে জীবজন্তু, গাছপালা, মানুষের মতন যেন অবয়ব ধারণ করেছে। এত বড় ঘটনাকে প্রাঞ্জল ভাষায় মানুষের একেবারে মনের দরজায় পৌঁছে দিতে, এমন ভাষাশৈলীর প্রয়োজন ছিল। সঠিক স্ব-নির্বাচিত গঠনশৈলি দিয়ে সমস্যা - কথায় আসার আগে ভবিষ্যতের লোককথা আঙ্গিককে সামনে আনছেন। সহজ - সরল পরিপূর্ণ সেই বিন্যাস। আমেরিকার কোনও একটি লোকালয়ের বর্ণনা দিচ্ছেন যেখানে সমস্ত জীবপ্রাণ মিলেমিশে পরিবেশ সংগীত যেন গড়ে তুলছে। ক্ষেতভরা ফসল, পাহাড় ঘেরা ফল বাগান, সবুজ জমি মিলেমিশে যেন অপরূপ বসন্তকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে। শরৎকালীন ওক্, মেপ্‌ল্ আর বার্চ - বৃক্ষরাজি কত না রঙের ঢেউ তুলেছে, পাইনের প্রান্ত রেখার ছন্দে। শরতের ভোরের মায়াবী আলোছায়ায় হরিণেরা ক্ষেত রেখার ছন্দে। শরতের ভোরের মায়াবী আলোছায়ায় হরিণেরা ক্ষেত পেরিয়ে চলেছে, ডেকে উঠছে পাহাড় কোলের শেয়ালরাও। সুন্দর প্রকৃতি পরিবেশের বর্ণনা সুন্দব . ভাষার আরও যেন প্রাণবন্তকরে তুলছেন। এবার বলছেন সেই পাখিদের কথা ---

Along the roads, laurel, viburnun and alder, great ferns and wild flowers delighted the traveler's eye through much of the year. Even in winter the road sides were places of beauty, where countless birds come to feed on the berries and on the seed heads of the dried weeds rising above the snow. The countryside was, in fact, famous for the abundance and variety of its bird's life, and when the flood of migrants was pouring through in spring and autumn people traveled from great distance to observe them…

এ যেন আদর্শ বস্তুতান্ত্রিক ভূমি। যেখানে মানুষ ভূমি, প্রকৃতি, জীবপ্রাণ, পরিবেশ সব মিলেমিশে সকল গৃহবাণীকে যেন জীবনসংগীতের মহাছন্দে আনছে। নির্মল ঝরনায়, জল - আবাসে মাছেরা তাদের জীবন চক্রে আরও সজীব হয়ে উঠছে। এমন আনন্দময় জীবনচক্রে, হঠাৎ আঘাত হানলে মৃত্যুর যেন কালোছায়া। কৃষকেরা সব বলাবলি করতে লাগল অদ্ভুত রোগের কথা। ডাক্তারেরা হতবাক হয়ে উঠল। রোগ মহামারি হয়ে উঠতে লাগল অত সুন্দর প্রাকৃত লোকালয়ে। আর কি ভয়ঙ্কর সেই পরিণতি---

There had been several sudden end unexplained deaths not only among adults but even among children, who would be stricken suddenly while at play and die within a few hours.

মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এল আরও বড় বাহুবলে -- কেউ বাদ গেল না; পাখিরা ত নয়ই---

There was a strange stillness. The birds, for example – where had they gone? Many people spoke of them, puzzled and disturbed. The feeding stations in the backyard were deserted. The few birds seen anywhere were moribund; they trembled violently and could not fly. It was a spring without voices. On the mornings the had once throbbed with the dawn chorus of robins, catbirds, doves, jays, wrens and scores of other bird voices there was now no sound; only silence lay over the fields and woods and marsh.

কি বেদনার মতো বেজেছিল। পাখি সংগীত হারা, বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ছে, অসহায় কলতান। যেন মৃত্যুর নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে অসাছে ক্ষেতে, জঙ্গলে আর জলাভূমিতে। অন্যান্য প্রাণী পতঙ্গদের কি দশা---

On the farms the hens brooded, but on chicks hatched. The farmers complained that they were unable to raise any pigs – the litters were small and the young survived only a few days, the apple trees were coming into bloom but no bees droned among the blossoms, so there was no pollination and there would be no fruit…

জীবন চলচ্ছবি, চলমান প্রাণগঠন যেন থেমে পড়ছে। জলপ্রাণ শেষ হয়ে আসছে।

Even the streams were now lifeless. Anglers no longer visited them, for all the fish had died'

এমন আশ্চর্য সহমরণ, নিস্তব্ধ প্রাণচক্র, এসবের কারণ বলেছেন---

No witchcraft, no enemy action had silenced the rebirth of new life in this stricken world. The people had done it themselves.

মানুষ, যে মানুষ যাত্রী হয়েও জীবনযাত্রার মর্যাদা রক্ষা করে না ভ্রুক্ষেপ করে না সহযাত্রীর জীবন অধিকার। সেই আত্মসর্বস্ব, আত্মবিস্মৃত যার নিজেরাই মনের হুঁস নেই, সেই মানুষই পৃথিবীতে নতুন জীবনের আশাকে স্তব্ধ করে ফেলল!

এবার দেখা যাক কেমনভাবে অন্য পরিচ্ছেদ আনছেন। ক্রমবিবর্তন এবং ঘটনা ও বিশ্লেষণের পরম্পরাকে ধরতে যেন পারা যায়।

'A Fable for tomorrow'-র পর, The obligation to endure, Elixirs of Death, Surface waters and underground seas, Realms of the soil, Earth's Green mantle, Needless Havoc, And No Birds Sing,

Rivers of Death, Indiscriminately from the Skies, Beyond the Dreams of the Borgias, The Human Price, Through A Narrow Window, One in Every Four, Nature Fights Back, The Rumblings of An Avalanche, The Other Road,---এত ব্যাপক ও বিস্তৃত এই পর্যালোচনা ভাবলে অবাক হতে হয়। পরিচ্ছেদ বিন্যাস থেকে হয়ত অনেকটাই আন্দাজ করা ও যায়। আর কি গদ্য শৈলী, যেন কবিতার সুর ও ছন্দ ফল্গুর মতন সঙ্গী হয়েছে। যেমন শব্দ চয়ন, বিজ্ঞান ভাষা তেমন অনবদ্য, মর মী কবির যেন ভাষা। কথকতা। কখনও নৈর্ব্যক্তিক আবার কখনও স্পষ্ট কথা দৃঢ় করে সরাসরি বলেছেন। কিসের জন্যে তাঁর এত ব্যথা। প্রকৃতির জন্যে।

তাদের দুঃখের কথাকে, দায়ী মানুষের কাছে, সরাসরি প্রতিবেদনে যেন এনে দিচ্ছেন। কি ভয়ানক পরিণতি। আশা করছেন এতে যি দ মানুষের হুঁশ ফেরে। সরকার যেন সুনীতি নিয়ে এগিয়ে আসে। তার আইনানুগ ব্যবস্থা ও দায়িত্ব নিয়ে। বিজ্ঞানী অনুসন্ধান করে দেখুক বিকল্প ব্যবস্থা, বিকল্প কীটনাশকের উদ্ভাবনা। প্রযুক্তি এগিয়ে আসুক তার প্রকৃতিমুখী দায়িত্ববোধ নিয়ে নিয়ন্ত্রিত প্রায়োগজ্ঞান, বাসাম্য রক্ষার শপথ এবং স্থিতিযোগ্য প্রকৃতি নিকটবর্তী প্রকৃত পরিকল্পনার প্রয়োগ আদর্শ গড়ে উঠুক আগামী দিনের পরিবেশ ভবিষ্যতে। এম আশা করেছিলেন রাচেল কারসেন।

মনে রাখতে হবে, খুবই অর্থবহ সময়ের প্রেক্ষাপটে তিনি কাজ করেছিলেন। নিজেই বিজ্ঞান প্রযুক্তির অনেকটাই বুঝতেন বলেএকজন কৃতী সাহিত্যশিল্পীর পক্ষে অমন দৃষ্টি দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইউরোপ - আমেরিকার প্রবল অগ্রগতিতে বহু ভূমিকা নিয়েছিল, প্রযুক্তি। সাথে সাথে অর্থনৈতিক উন্নতির ধারায়, একঝোঁকা উন্নতির উল্লাসে, আপাত সামান্য তুচ্ছ ঘটনা যে অতিবড় পরিবেশের বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, তা কিন্তু চোখে পড়েনি। একই সময়ে চাঁদে যাবার মহাকাশ পথে মাথা বাড়িয়েছে মানুষ। উন্নতিশীল দেশে, বিশেষত নিবিড় উন্নত দেশসমূহে, এবং অবশ্যই আমেরিকায় অগ্রগতি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বেকারত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। আর পাশাপাশি বড় বড় অর্থনৈতিক ঋণ দিয়ে অনুন্নত দেশগুলিকে ওপর থেকে চাঙ্গা করার চেষ্টা চালানোও হল। ভাবা হয়েছিল, সরলরেখায় অঙ্কের নিয়মে উন্নয়ন হবে, কিন্তু সেই উন্নয়ন সর্বত্রমুখি হয়নি, হয়নি সর্বত্র গামি। কিছু মানুষেরঅর্থনৈতিক সুবিধা হয়েছিল, কিন্তু বৃহত্তর মানুষের ফল জোটেনি। দারিদ্র্য বেড়েছিল, চাপ বেড়েই চলেছিল পরিবেশের ওপর। বনভূমিসবুজ অরণ্য ক্রমশই বিপর্যস্ত হতে থাকল।

পৃথিবীর লোকসংখ্যা লাফিয়ে বেড়ে চলায় খাদ্যের জোগন বাড়াতে হচ্ছিল। আর একদিকে নিজস্ব দেশিয় কৃষি - সংস্কৃতি, ভুমিসংরক্ষণ প্রভৃতি অবহেলিত হতে লাগল। এমন সময়েই আমেরিকায় সর্বত্র অধিক ফলনের উদ্দেশ্য কীটনাশক রাসায়নিক প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই কীটনাশক পরীক্ষা করা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। যে সব তথ্য সাইলেন্ট স্প্রিং এ আছে।

পরের পরিচ্ছেদ The Obligation to Endure-এ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এই পৃথিবীতে জীবন প্রাণের ইতিহাস হচ্ছে জীবন প্রাণ কেমন করে তার চারপাশের সঙ্গে ব্যবহার করছে, মিথষ্ক্রিয়া বজায় রাখছে। পরিবেশও তার চারপাশে এই মিথষ্ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এই ছন্দ বজায় রাখাই সামগিক প্রাণ সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু বিশ শতকে মানুষ এত বেশি শক্তিশালি হয়ে উঠল, যে পৃথিবীর স্বাভাবিক চরিত্র পাল্টে দিতে লাগল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কাল থেকেই পৃথিবীতে সবথেকে বেশি দূষণের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। বায়ু, মাটি, নদী, সমুদ্র মারাত্মক দূষণ বর্জ্যে আক্রান্ত হতে থাকল। কারসন খুব বড় মাপের সাবধানবাণীটি এবার শোনাচ্ছেন যে, এমন দূষণ ছড়িয়ে দিচ্ছে মানুষ যা কিন্তু চিরতরে এই পৃথিবীর বিপর্যয় ডেকে আনবে। কত সুশৃঙ্খল ভাষার গঠন। আর একেবারে সরাসরি বলেছেন, পৃথিবীকে ভালবেসে, পৃথিবীর কথা, বলেছেন নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণে ট্রনটিয়াম ৯০ নির্গত হয়ে জল, বায়ু, পৃথিবীর আস্তরণ সব বিপর্যস্ত করে দিতেপারে। সেই স্থায়ী দূষণ - ছায়া প্রবেশ করতে পারে পশু - পাখির দেহে, এমনকি মানুষেরই অস্থি - মজ্জায়। অরণ্য প্রকৃতি কেউই রক্ষা পাবে না রাসায়নিক দূষণ থেকে। চেয়েছিলেন মানুষ পরিবেশ সহযাত্রীদের প্রতি তাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হোক। বল প্রয়োগ থেকেবিরত থাকুক জানাচ্ছন,

During the past quarter – century, this power has not only increased to one to disturbing magnitude but it has changed in character. The most alarming of all man's assaults upon the environment is the contamination of air, earth, rivers, and sea with dangerous and even lethal materials. This pollution is for the most part irrecoverable; the chain of life but in living tissues is for the most part irreversible.

এত স্পষ্ট সাবধান সংকেত এমনভাবে কেউ জানাতে পারেননি।

মানুষর ও প্রকৃতির জৈব প্রাণক্ষমতা, পৃথিবীর সহ্য শক্তি ভবিষ্যতে আরও ক্ষীণ হয়ে আসবে এমন কথাও কারসন জানিয়েছিলেন, তাঁর স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ মরমী ভাষায়। বেহিসেবি রাসায়নিক বিষক্রিয়া। বলেছেন যুদ্ধের সময়কালীন যেসব যুদ্ধ মানুষ প্রকৃতির ওপর চালিয়েছিল, উদ্ভাবন করেছিল শত শত বেহিসেবি কীটনাশক, তা থেকে ভাল - মন্দ সমস্ত পোকামাকড় একই সঙ্গে নির্বিচারে সহমরণে গেল---

To still the song of birds and the leaping fish in the streams, to coat the leaves with a deadly film and to linger on in soil – all this although the intended target may by only a few weeds or insects.
১৯৪৭ থেকে ১৯৬০-এ শুধু আমেরিকায় পাঁচগুণ কৃত্রিম কীটনাশকের বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছিল। এই সময়েই কারসন আর্সেনিক দূষণের কথাও জানিয়েছেন। বিস্তৃত করেছেন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। অসামঞ্জস্য ডিডিটি কিভাবে জীবনের ওপর স্থায়ী প্রভাব ফেলবে। তার পিছনের ইতিহাস, সঙ্গে সঙ্গে বাকি ইতিহাস কথাও নির্ভিকভাবে বিজ্ঞান - সাহিত্যের ভাষায় জানাচ্ছেন।। আলড্রিন সমেত প্রতিটি কীটনাশকের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। 'Elixirs of Death' আরম্ভই করেছেন,
For the first time in the history of the world, every human being is now subjected to contact with dangerous chemicals, from the moment of conception until death."
ভবিষ্যতে জল সংকট সম্বন্ধে সাবধান করে দিচ্ছেন। বলচেন সীমিত জল সম্পর্কে, ক্রমশই স্ফীতকায় জনসংখ্যা বিপর্যস্ত হবে। আরও মারাত্মক অবস্থা হবে কারণ মানুষই সেই সীমিত সম্পদের ওপর ক্রমাগত দূষণ ছড়াচ্ছে। মানুষ যেন অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, হুঁস হারিয়ে ফেলছে।
Of all our natural resources water has become the most precious. …In an age when man has forgotten his origins and is blind even to his most essential needs for survival, water along with other resources has become the victim of his indifference.
জল থেকে স্থলে আসছেন স্বচ্ছন্দ শক্তিতে। প্রকৃতির পারস্পরিক সম্বন্ধ সূত্র, প্রাণশৃঙ্খলায় যেন গাঁথা। ভুললে চলবে না।
Here again we are reminded that in nature nothing exists alone, To understand more clearly how the pollution of our world is happening, we must now look at another of the earth's basic resources, the soil."
পৃথিবীর ওপরের সামান্য আস্তরণই প্রাণ জীবনকে রক্ষা করে চলেছে। এ যেন এক বিস্ময়। সৃষ্টিরও রহস্য। প্রাণীজগত, মানুষ,জীবপ্রাণ সকলেই এই মাটির ওপর নির্ভরশীল, আবার একে অপরের প্রতিও নির্ভরতায় প্রতিষ্ঠিত। মৃত্তিকা প্রাণচক্রকে কত সহজ - সরল করে সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করেছেন,
The soil exists in a state of constant change, taking part in cycles that have no beginning and no end. New materials are constantly being contributed as rocks disintegrates, as organic matter decays, and as nitrogen and other gasses are brought down in rain from the skies. At the same time other materials are being taken away, Borrowed for temporary use by living creatures. Subtle and vastly important chemical changes are constantly in progress, converting elements derived from air and water in forms suitable for use of plants. In all these changes living organisms are active agents.
সত্যি বলতে কি মৃত্তিকা পরিবেশ কি এবং কেন সকলের মতন করে, সাহিত্য ভাষাকে অবলম্বন করে সহজিয়া করে তুললেন। বোঝার কোনও বাকি রাখলেন না। বিজ্ঞানকে অতিরঞ্জিত দুর্বোধ্য গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করলেন। খোপবদ্ধ প্রাণচর্চাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন। সাহিত্য - বিজ্ঞান জীবন - সংস্কৃতি হয়ে যাতে ওঠে, তার জন্য মাটিতে পা রেখে, প্রত্যক্ষ তাঁবু যেন ফেলেছেন প্রকৃতি - পরিবেশে। পরিবেশ কথা বোঝাচ্ছেন তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানি দৃষ্টি দিয়ে। সকলের বোধগম্য করে গড়ে তুলছেন পরিবেশ সাহিত্য। ভবিষ্যতমুখি জীবন - সংস্কৃতি। আর সবুজ আত্মকথা---
"Water, soil, and the earth's green mantle of plants make up the world that supports the animal life of the fact, he could not exist without the plants that harness the sun' energy and manufacture the basic foodstuffs he depends upon for life. Our attitude towards plants in a singularly narrow one."
সংকীর্ণময় আচরণে জীবনদায়ী বসুন্ধরা অধরাই থেকে যাবে এমন কথাও শুনিয়েছিলেন।কারণ মানুষ স্বঘোষিত প্রকৃতি জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রাণেরই বিরুদ্ধে যাচ্ছে আর ধবংসকে বরণ করে আনছে। যার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আগামীদিনের স্থিতিশীল পরিবেশ ভবিষ্যত ও উন্নয়নের পথে এই জয় ঘোষণা নিছকই 'Needless Havoc'---
As man proceeds towards the announced goal of the conquest of nature, he has written a depressing record of destruction, directed not only against the earth he inhabits but against the life that shares it with him."
তাই এই অবস্থা! ভয়ানক পরিণতি--- "And no Birds
Sing" বসন্ত এসে গেল পাখিরা কই গাইছে না ত! ইলিনয়ের এক গ্রাম থেকে লেখা এক গৃহিণীর চিঠি, প্রশ্ন করেছিল American Museum of Natural History-র অধ্যক্ষকে---
…when we moved here six years ago, there was a wealth of bird life; I put up a feeder and had a steady stream of cardinals, chickadees, downies and nuthatches and winter, and the cardinals and chickadees brought their you ones in the summer.
After several years of DDT spray, the town is almost devoid of robins and starlings,…

It is hard to explain to the children that the birds have been killed off, when they have learned in school that a Federal Law protects the birds from willing on capture. 'Will they ever come back' they ask, and I do not have the answer. The elms are still dying, and so are the birds. If anything being done? Can anything be done? Can I do anything?'

এই মর্মস্পর্শী পরিবেশে বিপদের উত্তর কি? কিছু কি আদপেও করা যাবে? কি করতে পারি এখন? -- এই সব প্রশ্ন আজও প্রাসঙ্গিক। আরও বড়মাপের প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে আসছে দূষণ ছায়ায় ঢেকে যাওয়া এই বসুন্ধরায়। উত্তর ক্রমশই কঠিন হয়ে চলেছে। কি বলব আমরা শিশুদের জিজ্ঞাসার উত্তর, 'পাখিরা কৈ'? পৃথিবীর কোন্ গ্রামের কোনও বনপথ ধরে যেতে যেতে বলে ওঠে-- 'নীল কণ্ঠপাখি কৈ বাবা?'

লক্ষ লক্ষ একর জমিতে, অরণ্যে, সেই মারণ কীটনাশক ছড়িয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। কি থেকে কী হতে পারে ভাবা হয়নি। পরিবেশক বিপর্যয়ে তৈরি হল--- 'River of Death' । কি সেই পরিণতি--

Within two days dead and dying fish, including many young salmon, were found along the banks of the stream. Brook trout also appeared among the dead fish and along the roads and in the woods, birds were dying. All the life of the stream was stilled.

নির্বাক বসন্ত, পাখিরা সংগীতহারা, অরণ্য - প্রকৃতি ঝিমিয়ে আসছে, শিশুরা অস্থির প্রশ্ন তুলছে, আর জলপ্রবাহ জলস্রোত প্রাণহীন; সারি সারি নিষ্প্রাণ গাছের সারি। এই হল সভ্য মানুষের উত্তর আধুনিক কীর্তিকাহিনী! সমাজ - সচেতন বিজ্ঞানী, বৃহত্তর মানবিক সভ্যতার সংরক্ষণে কলম ধরলেন। যাতে বিজ্ঞানের কোনও সাধন - ফল নির্বিচারে কিছু ব্যবসায়িক কিংবা রাষ্ট্রনেতাদের ইচ্ছাপূরণে যথেচ্ছভাবে আর ব্যবহৃত না হয়। যথার্থ সমাজ - প্রাণ যে মানবকল্যান - পথের সহযাত্রী হয়।

প্রশন তুলেছিল River of Death -এর শেষ স্তবক। কবে আমরা সত্যই গঠনমূলক গবেষণা গড়ে তুলব, যাতে এমন দূষণ আর না ছড়ায়। বিকল্প সাধনায় গড়ে তোলা সামগ্রী হয়ত একদিন জলপ্রাণ - জলস্রোতকে বিষময় আর করে তুলবে না। দূষণকে আটকাবে। চাই সর্বাত্মক মানবিক চৈতন্য---

When will the public become sufficiently aware of the facts to demand such action?

যে রাসায়নিক কৃষিক্ষেত্রে বিপর্যয় এনেছিল, ততদিনে আরও বৃহত্তর দানবীয় রূপ ধারণ করে তা গিয়ে দাঁড়াল---- "an amazing rain of death upon the surface of the earth." 'Indiscriminately from Skies' ---বর্ণনা করল সেই ঐতিহাসিক মৃত্যু - বৃষ্টির। কি ভয়ানক, কত বড় ভুল সেই মারণ ঝরানো হয়েছিল পঙ্গপাল ঠেকাতে। কোথায় সেই পরীক্ষা চালানো হল, না আমেরিকার Long Island -এ, ১৯৫৭ সালে, ঘনবসতি অঞ্চলে -- নগরে গ্রামে, লোকালয়ের আকাশ পথে। Nassan County, Long Island -- নিউইয়র্কের কাছেই ঘনবসতি অঞ্চল। নিউইয়র্কের শহরাঞ্চল, আর ঐশ্বর্যের গরিমাকে রক্ষা করতে -- যাতে সেখানে পালে পালে কীটপতঙ্গের আক্রমণ না হয়, সেই কারণে Long Island অঞ্চলকে শোষণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। নিউইয়র্কের অহঙ্কার এবং গরিমাকে রক্ষা করতে গিয়ে , Long Island -এর ঘনবসতিতে আকাশপথে -- এরোপ্লেনে স্প্রে করা হয়। ব্যাপকভাবে বৃষ্টিরমতো, ঝরনার পথে আকাশ থেকে নেমে আসতে লাগল ডিডিটি তৈলাক্ত মিশ্রণে। কি তার পরিণতি! বিনা বিচারে এই ভয়ঙ্কর কাজটি করেন Untied States Department of Agriculture (এরোপ্লেন ভাড়া করলেন) আর ত্বন্দ্বভ্র ক্তুস্তজস্ন ডডন্দ্বম্মত্রজব্ধপ্লন্দ্ধ স্পন্দ্র টুন্ধজনন্তত্তপুব্ধত্তজন্দ্রুস্ত ত্ত্বজস্নন্দ্বব্ধব্দ সেই বিষ বৃষ্টি করল।

বড়ন্দ্বভ্ত ব্দম্মাজ্ঞ্রভ্তন্দ্বস্ত ব্ধড়ন্দ্ব শুক্ত্রজব্ধন্দ্বজত্রন্তজন্দ্ব স্মাপুস্পব্ধব্দ স্পন্দ্র ব্দত্তত্ত্বজন্তু, স্তুজন্দ্ধন্তড়ন্দ্ধত্র ড়স্পত্তব্দন্দ্বভ্রনন্দ্রন্দ্ব প্পন্সন্দ্ধত্র স্তুন্দ্বব্দম্মা ন্দ্বজ্ঞ্রব্ধন্দ্ব ন্দ্বন্দ্রন্দ্রস্পজব্ধ ব্ধস্প স্তুস্পুন্দ্বজ ড়ন্দ্বজ ন্ধ্রজস্তুন্দ্ধ স্ত্বন্দ্রস্পজন্দ্ব ব্ধড়ন্দ্ব জস্প্ত্রজন্দ্ধ স্মাপ্তুন্দ্ব জন্দ্বত্তড়ন্দ্বস্ত ড়ন্দ্বজ,ত্রুস্ত ব্দড়স্পভ্রন্দ্বজ নন্দ্ধ নব্দন্দ্বস্তব্ধনন্তনস্তুন্দ্ব স্পুন্দ্বজ স্তুড়নপুস্তুজন্দ্ধত্রব্ধ স্মাপ্ত্রস্তুরুস্ত স্তুস্পপ্পত্তব্ধন্দ্বজব্দত্রব্ধ জ্ঞ্রনপুভ্র্ভ ব্দব্ধত্রব্ধনস্পব্দ. টুব্ধ ত্রন্দ্বব্ধ স্পত্রত্তস্নন্দ্বব্ধত্র ন্দ্রন্দ্ব শুক্ত্রজব্ধন্দ্বজ ড়স্পত্তজব্দ স্তুজ্ঞ্রুস্প ন্দ্রস্পজপ্পত্র ব্ধজস্পত্তব্ধড় নত্র ন্দ্রনন্দ্বপুস্ত ভ্রড়নস্তড় ব্ধড়ন্দ্ব স্মাপ্তুন্দ্বব্দ ড্রুস্ত ব্দম্মাজ্ঞ্রভ্তন্দ্বস্ত ব্ধন্দ্ধ ড়স্পত্তজব্দ প্ত্রব্ধন্দ্বজ নব্ধ ভ্রত্রব্দ স্তুন্দ্রস্ত. ত্তস্পব্ধস্পজ স্তুত্রজব্দ ভ্রন্দ্বজন্দ্ব ব্দম্মাস্পব্ধব্ধন্দ্বস্ত ভ্রনব্ধড় স্পনপুব্দ প্পনপ্রব্ধত্তজন্দ্বব্দ, ন্দ্রপুস্পভ্রন্দ্বজব্দত্রুস্ত ব্দড়জত্তস্ত্ত্ব ভ্রন্দ্বজন্দ্ব জত্তনন্দ্বস্ত. চনজস্তুব্দ, ন্দ্রনব্দড়, স্তুজ্ঞ্রত্ত্বত্রুস্ত ত্তব্দন্দ্বন্দ্রত্তপু নব্দন্দ্বন্তব্ধব্দ ভ্রন্দ্বজন্দ্ব স্পনপুস্তুন্দ্বস্ত.

এই হল আগে - পিছে না ভেবে দূষণ সৃষ্টির করার অমানবিক ইতিহাস। যেখানে শয়ে শয়ে গবাদি পশু, ডেয়ারি, মিল্ক কলোনিছিল, তাদের প্রতিবাদেও কোড়ও কর্ণপাত না করে, এই ডিডিটি বৃষ্টি করা হয়েছিল। পরে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল ডিডিটির মারাত্মক দূষণ ঘটছে দুধে এবং গরু - মোষেও। ছড়িয়ে পড়ল দূষণ, লাগামছাড়া কালো ছায়া। মানুষই বিজ্ঞান - প্রযুক্তি ও উন্নতির মত্ততায়জীবনবিরোধী শক্তিকেই লোকালয়ে, মানুষের দেহে, জীবপ্রাণ দেহে ছড়িয়ে দিল। সেই সব ঘটনার প্রতিবাদ, চোখ ও মন ফিরিয়ে দেবার মতন বিজ্ঞান সাহিত্য দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং। দিকে দিকে, যেমন ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, টেক্সাস, আলাবামা, ল্যুইসিয়ানা --- প্রভৃতি অঞ্চলেযে সব বিপর্যয় ঘটেছিল, তার বিবরণ সঞ্চয়ন করা হয়েছিল। কি গভীর মরমী সেই অনুসন্ধান। এও যেন আর এক হৃদয় ে

ভণ্ডে দেওয়া সঞ্চয়িতা। আমেরিকার প্রান্তে প্রান্তে যেখানে এমন কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে তার তথ্য আর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। ঘুরে ঘুরে, কতপরিশ্রমে, কি নিবিড় হৃদয়যোগে খুঁজে বেড়িয়েছেন রাচেল কারসন, কোথায় পাখিরা স্তব্ধ হল, সহমরণে গেল আপত তুচ্ছ কোন কীট, কাঠ পিঁপড়ের দুর্গতি, জীব বৈচিত্র্যের সংকট, মাছেরা প্রাণ হারাচ্ছে। জলপ্রাণ, আকাশ - বাতাস মাটি ক্ষেত্র, অরণ্য - বৃক্ষ, সকলের কথা বলেছেন। এযেন সত্যিকার মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, একজন চৈতন্যময়ী বিজ্ঞানী লেখিকা। আধুনিক পৃথিবীর এমন এক কঠিন সময়ে যখন কত বড় ভুলের মাসুল দিতে হচ্ছে---

থৃত্র ঋজ্জ্রম্ভৱঋ ন্দ Alabama treated in 1959 half of the birds were killed. Species that

পুন্লন্দ্ব ঙ্গু ঋড়ন্দ্ব ঋজঙ্গক্তস্তু ঙ্গক্ত ন্দ্রৱজন্দ্বশুত্তন্দ্ধ পুঙ্গভ্র্‌ন্দ্বঋব্ঋনঙ্গু ব্দত্তন্দ্রন্দ্রন্দ্বজন্দ্বস্তু ১০০ ম্নন্দ্বক্ত স্তুন্দ্রুঋ প্লঙ্গক্তঋপুন্দ্ঋস্তু*

এ যেন যুদ্ধের মর্মান্তিক বর্ণনা। ভবিষ্যতের বড় বিপদ সংকেত।

এমন সর্বগ্রাসী বিপদ থেকে উদ্ধারের রাস্তা মানুষের সচেতনা, দূষণ সম্বন্ধে জ্ঞান, শিক্ষা বিস্তার, সুপরিবেশ নীতি। সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান প্রযুক্তির দায়িত্ব, বিকল্প সাধনায় Non destructive Chemicals -এর উদ্ভাবন করা। কৃষিকাজও, বৃহত্তর পরিবেশ ব্যবস্থা ও গৃহবাণীকে শ্রদ্ধা জানানো। এমন কথা মনে করিয়ে দিলেন যুক্তি দিয়ে, হৃদয় ঢেলে, 'Beyond the dreams of the Borgias' অনুচ্ছেদে।

মানবিক মূল্যবোধের প্রশ্ন তুলছেন। নতুন পরিবেশ বিশৃঙ্খলা, জীবনছন্দে আঘাত হেনেছে। কেমন আঘাত,

্ন্দ্ব ড্রন্দ্ব ব্দন্দ্বন্দ্ধ ঋড্রঋ ঋড়ন্দ্বন্তঙ্গভ্র স্তুঙ্গঋপ্লন্দ্রঋন্দ্ব ব্দঙ্গনপ্ত, ভ্রঋন্দ্বক্তরুস্তু ন্দ্রঙ্গঙ্গস্তু, ঋড্রঋ ঋড়ন্দ্বস্তু ড্রন্দ্ব ঋড়ন্দ্ব ম্নঙ্গভ্রন্দ্বক্ত ঋঙ্গ প্লঙ্গ ন্দ্ব ঙ্গত্তক্ত ব্দঋক্তন্দ্রপ্লব্দ ন্দ্রনব্দড়পুন্দ্বব্দরুস্তু ঙ্গত্তক্ত ঋক্তস্তুন্দ্রব্দরুস্তু ভ্রঙ্গঙ্গস্তুপ্রুস্তুব্দ ব্দনপুন্দ্রুঋরুস্তু ভ্রনস্তুপুন্দ্বব্দ.

Industrial Age-এর এমন পরিবেশ বিপর্যয়কে, ব্যাখ্যা করেছেন যে, মানুষ প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ প্রাণ শৃঙ্খলায় একেবারে স্থায়ী বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে ফেলল। ঐতিহাসিক ভুলের মাশুল দিতে হবে ভবিষ্যত প্রজন্মকে। যার জন্য তারা কখনও দায়ি নয়। যেমন অসহায় প্রাণী, প্রকৃতির সন্তানেরা। 'The human Price' -এ প্রশ্ন তুলেছিলেন এই কি আধুনিক জীবনযাত্রার গতিপ্রকৃতি---

বঙ্গস্তুন্ত ভ্রন্দ্বত্রক্তন্দ্ব স্তুঙ্গুন্তন্দ্বক্তুন্দ্বস্তু ভ্রনঋড়ত্র স্তুনন্দ্রন্দ্রন্দ্বক্তন্দ্রুঋ ভ্রন্স্তু ঙ্গন্দ্র ড্রন্ত্রক্তস্তু ঋড্রঋ ঋড়ন্দ্ব পুত্তক্তঙ্গব্দ ন্দ ঙ্গত্তক্ত ন্দ্বুনক্তঙ্গুপ্লন্দ্রু ঋ —ত্র ড্রন্ত্রক্তস্তু ভ্রন্দ্ব ঙ্গত্তক্তব্দন্দ্বপুন্দ্ববদ ড্রন্দ্ব ন্দঋক্তঙ্গস্তুত্তন্তন্দ্বস্তু ন্দঋঙ্গ ঙ্গত্তক্ত ভ্রঙ্গক্তপুস্তুত্রব্দ ঙ্গত্তক্ত প্লঙ্গস্তুন্দ্বক্তু ভ্রন্ত ঙ্গন্দ্র পুনন্দ্রন্দ্ব ড্রব্দ ন্দ্বঙ্গপুন্দ্বস্তু.

প্যারাথিয়ন - এর মতন রাসায়নিক অপব্যবহারের ফলে এক গ্রামের পনের হাজার মানুষ চিরতরে বিকলাঙ্গ হল, হাজার হাজার স্নায়ুরোগী সৃষ্টি হল; অদ্ভুত রোগ জিঞ্জার প্যারালিসিস' এর দেখা দিল -- তার জবাব কি তারা দেবে যারা সামান্য কতক পোকামাকড় মারতে গিয়ে এত বহু প্রাণনাশের ও পরিবেশ বিপর্যয়ের ইতিহাস তৈরি করল।

আপাত ক্ষুদ্র অপরিসর জানালার যত সামনে আসা যায়, ততই বিশ্ব আকাশ স্পষ্টতর হয়। চাই সেই দৃষ্টি, যা নৈতিক মূল্যবোধে ঘেরা জীবনমুখী চেতনায় বিশ্ব আকাশের আলোকবার্তা আমাদের জীবনে এনে দেবে। 'বড়ক্তঙ্গত্তঋড়ত্র ত্তক্তক্তঙ্গভ্র্‌ন্স্তুঙ্গভ্র' তে তাঁর বিশ্বাস ও ভবিষ্যতমুখী আকাশে স্বচ্ছন্দ বিদগ্ধতায় সামনে এনে দিলেন। আদিকাল থেকে আগামী ভবিষ্যতের প্রাণ সম্বন্ধতার কথামালা। নির্ভীকভাবে প্রশ্ন করেছেন চলমান প্রজন্ম ঐতিহ্যের সংরক্ষণ বিষয়ে। আর আমাদের ব্যর্থতার অখণ্ডতা ও সম্পূর্ণতাকে রক্ষা করছি না বলে পরিবেশ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এমন অব্যর্থ জীবন দর্শনের আর কোনও বিকল্প নেই।

্ন্দ্ব স্তুরু, নন্দ্র ভ্রন্দ্ব ভ্রনব্দড়, ক্তন্দ্বস্তুত্তন্তন্দ্ব ঋড়ন্দ্ব ঋড়ন্দ্বক্তন্দ্রঋ ঋঙ্গ ঙ্গত্তক্ত ঋন্দ্রুন্দ্বঋনন্তু ড়ন্দ্বক্তনঋঋন্দ্ব,ত্র ম্নঙ্গব্দন্দ্বব্দব্দনঙ্গু ঋড্রঋ ড্রব্দ স্তুঙ্গপ্লন্দ্ব স্তুঙ্গভ্রু ঋঙ্গ ত্তব্দ ঋড়ক্তঙ্গত্তঋড় ব্দঙ্গপ্লন্দ্ব ঋভ্রঙ্গ স্তুপুপুনঙ্গু ভক্তব্দ ঙ্গন্দ্র ন্দ্বঙ্গপুত্তঋনঙ্গত্রুস্তু ব্দন্দ্বস্তুঋনঙ্গু ঙ্গন্দ্র পুন্লন্দ্ঋ ম্নক্ত ঙ্গঋঙ্গম্নপুব্দপ্ল,ত্র ম্নঙ্গব্দন্দ্বব্দব্দনঙ্গু ঋড্রঋ নব্দ ঙ্গত্তক্তব্দ ন্দ্রঙ্গক্ত ঋড়ন্দ্ব প্লঙ্গপ্লন্দ্রুঋ ঙ্গুপুন্তু, ত্তুঋনপু ভ্রন্দ্ব প্লত্তব্দঋ স্নত্রব্দব্দ নঋ ঙ্গু ঋঙ্গ ঋন্দ্রুন্দ্বক্তঋনঙ্গুব্দ ঋঙ্গ স্তুঙ্গপ্লন্দ্ব,্ন্দ্বত্রক্তন্দ্ব স্তুঙ্গন্দ্ঋ পুনঋঋপুন্দ্ব ঙ্গভ্র ঋঙ্গ ম্নক্তন্দ্বব্দন্দ্বক্তন্দ্ব নঋব্দ ন্দঋন্দ্বঋক্তনঋস্তু

এমন মানবিক দায়িত্ব সম্বন্ধে বারে বারে কখনও কথকতার আঙ্গিকে, কখনও তথ্য চয়নে, আবার বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সচেতন করে দিচ্ছেন। পরিবেশ চেতনার উদবোধনে মানুষের সহৃদয় আচরণের ওপর জোর দিচ্ছেন। বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদদের নিছক ল্যাবরেটরি কক্ষ কিংবা ড্রইং বোর্ড অভ্যাস থেকে বেরুবার ডাক দিচ্ছেন। সামান্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে বারণ করছেন। বলছেন কোনও কিছু আবিষ্কার কিংবা উদ্ভাবন করলেই উল্লসিত হয়ে নির্বিচারে ভাবনাচিন্তা না করে, ব্যবসায়ীদের হাতে কিংবা রাষ্ট্রনায়কদের হাতে তুলে দিয়ে বিজ্ঞানীরা, প্রযুক্তিবিদরা যেন ক্ষান্ত হন না। দেখতে হবে কি অবস্থা দাঁড়াচ্ছে প্রয়োগ করার পর। চারপাশের উন্নতি হচ্ছে নাকি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়ে চলেছে। অর্থাৎ এই বিশ্বজগতের, প্রাণ প্রাণীর সুখ দুঃখের খবর রাখতে হবে। আশ্চর্য বিস্ময়ে অণুর অণু, রেণু রেণুর মতন হয়ে, প্রত্যেকের জীবনযাত্রা, জীবনধারণের খবর রাখবে। তবেই প্রয়োগবিদ, প্রয়োগশিল্পী হবেন। যথার্থ প্রাণ - জীবন সংরক্ষিত থাকবে। উৎপাদনের মাত্রাছাড়া উল্লাসের নাগরিক জীবন যেন ব্যতিব্যস্ত হয় আবার প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ক্ষতি হতেই পারে। যদি না জানা থাকে কি উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে। এই স্তূপীকৃত বোঝা বানাতে গিয়ে। প্রাণজীবনকেও হয়ত তার মাশুল দিতে হয়। সত্যি বলতে কি ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬২ তে এমন ঘটনাই ঘটেছিল আমেরিকায়। রাচেল কারসন এমন প্রত্যক্ষ ঘটনার সাক্ষী। অভিজ্ঞতায়পুষ্ট। অতবড় জীববিজ্ঞানী, আবার একদিকে প্রতিভাবান লেখিকা। সরব হলেন। প্রতিবাদী পরিবেশ বিজ্ঞ

ান সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটল। আমরা লাভ করলাম দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং।
ক্যান্সার আজ আমাদের জীবনে একটা বড় কালো ছায়া। প্রতি বছরে অগুণতি মানুষ এই রোগে মারা যাচ্ছে। এই মারাত্মক ব্যাধিতে মানুষ অসহায়। গরিব দেশের মানুষ এই রোগের চিকিৎসা করাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। একেকটা পরিবার ধবংস হয়ে যাচ্ছে। বিভ্রান্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা। এখনও এই ব্যাধিকে আয়ত্তে আনা যায়নি। কাজেই 'ত্নজন্দ্বন্দ্বন্দ্বনস্ক নন্দ্ব ন্ধড়ন্দ্ব নপ্পস্মান্দ্বস্তব্ধন্নন্দ্ব স্নন্দ্বস্ত' যে কথা তিনি খুন্দ্ব ন্দ্ব ন্দ্বন্দ্বন্ত ঠস্পত্তজ এ জানাচ্ছেন। বলছেন পরিবেশ দূষণ এমন মারাত্মক ব্যাধিকে হয়ত ডেকে আনছে। 'ড্রন্নজস্ক প্লন্দ্বস্ক্বপ্ত স্তত্তব্দন্দ্বব্দ' কে প্রতিহত করতেই হবে। সজাগ হতে হবে এমন প্রতিঘাত সম্বন্ধে। সত্যিই কি আমরা তা অনুধাবন করেছি। যদি করতাম তাহলে ১৯৬১ -র দূষণজনিত মহামারি থেকে আমরা শিক্ষালাভ করতাম। প্রাকৃতিক অনিয়ম, বিপর্যয় সংকেত দেখেও আমাদের হুঁশ ফেরেনি। জলীয় দূষণ থেকে মারাত্মক পরিবেশ ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। যা থেকে রোহিত জাতীয় মাছেদের লিভার ক্যান্সার প্রায় মহামারী রূপ নিয়েছিল। ব্যাপক জলীয় দূষণে প্রকৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল মানুষ ১৯৬১ সালে আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে দেখা দিল সেই ভয়ানক বিপর্যয়। যার বর্ণনা করেছেন রাচেল কারসন। কি তার ভাষা শৈলি আর গভীর অনুসন্ধানী মরমী বিজ্ঞানী দৃষ্টি!---

/ন্দ্ব ন্ধপ্সপুন্দ্বস্তব্ধন্দ্ব স্তুস্তন্দ্বজ স্তত্তব্দন্দ্বন্ধন্দ্বন্ধব্দ ন্দ্ব প্সত্তজ ন্দ্বন্নজপ্সপ্লন্দ্বন্ধত্রন্ধ প্সত্তজ স্মান্দ্বজনপ্ত,ত্রব্দ ভ্রব্দ স্তপুন্দ্বজপুন্ত নপুপুত্তব্দন্ধ জ্রন্ধন্দ্বস্ত স্তুত্র জন্দ্বস্তন্দ্বন্ধ ড্রস্মান্দ্বন্দ্ধ ঢ ন্ধড়ন্দ্ব ব্দস্মাজন্দ্ধ প্সন্দ্র ১৯৬১ত্র ন্দ্বস্মানস্তন্দ্বপ্লনন্ত প্সন্দ্র পুন্নন্দ্বজ স্তুস্তন্দ্বজত্রস্মান্দ্বজন্দ্বস্তত্র প্লপ্সন্ধ জ্রন্স্তভ্র ন্ধজপ্সত্তন্ধ ন্দ্ব প্লস্তুন্দ্বস্তন্দ্বজ্রপ্ত, ব্দন্ধন্ধন্দ্বত্রস্ত স্মাজন্নন্ধন্দ্ব ড্রন্ধস্তড়ন্দ্বজনন্দ্বব্দ, বজপ্সত্তন্ধ ন্দ্ব স্তন্ধড় ন্দ্বব্দন্ধন্দ্বজত্রস্ত ভ্রন্দ্বব্দন্ধন্দ্বজ স্মত্রজন্ধব্দ প্সন্দ্র ন্ধড়ন্দ্ব হুনন্ধন্দ্বস্ত ত্রন্ধন্ধন্দ্বব্দ ভ্রন্দ্বজন্দ্বত্রন্দ্রন্দ্বস্তন্ধন্দ্বস্ত ন্দ্ব ব্দপ্সপ্লন্দ্বত্রজন্দ্বব্দ স্মাজ্রস্তন্ধনস্তপুপুন্ত ১০০ স্মান্দ্বজ স্তন্দ্বন্ধ প্সন্দ্র ন্ধড়ন্দ্ব ন্ধজপ্সত্তন্ধ প্স্নন্দ্বজ ন্ধড়জন্দ্বন্দ্ব ভন্দ্বজব্দ প্সন্দ্রত্রন্দ্ব স্তন্দ্বন্নন্দ্বপুপ্সস্মান্দ্বস্ত স্তস্তন্দ্বজ.*

এই পর্যবেক্ষণ বা আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছিল Environmental Cancer section of the National Cancer Institute এর সঙ্গে Fish and Wildlife Service এর যৌথ উদ্যোগে। রাচেল কারসন স্মরণ করিয়েছেন, দায়িত্ব কথা --- ... so that early warning might be had of a cancer hazard to man from water contaminants.
এরপর প্রকৃতির প্রতিশোধ, 'Nature Fights Back'। গভীর সত্যদর্শনকে আনলে। দেখিয়ে দিলেন অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে থাকল সামান্য পোকামাকড়। মানুষের যুদ্ধের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে, রাসায়নিকের আক্রমণকে অতিক্রম করে, 'Strains resistance to chemicals' গড়ে তুলল। এই সত্য ঘটনা থেকে আজ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবও চোখে পড়ছে। মশা এমন নাশক শক্তি, অতিক্রমী শক্তি ধারণ করেছে যে নতুন শতাব্দীতে এসেও মশা ম্যালেরিয়াতে পরিবেশ জীবন অতিষ্ঠ। প্রায় মহামারির রূপ নিয়েছে। শহরবাসী, গ্রামবাসী হাড়ে হাড়ে তা টেরও পাচ্ছে। রাচেল কারসন এই প্রহসনকে ব্যঙ্গ করেছিলেন Nature Fights Back এর প্রথম ছত্রেই---

বপ্স ড্রন্দ্ব জনব্দপ্সন্দ্বস্ত ব্দপ্স প্লত্তস্তড় ন্দ্ব প্সত্তজ ন্দ্বন্দ্রন্দ্রপ্সজন্ধব্দ ন্ধপ্স প্লপ্সত্তপুস্তত্রন্ধত্তজন্দ্ব ন্ধপ্স প্সত্তজ ব্দত্রন্ধনব্দন্দ্রস্তন্ধনপ্সত্রস্ত ভন্দ্বন্ধ ন্ধপ্স ড্রন্দ্ব ন্দ্রনপুন্দ্বস্ত ন্দত্রস্তড়নন্দ্বন্দ্ধ প্সত্তজ ন্ধস্ত্রপ্ত ভ্রপ্সত্তপুস্ত ন্দস্তন্দ্বন্দ্বস্ত ন্দ্ব ন্ধড়ন্দ্ব ন্দ্রন্ত্রপ্ত নজপ্সস্ত

বলেছিলেন মানুষের প্রকৃতি পরিবেশের ওপর দখল এবং প্রভাব বিস্তার পরিবেশের স্বাভাবিক শোধন ক্ষমতাকে একদিন ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দিতে পারে। কমজোরী পরিবেশ আজ নানান রোগ মহামারী এবং জীবন আতঙ্কের যে অন্যতম কারণ, দৈনন্দিন জীবনে আমরা তা দেখতেই পাচ্ছি।
দরকার এমন এক জীবনদর্শনের যা, মানুষকে প্রকৃতিমুখী করে। প্রকৃতির জীবনচক্র, জীবনছন্দকে গ্রহণ করেই গড়ে তুলতে হবে উন্নয়ন। সর্বতোমুখী মানবিক আচরণই পরিবেশ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে। সাইলেন্ট স্প্রিং বহু উদাহরণ, নানান তথ্য, বিজ্ঞান প্রযুক্তি তত্ত্ব-- এসব মিলিয়ে এমন এক পরিবেশ সাহিত্যের সূচনা করল, যা পরিবেশ চর্চায় ঐতিহাসিক তো বটেই; দৃষ্টিভঙ্গি ও বিন্যাস দেখলে বোঝা যাবে কাজটি কতখানি সময়োচিত ছিল। প্রথমদিকে ডিডিটি-র প্রকোপে, পোকামাকড় প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় মারা গেলেও ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মত বেঁচে থাকার লড়াইয়ে ক্রমশই তারা ডিডিটি বা অন্যান্য রাসায়নিক কীটনাশকদেরই অতিক্রম করে গেল। প্রতিরোধ গড়ে তুলতে থাকল। আর বহু বিভ্রাটের সৃষ্টি হল। যেমন আজ ম্যালেরিয়া আবার বড় মহামারী হয়ে ফিরে এসেছে। এমন বস্তুতান্ত্রিক বিভ্রাটের সতর্কবার্তা, বৈজ্ঞানিক সত্য প্রাঞ্জল সাহিত্য ভাষায় রাচেল কারসন তুলে ধরেছিলেন। গভীর মননের প্রয়োজন,প্রয়োজন বৃহত্তর অন্তর্দৃষ্টির---

ন্দ্ব ন্দ্বন্দ্বস্তত্র প্লপ্সজন্দ্ব ড়নন্ধড়—প্লনস্তন্দ্বস্ত প্সজনন্দ্বন্ধন্ধনপ্সত্রস্তত্র স্তন্দ্বন্দ্বস্মান্দ্বজ ন্দব্দনন্ধড়ন্ধ, ভ্রড়নস্তড় ঢ প্লনব্দব্দ ন্দ্ব প্লস্তুন্ত জন্দ্বব্দন্দ্বজস্ত ড়ন্দ্বব্দ. স্মনন্দ্রন্দ্ব নব্দত্র প্লনজ্রস্তপুন্দ্ব ন্দ্বস্তস্সস্ত প্সত্তজ স্তপ্সপ্সাজন্দ্বড়ন্দ্বব্দনপ্সত্রস্ত ভ্রন্দ্ব ব্দড়প্সত্তপুস্ত জন্দ্বন্দ্বজন্দ্বস্তন্দ্ব নন্ধ ন্দ্বন্দ্ব ভ্রড়ন্দ্ব জন্দ্ব ভ্রন্দ্ব ড্রন্দ্ব ন্ধপ্স ব্দন্ধজত্তন্ধন্ধপুন্দ্বত্রস্তন্দব্দন্ধ নন্ধস্থ

খরতর হিমবাহের মতন ঘড় ঘড় শব্দ শুনতে পাওয়ার সময় এসেছে। সময় এসেছে হুঁস ফিরে পাওয়ার, তা না হলে মানুষ এমন বেহিসেবি হিমবাহে ক্ষত বিক্ষত হবে। প্রকৃতির পক্ষে, মানুষের পক্ষেও এমন সমন্বয়ী গবেষণা আদর্শের কথা, স্মরণ করিয়ে দিলেন।
শেষ অনুচ্ছেদ 'বড়ন্দ্ব খন্ধড়ন্দ্বজ স্তস্ত'। কবি রবার্ট -এর 'পুন্দ্বব্দ ন্ধজ্রন্দ্বপুন্দ্বস্ত স্তু' এর যেন সন্ধান করছেন। কি চমৎকার প্রশ্ন। অ

াশঙ্কাজনিত দ্বিধাবিভক্ত জীবন পথের নিশ্চয়তা, আবার অনিশ্চয়তার মতন গভীরজীবন দর্শনের কথা বলেছেন। বলেছেন ভবিষ্যতের কথা। এসব লেখার পর ঘাত প্রতিঘাতের পর কেমন হবে মানুষের মানুষী পথ হাঁটা। দ্রুত উন্নতির মত্ততায় বেসামাল পথে পথে চলতে গিয়ে জীবনকেই অনিশ্চিত করে তোলা; নাকি বিকল্প সাধন করে পৃথিবীর স্থায়িত্বকে রক্ষা করা। রাচেল কারসন বিজ্ঞানী সাহিত্যিক। তিনিই পারেন গভীর জীবন সংকটকে ছন্দহারা বৈজ্ঞানিক প্রয়োগকে অনবদ্য সাহিত্য ভাষায় মেলে ধরতে। সর্বত্রগামী সেই আশারপথে অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

We stand now where two roads diverge. But unlike the roads in Robert Frost's Familiar poem, they are not equally fair. The road we have long been traveling is deceptively easy, a smooth superhighway on which we progress with great speed, but at its end lies disaster, The other form of the road – the one 'less traveled by' –offers our last, our only chance to each a destination that assures the preservation of our earth.

এত বড় মাপের পরিবেশ দলিলের মতন চোখ খুলে দেওয়া গ্রন্থটির শেষভাগে এত গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে সারকথা যেন বলছেন। সত্যদ্রষ্টারা যেমন বলেন এমন তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান এনে দিল, যা অনুভব দিয়েই বোঝা যায়। কত পরিসংখ্যান দিলেন, মিলিয়ে দিলেন নানা সত্যের সারি। একথাও বলেছেন যা ঘটে গিয়েছে, বিপদ এমন আসতে পারে -- সবই সততার সঙ্গে সাধারণ মানুষকে জানাতে হবে। ভেবে দেখতে হবে ভুলের থেকে কেমন ভাবে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব। প্রয়োগ করব সততার সাধনাকে, স্থিতিযোগ্য পরিবেশ জীবনপথের সন্ধানে।

সততার সাধনায় নিবেদিত প্রাণের সংযোগ দরকার হয়। পৃথিবীর আবাসস্থলের বিপুল শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, নম্রতা প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়। নৈতিক জীবনমুখী মূল্যবোধ ছাড়া এমন নিবেদন কখনও সম্ভবপর নয়। বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদদের ভুলে গেলে চলবে না, প্রয়োগ সাফল্যই বড় সাফল্য। প্রয়োগকে সুপ্রযুক্ত করতে হলে, মানবিক, বৈজ্ঞানিক, আধ্যাত্মিক সত্য সম্বন্ধতার সমন্বয়ী দৃষ্টি থেকে বৃহত্তর প্রাণ, জড় জীবজগতকে দেখতে হবে। হৃদয়ে স্থান দিতে হবে। সম্মান জানানো হবে তাদের পারস্পরিক সত্তা ও শৃঙ্খলাকে। যদিও সত্যিই সম্মান জানানো হয়, তাহলে নিশ্চয় ঘটবে না। এমন কোনো প্রয়োগ যা প্রাথমিক নম্রতাটুকুও প্রকাশ করতে ভুলে যাবে। যা থেকেআসবে বহু বিপর্যয়। প্রায় শেষ কথার সুরটিকে যেন ধরিয়ে দিয়েছেন। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন জীবনের অনন্ত জীবন সম্ভাবনা। স্থন্দপ্রব্ধজ্ব্রপ্সজস্তন্ত্রজস্ত স্তুন্ম্রন্তনব্ধনন্দবদ প্সন্র পুনন্দ্রন্দ ড্রন্দ স্থন্দ্ব নব্ধপ্সজন্দস্ত স্তু ব্ধড়ন্দ স্মাজ্ব্রস্তব্ধনব্ধনপ্সন্দজব প্সন্র ব্ধড়ন্দ স্তড়ন্দ প্লনন্ত্রপ্ত স্তপ্সব্ধজপ্সপ্ত ভড়প্স ড্রন্দ স্তুপ্সব্তব্ধড়ব্ধ ব্ধপ্স ব্ধড়ন্দনজ ব্ধবদপ্স ন্প্স 'ড়নব্ধড় প্লনস্তন্দস্ত প্সজনন্দব্ধব্ধনপ্স' ন্প্স ড়ব্রপ্লনপুনব্ধস্ত স্থন্দ্রপ্সজন্দ ব্ধড়ন্দ্রব্দব্ধ ন্দ্রপ্সজস্তন্দবদ ভ্রনব্ধড় ভড়নস্তড় ব্ধড়ন্দস্ত ব্ধপ্সন্দজ.

প্রকৃতির অস্তিত্ব ও ভারসাম্য রক্ষা করা বিজ্ঞানের দায়িত্ব। পরিবেশ বিপর্যয় কত বহু অঘটন ঘটাতে পারে তার দলিল সাইলেন্টস্প্রিং। রাচেল কারসন বসুন্ধরার প্রাণ প্রতিমার প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান চর্চায় যারা যুক্ত নেই তাদেরকেও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দীপনায় যুক্ত করেছিলেন। আধুনিক পরিবেশ আন্দোলনকে সর্বত্রগামী করে তুলতে সাইলেন্ট স্প্রিং -এর ভূমিকা যেন অভিভাবকের মতন। খুব বড় মাপের পরিবেশ চেতনার নতুন আলো।

এত বড় মানের বিপদ সংকেত জানিয়ে দিলেন রাচেল কারসন। যুক্তি, বুদ্ধি হৃদয় আর তথ্যরাশিতে ভরপুর দি সাইলেন্ট স্প্রিং -কে সত্যিই কি জীবনে গ্রহণ করেছি আমরা। যেকথা 'ছিন্নপত্রাবলী' কিংবা 'স্মৃতির রেখা'র ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য।

যদি সত্যিই গ্রহণ করতাম, তাহলে কি এই সেদিন দৈনিক সংবাদে এমন খবর বেরত? যেমনটা ডিসেম্বর ১১, ১৯৯৯, ট্রাস্টঅফ ইন্ডিয়া জানিয়েছিল। এতদিনে বোধহয় তাই, ১৯৬২ থেকে ১৯৯৯, ভারতে 'Centre to ban 18 pesticides' খবর হয়। /বড়ন্দ গুপ্সন্দব্জপ্লন্দব্ধ নব্দ ন্ত ব্ধড়ন্দ স্মাজপ্সস্তন্দবদব প্সন্দ্রব্রস্তন্দ্ধ ১৮ স্মান্দবদব্ধনস্তনস্তন্দবদ ভ্রনব্ধড় স্তুস্তন্দবদ নব্জ্রস্তুন্দ পুপ্সন্ধ ব্ধন্দবজপ্ল ন্দবন্দ্রন্দ্রন্দবস্তব্ধবদ.* বড় দেরিতে হলেও ভুল বুঝতে আরম্ভ করেছি। সংবাদপত্রে এমনও লেখা হয়েছিল যে,

of the 150 pesticides in use in the country, the centre had already banned 20 including DDT and BHC known as Gamaxyn, ব্ধপ্সন্দব্ধ ন্তব্ধপ্স স্তপ্সব্দনস্তন্দবজ্রব্ধনপ্স ব্ধড়ন্দ নপুপ্ত —ন্দবন্দ্রন্দ্রন্দবস্তব্ধ প্স ব্ধড়ন্দ বদপ্সনপুব্রস্ত প্সব্ধড়ন্দবজ স্তপ্স — প্সজন্ধ্র নব্দপ্লবদস্থ

আমেরিকার মতন অতি উন্নত দেশে, মানুষ ভূমি পরিবেশ বিপর্যয়ের মতন প্রত্যক্ষ ঘটনা থেকে শিক্ষিত হয়ে, বহু বড় বড় বাঁধ নির্মাণ প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতি পরিবেশ ও মানুষের ছন্দ বিনষ্ট করে দেয় এমন অতিকায় নদী বাঁধগুলিকে নিবিড় পরিবেশ জীবন সংস্কৃতির পরিপন্থী বলতেই হয়েছে। বড় ভুলের মাশুল গুণছে বৃহত্তর মানুষ। প্রযুক্তি ও পরিকল্পনা মিলেমিশে নিবিড় জীবন সংস্কৃতি গড়ে তুলবে এমন আশাই করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে এমনটা প্রায়ই ঘটে না। জল - বাঁধ, নদী - বাঁধ নিয়ে পরিবেশ বিতর্কের ও আন্দোলনের ধারা নেমেছে ভারতেও। বিপর্যস্ত মানুষ এক গলা জলে দাঁড়িয়ে সমবেত প্রতিবাদ জানিয়েছে; প্রতিবেদন সাহিত্য প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। পরিবেশ আন্দোলন বৃহত্তর রূপে দেখা দিয়েছে।

:

।। পাঁচ ।।

বহুজন হিত - দ্য গ্রেটার কমন গুড

১৯৯৯। ভারতের নর্মদা। জলসিন্ধি থেকে নৌকায় যেতে যেতে, ওপারের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে, দ্য গ্রেটার কমন গুড এর লেখিকা অরুন্ধতি রায় হেসেছিলেন। হেসেছিলেন খুব জোরে --- ‘ট ব্দব্ধপ্সপ্সস্তু প্সন্ত্র ড়নপ্তপ্তক্রস্তু প্তব্রন্তব্ধড়ন্দ্বস্তু প্সন্তব্ধ প্তপ্সন্তস্তু.’

বিগত প্রায় দশ বছর ধরে এই নর্মদা বাঁধ প্রকল্পের কাজ হয়। নর্মদা সাগর পরিকল্পনা এবং সর্দার সরোবর পরিকল্পনা, এই বৃহত্তর প্রকল্পের বিশিষ্ট অঙ্গ। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ প্রকল্প এখন বড় বাঁধ - এর খরচ হবে প্রায় আকাশছোঁয়া -- আনুমানিক ২০,০০০ কোটি থেকে ২২,০০০ কোটি টাকা। বলা হচ্ছে, বিগত পঞ্চাশ বছরে ভারতে প্রায় ৩৬০০ বাঁধ নির্মাণ করতে প্রায় ৮০,০০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। দেখতে হয় আনুপাতিক লাভের ক্ষতিয়ান। পরিবেশ খাতের তথ্য। এইসব প্রকল্পের রূপায়ণে লক্ষ লক্ষ মানুষের, আদিবাসী জগতের ছিন্নমূল হওয়ার ঘটনা। বনভূমি, প্রাকৃতিক প্রজাতির বিনষ্টির কথা। মানুষের উচ্ছেদের তথ্য দিয়েছেন অরুন্ধতি

India has 3600 big dams – they have devoured 50 million people already.
Silently. ত্তপ্সভ্র নব্ধ’ব্দ ব্ধড়ন্দ্ব ব্ধত্তব্জ প্সন্দ্র ত্তব্জপ্পস্তু.

বিপর্যয়ে মানুষ - প্রকৃতি পরিবেশ ছন্দহারা হয়। আর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা, ভূমি - স্থানীয় মানুষ - কর্মছন্দের ত্রিমাত্রিক সমাজজীবন। একজন সাহিত্যিক, সফল সাহিত্য কর্মী -- নর্মদা আন্দোলনের কি এবং কেন জানতে চেয়েছেন। জানতে তো পারতেনই-- কত রকমের জার্নাল, রিপোর্ট, ভিডিও ফিল্ম - তথ্যচিত্র বেশ কিছু পত্র - পত্রিকা পুস্তিকাও রয়েছে; আছে ইন্টারনেট, তথ্যসমূদ্র। কিন্তু তিনি নিজে প্রত্যক্ষ পরিবেশে এসে, দেখছেন, জানছেন। বুদ্ধি - হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। নিশ্চয়ই তথ্য দেখেছেন পড়েওছেন। এই সব ভিত্তি করে মানুষের কথা বলতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। অভিজ্ঞতায় শক্তিলাভ করে, স্বচ্ছন্দ - প্রাঞ্জল ভাষায় তথ্যকে - দৃশ্যকে, কথকতাকে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করেছেন। সৃষ্টি করেছেন এমন এক ব্যতিক্রমি প্রতিবেদন সাহিত্য। যা পড়লে বেশ ভাবায়। বৃহত্তর মানুষের চেতনা এবং মনসংযোগ আকর্ষণ করতে নিশ্চয়ই সমর্থ হয়। এমন একটি সমৃদ্ধ মন নিয়ে তিনি নর্মদার অন্দরে প্রবেশ করতে পেরেছেন, যাকে তিনি বলেছেন Curiosity।তবে এমন আগ্রহে সৃষ্টিশীল খোঁজাখুঁজি বলতেই হয়। বড় পরিশ্রম করে, তথ্যকে প্রাণবন্ত করেছেন। চমৎকার গাথা গদ্যে। মানুষ জেনেছে বাঁধ মানুষের জন্যে, নাকি মানুষের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে ভুল পরিকল্পনার পরিচালনায়। কি ক্ষত পরিবেশ বিপদকে ডেকে আনবে। চারপাশের স্থায়ী পরিবর্তন কি প্রকৃতি পরিবেশ মানুষের গৃহবাণীকে বিনষ্ট করে দেবে। ১৯৯৯, মে মাসে একটি ইংরেজি জার্নালে ‘দ্য গ্রেটার কমন গুড’ প্রচ্ছদ নিবন্ধ রূপে প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। সাম্প্রতিককালে এমন একটি প্রতিবেদন সাহিত্য খুব বেশি হয়নি। দেশে - বিদেশে লেখাটি প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া ফেলেছে। আলোচনা হয়েছে। পক্ষে - বিপক্ষে লেখা হয়েছে। মতামত প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি সেই জার্নালটিতেই কাছাকাছি সময়ে (জুলাই, ১৯৯৯) লেখাটিকে কেন্দ্র করে সংযোজনও বেরিয়েছে। প্রত্যুত্তর, সওয়াল জবাব--- এত কিছু হয়েছে। লেখাটিকে কেন্দ্র করে। পরিবেশবিদ, পরিবেশকর্মী, প্রয়োগবিদ, সাহিত্যিক, শিল্পী, আবার সাধারণ মানুষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন অরুন্ধতিতাঁর দ্য গ্রেটার কমন গুড দিয়ে। সব থেকে বড় কথা এতকাল ভাসা ভাসা একটা ধ্যান - ধারণা চলে আসছিল নর্মদা নিয়ে -- তার বহু সমাধান করেছেন জেনে বুঝে তথ্য চয়নে সাহিত্যে রূপ দিয়ে। দরকার ছিল এমন একটি কাজের; যা নদীর কথা বলবে, বলবে নদীর জীবন, নদীকে ঘিরে জীবনকথার সংবাদ। নদীর বাঁধের কথা। তার ভালো- মন্দ। বাঁধ ঘিরে ঘটে যাওয়া পরিবেশ বিপর্যয়ের নানান তথ্য। প্রাকৃতিক ভারসাম্যের ক্ষতি। গ্রাম সমাজ বিনষ্টের নানা সংবাদ আর ঐহিসাসিক ভুলত্রুটির বিরুদ্ধে কেন এই পরিবেশ আন্দোলন। এতসব কিছু নিয়েই গড়ে উঠেছে লেখাটি। একথাও বলার যে, একজন আধুনিক ভারতীয় লেখকের এমন ইংরেজি প্রতিবেদন ধাঁচের সাহিত্য ভাষাও যথেষ্ট আঁটসাঁটো। সরাসরি, বোধগম্যও হয়। বিন্যাসে কোথাও ছন্দ - পতন ঘটেনি। প্রযুক্তি বিজ্ঞান - সংক্রান্ত কাজে এইকাজ যথেষ্ট গুরুত্বের। প্রায় বিরল বলা চলে। কারণ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকেরা, অন্তত ভারতে, কোথাও পরিবেশ বিভ্রাট বা প্রযুক্তি সংকটের প্রশ্নে তেমনভাবে মনোযোগ নিয়ে এগিয়ে আসেন না। পক্ষে - বিপক্ষে যেমন হোক না, কেন, যুক্তি ও হৃদয়ের কলম নিয়ে।

আগামী দিনে পরিবেশ চর্চাকে বহু মানুষের নিকটবর্তী করে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখা হচ্ছে। ভাবা হচ্ছে পরিবেশ সচেতনতাকেবহুধা করতে একে সাহিত্য - সংস্কৃতির মানুষ চিন্তা পথের মিলনে, জীবন - ঐক্য সাধনাকে এগিয়ে দেবেন। ভারত এখন নানান সমস্যারস ামনে। একদিকে দ্রুত উন্নয়ন লক্ষ্য আর একদিকে পরিবেশ সংরক্ষণ। গ্রাম সমাজকে সচলায়িত করা, নগর অতি - নগরকে নিয়ন্ত্রণ করা। একদিকে দারিদ্র, ভূমিচ্যুত হয়ে যাওয়া মানুষের দল, ঘন অন্ধকার ঝুপড়ি, আতঙ্ক মহামারী, অশিক্ষা, পাশ্চাত্য ধাঁচের বিলাসিতার হাতছানি, মেকি জীবন - যাপনের দ্বিধাগ্রস্ত সংস্কৃতি বা অপসংস্কৃতি। ধনী আরও ধনকে লুঠতে চায়। হাজার হাজার কোটি টাকার বাঁধ প্রকল্প মানে, কিছু মানুষের ও প্রতিষ্ঠানের তাৎক্ষানিক অর্থ লাভ। উঁচু হয়ে, স্ফীত হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক ধনের উল্লাস। এমন উল্লাসেসামিল হন রাজনীতিক দলেরা, তাদের ছায়ায় গড়ে ওঠা মাফিয়া রাজ। লুঠের মালের মাচায়। চাষের জমিতে কত জল এল, এল কত লোনা জল। নদীর অববাহিকায় নাব্যতা কত কমল। নদীর আঘাতই বা কত হল। সত্যিই কত খরচের বিনিময়ে কত লাভ হল, সাধারণ গ্রামের মানুষের আঘাতের খবর পাথুরে, ঠাণ্ডা অফিস ঘরে, আকাশচুম্বী অট্টালিকায়, বাসা পায় না। স্থান পায় না মানুষের ধবনি, মানুষীপরিকল্পনা।

আজ খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়, 'তবে পঞ্চভূতবন্ধনকর ইন্দ্রজাল'। যা ছিল 'সকলের গান' মুক্তধারায়। তাই যেন হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়ে যায় তার মর্মর বাণীকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একান্ত নিজস্ব পল্লীজীবনে, 'ছিন্নপত্রাবলী' পর্যায়ে গ্রামের, নদীর সমাজচিত্র পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর পত্রসাহিত্য ধারায়, মানুষের কথা, বিশ্বপরিবেশ সংবাদরাশি ফুলে ফলে আমাদের পুষ্টি যুগিয়েছিল। সমসাময়িক কালেই 'পঞ্চভূতের ডায়রি'-র মতন পরিবেশ বিজ্ঞান - সাহিত্য আমাদের চারপাশ, উর্ধবাকাশকে চেতনার নাগালে এনে ও দিয়েছিল। ছিন্নপত্রাবলী-র সময় থেকেই বছর বছর 'পল্লী জীবনের গল্প' বাস্তবের পরিপূর্ণতায় আমাদের জীবনযাত্রায় এনে দিয়েছিলেন। বলেওছেন, 'একসময় ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনকথা'। এই যে সহিতত্বর দৃষ্টি, পৌরুষের মতন পরিবেষ্টনীকে দেখার জানার প্রবল ইচ্ছা, এতে আছে বিরল বাংলায় পল্লীর বিচিত্র জীবনকথা'। কিন্তু পরিবেশ পরিবেষ্টনীর কথা বলতে গেলে মানুষকে জানাতে গেলে এমন পরিশ্রমী দৃষ্টি, সাহস ও গভীরতা সবই দরকার। পরিবেশ - সংস্কৃতি তার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। ত্যাগের সঞ্চয়ে তীরেতীরে গড়ে ওঠা রবীন্দ্রসাহিত্যে, নদী ও নদীর বাঁধ প্রসঙ্গ এসেছে। এসেছিল প্রযুক্তি ও প্রকৃতির পরিবেশের সংঘর্ষ সংকেত। মানুষের কথা, নদীর জলের, ঝরনার অধিকার, খেত, চাষ - আবাদ -- কোনও কিছুই বাদ যায়নি। নর্মদা সংকট, বাঁধ জলধার, জলছাড়া নিয়ে প্রবল ঝড় উঠেছে, যেখানে অরুন্ধতি তাঁর সাহিত্যকে ডাক দিয়েছেন সংস্কৃতি - কর্তব্যে -- এমন প্রেক্ষাপটে ১৯২২ সালে লেখা মুক্তধারা নাটকের প্রাসঙ্গিকতা আবার নতুন ভাবে আমাদের ভাবাচ্ছে। 'মুক্তধারা' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, '...যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে --- কেননা যে - মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে -- তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছ।' পীড়িত মানুষের কথা মুক্তধারায় এসেছিল। পীড়ন থেকে মুক্তপ্রাণ, যাত্রাপথের মুক্তি পাবে এমন আশা তিনি করেছিলেন। কিন্তু এত বছর পর এসেও যাত্রাপথের প্রযুক্তি সংস্কৃতিতে ঠাঁই পায়নি রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রভাবনা! এখনও কি তাই মানুষের খেতের ফসল ভেসে যায়। বুক বুক জলে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের সারি; বনস্পদে বেড়ে ওঠা আদিবাসীরা জানতেই পারে না কিসের বাঁধ, কার বাঁধ! এখনও কি শিবতরাইয়ের মানুষ বাঁধ গড়ার যন্ত্র দেখে বয়ে চলেছে---

'যেন মস্ত একটা লোহার ফড়িং আকাশে লাফ মারতে যাচ্ছে।'

'ঐ ফড়িংএর ঠ্যাং দিয়ে তোমাদের জল আটকাচ্ছে।'

মুক্তধারায় বাঁধ বেঁধেছে, জল ছেড়ে ভাসানো হবে আর একদিকে। মানুষেরা বলছে---

'আমরা মরে ও মরব না পণ করেছি' আশর্চ্য হতে হয়, আজ এমন কথাই কিন্তু বৃহত্তর নর্মদা, সর্দার সরোবরের বিপর্যস্ত মানুষেরও কান্না ভেজানো প্রতিধবনি। এমন সব ঘটনা, গভীর প্রতিবাদকে অরুন্ধতি তাঁর লেখায় এনে দিয়েছেন। সরেজমিন অভিজ্ঞতায় জানিয়েছেন আতঙ্কের পরিস্থিতি। কত কত মানুষের গৃহহারা হওয়া, ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা ও বাস্তব পরিস্থিতি।

মুক্তধারায়্য যেমন ছিল, তেমনই অহঙ্করী প্রশাসন আজও স্বাধীন ভারতে, পরাধীন চিন্তার কর্তাব্যক্তিরা আচরণ করে চলেছেন। ভূক্ষপ করেন না কার জমিতে কে ভেসে যাবে, নদী জলের অধিরাই বা কার, কাদের খেতের ফসল কোথায় ভেসে যায়, কি আসে যায়! তাই উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ, মুক্তধারার প্রেক্ষাপটে, দূতের কথা -- 'কত লোক ধুলোবালি চাপা পড়ল, কত লোক বন্যায় ভেসে গেল ...' পড়তে পড়তে যেন মনে হয়, এ'ত সরদার সরোবর প্রকল্পের ভেসে যাওয়া মুখ্‌দি গ্রামের মানুষেরই যেন প্রাণের কথা। কিংবা 'মানুষ' অভিজিতের দূত এবং 'যন্ত্রী' বিভূতির কথোপকথন প্রাসঙ্গিকতার মাত্রায় যেন বড় সত্য নিয়ে হাজির হয়---

দূত। তারা নিশ্চিত আছে, জানে না আর সপ্তাহ পরেই তাদের চাষের খেত---

বিভূতি। চাষের খেতের কথা কী বলছ?

দূত। সেই খেত শুকিয়ে মারাই কি তোমার বাঁধ বাঁধার উদ্দেশ্য ছিল না?

বিভূতি। বালি - পাথর - জলের ষড়যন্ত্র ভেদ করে মানুষের বুদ্ধি হবে জয়ী এই ছিল উদ্দেশ্য। কোন্ চাষির কোন্ ভুট্টার খেত মারা যাবে সে কথা ভাববার সময় ছিল না।'

আজও কারও সময় নেই। মানবিকতার ভরা, আক্ষেপের সুরে অরুন্ধতি বর্ণনা করেছেন। ঔদাসিন্য, ঔধ্যত্বের মোড়কে ঢাকা প্রশাসন, শাসকদের আচরণ বাস্তব সমস্যাকে আরও ঘোরালো করে দিয়েছে। নির্মম ঘটনাগুলিকে বিস্তৃত করে, দ্য গ্রেটার কমন গুড -এ লিখেছেন।

The million of displaced people don't exist any more. When history is written they won't be in it. Not even as statistics. Some of them have subsequently been displaced three and four times – a dam, an artillery proof range, another dam, a uranium mine, a power project … The great majority is eventually absorbed into slums on the periphery of our great cities, where it coalesces into an immense pool of cheap construction labor (that builds more projects that displace more people). True, they're not being annihilated on taken to gas chamber, but I can warrant that the quality of their accommodation is worse than in any concentration camp of the Third Reich. They're not captive, but redefine the meaning of liberty"

খুব বড় প্রশ্ন তুলেছেন। India lives in her villages, we've told in every other

sanctimonios [illegible]. [illegible], [illegible]. India dies in her villages. India gets kicked around in her villages. India lives in her cities."

তথ্য সমৃদ্ধ যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে। দারিদ্রসীমার নিচে বাস করছে। খাদ্যশস্য উৎপাদন করেও, মানুষের কল্যাণে তা আসছে কই।

Certainly India has progressed but most of its people haven't.

তথ্য সমৃদ্ধ পরিসংখ্যান দিয়েছেন অত্যন্ত গুছিয়ে, সরাসরি প্রতিবেদনে---

[illegible] ১৯৪৭, [illegible], India was food deficit. In ১৯৫০, [illegible] ৫১ [illegible]. [illegible] ২০০ [illegible].

[illegible] ১৯৯৫, [illegible] ৩০ [illegible], ৪০ [illegible] — [illegible] ৩৫০ [illegible] — [illegible]. [illegible] ১৯৪৭.

খুব পরিশ্রমী, অনবদ্য অর্ন্তদৃষ্টি এবং হৃদয় দিয়ে লেখা এমন প্রতিবেদন সাহিত্যের প্রযোজন ছিল। প্রয়োজন ছিল জ্বলজ্যান্ত সত্যগুলোকে সামনে রাখা। যাতে সকলে বুঝতে পারে, ধরতে পারে সমস্যা কত গভীর রয়ে গেছে। সংগত কারণেই ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে, অমানবিক পরিস্থিতিতে প্রতিবাদী ভাষা রূপ নিয়েছে, প্রাথমিক প্রশ্ন রেখেছেন দেশের কাছে --

[illegible] Pakistan. But who will protect us form ourselves.

[illegible]

মানুষেরই তৈরি এই সমস্যায় মানুষই চাপা পড়ছে। পাঁচ কোটি মানুষ যেখানে হারিয়ে যায়, সেখানে উন্নয়ন - এর সংজ্ঞা ভেবেদেখতে হবে। পরিবেশ সংস্কৃতির বড় শর্তই হল স্থানীয় মানুষ ও ভূমি এবং তাদের কর্ম - কে অগ্রাধিকার দেওয়া। সেই পথেই ভারতের স্থিতিযোগ্য উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও পরিকল্পনাগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে, অসামঞ্জস্যকে, নিবিড় কর্ম সংস্কৃতি ও জীবন সুরক্ষার আয়োজনে দৃঢ় করতেই হবে। তবেই গড়ে উঠবে সামাজিক ও পরিবেশিক স্বাস্থ্য। অভিপ্রেত যা সকলেরই কাছেই।

:

।। ছয় ।।

লেখাটির প্রথমে বর্ণনা দিয়েছিলেন বেশ কয়েকটি আদিবাসীগ্রামের। যেখানকার স্থানীয় মানুষেরা, শিশুরা বনভূমির মাঝে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তারা সব জল - তোড়ে ভেসে যেতে পারে। বর্ষায় যখন সর্দার সরোবর জলাধার থেকে তোড়ে জল ধেয়ে আসবে। প্রশ্ন তুলেছেন এমন গভীর আবাসিক সামাজিক, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে, যা হাজির করে খুব বড় মাপের সত্যকে। প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, কিন্তু খুব সংযত, প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা দিয়ে ---

[illegible]

বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ভারতের আদিসভ্যতা, ভেসে যাবে মানুষ। খুব গভীর প্রশ্ন তুলেছেন। যে কোন প্রযুক্তিকে মানবিক অবয়বে, প্রয়োগে রূপায়নে মানুষ ও প্রকৃতির নিত্য সম্বন্ধতাকে সংরক্ষিত রাখতে হবেই। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, মানুষের বাসস্থানের ইতিহাস, অরণ্য ভূমি - সংস্কৃতি -- এ সবই পরিকল্পনায় রাখতে হবে। তা না হলে আপাত সামান্য আঘাতের, ভুলের প্রয়োগে -- মানব প্রকৃতি পরিবেশ সভ্যতাই ভেঙে পড়বে। যত বড়ই প্রকল্প হোক না কেন, সেইসব প্রকল্প গড়ার আগে, একেবারে প্রাথমিক স্তরে, স্থানীয় সামাজিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক পরিবেশের বিস্তৃত সমীক্ষা এবং সুস্পষ্ট পর্যবেক্ষণের অবশ্যই দরকার। তা না হলে কি ভয়ঙ্কর পরিবেশ ক্ষতের যে সৃষ্টি হয় তার নানা পরিচয় এই প্রতিবেদকের রয়েছে।

উন্নয়নের বিপক্ষে নিশ্চয়ই তিনি নন। উন্নয়ন স্থানীয় মানুষ ও তার চারপাশের অবস্থান মানিয়ে গড়ে উঠবে। কথা হচ্ছে এমন উন্নয়ন যেন না হয় যে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হয়ে গেল, অথচ তার থেকে বেশি টাকার ক্ষতি হল পরিবেশের। এমন স্থায়ী পরিবর্তনে বিনষ্ট হবে মানুষ ও তার ভূমিজ সংস্কৃতি। দলে দলে ছিন্নমূল তৈরি হবে। গ্রামসমাজ হয় বিনষ্ট। কিছু মানুষের সুবিধা দেখতে বৃহত্তর মানুষ বিপর্যস্ত হল। ইকোলজি বিধবস্ত, ভবিষ্যত পরিবেশ অনিশ্চিত।

এমন ধরনের পরিকল্পনা নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতের এমন বহু দৃষ্টান্ত অরুন্ধতি দিয়েছেন যা থেকে আধুনিক ভারতের সর্বতোমু

খি পরিকল্পনা বিষয়ে সন্দেহ দানা বাঁধতেই পারে। নাগার্জুন সাগর বাঁদ ভাক্‌রা নাঙাল, বারগি বাঁধ প্রভৃতির পাশাপাশি বিদেশের বড় বাঁধের প্রসঙ্গও এনেছেন। যাতে মানবিক চৈতন্যের উদয় হয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে শুনিয়েছেন গ্রামবাসীদের ক্ষোভ, আদিবাসীদের আ শঙ্কার কথা। খুবই আশাপ্রদ যে পাশাপাশি বাস্তুব্যবস্থারও অবস্থান জানিয়েছেন। কোন প্রেক্ষাপটে, বিশ্বব্যাঙ্ক এগিয়ে এল। আর কেন ই বা তারা পিছিয়ে গেল সেই সব তথ্য রয়েছে।

ভারতের তীব্র বাস্তব অবস্থার কথা তুলেছেন। যাকে বলা যেতে পারে বাঁচার অধিকার উন্নয়নের শর্ত সম্বন্ধতার দর্শন। কি পরিবেশ মানুষ আজ বাস করছে--- "…one-fifth of our population – 200 million people – doesn't have safe drinking eater and two – thirds – 600 million – lack?? Sanitation."

যথার্থ মন না থাকলে, মনন হবে কি করে। আজ মনন ছাড়া, ভবিষ্যতমুখি পরিবেশ ও স্থিতিযোগ্য উন্নয়নই বা হবে কি করে। এই প্র শ্ন আজ দিকে দিকে, স্বদেশ - বিদেশে। আগে জানতে হবে দেশকে -- তার মানবিক - সামাজিক ভূগোলকে, মানসিক স্বাস্থ্য, বাহ্যিক স্বাস্থ্য-র সব খবর রাখতে হবে। তবেই প্রকল্প, প্রযুক্তি -- প্রয়োগশিল্পের স্তরে মাথা উঁচু করে মানুষ ও প্রকৃতি পরিবেশের বন্ধু হবে। দ রকার হবে, মুক্ত জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চা। যথার্থ পরিবেশ - সংস্কৃতি গড়তে খোপবদ্ধ বিদ্যাচর্চা, সংকীর্ণ মনোভাবকে বাতিল করতে হবে। একুশ শতকের দিশা আজ পরিবেশ শতকের। একক ভাবে কোন্য বিজ্ঞান প্রযুক্তি এত বড় মানবিক সমস্যার মোকাবিলা আর হাত করে উঠতে পারবে না। দ্য গ্রেটার কমন গুড - কে বিস্তৃত করতে হলে নিজেদেরকে বিস্তৃত করতেই হবে। একে অপরের চিন্তা ঃ ভা বনার সম্মিলনেই বৃহত্তর পরিবেশ সমাজ, পরিবেশ - সংস্কৃতি গড়ে উঠবে। কোনও প্রকল্প গড়ার আগে আন্তসম্পর্কযুক্ত চোখের দে খা মনের দেখার ঐকতান, শক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এ ভূমি কার, নদী কাদের, বনভূমি কিংবা ঝরনা জলের মাছ -- এদের যে আছে পরিবেশের অধিকার। এই বোধ, ভালবাসা গড়ে তুলতে পারে। যে ভালোবাসায় প্রযুক্তি, মানবিক পরিবেশ সংস্কৃতিতে উত্তীর্ণ হন। এমন উত্তরণের ভাষায একজন সাহিত্যিক, প্রযুক্তিবিদ, শিল্পীর সমান দায়, দায়িত্ব।

এই দায়িত্বই রাম বাই - এর দুঃখ অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারবে। রাম বাই, যিনি উদ্বাস্তু। জববলপুরের ঘিঞ্জি অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে বাস করেন। যার বাপ - পিতামহের আপন সবুজ গ্রাম ভেসে গিয়েছে নর্মদার ওপর বারগি বাঁধ নির্মাণ করতে। তার কথা প্রাণ দিয়ে মন দিয়ে শোনার সময় হয়েছে, যথার্থই দ্য গ্রেটার কমন গুড - কে অগ্রাধিকার দিতে। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছিল তার প্রিয় গ্রামট যুগ যুগ ধরে রাম বাই-র যেখানে স্বাভাবিক প্রাকৃত নিয়মে বেড়ে উঠেছিল; গড়ে ঠেছিল তাদের লোক জীবন - সংস্কৃতি -- মানুষের তৈরি প্লাবনে মানুষকেই ভাসিয়ে দিল। রাম বাই বাস্তুচ্যুত, নেই চকিতের বস্তিতে দলা পাকিয়ে গেল তাদের প্রকৃতিমুখি জীবন স্থানিক কর্মঐতিহ্য। ডুবে গেল প্রাচীন অরণ্য সভতা, বিরল স্থানিক প্রজাতি। রামবাই প্রশ্ন তুলেছিল --- "Why didn't they just poison us? Then we wouldn't have to live in this shit–hole and the government could have survived alone with its precious dam all to itself." এইখানেই অরুন্ধতির দ্য গ্রেটার কমন গুড - এর সবথেকে বড় সাফল্য। মন চোখ খুলে দেয়। কি করতে গিয়ে কি করে ফে লেছি আমরা! তার সামনাসামনি করে দেয় সকলকে।

:

।। সাত ।।

এমন কর্তব্য বড় আকারে সাইলেন্ট স্প্রিং (১৯৬২) পালন করেছে। কত বড় পরিবেশ জীবন জিজ্ঞাসা আর যাত্রী হবার সংকল্পের কথা 'স্মৃতির রেখা' (১৯২৫-২৮) জাগিয়েছে। কৃতির সঙ্গে সুবৃহৎ আত্মীয়তার প্রতিমা 'ছিন্নপত্রাবলী' (১৮৮৭-১৮৯৫) এনে দিয়েছে। ছিন্নপত্রাবলী থেকে দ্য কমন গ্রেটার গুড (১৯৯৯) প্রায় একশ বছরেরও বেশি সময়ের প্রেক্ষাপট। উনিশ শতকের সেষ অধ্যায় থেকে বিশ শতকের প্রায় সেষ পর্যায় পর্যন্ত মানুষ ভূমি ও পরিবেশ নিয়ে এই চারটি ব্যতিক্রমি সাহিত্যের বিস্তার। পত্রসাহিত্য, ডায়ারি - সাহিত, বিজ্ঞান - সাহিত্য, আর প্রতিবেদন সাহিত্য। প্রায় সবক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে লেখকরা প্রত্যক্ষ পরিবেশে (যাকে বলে experience 'at site') থেকে আন্তরিকতা - অভিজ্ঞতায় মানুষ ও প্রকৃতির কথা বলেছেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে, বাস্তবিক বাস্তব্যবস্থার কথা, পরিবেষ্টনীর প্রভাব এবং মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির নিত্য ছন্দের সত্যগুলিকে তুলে ধরছেন। পরিবেশকে বুঝতে হলে ভালবাসার শর্ত থাকে। তা না হলে, নিছক বুদ্ধি দিয়ে গভীরের তল পাওয়া শক্ত। মানুষ বুদ্ধি বলে বাহুবলকে প্রকৃতির ওপর চাপিয়ে দিতে পেরেছে। আজও করে চলেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, দূষণ সমস্যা মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকেই দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ছিন্নপত্রাবলী, স্মৃতির রেখা, সাইলেন্ট স্প্রিং, দ্য গ্রেটার কমন গুড--- পরিবেশের স্বপক্ষে, বেহিসেবি মানুষের বিপক্ষে, অনৈতিক আচরণের বিরুদ্ধে বড় প্রতিবাদ। অবশ্যই পরিবেশমুখি চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খুব বড় শক্তি। এমন সাহিত্য, যা ভিন্ন ধারায় -- একাধারে অনেকটাই সহজিয়া বর্ণনায় আবার - ওদিকে বিদগ্ধ জিজ্ঞাসায় ভরপুর। প্রশ্ন তুলছে একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে। মানব সভ্যতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এসে পড়েছে। আর এসেছে খুব বড় মাপের বৌদ্ধিক মানবিক আদর্শকথা, যে কোনও তুচ্ছই তুচ্ছ না যাকে আমরা তুচ্ছ ভাবছি, তাই কিন্তু এই বিপুল পরিবেশ প্রাণের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রযুক্তি সভ্যতা ও মানুষের অগ্রগতির অপরিহার্য সত্যশক্তি। বিজ্ঞানকে প্রয়োগ শিল্পে উত্তীর্ণ হতে হলে চাই মানবিক দৃষ্টি ও মনন। উদার দৃষ্টি ও গভীর মমতায় ভরা মনের পুষ্টি আসে সাহিত্য - সংস্কৃতি থেকে। প্র

কৃতিমুখি সাহিত্য, এমন সব অভিজ্ঞতা এনে দেয়। যা থেকে প্রকৃতি, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণ প্রাণী সমাজের ছন্দ, বাস্তব জগতের আয়ত্ব এসে পড়ে। বোঝার ক্ষেত্রে সহজ হয়ে যায়। বিজ্ঞান আর সাহিত্য - সংস্কৃতি মিলে যে সমন্বয়ী জ্ঞানের ক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে পারে, তার প্রয়োজন প্রযোগবিদ্যায় অত্যন্ত গুরুত্বের। পরিবেশ - সংস্কৃতি গড়ে তুলতে অপরিহার্য।

যে সব গ্রন্থের, আলোচনা করা হল সেগুলি আন্তসম্পর্কযুক্ত প্রয়োগবিদ্যা চর্চায় যথেষ্ট গুরুত্বের। এমনকি আধুনিক মানুষের সবথেকে যে বড় ভুল -- প্রকৃতি পরিবেশের ভারসাম্যকে আঘাত করা, ছন্দচ্যুত করে ফেলা; এমন সব বড় ভুলের বিরুদ্ধে লেখা বুদ্ধি ও হৃদয় যোগে শ্রেষ্ঠ পরিবেশ চেতনা। 'ছিন্ন পত্রাবলী' এই বিপুল বিশ্বজগৎ বিশ্বপ্রাণের সপক্ষে নৈতিকতার দলিল। 'স্মৃতির রেখা' এমনই সবুজ দর্শনের সন্ধান করেছে, যা আগামী দিনের পরিবেশ সচেতন মানুষের বড় কর্তব্য। প্রকৃতি প্রাণ পরিবেশ মাঝে স্থান লাভ করে। অতীতের অবস্থার কথা ভেবে - বুঝে, ভবিষ্যতের পথকে প্রত্যক্ষ করা। যে পথে চলতে গেলে সচেতন পরিবেশ - দাত্রী হতে হবে। এই ধরিত্রীর সহযাত্রীদের কথা যে ভাবছে, সেই তো পরিবেশের সবথেকে বড় বন্ধু। দ্য সাইলেন্ট স্প্রিং শুধু যে মারাত্মক পরিবেশ ক্ষতের খবর এনে দিয়েছে তা তো নয়; দেখিয়ে দিয়েছে এমন ভুল থেকে ভবিষ্যতের মানুষ যেন শিক্ষা নেয়। পরিবেশ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে এমনচৈতন্য আজও সবথেকে প্রয়োজনীয়। আর দ্য গ্রেটার কমন গুড প্রমাণ করে দিয়েছে মানুষের সনাতন পরিবেশ জীবন ও জীবিকা সংস্কৃতি-তে, কিছু ভুল পরিকল্পনা কত বড় পারিবেশিক বিপর্যয় আনতে পারে। উন্নয়ন, পরিবেশ এবং স্থিতিযোগ্য মানুষী ভবিষ্যতেরস প্রশ্ন থেকে গিয়ে সাহিত্য এগিয়ে এসেছে। প্রযুক্তি পরিকল্পনা তা থেকে সমৃদ্ধ হবে। অগ্নিময় উৎসাহ, জীব-জীবনমুখি পরিবেশকথাকে স্বচ্ছন্দ প্রাঞ্জলতায় আমাদের জীবনযাত্রায় এনে দিয়েছে। এমন সাহিত্য, যাকে পরিবেশ সাহিত্য বলা যেতেই পার, খুব সুলভ্য নয়। বৃহত্তর পরিবেশ আন্দোলন গড়ে তুলতে, সর্বস্তরের মানুষের চেতনার উদবোধনের প্রয়োজন হবে। এমন সব সাহিত্য - সংস্কৃতির ঐতিহ্য গুলিকে পারিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বিশ্লেষণের সময় এসেছে। তাতে মানব - জীবপ্রাণ ভবিষ্যত অনেক বেশি সুরক্ষিত হবে।

যে কোনও পরিবেশ কেন্দ্রিক পরিকল্পনা তার দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হবে। সমন্বয়ীচর্চা ছাড়া পরিবেশ আন্দোলন, পরিবেশ চেতনা কখনই গড়ে উঠতে পারে না। সর্বত্রগামী পরিবেশ চেতনা ছাড়া এই ধরিত্রীর যথার্থ মঙ্গলসাধনা কখনও সম্ভবপর হবে না। মানুষেরপরিবেশমুখি আচরণেই বিপর্যস্ত এই জীবন আবার সংগীতময় হয়ে উঠতে পারে। বিশাল প্রযুক্তির সব থেকে বড় উন্নতির পর, ঐ বিশ শতকেই এসে গেছে সব কিছু প্রায় পেয়েও, জীবনপ্রাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে মানুষ যাত্রাপথে, সহযাত্রীদের কথা ভাবতে ভুলে যাচ্ছে -- বুদ্ধিময়তার উল্লসিত মানুষ চলছে। আগামী দিন, পৃথিবী পরিবেশের প্রতি সম্মান জানানোর শতাব্দী। আর যেন বড় বড় ভুল আমরানা - করি। বিজ্ঞান প্রযুক্তি, সাহিত্য - শিল্প, মিলে মিশে যে পরিবেশ সংস্কৃতি গড়ে তুলবে সেই হবে যথার্থ প্রাণময়তার ভরা জীবন সংস্কৃতি। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সবুজ প্রকৃতি, নদী - বায়ু -জল, পশু - প্রাণী - কীটপতঙ্গ আজ আর সুখে নেই। 'মাতৃক্রোড়েব আতপ্ত স্পর্শে' কোথাও বিঘ্ন ঘটে চলেছে। দারিদ্র, ক্ষুধা, দূষণ ও অসামঞ্জস্য জীবনবাণী - কে সংগীতহারা করে তুলেছে। বসন্ত নির্বাক। বৃহত্তর সকলের ভালো, আর ঘর পাচ্ছে না। একঝোঁকা উন্নতির সভ্যতায় জগতের গৃহবাণী বিপন্ন হয়ে চলেছে।

ভবিষ্যৎ - মানুষ কখনই এমন ভুলকে স্থায়ী করবে না। শিক্ষা লাভ করে শুধরে নেবে। সভ্যতার ইতিহাস, নব জাগরণের আলো সেই কথাই তো বলে। জীবন সত্য সাধনা, নৈতিক মূল্যবোধ --- পৃথিবীর কাল আলো করা পারিবেশিক আচরণ আবার ফিরিয়েই আনবে। মানব জীবন এমন সব বিজ্ঞান - প্রযুক্তি, পরিকল্পনা ও সাহিত্য - সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটাবে যা হয়ে উঠবে একুশ শতকের শ্রেষ্ঠ সংগীত। বসন্ত আসবে, সংগীত নিয়ে। পাখিরা মেতে উঠবে গানে গানে। বিস্মিত অপু ভবিষ্যতের সবুজ গ্রাম পথে নীলকণ্ঠ পাখিকে খুঁজে পাবে। স্থানিক বিরল প্রজাতিরা ফিরে আসবে বনপথে। বাস্তুহারা রাম বাই, নর্মদার কোল ঘেঁষা লোকজীবনে আবার বাসা ফিরে পাবে। বিষের কথা ভুলে, জীবন - আনন্দের গান গাইবে। পরিবেশ পত্রগুলোকে, মিলিয়ে নিয়ে প্রাকৃত মানুষ স্বচ্ছন্দ পৌরুষে মাথা উঁচু করে যেন বলতে পারে -- 'আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালবাসি'।

পরিবেশ হইতে সাবধান

মোহিত রায়

মন চল নিজ নিকেতনে। তবে কেমন সে নিকেতন? মন বাউল কি বলে হে বলে হে? কেমন সে নিকেতন তা বলা হয়েছে ইন্ডিয়া টুডে-র ২সেপ্টেম্বর, ২০০২-সংখ্যায়। দিল্লী শহর থেকে ২৫ কিলোমেটার দূরে সেই শান্তিনিকেতন ও পরিবেশ-গ্রাম। এখানে ঘরবাড়ি কাফে রেস্তোঁরা গল্ফকোর্স লেক, ক্লাব - সবই আছে, সবই আছে সবুজ পলিবেশে। এখানে আছে ২৫০০০ গাছ, অখানে সব বর্জ্য পুনশ্চক্রায়িত হবে। প্লাস্টিক থাসবে না। বর্জ্য থেকে হবে জৈবগ্যাস। কম্পোস্ট সার। গাড়িতে বাজবে না হর্ন। এর পরিকল্পনা করেছ এক ব্রিটিশে কোম্বানি। এই নিকেলের মালিক পরিবেশপ্রেমী অশ্বিনী খুরানা তার ১০০০ কোটি টাকার লটারি ব্যবসা থেকে এই নতুন কর্মকান্ডে নেমেছেন। এই শান্তিনিকেতনের এক একটা বাড়ির দাম পড়বে ন্যূনতম ১ কোটি টাকা। পরিবেশপ্রেমের জন্য এই দাম দিতে রাজী অনেকেই - জানেন অশ্বিনী খুরানা।

পরিবেশ প্রেমের এই ঢেই এখন বইছে আবিশ্ব। একেবারে শন্তিপুর ডুবুডুবু, নদে ভেসে যায় রে। একেবারে নতুন মডেলের গাড়ি, যার ৩০ শতাংশ তৈরি প্লাস্টিকে - সেই গাড়ির সুবেশা মাগিক এসে যোগ দিচ্ছে প্লাস্টিক বিরোধী মিছিলে, যার বাড়িতে এখনো বিদ্যুৎ পৌছয়নি সেও হ্যাবিকেনের আলোতে রচনা লিখছে বিকল্প শক্তি নিয়ে। বিশ্বসুন্দরী থেকে গ্রামের এক এন জি ও কর্মচারী - এক নতুন বমনবশৃঙ্খল। এক নতুন শেকলে বাঁধা হচ্ছে সব মানুষকেই। এই পরিবেশ শৃঙ্খল নিয়ে কিছু কথা।

:

অবাক জলপান

:

বছর খারেনক হবে, গত পুজোর কিছুদিন আগে, হুগলীর শল্পাঞ্চলেক কছু মানুষ ঠিক করলেন যে এবার পুজোর সময় পরিবেশ নিয়ে প্রচারাভিযান চালাবেন। এই মানুষজনেরা মোটামুটি রাজনৈতিক ভাষায় সচেতন মানুষ, বামপন্থীতো বটেই এবং সরকারী বামপন্থীও নন। ত্তিন পেশার, মূলন ত্রিশোর্ধ, চল্লিশ পঞ্চাশের বয়সের কিছু রাজনৈতিক-আধা রাজনৈতিক-আধা রাজনৈতিক মানুষ। স্থানীয় সমস্যা নিয়ে কিছু কববেন বলে একটি সংগঠনও তৈরি করে বিভিন্ন উদ্যোগ নিচ্ছেন। আসন্ন শারদীয়া উৎসবের সময় পরিবেশ নিয়ে প্রচারে নামবেন সংগঠনের সমস্যরা।

হুগলীর শিল্পাঞ্চলের রাজনীতি সচেতন বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠা ট্রেড ইউনিয়ন থেকে গণ নাট্য থেকে লিটল ম্যাগাজিন - নতুন ব্যালার নয়। শারদীয়া উৎসবকে পবচারের জন্য ব্যবহার করাও নতুন নয়। শুধু প্রচারের বিষয়টি একেবারে নতুন - পরিবেশ। তিন দশক আগে ১৯৭২- এ স্টকহোমে যে পর্বের শুরু গত এক দশকে তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে এদেশে, এমনকি হুগলীর গঙ্গার ঘাটেও। ১৯৭২ - এর আন্তর্জাতিক স্টকহোম সম্মেলন কিন্তু একগুচ্ছ ঘোষণাপত্র ছাড়া তেমন কিছু হয় নি। উপস্থিত হয়েছিলেন মাত্র জনা কয়েক রাষ্ট্রপ্রধান। যার অন্যতব ছিলেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। গুরুত্বপূর্ণ আর কেউই ছিলেন না। কেন হঠাৎ পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে ইন্দিরা গান্ধী সেই সম্মেলনে গয়েছিলেন তা নিয়ে পরিবেশ ঐতিহাসিকরা গবেষণা করতে পারেন। কারণ ভারতে তখন পরিবেশ মফতরই ছিল না। ছিল না কোনো আইন কানুন। ঐ সম্মেলনের তৎকালীন কোনো গুরুত্ব অন্তত সংবাদ মাধ্যম দেননি, ঐ সময়কার বেশ কিছু ক্যুইজ বুক বা পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর বইতেও কখনও স্টকহোম সম্মেলনের উল্লেখ নেই। আশর দশক থেকে অবস্থা পাল্টাতে থাকল দ্রুত। ফলে ১৯৯২ - এ যখন স্টকহোম সম্মেলনের কুড়ি বছর পূর্তিতে (অবশ্য স্টকহোম সম্মেলনের কোনো দশ বছর পূর্তির সম্মেলন নেই!) রিও ডে জেনিরোতে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হল, তাতে যোগ দিলেন বশ্বের সবচেয়ে বেশ সংখ্যক রাষ্ট্রপ্রধান। দেড় শতাধিক রাষ্ট্রপ্রধান যে বষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলে আসেন তার গুরুত্ব যে প্রশ্নাতীত তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। এরকম গুরনত্বপূর্ণ বিযয় যে রাজনীতি, অর্থনীতি বা সামাজিক মতামতকেও প্রভাবিত করবে তাও স্বাভাবিক। ফলে গত দু দশকে পরিবেশ রাজনীতি ও ব্যবসার সাথে জড়য়ে গেছে। পরিবেশ হয়েছে রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার, ব্যবসার নতুন ক্ষেত্র - ফলে এতে জড়িয়ে পড়েছে সরকার, রাজনৈতিক দল। ব্যবসায়ী এবং এনজিওরা। গত এক দশকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের পলে যে অারেক বিশ্বায়ন ঘটে চলেছে তার হাওয়া থেকে হুগলী বাদ যায় কী করে?

হুগলীর এই সমাজসচেতন মানুষেরা পুজোর আগে পরিবেশ নিয়ে যে প্রচারে নামবেন - তার মূল লক্ষ্য প্লাসিটিকের ব্যবহার বন্ধ করা। প্লাস্টিক ব্যাগ নয় (ওটাতো সরকারই করছে), প্লাস্টিকের জলের ট্যাঙ্ক ব্যবহার বন্ধ করা থাকবে একটি প্রধান স্লোগান। বন্ধ করতে হবে প্লাস্টিকের খেলনাও। এই দূষণ নাকি ভয়ানক সমস্যায় ফেলেছে হুগলীর অধিবাসীদের। এখানের জলদূষণের প্রধান সমস্যা কি প্লস্টিক (পিভিসি বা পলিইথিলিন)। জলাধারের জন্য? আর প্লাস্টিক জলাধার বা পাইপ থেকে কতটা দূষণ হয়? তার পরিণাম কি? না, সংগঠকেরা এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানেন না। এই অঞ্চলের পানীয় জল দূয়ণের প্রধান উৎস কী? এসবও তারা খুব একটা ভাবেন নি। একটি বিদেশী পরিবেশবাদী গ্রুপের প্রচারপত্র থেকে প্লাস্টিক জলাধার থেকে কী কী দূষণ হতে পারে তাই তাদের তথ্যভিত্তি। কিন্তু এইসব দূষণ ঠিক কী কী ভাবে ঘটতে পারে তা তারা জানেন না এবং এজন্য পাড়ার কোনো রসায়নের শিক্ষককেও তাব

া জিজ্ঞেস করেন নি। যে সব দূষণের কথা বলা হচ্ছে তা কি এখানকার পরীক্ষাগারে মাপা যাবে? তাও তারা জানেন না। জানেন না ভারতীয় মাত্রা অনুযায়ী পানীয় জলে দূষণের মুখ্য মূষকগুলি কী?

হ্যাঁ, পরিবেশ আন্দোলন করতে গেলে এসব না জানলেও চলে। বেশ কিছু প্রকৃতি প্রেমের কথা বা বেশ গরম গরম সমাজব্যবস্থা নিয়ে পুঁজিবাদীদের মুন্ডপাত - এসব নিয়েই করে ফেলা যায় চকচকে পরিবেশ আন্দোলন। ঝকঝকে কাগজে ফুটফুটে ছবি নিয়ে ইংরাজী প্রচারপত্র।

এসব প্রচারপত্রে পাবেন ওজোন গহ্বর থেকে ডায়অক্সিজেন হাজারো কথা - কিন্তু পানীয় জলের মুখ্য সমস্যা প্রাণঘাতী জীবাণুর কথা থাকে না। কারণ পশ্চিমী দেশগুলিতে এই সমস্যা অনেকদিন নেই। হুগলীর এই আদর্শনিষ্ঠ মানুষরাও বেশ গরম প্রতিষ্ঠানবিরোধী পরিবেশবাদে মজে নিজেদের পানীয় জলের সমস্যা ভুলে গেলেন। পানীয় জল নিয়ে যদি কোনো প্রচার করতেই হয় তবে তাদের প্রথম কাজ পানীয় জলে কোনোভাবে মানুষের মলমূত্রজনিত নোংরা প্রবেশ করছে কিনা তা পরীক্ষা করা। এর থেকে জলে প্রবেশ করবে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু - পেট খারাপ থেকে কলেরা বা জন্ডিস, সবই ঘটাতে পারে যারা। এর ফলাফলও প্রায় হাতে নাতে - জীবনমৃত্যুর টানাটানি। প্লাস্টিক জলাধারের দূষণের ক্ষতি হতে পারে দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারে, বেশ দশ-কুড়ি বছর পরে। কিন্তু যাদের এক গ্লাস জল পান জীবন বা মৃত্যুর জুয়া খেলার মতন, তাদের 'দীর্ঘস্থায়ী' 'সম্ভাব্য' 'কিছু' ক্ষতির কথা ভাবলে চলে কী করে। এটা অনেকটা পুপুলেয়ার খরা কবলিত গ্রামে কোন ব্রান্ডের মিনারেল ওয়াটার বেশ বিশুদ্ধ তার আলোচনা করার মতন।

সত্যি কি আমাদের পানীয় জলে এসব জীবাণুরা থাকে? হাওড়া গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির শ্রী সুভাষ দত্ত এ ব্যাপারে একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা করেছেন। সুভাষবাবুর সংগঠন সে অর্থে ঝকঝকে পরিবেশ সংগঠন নয়, দেশী-বিদেশী অনুদানও গ্রহণ করে না। তিনি গত বছর বিভিন্ন স্থানের পানীয় জলের পরীক্ষা করান বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী পরীক্ষাগারে। এতে উত্তরপাড়ার প্রতিবেশী বালী পুরসভার জলেরও নমুনা ছিল। ওনার পরীক্ষাপ্রাপ্ত ফলাফলের কয়েকটি নীচে দেওয়া হল:

:

বি.দ্র. পানীয় জলে মোট কলিফর্ম ১০-এর নীচে থাকতে হবে। এর একক হল MPN/100ml। ফেকান কলিকর্ম, একটিও থাকতে পারবে না।

:

দেখাই যাচ্ছে যে আমাদের পানীয় জলে কী ভয়ানক রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুরা থাকে। এ দেশে পানীয় জল নিয়ে কিছু করতে হলে প্রথম কাজ জীবাণুরা থাকে। আমাদের পুরসভাগুলির পাইপে থাকে বিভিন্ন ছিদ্র, গার্হস্থ্য বর্জ্যে জলের পাইপ আর পানীয় জলের পাইপ থাকে পাশাপাশি। ঠিকমত ক্লোরিন ব্যবহার করে নির্বীজ করা হয় না - এসব নানা কারণে নিরাপদ পানীয় জল পাওয়াটাই দুরূহ। যাদের এসব সমস্যা নেই তারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দূষণ নিয়ে মাথা ঘামাতেই পারেন। নিউইয়র্ক শহরে ১০০০ স্থান থেকে জলের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হয় আর পানীয় জলের পরীক্ষায় আছে ২০০ টি দূষকের নাম। আমরা কি এখন ঐ মানের জন্য প্রচারে নামব? সুভাষ দত্ত তা করেন নি। দুটি মুখ্য দূষককে পরিমাপ করিয়ে কাকাতা উচ্চ আদালতে মামলা করেছেন পুরসভাগুলির বিরুদ্ধে। সম্প্রতি এই মামলার অন্তর্বর্তী রায়ে পুরসভাগুলিকে নোটিশ দিয়েছে উচ্চ আদালত।

হুগলীর ঘটনা দিয়ে এজন্য শুরু করা হল, কারণ হুগলীর এই সংগঠনের লোকেরা প্রথমেথ জানিয়ে দিয়েছিন যে তাদের এইসব কর্মকান্ডে তারা কোনো দেশী-বিদেশী অর্থ নেন না, এবং বিদেশী অর্থপুষ্ট সংগঠনকে তারা এই উদ্যোগে ডাকবেনও না। পরিবেশ নিয়ে তাদের উদ্দেশ্য যে মহৎ এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু পবিবেশের সমস্যা কোনটা তা জানিয়ে দেবার জ্য অর্থপুষ্ঠ লোক আছে অনেক দেশী ও বিদেশী।

যেখানে দেখিবে ছাই

সে কথা তো জানা আছে আবার - ''যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন''। সেই ছাইয়ের কথায় আসা যাক। হঠাৎ যদি দেখেন কোনো নতুন পরিবেশ সংগঠন প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে, বিশেষত পিভিসির বিরুদ্ধে তেড়ে-ফুঁড়ে নামছে, কারণটা জানতে হলেবিখ্যাত অন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী সংগঠনের ভারতীয় শাখার ওয়েবসাইটটা দেখে নিন। নিশ্চয়ই ওরা ভারতীয় কর্মকান্ডের যে আদেশ রেখেছেন তাতে পিভিসি রয়েছে। সুতরাং বুদ্ধিমান সংগঠন, যাদের বিদেশী অর্থ ও যোগাযোগ দরকার, তাদের পিভিসির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একনই নামতে হবে। আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী নামী সংগঠনগুলির অবস্থাও এখন বহুজাতিক কর্পোরেশনের মতনই। এদের কর্মীরা স্রেফ যে-কোনো অফিসের কর্মীর মতনই, বিশেষত এদেশে তাদের দু একজন শ্বেতকায় প্রতিনিধের মান এতই খারাপ যে সংগঠনগুলির ওপর ভরসা করা কতটা যাট তা ভেবে দেখা দরকার।

ছাইয়ের কথায় আসা যাক। ঐ আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভারতীয় কর্মকান্ডের আরেকটি নির্দেশ বর্জ্য চুল্লীর (Incinerator) বিরুদ্ধে অভিযান। হাসপাতালের বিভিন্ন সংক্রামিত বর্জ্যকে নষ্ট করবার জন্য বিশেষ চুল্লীতে তা পুড়িয়ে ফেলা হয়। সুতরাং এই অভিযানে নামবার জন্য তৈরি হয়ে গেল মুম্বাই মেডওয়েস্ট অ্যাকশন গ্রুপ (MMAG)। মনে রাখতে হবে সাধারণভাবে দূষণের বিরুদ্ধে সচেতনতার অভিযান. আর বিশেষ প্লাস্টিক বা চুল্লীর বিরুদ্ধে অভিযান কিন্তু সম্পূর্ণ অভিন্ন। যেমন ধরা যাক পাড়ায় ম্যালেরিয়া হচ্ছে।

সে জন্য মর্দমা পরিষ্কার রাখা, মশারী খাটানো, ঝোপঝাড় পরিষ্কার করাটা উদ্যোগী মানুষেরা মিলে করে থাকেন। কিন্তু রোগ নিবারণে কোনো ওষধ খাওয়া হবে, খেলে তার কী পরিতিক্রিয়া, কোন মশাটা বেশি দায়ী - এসব করতে হলে ডাকতে হবে চিকিৎসককে বা মশা বিশেষজ্ঞদের। আপনার ছেলের জ্বর কমাতে যদি ডাক্তারবাবু না এসে প্রচারপত্র হাতে ক্লাবের দাদা এসে দাঁড়ায়, তাবে ল কেমন হবে?

পরিবেশের ক্ষেত্রে এসবের কোনো বালাই নেই। মেডিক্যাল ওয়েস্ট অর্থাৎ চিকিৎসার বর্জ্য নিয়ে অ্যাক্সন গ্রুপ তৈরি হয়ে গেলেও তাতে অভিজ্ঞ ডাক্তার বা পরিবেশ বিশেষজ্ঞ থাকতে হবে তার কোনো দরকার নেই। চিকিৎসার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক আছে। কিন্তু MMAG

জানে যে বর্জ্য চুল্লীর বিরুদ্ধে অভিযান চালানোই বুদ্ধিমানের কাজ। তারা মুম্বাই শহরের হাসপাতালের চুল্লিগুলির একটি সমীক্ষা পর্যন্ত করে ফেলেন। কারা করল এই সমীক্ষা? সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্ররা। না, পরিবেশ নিয়ে কাজকর্মে কোনো বিশেষ জ্ঞানের দরকার নেই, ফলে ছাত্রদল বেরিয়ে পড়লো সমীক্ষায়। কেন যে হাসপাতালগুলি সেই সমীক্ষায় রাজী হন তা জানা যায় না। তবে যেহেতু এইসব NGO

দের উচচমহলে যোগাযোগ খুব ভাল ফলে এদেশে এসবে অসুবিধে হয় না। কোনো প্রাইভেট কোম্পানি এ ধরণের অশিক্ষিত কর্মীদের দিয়ে সমীক্ষা করালে সে রিপোর্ট টেবিলে স্থান পেত না। কিন্তু সন্ত্রান্ত ঝকঝকে NGO

দের কথা আলাদা। আর ছাত্ররা আবার ''সেন্ট-জেভিয়ার্স'' কলেজের যে, দাদারের অনামী কলেজ নয়।

যেহেতু চিকিৎসার বর্জ্য আইন পাস হয়েছে ১৯৯৮-এ, ফলে ১৯৯৯ -এ সব হাসপাতালের চুল্লিগুলি একেবারে কাম্য মানের হবে তা অবাস্তব। কিন্তু এগুলি এখন যে কাজ করে চলেছে তা কি দূষণ ঘটাচ্ছে? তাহলে মাপতে হবে চুল্লীর ধোঁয়া। এসব মাপবার কথা সম্ভবত এদের জানাই নেই। ধরা যাক সব চুল্লী ঠিক নেই, ফলে ভারতীয় মান অনুযায়ী নতুন চুল্লী কিনে লাগালেই হয়। কিন্তু তাহলে তো চুল্লীবিরোধী অভিযান সম্পন্ন হলো না। সুতরাং তারা চুল্লীর ছাই সংগ্রহ করে (যদিও যে কোনো নমুনা সংগ্রহেও প্রশিক্ষণ দরকার) তা মাপালেন এবং ঘোষণা করলেন যে চুল্লীর ছাই বিষাক্ত! ফলে আর চুল্লী রাখাই চলবে না। কেন বিষাক্ত? কারণ পানীয় জলে সীসা থাকার সীমা হচ্ছে ০.১-১ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে। সেখানে হয়ে আছে ৬.৮ বিলিগ্রাম প্রতি লিটার! দস্তা (Zinc), ক্যাডামিয়ানও প্রতি মিলিলিটারে আছে অনেক। পাঠক যখন বাজারে চাল বা আটা কেনেন তখন কি কেজিতে কেনেন না লিটারে কেনেন? আর যখন তেল কেনেন তখনতো লিটারেই কেনেন। অর্থাৎ খুব সাধারণ জ্ঞান থাকলেই জানা যায় যে ছাই বা কোন শক্ত পদার্থে লিটারে মাপা যায় না। লিটার মাপা হয় তরল কিংবা গ্যাসের। কিন্তু MMAG -র রিপোর্ট ছাই মাপছে লিটারে।

মনে রাখবেন এটা কোন ছাপা ভুল নয়, কারণ ছাইয়ের গুণাগুণের সঙ্গে পানীয় জলের মান তুলনা করাটা আরও বড় ভুল।

এছাড়া আরো বড়, দন্ডনীয় ভুল হচ্ছে যে MMAG -বই লিখেছে যে ভারতীয় পানীয় জলের মান (IS-2490) এবং (IS-3306) -এর সঙ্গে তারা তুলনা করছেন। আসলে (IS-2490) এবং (IS-3306)

-এর সঙ্গে পানীয় জলের কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলি হচ্ছে শিল্প থেকে বর্জ্য জলের মান সংক্রান্ত তালিকা। পানীয় জলের মানের জন্য রয়েছে (IS-10500)।

তাহলে ভাবুন, যারা ছাই এবং জলের মাপ কী হয় জানেন না, পানীয় জলের আর শিল্পের বর্জ্য তাদের মান কী জানেন না, তারা যখন বর্জ্য থেকে কীভাবে ওসব দ্রবণ নয় তার আন্তর্জাতিক লড়াইয়ে নেবে যান তার কারণ কী হতে পারে? বিদেশী অর্থ, যোগাযোগ, বিদেশ ভ্রমণ - স্রেফ এইজন্য এইসব মেবে গেছে পরিবেশের উন্নয়নে। এই ধরনের সংগঠনের শাখা এখন সারা দেশে, এই কলকাতাতেও গজিয়ে উঠেছে।

নন্দলালেরা এখন

বিপদটা আরো বেশি এজন্য যে সংবাদ মাধ্যমও পরিবেশের বিভীষিকা প্রচার করতে ভালবাসে, তাতে সাংবাদিকের পরিবেশবান্ধব ভাবমূর্তিটাও ভাল হয়। এই সব ক্রমশ প্রচারে হুগলীর সংগঠকদের মতনই অনেকেই প্রভাবিত হন। আরো দুটি ঘটনা বললে অবস্থাটা বোঝা যাবে। কিছুদিন আগে একটি সভায় পরিবেশ নিয়ে আলোচনার বিষয় ছিল - POP নিয়ে। POP মানে Persistent Orvanic Pollutant -

অর্থাৎ যেসব জৈবরাসায়নিক দূষক দীর্ঘকাল পরিবেশে স্থায়ী হতে পারে। ১২ টি দূষককে এরমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। যাদের ডাকনাম ডার্টি ডজন। এর বধ্যে অন্যতব রাসায়নিক হচ্ছে ডিডিটি (ডাই ক্লোরোডাই ফিনাইলট্রাইক্লোরোইথেন)। ডিডিটি এখনও এ দেশে পরিচিত নাম। রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ কার্যক্রম (United nations Environment Programent Programme) এই সব POP

কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে উদ্যোগী হলে, বিভিন্ন বিজ্ঞান গ্রুপ এবং গরীব দেশ ডিডিটিই এ তালিকা থেকে বাইরে রাখতে বলেছে। কারণ গরীব দেগে ম্যালেরিয়া পুখতে ডিডিটিই এখনও সবচেয়ে সস্তা ও কার্যকরী হাতিয়ার। আর ম্যালেরিয়া এখনও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হত্যাকারী রোগ, বছরে ২০ লক্ষ লোক মারা যায় ম্যালেরিয়ায়। এর বড় অংশই আবার শিশু। ম্যালেরিয়া নিবারণে চীন ও ভারত এখনও প্রচুর ডিডিটি ব্যবহার করে। এসব নিয়ে আলোচনা হয় ঐসভায়। কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন স্থানের সভায় উপস্থি

ত ছিলেন এক তরুণী, বেশ অনুশোচনার সঙ্গে জানালেন যে ডিডিটির যে বিভিন্ন ব্যবহার আছে, ম্যালেপিয়া নিবারণে এর এতবড় ভূমিকা (বিলেতে আমেরিকাতেও যে লোকে ম্যালেরিয়ায় হামেশাই মরত, একথা এখন প্রায় অজনা) ইত্যাদি এসব উনি আগে জা নতেন না এবং এর নিষিদ্ধকরণ নিয়েও যে এই বিতর্ক আছে তার তা অজানা। মহিলা একটি এন জিও তে তাদের প্রকাশনায় কাব্য করেন এরং তারা ডিডিটি নিয়ে বই ছাপান। কিন্তু ডিডিটির এসব দিক উনি কোনোদিন শোনেন নি।

প্রচার মাহাত্ম্যের আরেক বড় এবং প্রভাববিস্তারকারী আরেকটি ঘটনা শোনা যাক। আকাশবাণীর এফ এম চ্যানেলে রাতে এক একি ট বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠান হয়। সেদিন অনুষ্ঠান পলিচালনাকারীরা বিষয় ঠিক করেছেন - ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দূষিত ইস্পাত এদে শ আমদানী সম্পর্কে মতামত। দু-একটি ইংরাজ সংবাদপত্রে এই মর্মে একটি সংবাদের ওপর ভিত্তি করে করে তারা বিষয় ঠিক করে ফেলেছেন। এই অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞদের কাছে ফোনে মতাবম চাওয়া হয়। এই দূষণ সম্পর্কে মতামতের জন্য ফোনে কথা বলা হয়ে ছিল এই লেখক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ড রবীন মজুমদারের সঙ্গে। রবীনবাবু শ্রদ্ধেয় মানুষ। একজন বেশ কিছুটা কঠোর পরিবেশবাদীও বটে। তিনিও ফোনে জানালেন যে বিদেশ থেকে দূষিত বর্জ্য উন্নয়নশীল দেশে রফতানীর ব্যাপ ারটা ঘট, কিন্তু এই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের (১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১, ইসলামী মৌলবাদী আক্রমণে ধবংসেপ্রাপ্ত) ইস্পাত দূষিত কে ন হবে তা তিনি ঠিক একনই বুঝতে পারছেন না। সাধারণভাবে আগুনে ভস্মীভূত হলে সেই ভবনের ইস্পাত দূষিত হয় বলে উনি জানেন না। বিশেষ কোনো অভিযোগ থাকলে তার জন্য অনুসন্ধান দরকার।

এই লেখকও ফোনে বললেন যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে চাপপাশে বায়ু ও জলের মান নিয়ে প্রচুর তথ্য আমেরিকার পরিবেশ সংস্থা জানিয়েছেন। তাতে গুরুতর দূষণের কোনো আশঙ্কা নেই। অতএব ইস্পাত থেকে দূষণ হবে তা বলে দেওয়াটা ঠিক নয়।

ফোনে বক্তব্য রেখেছিলেন জনা দুয়েক ট্রেড ইউনিয়ন নেতা। তারা কিন্তু বিশদে জানিয়ে গেলেন যে এজন্য কি ভয়ানক দূষণ হতে যাচ্ছে!

আসলে সমস্যাটা এখানেই যে অনুষ্ঠানকারীরা ধরেই নিয়েছেন যে দূষণ এতে হবেই, কিন্তু আদৌ এই খবরটার কোনো গুরুত্ব আছে কিনা তার জন্য কারো মতামত নেওয়া জরুরী মনে করেন নি। ফলে অনুষ্ঠানে তারাই যাদের বিশেষজ্ঞ বলে নিশ্চিতকরেছিলেন ত ারা বিষয়টিকে গুরুত্বই দিলেন না, অথচ যারা এ বিষয়ে সামান্যই জানেন তারা এটিকে নিয়ে অগ্নিগর্ভ ভাষণ দিলেন আকাশবাণীর গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেলে। ভাবুন তো, এটা যদি কোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় হতো তাহলে ব্যাপারটি কেমন দাঁড়াত?

অনুষ্ঠান চালকেরা ঠিক করে নিছেন অমুক রোগটা কী ভয়ানক। চিকিৎসকরা বলছেন - ওটা তেমন কিছু নয়, আর অন্যরা বলে যা চ্ছেন শেষের সেদিন কি ভয়ংকর। শ্রোতারা কি বুঝছেন কে জানে!

পরিবেশ নিয়ে যা খুশী বলবার আরো বড় অধিকারের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে আদালত। অবশ্য আদালতকে এই ভূমিকায় আসতে ত বাধ্য করেছে আমাদের দেশের সরকারী আমলা, প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীরা। যাদের দূষণ সংক্রান্ত বিষয় দেখবার কথা তারা সময় মতন তাদের কাদ করেন নি বলেই আদালতে মাবলা হয়েছে। যেমন বিখ্যাত গঙ্গাদূষণ সংক্রান্ত মামলা। কিন্তু এই সব মামলার অনেক রায়েরই কোনো বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তি নেই। কিন্তু সরকারী দফতরগুলি তরা কোনো বিরোধিতা করেনি। যেমন, গঙ্গা দূষণ সংক্রান্তমামলায় গঙ্গা উপত্যকার শিল্পগুলির বায়ুদূষণকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, অথচ যার সঙ্গে গঙ্গা দূষণের কোনো সম্পর্ক নেই। একইবাবে তুঘলকী রায়ে দিল্লীর ক্ষুদ্রশিল্পকে দিল্লা শহরে সি.এন.জি.তে সমস্ত গাড়ি চালানোর রায়ও সেরকমই। এতে একমাত্র ল াভবান হয়েছে দিল্লীর ধনী ও উচচবিত্ত মানুয়েরা। সুপ্রীমকোর্ট প্রায় হয়ে উঠেছে দিল্লী হাইকোর্ট। এমনকি দেশে স্নাতকস্তরে প্রবেশকে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পঠন শুরু হয়েছে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে।

এই অত্যুৎসাহে কখনো কৌতুকপ্রদ পরিবেশ সচেতনতা তৈরী হচ্ছে। যেমন কাকাতা হাইকোর্টের শব্দ দূষণের সীমা ৬৫ ডেসিবেল। একজন বিচারপতি ও একজন আইনজীবী এ রাজ্যে শব্দ দূষণ বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছেন। অথচ যা বলা হচ্ছে তা সরই ভুল। ভারতীয় আইনের কোথাও বলা নেই, ৬৫ ডেসিবেল শব্দ সীমার কতা, শব্দবিজ্ঞান নিয়ে যাদের সামান্য চর্চা আছে তারাও জানেন যে ৬৫ ডেসিবেল আদৌ কোনো উচচনাদ নয়। শব্দ দূষণের একটি সীমা আছে যাতে বলা বাণিজ্যিক অঞ্চলে ১৫ ঘন্টার শব্দমানের লগ স মতুল হতে হবে ৬৫ ডেসিবেল। এটি জানতে গেলে বিভিন্ন সময়ের শব্দের মান নিয়ে একটি অংক করতে হয়। কিন্তু এতসব পরিবেশের জন্য করার কোনো মানে হয় না। ফলে আইনজীবী শব্দমাপক খন্ড নিয়ে ঘুরছেন। কোনো অচিকিৎসক এরকম গলায় স্টেথো নিয়ে ঘুরলে তাকে আমরা ঠর্গ বলে থাকি। একইভাবে শব্দদূষণের জন্য বন্ধ করা হচ্ছে সমস্ত শব্দবাজী যদিও তার জন্যও ভারতীয় আইন আছে। অবশ্য এসব হম্বিতম্বি সব বন্ধ হয়ে যায় আজানের মাইকের সামনে। মাইকে আজানের অধিকার নিয়ে ইমামদের মাম লা কলকাতা হাইকোর্টে ও সুপ্রীম কোর্টে খারিজ হয়ে গেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত পুজোর জন্য বিখ্যাত চন্দনজরের সংগঠকদের হাজত বাস করতে হয়েছে।

আর শব্দ দূষণের এই প্রহসনে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন অনেক সাধারণ সঙ্গীত শিল্পী ও বাজিয়েরা পাড়ার তবলচীর শুকনো মুখ দেখে বুঝেছি শব্দভেদী বাণ কী নিদারুণ!

ছায়াময় পথে

পরিবেশ সমস্যার মতন একটি ব্যাপক সমস্যার মোকাবিলা করতে দয়ে সবসময় সবকিথু জেনে বুঝে কাজ করা সম্ভবও হয় না। নি

জন্ম, বিশ্বাস, বিবেচনার উপর নির্ভর করেই কখনো উদ্যোগ নিতে হয়। যেমন নিয়েছেন হুগলীর মানুষ বা আকাশবাণীর অনুষ্ঠান চালক। যেমন একটি ছোট দ্বিমাসিক পত্রিকা খুবই পারমাণবিক শক্তি বিরোধী। তারা এ বিষয়ে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই গুকা যিনি চালান, সম্পাদক মশাই কিন্তু পারমাণবিক বিকীরণ সম্পর্কে খুব একটা অবহিত নন। তাঁদেরই আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি প্রথম জানলেন যে তিনি এই বিকীরণ সমুদ্রেই ডুবে আছেন, এবং প্রথমে তা মানতেই নারাজ ছিলেন। কিন্তু এঁরা সবাই একটা বিষয়ে এক - যে তারা এ কাজ কোনো অর্থ, খ্যাতি
বা অন্যান্য লাভের জন্য করেছেন না। পত্রিকার সম্পাদক প্রায় পকেটের পয়সা দিয়েই অন্যের লেখা পারমাণবিক শক্তি বিরোধী বই ছাপাচ্ছেন, হুগলীর মানুষ জনস্বার্থেই প্লাস্টিক জলাধারের বিরুদ্ধে উদ্যোগ নিয়েছেন। এমনকি অনেক আইনজীবীরাও পরিবেশের স্বার্থে মহৎ কিছু করেছেন বলে ভাবছেন।

কিন্তু এর পাশাপাশি রয়েছে আর একটি বিশাল জগৎ। এরা দেশী-বিদেশী পরিবেশ এন জিও। দিল্লী-মুম্বাইয়ে এদের রমরমা দেখবার মতন। কলকাতায় সবে এরা উঠছেন। এরা পরিবেশকে বিভিন্ন কারণে বেছে নিলেও এটি এখন তাদের অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার উৎস। যেমন বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ী সংগঠন পরিবেশ বিষয়ক ব্যবসা শুরু করেছে। এই ব্যবসায় কেউ বানাচ্ছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, কেউ দূষণ মাপছে। কেউ উপদেশ দেয়। এ সবই করা হয় ব্যবসা বাণিজ্যের একটি নতুন ক্ষেত্র হিসেবে। পেশাদারী সমাদসেবী এন জিওরাও ঠিকই একইভাবে নতুন সেবার কর্মক্ষেত্র হিসেবে তেছে নিয়েচে পরিবেশ। কারণ পরিবেশ খাতেই এখন অনেক অর্থগম। এবং শুধু পবিবেশ নয়, পবিবেশের বিশেষ বিশেষ কিছু সমস্যা নিয়ে খাতা সারলেই অর্থাগম। যেমন স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে হলে করতে হবে এইডস নিয়ে, ম্যালেরিয়া নয়। কারএ ওতে পয়সা নেই। এইসব এনজিওদের পরিবেশ বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের কোনো প্রয়োজন হয় না। বিদেশী প্রচারপত্র এবং চকচকে ইংরেজি ঝকঝকে প্রকাশনা এবং উন্নত প্রচারের মাধ্যমে এরা অচিরেই পরিবেশ বিশেষজ্ঞ হয়ে যান। প্রতিষ্ঠান বিরোধী সংলাপ, জনস্বার্থের ফুলঝুরি, দূষণের কেরামতের ছবি - সব বিলিয়ে ভাবমূর্তি তৈরি হয়ে যায়। ঠিক গ্রামাঞ্চলে কোয়াক ডাক্তারেরা যেভাবে গুছিয়ে ব্যবসা করেন। সেভাতেই কিন্তু উজ্জ্বল ভাবমূর্তি নিয়ে প্লেনে দিশ বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে এরা মাস ট্রান্সপোর্ট নিয়ে ভাষণ দেন। সমস্ত চকচকে ইংরাজি পত্রিকা থেকে যত সুন্দরী প্রতিযোগিতার সুন্দরীরা সরাই এখন পরিবেশ বলতে অজ্ঞান। শিক্ষিত ডাক্তারের অভাবে, গ্রামাঞ্চলে শেষ পর্যন্ত মানুষকে এই কোয়াকদের উপরই নির্ভর করতে হয়, যতই তাদের গালমন্দ করা হোক না কেন। গ্রামের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বালমন্দ মিলিয়ে তারাই দাঁড় করিয়ে রখেছে। পরিবেশের জগতেও ব্যাপারটা অনেকটা তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদদের সংগঠন, সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ - এরা সাধারণত নীরব হয়েই থাকেন। ফলে পবিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিই। কিন্তু এখনও খুব সচেতনভাবেই এই অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে কিছু সংগঠনও।

পরিবেশ নিয়ে এই আতিশয্যে যাদের দূরাবস্থার কথা হারিয়ে যাচ্ছে, তারা হচ্ছেন শ্রমিকরা বা গরীর মানুষেরা। দিল্লী শহহ থেকে সব শিল্প সরিয়ে নিতে নির্দেশ দেওয়া হল। এর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেন কয়েক লক্ষ শ্রমিক যারা কোনো ক্ষতিপূরণ পাবেন না। হাওড়ার কারখানায় চিমনী থেকে দূষণ এখন অনেক কবে এসেছে কিন্তু কারখানার ভিতরে শ্রমিকরা অবর্ণনীয় পরিবেশে কাজ করে যাচেছন। পরিবেশ আইন কার্যকরী হচ্ছে কিন্তু ফ্যাক্টরিতে অ্যাক্ট কার্যকরী হচ্ছে না। নিউইয়র্ক থেকে দূষিত ইস্পাত এল কনা তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। কিন্তু সেই নিউইয়র্ক শহরে হাওড়া থেকে যা ঢালাই লোহার সামগ্রী যাচ্ছে সে কারখানার শ্রমিকের পরিবেশের কথা ভাববার কেউ নেই। গরীব মানুষের ঘরে এখনো আলো জ্বলল না তাকে বোঝানো হচ্ছে বিকল্প শক্তির কথা।

অন্য সুন্দরবন

এই শেষ করা যাক সুন্দরবন দিয়ে। হুগলীর শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক সুন্দরবনের মানুষ - এদের বাদ দিয়ে কি পরিবেশ ভাবনা এগুবে? সুন্দরবনের মানুষজন বন জঙ্গল পরিবেশ নিয়ে কি ভাবছেন দেখা যাক।

সুন্দরবনের একটি বড় দ্বীপ কুয়েমুড়ি দ্বীপ। রাতে রায়দীঘি থেকে সকালে ২ ঘন্টা লঞ্চে চেপে সুন্দরবনের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে কুয়েমুড়ি দ্বীপে পৌঁছান যায়। পূর্বদিকে চওড়া নদী পেরুলে একেবারে জঙ্গলে কুয়েমুড়ি বড় দ্বীপ। দ্বীপে কোনো পাকা রাস্তা নেই, নেই বিদ্যুৎ। 'আরোগ্য সন্ধান' নামক একটি স্বাস্থ্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ২৪ মার্চ, ২০০২ একটি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করে। প্রায় সাড়ে ছশো মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ দেওয়া হয়। 'বসুন্ধরা' সংগঠন এই রোগীদের কিছু মানুষের মধ্যে পরিবেশ সংক্রান্ত একটা সমীক্ষা চালায়। এ ছাড়া সমস্ত রোগীদেরই আর্থ-সামাজিক একটি সমীক্ষা করা হয়। কুয়োমারী দ্বীপে কেউই পায়খানা ব্যবহার করেন না। সবার প্রধান সমস্যা খাবার জলের। নলকূপ অনেক দূরে দূরে। মাঝে মাঝে তা খারাপ হয়ে থাকে। রাকা রাস্তাও কম। সুন্দরবনের এই মানুষেরা দূষণ নিয়ে কি ভাবেন?

প্রশ্ন ছিল কোন দূষণ নিয়ে তারা চিন্তিত? ৬৫ শতাংশ মানুষই চিন্তিত পুকুরের জলের দূষণ নিয়ে। পায়খানা না থাকায় যে-কোনো জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ পুকুরের জলে দূষণ ঘটাচ্ছে। এ ছাড়া যে যেমন নোংরা ফেলে, পাড় ভেঙে আছে, গরু-মোষ ধোয়াচ্ছে। কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। সুন্দরবনের গ্রামের পুকুর কি করে ভাল রাখা যায় তা হতে হবে পরিবেশবিদের গবেষণার বিষয়। অবশ্য ১৭.৫% মানুষ কোনো উত্তর দেননি। অর্থাৎ বাক ৩৫%

মানুষ দূষণ নিয়ে ভাবেন না। জঙ্গলের কাছে হলেও মাত্র ৩২ শতাংশ মানুষ কখনও জঙ্গলে গিয়েছেন। সুনাদরবনের বাঘ নিয়ে ২৫

% মানুষের বাঘ নিয়ে মাথাব্যাথা নেই। স্থানীয় মানুষ কিন্তু বাইরের মানুষ এখানে ঘুরতে আসুক খুব চান। ৮৭.৫%
মানুষ মানে করেন, বাইরের লোক ঘুরতে এলে তাদের ভালই হবে।
৭ এপ্রিল, ২০০২, একই সমীক্ষা চালানো হয় রায়দীঘিতে স্বাস্থ্যক্যাম্পে। রায়দীঘিতে হয়েছিল বিশেষ এন্ড্রোস্কোপি ক্যাম্প। এখানের রোগীরা সুন্দবনের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছিলেন। এখানকার সমীক্ষায় ফলাফল প্রায় কুয়োমুড়ির মতনই। এখানেও মানুষজন বলেছেন যে পুকুরের জলে দূষণই মূল সমস্যা (৫৭%)। আর দূষণ নেই বা জানেন না বলেছেন ৪০%
মানুষ চান জঙ্গলে বাঘ বাড়ুক। বাকীরা বাঘ নিয়ে তেমন ভাতেন না। পর্যটকরা ঘুপতে আসুক, তা চান প্রায় সবাই (৮৯%)।

বৃহৎ ব্যবসায় ও অপবিজ্ঞানের সংযোগে অস্তিত্বের সঙ্কট

শৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ

তুরঙ্গের গতসংখ্যায় লিখেছিলামযেনিউটনের mechanics, ডারউইনের বিবর্তনবাদ (বিশেষ করে তাঁর ‘‘survival of the fittest’’ থিওরি) এবং মেন্ডেলের genetics
—এই ত্রয়ীর সংযোগে ‘‘খণ্ডিত বিজ্ঞানের’’ জন্ম হয়েছে। ‘‘খণ্ডিত বিজ্ঞান’’, ‘‘fragmented science’’, ‘‘reductionist science’’ বলতে ঠিক কি বোঝায়, তা অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। এর বিপরীতে আছে সামগ্রিকতা-অভিমুখী বিজ্ঞান, ‘‘science with a holistic approach’’, সুবিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী Alfred North Whitehead যাকে বলেছেন ‘‘organismic science’’। বেশ বিবেচনা করেই ‘‘holistic
science’’ কথাটি এড়িয়ে চলছি। পূর্ণব্রহ্মে যেমন পৌঁছানো যায় না, তেমনই holistic
science-এ পৌঁছানো অসাধ্য। সব সময় সামগ্রিকতার দিকে খেয়াল রাখলেই হল। তাকেই বলা হয় ‘‘organismic science’’.
বাংলার রাজনীতি ও শিক্ষাজগতের এক জ্যোতিষ্ক এবং পরম শ্রদ্ধেয় এক অধ্যাপক চিঠিতে লিখেছেন, ‘‘বিজ্ঞানসম্মত জনকল্যাণ স ংঘটনের প্রস্তাব নিয়ে বিতণ্ডা ও বিসংবাদ বুঝি না। বিজ্ঞানসম্মত ও জনকল্যাণমূলক সিদ্ধান্ত কেন গ্রহণ করা কঠিন তাও বুঝি না।’’ তাঁর অতি আন্তরিক ও সংশয়-কণ্টকিত এই প্রশ্ন বর্তমান জগতের জীবন-মৃত্যুর মূল প্রশ্নটিকেই আলোচনার কেন্দ্রস্থলে এনে দিয়েছে।
বিগত শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে বিজ্ঞানের নামে যা কিছু প্রাধান্য পেয়ে চলেছে, তার সব কিছুই ‘‘big science’’ আর ‘‘big business’’-এর মেলবন্ধনের ফল। ‘‘Big science’’ বলতে কিন্তু ‘‘great science’’ বোঝায় না। ‘‘Big
science’’ বলতে বোঝায় সেই বিজ্ঞান যার ঝোঁক জটিল gadgets তৈরির দিকে, যার ফলে big
money-র প্রয়োজন হয়। জগতের সব কিছু মেশিনের ধরণে চলে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে বিজ্ঞানের যাত্রা, তার পরিণতি ঘটে জটিল প্রযুক্তিতে (complex technology তে)। একে ‘‘scientific
technicalism’’ বলা উচিত। যাঁরাই এর মোহে মুগ্ধ, তাঁরাই একে ‘‘high-tech’’ বলেন। সমাজবিজ্ঞানীর বিচারে একে ‘‘low social-efficiency tech’’ বলাই সমীচীন। প্রয়াত অর্থনীতিবিদ Dr. V. K. R. V. Rao ন্যায়সঙ্গত ভাবেই ‘‘hi-
tech’’-এর এই সংজ্ঞা চালু করেছিলেন।
বিজ্ঞানের এই পরিণতি অবধারিত ছিল না। বিজ্ঞানের মূল কাজ প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করা যাতে প্রাণীর কল্যাণ ঘটে। প্রকৃতির নিয়ম যত গভীরভাবে বোঝা যাবে, ততই ক্ষমতা জন্মাবে অতি সরল আঙ্গিকে/পন্থায় সমস্যার সমাধান করতে—যে আঙ্গিক/প্রকরণ সাধারণ মানুষের জীবনের ছন্দের সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে (imperceptibly) মিশে যায়, যাতে দুঃসাধ্য সাধনার ব্যঞ্জনা থাকবে না, সাধারণ মানুষের অনধিগম্য প্রযুক্তির প্রয়োজন হবে না। বিজ্ঞানকে সে পথ থেকে বিচ্যুত করা হয়েছে। শুধু আইনষ্টাইন, Max
Planek, Niels
Bohr, হাইসেনবার্গ, জগদীশচন্দ্র বসু, ডিরাক প্রমুখ দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক এই বিচ্যুতি এড়াতে পেরেছেন। কিন্তু কেন এই বিচ্যুতি ঘটতে পারল?
বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে বিশ্বজুড়ে মেশিন চেতনায় সমাচ্ছন্ন, মেশিন-সৃজন-অভিমুখী বিজ্ঞানচর্চার অতি প্রাবল্য ঘটেছে সত্য; কিন্তু তার মূল ছিল ষোড়শ শতাব্দীর দুই দার্শনিকের চিন্তায়, যাঁরা জ্ঞানচর্চায় নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকFrancis Bacon ও ফরাসি দার্শনিক Rene
Descartes-এর কাল ছিল নিউটনের-ও আগে। মধ্যযুগের কেতাবদুরস্ত, কল্পনানির্ভর, অপ্রামাণিক বিদ্যার ভিত কাঁপিয়ে দিয়ে তাঁরা পরীক্ষানিরীক্ষা ও প্রমাণ-ভিত্তিক বিজ্ঞানচর্চার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন কিন্তু উভয়ের বক্তব্যে এমন কিছু নির্দেশ ছিল যা’ অন্য এক প্রকার বিকৃতির বীজ বপন করেছিল।Bacon বললেন, ‘‘Knowledge is
power’’। জ্ঞান যে এক সারভূত সহজাত শক্তি—এক intrinsic
strength, সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যখন তাকে ‘power’ হিসাবে বর্ণনা করা হয়, তখন তার পিছে, মনের অগোচরে বা গোচরে, অনেক আশা জেগে ওঠে। প্রথমত আসে প্রকৃতিকে জয় করার শক্তি আকাঙ্ক্ষা; দ্বিতীয়ত, অন্য মানুষের উপরেও শক্তি খাটানোর কামনা। তা ছাড়া, বেকন তো নিজেই খোলাখুলিভাবে প্রকৃতিকে বাঁদিগিরির কাজে জুড়ে দেবার কথা বলেছিলেন, জুলুম করে তাঁর রহস্য বার করে নেওয়ার কথাও বলেছিলেন (‘‘torture her secrets out of
her’’)। অবশ্য তিনি একথাও বলেছিলেন যে প্রকৃতিকে জয় করতে হলে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলতে হবে। পরের যুগে তাঁর শেষোক্ত পরামর্শ বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে গিয়েছিল—শুধু প্রকৃতি জয়ের নেশাই বিজ্ঞান সাধকদের পেয়ে বসল।

বেকনের সমসাময়িক ফরাসি দার্শনিক Rene Descartes জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রকে অঙ্কশাস্ত্রের বিধানের (mathematical method) আওতায় আনতে চাইলেন। ভৌতিক জগতের রূপ ও কর্মপ্রক্রিয়া সবই মেশিন সদৃশ, এই ধারণা তিনি চালু করলেন। এই ধারণার উপসিদ্ধান্ত হিসাবে ''mathematical
equation-এর বাহিরে, quantification ব্যতিরেকে কিছুই বিজ্ঞানের মর্যাদার অধিকারী হবে না'', এই নীতিবাক্যও তিনি চালু করলেন। মানুষের আবেগকেও পরিমাপ (quantity) করা যায়, এ ধারণাও তিনি প্রচার করেন। এই তত্ত্বকথার প্রভাব এখনও প্রবল। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, Descartian ভাবধারায় প্রভাবিত এক Psychology শিক্ষককে যখন (১৯৮০ সালে) আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ''Can you quantify mother's love?'' মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে-ই তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ''Yes, it can be done''. স্তম্ভিত, বাকহারা হয়ে গিয়েছিলাম।
Descartes-এর বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ : ''মেশিনের বিভিন্ন অংশের আন্তঃক্রিয়া মেশিনের স্বভাব ও কর্মধারা নির্ধারণ করে। বস্তু ও প্রাণীজগতের সব কিছুই ওই মেশিনের মতোই। তাদের উপাদানসমূহের খর্বীকৃত (reduced) রূপগুলির আন্তঃক্রিয়া (interaction) অধ্যয়ন করলেই জগতের সব কিছুই সম্যকভাবে জানা যাবে।'' The material universe, including the organisms, can be understood by reducing them to the simplest constituents and by studying their interactions
— এই ছিল তাঁর শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার। মেশিনরূপে সব কিছুকেই দেখা—যাকে সংক্ষেপে বলা হয় mechanomorphic world
view—গত চার শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানকে পরিচালিত করে আসছে। যদিও জীববিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে Descartes-এর বক্তব্য একটু আধটু বদল করে নিয়েছেন, ভৌতবিজ্ঞান চর্চায় এর প্রভাব অপ্রতিহত আছে—এবং সে ক্ষেত্রে থাকার কারণ-ও আছে। অবশ্য সম্প্রতিকালে ভৌতিক জগতেও অতি ক্ষুদ্রের ক্ষেত্রে এবং অতি বৃহতের ক্ষেত্রে—in atomic and subatomic physics and in astrophysics and cosmology—এই mechanistic
paradigm পরিত্যক্ত হয়েছে।
Mechanistic ধাঁচে বিজ্ঞানচর্চার এক সুবিধা আছে। এই ধরনের চর্চায় চাপ, তাপ, গতিবেগ, কম্পন, টানপ্রতিরোধ ক্ষমতা (pressure, temperature, velocity, vibrancy, tensile
strength) প্রভৃতি মুষ্টিমেয় মাপকাঠির (parameter) প্রয়োজন হয়। অচেতন জগতের অর্থাৎ প্রাণহীন বর্গের Systems চর্চায়—মায় গ্রহ-নক্ষত্রের পর্যালোচনায়, ভূলোকেও মহাশূন্যে বার্তা আদান-প্রদানে, এবং প্রাণবিনাশী অস্ত্র উদ্ভাবন ও উৎপাদনে—in all non-life and life-destruction-oriented systems—এই reductionist পদ্ধতি ও quantification
approach অতি ফলপ্রসূ। এমনকী জীববিজ্ঞানের কিছু ক্ষেত্রেও—যথা gene-এর রাসায়নিক প্রকৃতি, বংশগত বৈশিষ্ট্যের (heredity) মূল উপাদান সন্ধানে এবং অনুরূপ কতিপয় খোঁজে এই paradigm মহৎ অবদান রেখেছে। তবুও জীববিজ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই reductionist পদ্ধতি ও quantification guideline দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তদুপরি জীবনের ধারক (life support)
system-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে—যেখানে আছে বহু উৎপাদক (factors), যেখানে ভূমি, জল, বনসম্পদ জাতীয় resource systems এবং জীবমণ্ডলের পরিবেশ সতত আন্তঃক্রিয়ায় রত—reductionist বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করতে গেলেই তার ফল হয় বিষময়, জীবনবিধ্বংসী।
Machines
ওorganisms-এর মধ্যে আছে বিস্তর প্রভেদ। Machine তৈরি হয় গোনাগাথা parts-এর সুষ্ঠু সংযোজনে। নিশ্চল উদ্ভিদ ও চলমান প্রাণী নিয়ে যে চেতন জগৎ, সেখানে দেখা যায় পরিস্থিতি অনুযায়ী আপন দেহের ভিতরে বেশ কিছু অদল-বদলের ক্ষমতা (flexibility and plasticity). দ্বিতীয়ত, প্রাণবন্তের জগতে আছে চক্রাকারে আবর্তনশীল সংবাদপ্রবাহ (cyclical patterns of information flows) যাকে বলা হয়, feedback loop. তৃতীয়ত, চেতন জগতে কাজ করে আত্মসংগঠনের নিয়ম (principle of self-
organization)। এই আত্মসংগঠনের মধ্যে আবার আছে দুই প্রকার শক্তি—একটি হচ্ছে আত্ম-নবীকরণ; অপরটি, আপন জাগতিক শক্তির সীমানা ছাপিয়ে উত্তরণ (self-renewal and self-
transcendence), এই আত্ম-নবীকরণ ঘটে মূল চেহারায় পরিবর্তন না ঘটিয়ে। মস্তিষ্ক বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত দেহের জীবকোষ প্রতিনিয়ত ভেঙে যাচ্ছে আবার নতুন কোষ গড়ে উঠছে অথচ বাহিরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। আর প্রাণময় জগতের শীর্ষে যে মানুষ, তার মধ্যে আছে জ্ঞান ও বুদ্ধির ঊর্ধ্বে উঠে অতীন্দ্রিয় জগতে বিচরণ করার ক্ষমতা। চতুর্থত, organisms নিজেরাই কোনও না কোনও ecosystem-এর মধ্যে বাস করে, আবার তাদের অভ্যন্তরেও আছে এক একটি ecosystem আর তার (শেষোক্তের) মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট organism যারা যথেষ্ট autonomy ভোগ করে ও host প্রাণীর সমগ্র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে গ্রথিত করে নেয়। পঞ্চমত, প্রাণবন্তদের মধ্যে আছে প্রধানত সংযোগ। প্রতিযোগিতা সেখানে যা কিছু আছে, তা শু

ধু বৃহত্তর ক্ষেত্রে (system) ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। তদুপরি, organisms-এর জগতে প্রতিনিয়ত variety সৃষ্টি হচ্ছে; অ াবার সেইvariety-র মধ্যেও individuality
(স্বাতন্ত্র) আছে। উপরি উক্ত বিবরণ থেকে বোঝা যাবে, জীব বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারে mechanomorphic world view কত বিভ্রান্তিকর ও ''গবেষণার ফল পরিমাণাত্মক রূপে প্রকাশ করতেই হবে,'' এই নির্দেশিকা(quantification guideline) কত অসঙ্গত। বহির্জগতের সঙ্গে প্রতিটি organism-এর নিরন্তর বহুমাত্রিক ঘাতপ্রতিঘাতজনিত যে আন্তঃক্রিয়া চলে ছে এবং প্রতি organism-এর দেহাভ্যন্তরে তার আপন বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেও অন্তঃস্থিত ক্ষুদ্র organism-দের সঙ্গে—এ বং শেষোক্তদের মধ্যেও—যে অজস্র আন্তঃক্রিয়া চলছে, তার পরিমাপ অসম্ভব।
জীববিজ্ঞানের গবেষকরা যে সাধারণতorganism-এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনও অংশ নিয়ে অনুশীলন করে চলেন, তার কারণ সে ে ক্ষত্রে গবেষণার ফল পরিমাণাত্মক রূপে (অঙ্কের ভাষায়) প্রকাশ করা সম্ভব হবে। কিন্তু যেখানে জীবনের পরিচয়-ই হচ্ছে প্রতি তন্তু র সঙ্গে প্রতি তন্তুর, প্রতি কোষের সঙ্গে প্রতি কোষের সংযোগে (linkage), বাঁধনের মধ্যে বাঁধনে, সেখানে সংযুক্তির বৃহত্তম ও উচ চতর ক্ষেত্রগুলি বাদ দিয়ে অতি ক্ষুদ্র স্তরের আন্তঃক্রিয়াতে সীমিত থাকা তো জীববিজ্ঞান থেকেই পলায়ন। তাতেও দোষ না-ই বা ি দলাম। কিন্তু যখন এই সব বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে এই স্তরে চর্চা করেই তাঁরা জীবনের রহস্য উদঘাটন করবেন, তখন তা হয়ে দাঁ ড়ায় আত্মপ্রতারণা। জীবন যেখানে বহুস্তরীয় (multi-level) সংগঠন, সেখানে নিম্ন স্তরে গবেষণা করেই life force -এর বিভিন্ন দিক উন্মোচন করার আশা তো মরীচিকার পিছনে ধাওয়া।
নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীদের সমাজে যিনি সম্মানের উচ্চ আসন পেয়েছিলেন, সেই Albert Szent
Gyorgi তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে ও অনবদ্য ভাষায় Relationship between the Biological and the Physical Sciences ব্যাখ্যা করেছিলেন ১৯৫৪ সালে এক বক্তৃতায়। রঙ্গ করে তিনি বক্তৃতার শিরোনামা দিয়েছিলেন ''Fifty Years of Poaching in
Science.'' বিজ্ঞানের বহু বিভাগে কাজ করে বহু বিভাগ থেকে idea ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিলেন বলে তিনি নিজেকে poa cher বলেছেন। জীববিজ্ঞানের বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে শুরু করে bacteriology, molecular biology, subatomic physics-এ তিনি ডুব দিয়েছেন আবার জীবনের অখণ্ডতায় ও multi-level synergy পর্যালোচনায় ফিরে এসেছেন।
প্রথমে তিনি দেখান যে অচেতন ও চেতন উভয়ের জগতেই সংগঠন ব্যবস্থা আছে কারণ সংগঠন হচ্ছে প্রকৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তবে অচেতন জগতে এই সংগঠন কিছু দূর গিয়ে থেমে যায়; আর চেতন জগতে এই সংগঠন প্রক্রিয়া চলতে থাকে বহুদূর। তদুপরি সংগঠনের প্রতি ধাপেই নতুন জটিল, সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর গুণের (properties) আবির্ভাব ঘটে যার কোনও তুলনা অচেতন জগতে নেই। এখানেই শুরু হয় জীববিজ্ঞানীর উভয়-সঙ্কট। Quantification চাইলে জীবসংগঠনের নিম্নস্তরে আবদ্ধ থাকতে হয়; তাতে জীবনের প্রক্রিয়া-বোধে অগ্রগতি হয় না। পক্ষান্তরে পর্যবেক্ষণের কেন্দ্র যদি উচ্চতর কোনও স্তরে নিবদ্ধ করা হয় বা সমগ্র organ ism-ই যদি পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু হয়, তা হলে পরিমাপ সম্ভব হয় না, ফলে দ্যা-কর্তা (Descartes) মার্কা বিজ্ঞানীর পংক্তিতে স্থ ান লাভ ঘটে না। জীবজগতে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার নির্দোষ সমাধানসন্ধানী বিজ্ঞানী যে কী নিদারুণ দোটানার মধ্যে পড়েন, তার ি ববরণ দিয়েছেন Szent
Gyorgi তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে। যেহেতু প্রতি জীববিজ্ঞানীর কাছে এই অতি প্রাঞ্জল বিবরণ ও ব্যাখ্যা আলোকবর্তিকার মে তা কাজ করবে, সেজন্য বিশদ উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না।
Putting things together in a meaningful way is called ''organization''. It is one of the basic features of nature. If elementary particles are put together to form an atomic nucleus, something new is created which can no longer be described in terms of elementary particles. The same thing happens again if we surround this nucleus by electrons and build an atom, when we put atoms together to form a molecule, and so on. Inanimate nature stops at the low level of organization of simple molecules. But living systems go further and combine molecules to form macromolecules, macromolecules to form organelles such as.... and eventually put all these together to form the greatest wonder of creation, a cell with its astounding inner regulations. Then it goes on putting cells together to form ''higher organisms'' and increasingly more complex individuals, of which we are examples. At every step, new, more complex, and subtle qualities are created. In the end we are faced with properties which have no paralled in the inanimate world, although the basic rules remain unchanged.
''It is most important for the biologist to give himself an account of the relationships when he asks himself on which level of organisation to work when embarking on research with the desire to understand life. Those who like to express themselves in the language of mathematics do well to keep to lower levels. Any level of organisation is fascinating and offers new vistas and horizons, but we must not lose our bearings lest we fall victim to the simple idea that any level of

organization can best be understood by putting it to pieces, by a study of its components, that is, to study of the next lower level. This may make us dive to lower and lower levels in the hope of finding the secret of life there. It made my own life a wild-goose chase. I started my experiments with rabbits, but finding rabbits too complex, I shifted to a lower life and studied bacteria; I became a bacteriologist. Soon I found bacteria too complex, and shifted to molecules and became a biochemist. So I have spent my life in the hunt for the secret of life.....

For twenty years I studied energy transformations by going to the source of vital energies and worked on biogical oxidation on the molecular level. These shedies netted me a Nobel Prize but left me without a better undertanding.... The more I knew, the less I understood; and I feared that I would end my life knowing everything and understanding nothing. Evidently something very basic was missing. I thought that in order to understand I had to go one level lower, to electronics, and I began to dabble in quantum mechanics. So I finished up with electrons. But electrons are just electrons and have no life at all. Evidently on the way I lost life.....

''I do not regret the wild goose chase, because it made me wiser. I know now that all levels of organization are equally important and we must know something about all of them if we want to approach life.....Even if we limit our work to a single level, we have to keep the whole in mind. Naturally, the higher we climb on the ladder of organization and complexity, the less our material becomes accessible to mathematical analysis but we must not think of ourselves as scientists only when we speak in equations.''

এই ভাষণের পর প্রায় অর্ধশতাব্দী কেটে গেল। জীব বিজ্ঞানীরাই আত্মানুসন্ধান করে বলুন, তাঁরা বিভিন্ন স্তরের ফলাফল কীভাবে আন্তঃসম্পর্কের মধ্যে আনেন (correlate) ও কীভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেন।

আগেই বলেছি, শুধু যে নিশ্চল বা সচল organisms-এর উপর reductionist বিজ্ঞান প্রয়োগ ক্ষতিকর হয় তা নয়, জীবনের ধ ারক (life-support) system-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রে—ভূমি, জল, বনসম্পদ জাতীয় resource systems-এর উপর reductionist বিজ্ঞান ওরফে fragmented science প্রয়োগ করতে গেলেই তার ফল হয় বিষময়, জীবনধবংসী। আসলে খণ্ডিত বিজ্ঞান হচ্ছে অ-বিজ্ঞান, যদিও প্রকৃতি-জয়-অভিলাষী সেচবিজ্ঞানী, কৃষিবিজ্ঞানী ও মেডিক্যাল বিজ্ঞানীরা একেই ''আধুনিক বিজ্ঞান'' বলে চালাচ্ছেন।

তাই নদীর বুকে আড়াআড়িভাবে বাঁধ তৈরির পরামর্শ আসে। তাতে যে নদীকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হয়, ব-দ্বীপ এলাকার ভূ গর্ভে লোনাজলের অবাধ প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়, সে কথা মনে থাকে না। রাজস্থানের মতো স্বল্পবৃষ্টি, তাপদগ্ধ অঞ্চলে সুবৃহৎ জ লপথ নির্মাণ করে সুপ্রচুর সেচের ব্যবস্থা করা হয়। খেয়াল থাকে না যে তার ফলে কয়েক দশকের মধ্যেই অতীতের শুষ্ক কিন্তু যথে ষ্ট উর্বর শস্যভূমিকে বিস্তৃত লবণাকীর্ণ চির-অনুর্বর জমিতে পরিণত করার ব্যবস্থা হয়। রাসায়নিক সার প্রয়োগে ভূমি-মাতৃকার বল াৎকারের ব্যবস্থা করে আপন ধবংসের ব্যবস্থা পাকা করা হয়। জমিতে বিষ, জলে বিষ, বাতাসে দূষণ, খাদ্যে কীটনাশকের বিষাংশ (যা মানুষের পক্ষে ধীর সঞ্চারী বিষ ''slow poison''), পুরুষও নারীর জননেন্দ্রিয়ে ক্যান্সারের পত্তন, এ সবই ''Green Revolution'' অন্তর্ভুক্ত chemicalisation-এর আশর্চ্য মহিমা।

রোগনিরাময়ের ক্ষেত্রে এসেছে সংশ্লিষ্ট রোগজীবাণুর সম্পূর্ণ বিলোপের আয়োজন। খেয়াল থাকে না যে এহেন কঠোর দাওয়াই প ্রয়োগের ফলে প্রাকৃতিক নিয়মেই দেহাভ্যন্তরে রোগজীবাণুর বিকারগ্রস্ত রূপান্তর (mutation) ঘটে, যাতে পরের ধাপে ওষুধও নি ষ্কাম হয় আবার অধিকতর মারাত্মক রোগের উদ্ভব ঘটে। আধুনিক medicare অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্রুত আপাত নিরাময় (seemi ng cure) ঘটিয়ে তাক লাগাবার সাথে সাথে রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা খতম করে। তাতে যদি ক্রমবর্ধমানহারে ক্যান্সার সৃষ্টি হয় এবং সব নিরাময় (curative) চিকিৎসার বাহিরে যে শল্য চিকিৎসা, তার জন্য কাতারে কাতারে প্রার্থী তৈরি করে, তবে সে বাহাদুরি ে তা reductionist medical বিজ্ঞানের। আজ যে চারিদিকে নূতন নূতন super-weed গজিয়ে উঠছে, নতুন নতুনvirus-এর আবির্ভাব দ্রুত বিস্তারে ত্রাসের সঞ্চার করছে, সেও তো ''প্রকৃতিজয়ী'' বিজ্ঞানের ম হৎ অবদান!

তবুও কি রাজনীতি ও সাহিত্য জগতের নেতারা, ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকরা প্রশ্ন ওঠান, ''এ কোন বিজ্ঞান?'' বি জ্ঞানের নামে সকলেই এত অভিভূত যে তাঁরা ভুলে যান, বিজ্ঞানের প্রকারভেদ আছে—এক আছে reductionist বিজ্ঞান, অপরটি organismic বিজ্ঞান; একটি প্রকৃতি-বিজয় অভিলাষী, অন্যটি প্রকৃতি-অনুসারী। প্রকৃতি অনুসারী যে বিজ্ঞান, তা প্রকৃতির নীতি গুলি আত্মস্থ করে তার সার্থক প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। এর বহু উদাহরণ আছে, যার জন্য পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জী বনে সৎ এমন বহু বিজ্ঞানী আজও মনে করেন, ''প্রযুক্তি দু'রকমের আছে—একটি elite-পন্থী, অন্যটি গরীব-সহায়ক; কিন্তু বিজ্ঞান তো শুদ্ধ জ্ঞান, তা কি করে হবে দু'রকমের?'' এ এক অন্ধতা। Reductionist বিজ্ঞান আর organismic বিজ্ঞানের প্রভেদ এত দুস্তর যে চার শতাব্দীর সঞ্চিত চোখের ঠুলি আজ খসে যাচ্ছে। জীবনের অস্তিত্ব সঙ্কটে উটপাখি সাজার কোনও উপায় আজ যে আ

র নেই।

কার্ল মার্কস একদা রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাসের দর্শন চ্যালেঞ্জ করে জগতকে বদলে দিতে চেয়েছিলেন। প্রযুক্তির ঘরাণা (genre) নিয়েও তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছিলেন যে প্রশ্নের গুরুত্ব তাঁর শিষ্যদের কাছে যথেষ্ট স্বীকৃতি পায়নি। তিনি বলেছিলেন handmill-এর প্রযুক্তির জমানায় স্বাধীনartisan সৃষ্ট হয়; steam-mill-এর জমানায় বৃহৎ উৎপাদনের কারবারী সৃষ্ট হয়—সভ্যতার বনিয়াদ সম্বন্ধে এ হচ্ছে বুনিয়াদি কথা। বিজ্ঞানের দর্শন ও প্রযুক্তির ঘরাণার মূল প্রশ্নে—তা কি প্রকৃতির উপর টেক্কা দিতে চাইবে, না কি প্রকৃতি অনুসারী হবে, এই প্রশ্নে—মানুষের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে পৃথিবী গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকবে, না বিলুপ্ত হবে। ফাটকা পুঁজির বিশ্বগ্রাস—যার বাহারি নাম globalisation—দিকেদিগন্তরে যুদ্ধ সৃষ্টি করছে; আর সেই বৃহৎ ব্যবসায়ী আর অপবিজ্ঞানের সংযোগ সহস্রাব্দের সন্ধিকালে ডেকে আনছে reductionist বিজ্ঞানের চরম ভয়ঙ্করী রূপ, যাকে ''রাক্ষসী বিদ্যা'' না বললে কর্তব্যহানি হয়। এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পোশাকি নাম transgenic engineering, যার মোহিনী মায়া বহু গবেষককে আকৃষ্ট করছে কিন্তু যার অনিবার্য পরিণতি ধ্বংসকাণ্ডে, চেনা-জানা জীবজন্তুর, কীটপতঙ্গের—ও মানুষের নিজের—দানবিক রূপান্তরে, শত লক্ষ বৎসর ধরে গড়ে ওঠা জীবনের মহাজালের (web of life) ছিন্নভিন্নতায়।

Reductionist বিজ্ঞানের এই পরিণতির আভাষ পেয়েই Principle of Indeterminacy-র জনক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী Werner Heisenberg ১৯৪৬ সালে Gottingen বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেছিলেন, বিজ্ঞান যে পথে চলেছে, তাতে জীবন বিপন্ন হতে চলেছে। বিজ্ঞানীদের তিনি ডাক দিয়েছিলেন প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্য উদঘাটন করতে, প্রকৃতির পথে বাধা সৃষ্টি না করতে।

“New possibilities of interfering with Nature are threatening us in many fields ..... It has become a practical possibility to produce infectious diseases and perhaps worse; even the biological development of man may be influenced in the direction of some predetermined selective breeding. Finally, the mental and spiritual state of people could be influenced and, if this were carried out from a scientific point of view, it could lead to terrible mental deformations of great masses of people. One has the impression that science approaches on a broad front of a region in which life and death of humanity can become dependent on the actions of a few, very small groups of people .....people have not realized the terrible danger which threatens them as a result of further scientific developments.” পরিশেষে তিনি বল্লেন,“The core of science is formed, to my mind, by the pure sciences, which are ..... the branches in which pure thought attempts to discover the hidden harmonies of Nature.

সুতরাং বিজ্ঞানকে ফিরিয়ে আনতে হবে তার কল্যাণময় কর্মে। ক্ষমতার দাপট মানুষকে নিয়ে এসেছে আত্মবিলুপ্তির কিনারায়। যত বড় বিজ্ঞানী হোন না কেন, প্রকৃতি যেমন বিভিন্ন species-এর মধ্যে co-evolution-এর ব্যবস্থা করেছে, সে ব্যবস্থা করার ক্ষমতা মানুষের কোনও দিনই আসবে না। প্রকৃতিকে যতই জানব, ততই ক্রমবর্ধমানহারে অজানা জগতের প্রশ্নপট হাজির হতে থাকবে। তার inexhaustible intelligibility-র কথা বুঝলেই কল্যাণময়তার পথে দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হবে।

পশ্চিমবঙ্গের নদী : ফিরে দেখা

কল্যাণ রুদ্র

নদীকথা শুধু ভূগোল বা ইতিহাস নয়, নদী লালন করে মানুষেরই কতকথা। বাংলা তো প্রবাদেই নদীমাতৃক, যে নদী নিয়ে তাঁর দুঃখ সুখের বারমাস্যা, ঘরগেরস্তি। যে নদী শিল্প, পরিবহন বা নৌবাণিজ্য - বাংলার জীবন সমাজ অর্থনীতির সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে নদী। জীবনদায়ী স্রোতধারা এখানে পবিত্র ও প্রণম্য।

গঙ্গা - ব্রহ্মপুত্র ও তাদের অসংখ্য উপনদী - শাখা নদীর জলের সাথে ভেসে আসা পলি সঞ্চিত হয়ে গড়ে উঠেছে এই বৃহত্তমবদ্বীপ। যত পলি জমেছে সাগরে ততই সরে গেছে আরও দক্ষিণে, ক্রমশ বদলে গেছে বদ্বীপের ভৌগোলিক রূপ। বাংলার এই বিবর্তনআজও অব্যাহত। স্বাধীনতা - উত্তর পশ্চিমবঙ্গ পায়ে পায়ে অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় পেরিয়ে এল। গত তিন শতাব্দীতে বাংলার নদী মানচিত্র অনেক বদলে গেছে --- হারিয়ে গেছে অনেক নদী, অনেক স্রোতধারা খুঁজে নিয়েছে নতুন পথ। এ সব পরিবর্তন শুধু প্রাকৃতিক কারণে ঘটেনি। নদী অববাহিকা জুড়ে কৃষি ব্যবস্থার প্রসার ঘটার সাথে সাথে বিঘ্নিত হয়েছে নদীর গতিশীল ভারসাম্য। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল বন্যাপ্রবণ এলাকায় পাড় বাঁধ বা এমব্যাঙ্কমেন্ট নির্মাণের কাজ। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এ্যাক্ট চালু হওয়ারপর বন্যাকে সম্পুর্ণ নিয়ন্ত্রণের এক অন্ধমোহে যত্রতত্র পাড় বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ফলে দুই ধরনের সমস্যা দেখা দেয় প্রথম নদীঅববাহিকার বৃষ্টির জল নদীখাতে গড়িয়ে পড়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়, দ্বিতীয়ত, বর্ষার জলে ভেসে আসা পলি যা আগ প্লাবন ভূমি ছড়িয়ে যেত তা নদীখাতে জমে যেতে থাকে। তিন শতাব্দী পর এখন লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে দামোদর, তিস্তা বা সুন্দরবনের বহু নদীর খাতপ্লাবন ভূমির থেকে উঁচু হয়ে উঠেছে। তাই বন্যার সময় পাড় বাঁধ ভাঙনে জল আর নদীতে ফেরার পথ পায় না। বর্ষার পলিসিক্ত জল পূর্বপুরুষরা, উইলককস যাকে বলেছেন 'ওভার ফ্লো ইরিগেশন' বা প্লাবন সেচ । এই অঞ্চলের নদীগুলির বাৎসরিক জল প্রবাহের ৮০ শতাংশই বয়ে যায় জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে। বিপুল জলস্রোত তখন নদীখাত উপচে প্লাবন ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে আর প্রবহমান স্রোতের টানে সারা বছর ধরে নদীখাতে জমা পলি ধুয়ে সাগরে চলে যায়। এই ভাবে বদ্বীপের নদী বেঁচে থাকে। অতীতে যে পলি প্লাবন ভূমিতে ছড়িয়ে যেত, পাড় বাঁধে বা এমব্যাঙ্কমেন্টের ফাঁসে বন্দী নদী এখন সেই পলিতেই ভরাট হয়ে গেছে। উইলককস্-এর চোখে পড়া বাঁধ তাই 'শয়তানের শৃঙ্খল'। শৃঙ্খলিত নদী মজে যাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে বেড়েছে বন্যা ও ভাঙনের প্রকোপ, হানা দিয়েছে ম্যালেরিয়া। উইলককস্, এডাম উইলিয়ামস বা সতীশচন্দ্র মজুমদার -- বুঝেছিলেন পাড় বাঁধে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া। ১৯২৭ সালে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখেছিলেন "Embankments in the riparian tract may for a time prevent overflow from the rivers, but would tend to raise the bed of rivers still further, and thus make the situation much worse in the long run." (Rainfall and floods in North Bengal, 1870-1922p.6. Deptt of Irrigation, Bengal Govt.) ১৯৪২ সালে সতীশবাবু লিখেছিলেন পাড় বাঁধের সাহায্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টার অর্থ হল 'আগামী প্রজন্মকে বন্ধক রেখে এই প্রজন্মের স্বার্থ রক্ষা করা'। স্বাধীনতার পরও এসব কথা কেউ শোনেননি। নদী শাসনের পরম্পরা আজও চলেছে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার পশ্চিমি প্রযুক্তির সংকীর্ণ পথ ধরে। আজও নদীর পাড় ধরে নির্মিত প্রায় ১০,৫০০ কিমি দীর্ঘ পাড়বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ করে রাজ্য সেচদপ্তর। একথা সত্য যে এই বাঁধগুলি ভেঙে ফেলে নদীকে আবার মুক্ত করে দেওয়া এখনই সম্ভব নয়, কারণ তাতে পার্শ্ববর্তী গ্রাম - শহরের বসতি বিপন্ন হবে। তবে পরিকল্পিত ভাবে প্লাবনভূমির বিভিন্ন অংশে পর্যায়ক্রমে বন্যার জল ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব। তাতে একাধারে নদীখাত গভীর হবে, প্লাবনভূমিও নতুন পলিতে ফিরে পাবে তার হারানো উর্বরতা। এজন্য প্রয়োজন একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা। কিন্তু স্বাধীনতা - উত্তর পশ্চিমবঙ্গে এমন কোন নদী পরিকল্পনার কথা ভাবা হয়নি।

রেল ও সড়ক পথও নদী চলার পথে বড় বাধা। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় রেল ও সড়ক ব্যবস্থার প্রসারের সাথে বেড়েছে বন্যা ও মালেরিয়ার প্রকোপ। ১৮৫৯ সালে হাওড়া - বর্ধমান রেললাইন চালু হয়। দক্ষিণ - থেকে উত্তরে প্রসারিত এই রেলপথনিম্ন দামোদর অববাহিকার নিকাশি ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। ফলে হুগলি ও বর্ধমান জেলায় বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, কৃষি উৎপাদন হ্রাস পায় এবং ম্যালেরিয়ায় বহু মানুষের মৃত্যু হয়। এ প্রসঙ্গে মেঘনাদ সাহা ১৯৩৩ সালে লিখেছিলেন--- "If there be anything like justice in the world, people of Burdwan are entitled to compensation from the parties concerned, for all these terrible inflictions on them." প্রায় একই মত ব্যক্ত করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশও, তিনি ১৯২৭ সালে লিখেছিলেন--- Railway embankments have occasionally acted as barriers for holding of floods. ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারদের একটি গোষ্ঠী চাইছিলেন বাংলার বুক চিরে রেল ও সড়ক পথ নির্মিত হোক যাতে বাংলার কাঁচামাল দ্রুত কলকাতা পার হয়ে ইংল্যান্ডপৌঁছে যায় এবং উৎপন্ন দ্রব্যও ফিরে আসে। বাংলা তখন একাধারে কাঁচামালের উৎস ও বাজার। স্যার আর্থার কটনের মতো নদী বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বুঝেছিলেন যে রেল ও সড়ক পথ জলের নিকা

শ পথকে ব্যাহত করবে --- তাই জলপথে বাণিজ্য করাই কাম্য। কিন্তু ১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার বুঝতে পা রে শুধু বাণিজ্যিক স্বার্থে নয় বিদ্রোহ দমনে ও সেনাবাহিনী দ্রুত যাতায়াতের জন্য চাইরেল ও সড়ক পথ। জঙ্গল মহলের শালগাছ যথেচ্ছ ভাবে কেটে তৈরি হলরেলের স্লিপার। ফলে দ্রুত বদলে গেল বাংলার ভূগোল।

বাংলার নদী নিয়ে একটি সামগ্রিক ইতিহাস কিন্তু আজও লেখা হয়নি। তবু কিছুটা চেষ্টা হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতার আগেই। স্বা ধীনতার পর বাংলার নদী সম্পর্কে প্রকাশিত একমাত্র উল্লেখযোগ্য বইটির শিরোনাম --- বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা, লেখক কপিল ভট্টাচার্য (১৯৫৯)। এছাড়া প্রকাশিত অন্য একটি বই হল তপোব্রত সান্যালের (২০০০) গঙ্গা : তত্ত্ব ও তথ্য। দুইটি বইতেই পশ্চিমবঙ্গের নদী নিয়ে নানা কথা আলোচিত হলেও আরও অনেক কথাই অব্যক্ত থেকে গেছে। বাংলার নদী ও তার নানা দিক নি য়ে প্রথম প্রামাণ্য বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪২ সালে, যার শিরোনাম 'রিভারস অব বেঙ্গল ডেল্টা' -- লেখক তৎকালীন সেচ বিভ াগের মুখ্য বাস্তুকার সুবোধচন্দ্র মজুমদার। 'অন্য যে দুটি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য তা হল রাধাকমল মুখার্জীর (১৯৩৮) দ্য চেঞ্জিং ফেস অ ব বেঙ্গল আর কাননগোপাল বাগচীর (১৯৪৪) গ্যাঞ্জেস ডেল্টা। আরও আগে নদী নিয়ে যে সব রিপোর্ট ও প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল ত া সবই সাহেব - ইঞ্জিনিয়ারদের রচনা। তার মধ্যে যেসব রচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল, জেমস রেনেলের (১৭৮১) এ্যান এ্যাকাউন্ট অব গ্যাঞ্জেস এন্ড ব্রহ্মপুত্র রিভার, জেমস ফারগুসনের (১৮৩৬) অন রিসেন্ট চেঞ্জেস ইন দ্য - ডেল্টা অব গ্যাঞ্জেস, ডব্লি উ। এস। শেরউইলের (১৮৫৮) রিপোর্ট অন দ্য রিভারস অব বেঙ্গল, ডব্লিউ. এ. ইংলিশের (১৯০৯) ক্যানালস এ্যান্ড ফ্লাড ব্যাঙ্কস অব বেঙ্গল, এফ. সি. হার্স্টের (১৯১৫) রিপোর্ট অন্ নদিয়া রিভারস্, স্টিভেনসন - মুর কমিটির (১৯১৯) রিপোর্ট অন্ দ্য হুগলি রিভার এ্যান্ড ইটস হেডওয়াটারস, এ্যাডাম উইলিয়ামসের (১৯১৯) হিস্টারি অব দ্য রিভারস ইন্ দা গ্যাঞ্জেস থ্রু বেঙ্গল। এই সব রচনার পাশাপাশি সাহেবদেরই উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল বহু নদী মানচিত্র। ওই সব মানচিত্র নির্মাতাদের মধ্যে দ্য এ্যানভিল (১৭৫ ২) (D'Anville) রেনেল (১৭৮১)মে (১৮২৪) ও হান্টার (১৮৭৫) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাহেবরা যে বাংলার নদী - সংস্কৃতি সব বুঝতেন তা নয়। তবু ইতিহাসের দায়েই ঔপনিবেশিক গদ্য পাঠ করতে হয়। অধিকাংশ সাহেব - ইঞ্জিনিয়ারদের লক্ষ্য ছিল কীভাবে নদীপথকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যায়--- তার পথ খোঁজা। নদী সম্পদে বাংলা ত খন ধনী ও গরবিনী। অনেক নদী বিশেষজ্ঞ কিন্তু তখনই বুঝেছিলেন --- শুকিয়ে মজে যাচ্ছে অনেক নদী, নদী বিত্তের বাংলায় বদলে যাচ্ছে পরিবেশে প্রকৃতির রূপরেখা -- সেই ঔপনিবেশিক পর্বেই। আর এই পরিবর্তন যে সর্বাংশে প্রাকৃতিক কারণে ঘটছে না তা প্রথ ম বুঝেছিলেন ডব্লিউ. এ. ইংলিশ (১৯০৯)। প্রাজ্ঞ সেই নদী বিশেষজ্ঞ লিখেছিলেন --- We construct reservoirs to store water and we abstract water from streams and apply it to irrigation of land without any regard to the apparent intention of Nature. We protect the banks of rivers from natural erosions and we dredge up sand and mud from the places in which Nature intended it to remain. There are, of course, limits within which we must confine our efforts, and success depends on a due apprehension of these limits and on a just sense of proportion.

বাংলার নদী নিয়ে সাহেবদের গবেষণার নেপথ্যে সাহেবদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ নিহিত ছিল। ক্রমশ মজে যাওয়া নদীর স্রোত ও বি পন্ন নৌবাণিজ্য নিয়ে তাদের উদ্বেগের অন্ত ছিল না। ইংরেজদের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল -- কলকাতা বন্দরের ক্রম হ্রাসমান নাব্যতা -- যে সমস্যা নিয়ে আজও বিব্রত। একথাও সত্য যে সাহেবদের নদী গবেষণার মধ্যে কোন গাফিলতি ছিল না --- উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন। আরও অনেকের মতো মেজর হার্স্টও বাংলার নদীর গতি প্রকৃতি বুঝতে চেয়েছিলেন গভীর মনোনিবে শ করে --- খুঁজেছিলেন নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণ ও তাকে স্রোতস্বিনী রাখার উপায়। তিনিই প্রথম নদীর গতিপরিবর্তনের ভূতাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল উত্তরে জলপাইগুড়ি থেকে দক্ষিণ বরিশাল পর্যন্ত বদ্বীপের পলির নীচের শিলাস্তরে একটিফাটল বা চ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে। উপরের পলিস্তর ওই চ্যুতি বরাবর ধীরে ধীরে বসে যাচ্ছে, ফলে বদলে যাচ্ছে ভূমির ঢাল। অনেকের ধারণা এই কারণেই ষোড়শ শতাব্দী নাগাদ গঙ্গার মূল স্রোত ভাগীরথীর খাত ছেড়ে পূর্বমুখী পদ্মার খাত ধরে বইতে শুরু করে। ১৭৮৭ সালে তিস্তা বা ১৮৩০ সালে যমুনা (ব্রহ্মপুত্র) নদীর গতিপরিবর্তনও একই কারণে ঘটেছিল। হার্স্ট গভীর অ নুসন্ধান করেছিলেন হুগলি নদীর মজে যাওয়ার কারণ। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন --- বছরের বিভিন্ন সময় নদীতে জল ও পলির পরিমাণ, নদীর বুক চিরে সেতুওজেটি নির্মণের প্রতিক্রিয়া, জলের গভীরতা ও চরের অবস্থান এবং নদীর অববাহিকা জুড়ে মানুষের নানা কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া। এ প্রসঙ্গে স্টিভেনশন্ - মুর কমিটির (১৯১৯) রিপোর্টও একটি অসাধারণ প্রামাণ্য দলিল বলে স্বীকৃত।

বাংলার নদী সদাই চঞ্চল --- ক্রমাগত গতিপথ বদলে নেয়। জলের স্রোতে ভেসে আসে প্রচুর পরিমাণ পলি আর সেই পলিতেই রু দ্ধ হয়ে যায় নদীর চলার পথ --- তখন নদী পাড় ভেঙে নতুন পথ খুঁজে নেয়। উত্তরবঙ্গের পূর্ব সীমান্তে সংকোশ নদী থেকে পশ্চিমে মেচি নদী পর্যন্ত সব খাতই এখন পাথর বালিতে অবরুদ্ধ। একই ছবি দক্ষিণবঙ্গেও --- পাগলা, বাঁশলই, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, ময়ুরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাই, রূপনারায়ণ, জলঙ্গী, চূর্ণী, ইছামতী, বিদ্যাধরী, সরস্বতী ও আদিগঙ্গা। একই ছবি দক্ষিণবঙ্গেও -- পাগলা, বাঁশলই, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, ময়ুরাক্ষী, অজয়, দামোদর,, দ্বারকেশ্বর, শিলাই, রূপনায়ারণ, জলঙ্গী, চুণী, ইছামতী, বিদ্যাধ

রী, সরস্বতী, আদিগঙ্গা --- সব নদী এখন মৃতপ্রায়। বর্ষা জলস্রোত ফি বছর দুকুল ছাপিয়ে ভাসিয়ে দেয় গ্রামের পর গ্রাম। বানভাসি মানুষ তখন আশ্রয়ের সন্ধানে দিশেহারা। বর্ষার পর আসে শুখা মরশুম --- তখন সেচের জলের জন্য হাহাকার, পানীয় জলের সংকট দেখা দেয় বহুগ্রামে। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা বুঝেছিলেন বর্ষায় উদ্বৃত্ত জল আর তারপর শুখা মরশুমে জলের ঘাটতি --- বাংলার মূল সমস্যা। তিনি চেয়েছিলেন - সে দপ্তরের পরিবর্তে একটি পৃথক নদী গবেষণা দপ্তর। অধ্যাপক সাহা লিখেছিলেন -- The Government of Bengal indeed maintain an irrigation department, but irrigation is not the problem of Bengal, which does not suffer from shortage of water but from excess and unequal distribution of water. What we want in Bengal is not an irrigation department, but a river training organization (P.24) । তার স্বপ্নস অব বেঙ্গল অঅর কাননগোপাল বাগচীর (১৯৪৪) গ্যাঞ্জেস ডেল্টা। আরও আগে নদী নিয়ে বে বাস্তবায়িত হয় নি। হরিণঘাটার নদী বিজ্ঞান মন্দির এখন নদীর মতোই মুমূর্ষু। নদী নিয়ে গবেষণার জন্য আমাদের পুণের কেন্দ্রীয় জল ও নদীর গবেষণাগারের দারস্থ হতে হয়। সঠিক নদী মানচিত্র পাওয়া দুষ্কর। ভারতীয় জরিপ বিভাগ বা ন্যাশানাল অ্যাটলাসের আনুকূল্যে এ পর্যন্ত যে সব মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছে --- তাতে অনেক নদী খুঁজে পাওয়া যায় না। হায়দ্রাবাদের কেন্দ্রীয়দূর সর্বেক্ষণ কেন্দ্রে (National Remote Sensing
Agency) উপগ্রহ চিত্র দুর্মূল্য এবং সাধারণের অধরা। ফলে নদী গবেষকরা অসহায়। অথচ 'নদী উৎসব' এখন বাৎসরিক শহুরে হুজুগ। নদীমাতৃক এই রাজ্যে পৃথক নদী মন্ত্রক নেই কেন -- এ প্রশ্নের উত্তর প্রয়াত পান্নালাল দাশগুপ্ত তাঁর জীবদ্দশায় পাননি। সেই ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে যথেচ্ছ নদীর শাসনের যে উত্তরাধিকার আমরা অর্জন করেছিলাম তা আজও অব্যাহত। জহরলাল নেহেরু স্বপ্ন দেখেছিলেন -- বড় বাঁধগুলি হবে ভারতের উন্নতির দেবালয়। তাঁর সেই স্বপ্নকে রূপ দিতে দেশজুড়ে অনেক নদীর বুক চিরে তৈরি হল বহু বড় বাঁধ -- জলাধারের নীচে হারিয়ে গেল বহু প্রাণ, বাস্তুচ্যুত হলেন অন্তত পাঁচ কোটি মানুষ। ১৯৪৮ সালে হিরাকুঁদ বাঁধের জন্য বাস্তুচ্যুত মানুষদের উদ্দেশ্যে নেহেরু বলেছিলেন --- ''If are to suffer, you should suffer in the interest of the
country.'' বড় বাঁধ ও উন্নয়নের স্বপ্ন রূপায়ণের অন্যতম প্রকল্প হল ডি ভি সি। আমেরিকার টেনেসি নদীর সাথে দামোদরের কোনচরিত্রগত মিল না থাকা সত্ত্বেও অন্ধমোহে টি ভি এ-র মডেল অনুসরণে হয়েছিল একটি বন্যা অনুসন্ধান কমিটি। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সেই কমিটি একদিকে দামোদর অববাহিকার উজানে কয়েকটি জলাধার নির্মাণের পরামর্শ দিয়েছিলেন, অন্যদিকে বর্ধমানের সলনা থেকে একটি খাল কেটে দামোদরের উদ্বৃত্ত জল দ্বারকেশ্বর নদীর খাতে বইতে দিতে চেয়েছিলেন। শেষোক্ত পরামর্শটি রূপায়িত না হলেও পরবর্তীকালে দামোদরের উজানে পাঁচটি জলধারা নির্মিত হয়েছে কিন্তু নিম্ন দামোদর অববাহিকার মানুষ বন্যার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায় নি। ডি. ভি. সি, মশানজোড় বা কংসাবতী প্রতিটি জলাধারই নির্মিত হয়েছে রাজ্যের পশ্চিম সীমানায় বা প্রতিবেশি রাজ্য ঝাড়খণ্ডে।ফলে বাঁধের ভাটিতে অনিয়ন্ত্রিত এলাকার অতিবর্ষণ জনিত জলস্রোত নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। গত পাঁচ দশকে পলি জমে জলাধারগুলির ধারণ ক্ষমতাও অনেকটা হ্রাস পেয়েছে।। তাই প্রত্যাশা সম্পূর্ণ পূরণ করতে পারে নি। জলাধার থেকে বাষ্পীভবন বা সেচ খালের নীচের মাটিতে জলসোষণের ফলে সংরক্ষিত জলের ৩৫ শতাংশ মাত্র ব্যবহারে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে মাটির নীচের জলভাণ্ডার -- এ যেনস্থায়ী আমানত ভাঙিয়ে এক অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধের দিনযাপন। কেউ মনে রাখেন না যে মাটির নীচের জলভাণ্ডারই শীত - গ্রীষ্মের অনাবৃষ্টির সময় নদীকে সজীব রাখে। ১৯৭০ এর দশক থেকে উচ্চফলনশীন ধান চাষের সাথে সাথে বেড়েছে জলের চাহিদা। বর্ষার জল দীঘি পুকুরে সংরক্ষণ করার চিরায়ত সংস্কৃতি এখন চূড়ান্ত অবহেলিত। বোনোর ধানের আগ্রাসী জলের চাহিদা মেটাতেই রিক্ত হয়ে যাচ্ছেআমাদের জলভাণ্ডার। সংশয়ী মনে প্রশ্ন জাগে শুখা মরশুমে ধানচাশের সজল বিলাসিতা আমরা আর কতদিন দেখাতে পারব? একথা অনেকেই জানেন, ১৫ কুইন্টাল বোরো ধান ফলাতে যে - পরিমাণ জল ব্যবহৃত হয়, তা দিয়ে ৩৬ কুইন্টাল গম বা ২০ কুইন্টাল ডাল উৎপাদন করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভূমি ক্ষেত্র মজুরের সংখ্যা ৭৪ লক্ষ। বিকল্পকৃষিতে এঁদের কর্ম সংস্থানের সুযোগ বাড়বে। পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনের প্রায় ৬২ শতাংশ এলাকা কৃষি জমি আর সেই জমির প্রায় ৯০ শতাংশে ধান চাষ করা হয়। এই বিস্তীর্ণ কৃষি জমিতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই তাই সীমাহীন শোষণে মাটির নীচে জলভাণ্ডার শুধু রিক্ত হয়নি, বিঘ্নিত হয়েছে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের সূত্রগুলি। ভৌম জলস্তরে এখন আর্সেনিক বা ফ্লুওয়াইডের বিষ। নদীর জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘাটতি ও কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার আধিক্য, ফলে কমে যাচ্ছে জলের জীববৈচিত্র্য। প্রকৃতির নানা অস্থিরতার ঝাপটা এসে পড়ছে মানুষের জীবনে। পরিবেশের নানা সমস্যা, বন্যা, ভাঙন নদীর গতিপরিবর্তন বা মজে যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ ও কৌতূহল বাড়ছে। এই সময়ের নদী গবেষকরা তাদের গবেষণার ফল নিয়ে সাধারণত ইংরাজী ভাষায় জটিল প্রবন্ধ রচনা করেন -- যা সাধারণ মানুষের অধরা থেকে যায়। অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সমকালীন গবেষণার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ - নদীর আন্তঃসম্পর্কটি অনুপস্থিত। অথচ আমাদের নদী গবেষণার ইতিহাস অন্য কথা বলে। ঔপনিবেশিক অবস্থার মধ্যেই নদী নিয়ে অন্য কথা ভেবেছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, মেঘনাদ সাহা, রাধাকমল মুখার্জী, নীহাররঞ্জন রায়, সুবোধচন্দ্র মজুমদার, কাননগোপাল বাগচী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অর্থাৎ বাংলার নদী ভাবনার এক দেশজ ধারাও ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা - উত্তরকালে কপিল ভট্টাচার্য ছাড়া বাংলার নদী নিয়ে অন্য কেউ বিশেষ ভাবেন নি। প্রযুক্তিবিদ্‌রা নদীকে শাসন করতে চেয়েছেন প্রকৃতি - মানুষের উপর সম্ভাব্য বিরূপ প্র

তিক্রিয়ার কথা না ভেবেই। একটি ব্যারেজ নির্মাণ করে গঙ্গার জল খালপথে ভাগীরথী - হুগলি নদীতে এনে কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছিল। ফরাক্কার জলে হুগলি নদীতে লবণতার মাত্রা কিছুটা কমলেও পলিসঞ্চয় কমে নি। এখনওপ্রতিবছর মোহনা থেকে প্রায় ২,১০ কোটি ঘন মিটার পলি অপসারণ করতে হয়। অথচ ব্যারেজের উজানে প্রতি বছর প্রায় ৩০ কোটিটন পলি জমে যাচ্ছে। পলিতে রুদ্ধ গঙ্গা পাড় ভেঙে নতুন পথ খুঁজছে। গঙ্গা হয়তো অচিরেই ফরাক্কা ব্যারেজকেএড়িয় নতুন চলার পথকরে নেবে --- এমন আশঙ্কা এখন সবার মনে। জল ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করে পলি ব্যবস্থাপনার উপর -- এই সহজ কথাটি সংকীর্ণ প্রযুক্তিবিদ্যার ধারণার অতীত ছিল। গঙ্গার মতো বিশাল নদীর চলার পথ রুদ্ধ করে জলকে অন্যপথে ঘুরিয়ে দিলে ভাসমান পলির চলার স্বাভাবিক ছন্দ বিঘ্নিত হয় -- এই সহজ কথাটি আমরা তিন দশক আগে বুঝি নি, আর সেই না বোঝার মাশুল দিতে মালদহে কয়েক লক্ষ মানুষ ভাঙন - দুর্গত ও ঘরহারা।

বাংলার নদী গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয়েছিল ঐতিহাসিক রাধাকমল মুখার্জী ও নীহারঞ্জন রায়ের হাত ধরে। কিন্তু পরিব্রাজকের বর্ণনা, প্রাচীন মানচিত্র পাঠ বা মাটির নীচ থেকে পাওয়া পুরাবস্তু বিশ্লেষণ করলেই নদীর ইতিহাস পুরোপুরি বোঝা যায় না; জানতে হয় ওই অঞ্চলের ভূতত্ত্ব, পলিস্তরের চিত্র। পর্যবেক্ষণ করতে হয় ভূপ্রকৃতি ও উপগ্রহ চিত্র থেকে পাওয়া নানা তথ্য। কিন্তু এসব বিষয় ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভূক্ত নয় তাই বাংলার ইতিহাস অনুসন্ধান অনেক সময় ভূগোলের গোলকধাঁধায় পথ হারিয়েছে, আর ভূগোলবিদ্‌রাও ইতিহাসের নানা জটিলতা বুঝতে পারেন নি। তাই ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভূগোল ভূতত্ত্ব, দূরসর্বেক্ষণ বিজ্ঞান (Remote Sensing) --- ইত্যাদি নানা বিষয়ের সমন্বয় ঘটাতে পারলে বাংলার সঠিক নদী - ইতিহাস রচনা করা যাবে। গাঙ্গেয় বদ্বীপের ভূতত্ত্ব বিয়ে গবেষণা খুবই অর্বাচীন। মাত্র পাঁচ দশক আগে থেকে খনিজ তেলের অনুসন্ধানের সময় পলি স্তরের যে ইতিহাস উন্মোচিত হতে শুরু করে -- সেখান থেকেই এই নতুন অধ্যায়ের সূচনা। উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণ নদী বিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এইসব আধুনিক বিজ্ঞান ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে এখনও অন্তর্ভুক্ত নয় আবার ভূগোলের পাঠ্যক্রমেও এসবের সামান্য অংশই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে নদী গবেষণাও সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের নদী নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার দায়িত্ব পালন করেন প্রযুক্তিবিদ্‌রা আর অধীত প্রযুক্তবিদ্যা চালিত হয় পশ্চিমি বিজ্ঞানের সংকীর্ণ পথ ধরে। মনে রাখা দরকার ইউরোপ বা আমেরিকা নদীগুলির সাথে ভারতীয় নদীগুলির মিল যতটা অমিল তার তুলনায় বেশি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় এশিয়ার নদীগুলির জলে বছরে প্রায় ৬৩৫ কোটি টন পলি ভেসে আসে আর ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার নদীগুলি বহন করে যথাক্রমে ২৩ ও ১০২ কোটি টন পলি। বাৎসরিক জল প্রবাহের প্রকৃতিও বিভিন্ন ধরনের। এই উপমহাদেশে নদীগুলির বাৎসরিক জলপ্রবাহের প্রায় ৮০ শতাংশ বয়ে যায় জুলাই, অগাস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে আর পশ্চিমি নদীগুলিতে সারা বছর প্রায় জলপ্রবাহে এত তারতম্য ঘটে না। তাই নদী শাসনের পশ্চিমিপ্রযুক্তি বিদ্যা এদেশে অনেকটাই অচল। এছাড়া মনে রাখা দরকার নবগঠিত গঙ্গার - ব্রহ্মপুত্র বদ্বীপের পলিস্তর এখনও নরম, জমাট বেঁধে ওঠে নি, ভূমিগঠনের কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। সর্বোপরি, অববাহিকার আয়তন, অববাহিকায় কৃষিজমি ও বনাঞ্চলের ব্যাপ্তি; প্রবহমান জল ও পলির পরিমাণ, নদী ঢাল, জোয়ার - ভাঁটার ওঠানামা ইত্যাদি নানা কারণের উপর নদী গতিশীল ভারসাম্য নির্ভর করে। ইংলিশ সাহেব সঠিকভাবেই বলেছিলেন --- 'আমরা নদী শাসনের অজুহাতে যা কিছু করি তার সবই প্রকারান্তরে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়ার চেষ্টা আমাদের এই সব কার্য কলাপের একটি সীমা থাকা প্রয়োজন, আর পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে সেই লক্ষ্মণ রেখাটি সঠিকভাবে চিহ্নিত করার মধ্যে। অর্থাৎ নদীর সাথে সহাবস্থানই আমাদের অস্তিত্বের শর্ত।

নদীসংযোগের সর্বনাশা প্যান

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

::::

নদীসংযোগের সর্বনাশা প্ল্যান, প্রাণীহিতে প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্যের বিধান; ডারউইন তত্ত্বের একদেশদর্শিতা ও ‘খণ্ডিত বিজ্ঞানে’র উৎপত্তি

ভারত সরকার সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে দেশেবড় বড় নদীগুলিকে সংযুক্ত করা হবে। তাতে নাকি ভারতের কোথাও জলাভাব থাকবে না। সরকারের এ সিদ্ধান্তে বিরোধী দলগুলিও খুব খুশি; বিপুলভাবে তাঁরা এই সিদ্ধান্তের সমর্থন জানিয়েছেন। দুঃখ হয় র াজনৈতিক দলগুলির চিন্তার দৈন্য দেখে। অটলবিহারী বাজপেয়ী বোধ হয় ভেবেছেন এই নদীসংযোগকাণ্ড চালু করার ফলে ভারতে র ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হয়ে থাকবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যদি কাজ হয়, তবে ভারতভূমিকে অনুর্বর বন্ধ্যাভূমিতে ও নুনপাহাে ড়র দেশে পরিণত করার জন্য পৃথিবীর লোক তাঁকে অবশ্যই স্মরণ করবে। দেশকে সব দিক দিয়ে দেউলিয়া করার এই বাহাদুরির ভাগীদার অবশ্যই হবেন এ কর্মে সরকারের সহযোগী বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ। চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙ্গ ভারতভূমিকে দীর্ঘমেয়াদি প তিতভূমি বানাতে পারেনি। বাজপেয়ী-আদবানি-সোনিয়া গান্ধী পারবেন। পরিবেশ ও নদীবিজ্ঞান বিষয়ে অনভিজ্ঞ কতিপয় শীর্ষ আ দালতের বিচারকও সেই বাহাদুরির অংশভাগী হবেন।

মাটি, নদী, পর্বত, বন আমাদের জীবন ও জীবিকার ভিত্তি। তাদের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনও পাঠ না নিয়েই আমাদের দেশে নে তা গজিয়ে ওঠে। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই ধরনের সিদ্ধান্ত। আমাদের দেশের কর্ণধারেরা ভেবেছেন, সারাদেশের রাস্তাঘাটে র network যদি বানানো যায়, তা হলে নদীসমূহের network বানানো যাবে না কেন?

স্যার আর্থার কটন শতাব্দী-অধিক কাল পূর্বে ভারতের নদীগুলি সংযুক্ত করার কথা বলেছিলেন। তাঁর ভাবনা ছিল কীভাবে দেশেব . ভিতরে নাব্যতা যথাসম্ভব বৃদ্ধি করা যায়। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে, ১৯৭০ দশকে ড. কে. এল. রাও প্রস্তাবটি আবার ওঠান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, দেশে সেচের যথাসম্ভব বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন। প্রস্তাবটি কার্যকরী করার পথে যে দুস্তর technogical বাধা ছিল, যে অভাবনীয় অর্থ ও বিদ্যুৎ ব্যয়ের ঝুঁকি ছিল তা বিবেচনা করে প্রস্তাবটি বর্জন করা হয়েছিল; কিন্তু মৌলিক প্রশ্নগুলি তখনও অবহেলিত ছিল। স্যার কটন ও ড. রাও উভয়েই বিশ্ববিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন কিন্তু ইঞ্জিনিয়াররা সাধারণত তাঁদের সংি শ্লষ্ট বিষয়ের বাইরে অন্য কিছু ভাবনা-চিন্তার বিষয় যে থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে নিস্পৃহ থাকেন। বিশেষজ্ঞতার সাধনায় তাঁরা ‘‘T unnel View’’ এর বন্দি হয়ে পড়েন।

নদীর কার্যকারিতা (function) কী, সে প্রশ্ন সর্বপ্রথমেই বিবেচনা করার দরকার ছিল। সে প্রশ্ন কর্তারা তোলেননি। আমিও প্রথমে তুলব না এঁদের চিন্তাজগতের সীমানার মধ্যেই যে প্রশ্ন সহজেই ওঠার কথা, সে বিষয়গুলির ব্যাপারেও এঁরা বিশেষ কিছু ভাবনা-ি চন্তা করেছেন কি না, তা উদঘাটিত করার জন্য।

নদীসংযোগ প্রকল্পের ঘোষিত উদ্দেশ্য উদ্বৃত্ত অঞ্চলের জল ঘাটতি এলাকায় পাঠানো। তা হলে প্রথমেই জানা দরকার, কোন কোন এলাকা জলের দিক দিয়ে উদ্বৃত্ত হওয়ার সৌভাগ্যভাগী? উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা (basin) ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন ও উদ্বৃত্ত-জলের এলাকা আছে কি? গঙ্গার জল যে সমস্ত প্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তারা প্রায় সকলেই প্লাবিত হয় এক মর সুমে, আবার অন্য ঋতুতে জলাভাবে পীড়িত হয়। এই যে এক ঋতুতে বন্যা, অন্য ঋতুতে জলসঙ্কট, এই দ্বৈত অবস্থা কিসের জন্য ঘ টে?

আরও কতকগুলি প্রশ্ন ওঠা উচিত ছিল দেশে এত সেচবিস্তারের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করার জন্য। শুধু ধান ও আখ ছাড়া কি কে ানও শস্য আছে, যাতে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়? চাষিরা বলেন, অন্য সব শস্যের চাহিদা ঈষৎ সিক্ততায় মিটে যায়। তা হলে সর্ব ত্র flow irrigation -এর জন্য এত অতি তোড়জোড় কেন? সেচব্যবস্থা নিশ্চয়ই জরুরি, কিন্তু মিতপরিমাণের অতিরিক্ত সেচ মাটিকে লোনা করে ছাড়ে। সে ক্ষেত্রে যাঁরা ধানের পর ধান একই মাটিতে একই বৎসরে চাষ করেন, তাঁরা দীর্ঘস্থায়ী অনুর্বরতা ডেকে আনেন, অ াপাতলাভের লোভে। পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমিয়া একদা ছিল সভ্যতার পীঠস্থান। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেচের ফলে গত তিন হাজার বৎসর ধরে সেই ভূমি আবাদের অযোগ্য হয়ে আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পশ্চিম পাঞ্জাবে — বর্তমানে পাকিস্তানে — লয়ালপুর, মন্টগোমারি ও সারগোদা সমৃদ্ধির নিদর্শন ছিল। বে-হিসেবি সেচের কারণে এলাকাগুলি এখন উর্বরতায় নিম্নশ্রেণীভু ক্ত। FAO বহু বৎসর পূর্বে জানিয়েছিল, সেচসিক্ত ভূমিগুলির শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশি অনুর্বর হয়ে গেছে। বিশ্ববিখ্যাত ভূমিি বদ স্বর্গত Prof Kovda জানিয়েছিলেন যে flow irrigation ভুক্ত জমিগুলির শতকরা ৮০ ভাগই লবণাক্ত অবস্থার শিকার হতে চলেছে। এ সব দৃষ্টান্ত থেকে আমরা শিক্ষা নেব না ? ভারতীয় এলাকায় পাঞ্জাবে ও সারদা সহায়ক ক্যানালের command area তে যে water

logging ও খেতি ভূমিতে লবণসঞ্চয় সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা দেখেও flow
irrigation --এর মোহে আবিষ্ট থাকব? রাজস্থানে ইন্দিরা গান্ধী ক্যানাল থেকে যে সব এলাকায় flow
irrigation ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, সে সব এলাকার জমিতে নুন যে জমছে, তা সমীক্ষা করার কথা ভেবে দেখছি কি? স্বল্পবৃষ্টির এলাকায় flow
irrigation জমির উপর তাড়াতাড়ি নুন জমিয়ে তোলে, কারণ সেখানে তাপের দহনে জল উবে যায়, নুন পড়ে থাকে। আর প্রচুর বৃষ্টির এলাকায় সেচ প্রণালীর সঙ্গে নিষ্কাশন (drainage) প্রণালী না থাকলে বিপদ ঘটে।
অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু — এই দুই রাজ্যেই প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তবুও এই দুই রাজ্যেই বেশি দাবি ওঠে অন্য অববাহিকা থেকে জল টেনে আনার জন্য। এর কারণ কি এই নয় যে এখানকার ধনী চাষিরা একের পর এক ধান কিংবা আখের চাষ করতে চাইছেন জমির ক্ষতি করেও—অথবা রাজ্য সরকার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্বপ্ন দেখছেন?
কোনও নদীকে তার মোহানা থেকে বিচ্ছিন্ন করে যদি অন্য নদীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, তাতে যে কী ক্ষতি হয়, সে কথায় পরে আসব। তার আগে একটি অতি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতেই হয়। ব্রহ্মপুত্রের জল গঙ্গায় কীভাবে আনা হবে, সে সম্বন্ধে সঠিক নির্ণয় সম্ভব হয়েছে কি? ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বকালে এই সংযুক্তি প্রস্তাব বাতিল হয়েছিল technological
challenge -এর অভূতপূর্ব জটিলতা ও খরচের বিপুলতার বহর জেনে। তা ছাড়া বিন্ধ্যপর্বতের উপর জল pump করে তুলে তাকে দক্ষিণদেশে নিতে গেলে ৯০,০০০ মেগাওয়াট খরচ হবে, এ কথা শুনে সকলে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। তার বিকল্প হিসাবে আজ NAWDA
যে প্রস্তাব রেখেছেন, তা কতটা কার্যকরী হবে, সে বিষয়টি প্রস্তাবক ইঞ্জিনিয়ারদের গণ্ডির বাইরে অন্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে কি? সেই বিকল্প প্ল্যান সরকারিভাবে প্রকাশ করে জনমত আমন্ত্রণ করা হল না কেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে?
ধরে নিলাম, সংযোগের সব technological
challenge অতিক্রম করে ব্রহ্মপুত্রের জল গঙ্গায় আনা হয়েছে এবং বিন্ধ্যাচলের বাধা এড়িয়ে জলসম্ভারকে দক্ষিণমুখী করা সম্ভব হচ্ছে। সেখানে কি নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে না? এমনিতেই পূর্ব বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ অভিযোগ করে আসছে যে উত্তর প্রদেশে বহু সংখ্যক বড় বড় সেচপ্রণালী জল টেনে নেওয়ার ফলে তারা যথেষ্ট জল পাচ্ছে না। এখন তাদের সে অভিযোগ তীব্রতর হবে। ''যত বেশি সেচ, ততই ভাল'', এই যদি নীতি হয়, তা হলে উড়িষ্যার লোক প্রাচুর্যের অজুহাতে অনেক বেশি সেচপ্রণালী তৈরি করে মহানদীর জল গোদাবরী পর্যন্ত পৌঁছানোর পথে বাধা তৈরি করবে না? তাতে কি রাজ্যে-রাজ্যে বিবাদ আরও ছড়িয়ে পড়বে না এবং নিজ নিজ জমির সর্বনাশ ডেকে আনবে না? তা ছাড়া, বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গার জলবন্টনের যে চুক্তি ১৯৯৬ সাল থেকে চলে আসছে, তাতে ফরাক্কায় জলের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভারত চুক্তিবদ্ধ। তার ব্যত্যয় হলে বাংলাদেশ কি একটা আন্তর্জাতিক বিবাদ হিসাবে বিশ্বের দরবারে তোলপাড় করে ছাড়বে না?
সুপ্রিম কোর্টের সামনে পেশ করা estimate
অনুযায়ী এই প্রকল্পে ৫৫৬০০০ কোটি টাকা খরচ হবে। পৃথিবীতে কোনও প্রকল্পে এত খরচের কথা কখনও শোনা যায়নি। খরচ যদি এই অঙ্কের দশ ভাগের এক ভাগও হত, তা হলেও এ প্রকল্প সমর্থনযোগ্য ছিল না, কারণ তার চেয়েও কম খরচে দেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের বিকেন্দ্রিক water harvesting technique
মারফত প্রতিটি গ্রামকে জলে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা যায়। রাজস্থানের মতো স্বল্পবৃষ্টির রাজ্যে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করার পর সরকারি মহল ও এ কথা মোটামুটি মেনে নিয়েছিলেন, যদিও বড় বড় সংগঠনের ইঞ্জিনিয়াররা তাতে অস্বস্তিবোধ করছিল। ভারত সরকারও বোধ হয় সন্দিগ্ধ ছিলেন। তাই পৃথিবীর কোথাও যার তুলনা মিলবে না, এমন বিশাল ও জটিল প্রকল্প গ্রহণ করে জানিয়ে দিলেন যে বারিপাত ধারণ ও সংরক্ষণে বিকেন্দ্রিক rainwater harvesting
-এর কার্যকারিতায় তাঁদের সত্যকার বিশ্বাস ছিল না। বিপুল অর্থব্যয়, কন্‌ট্রাক্টর নিয়োগ ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়করণ ব্যতীত তাঁরা ভরসা বা শান্তি পান না।
এই প্রজেক্টের প্রস্তাবকরা যুক্তি দেখাবেন, বিকেন্দ্রিক জলধারণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থায় স্বাভাবিক বৎসরে প্রয়োজন মিটতে পারে, কিন্তু ৪/৫ বৎসর অনাবৃষ্টি হলে কীভাবে সামাল দেবে? হিমালয়ের হিমবাহ-গলানো জল ছাড়া তখন উপায় থাকবে না। এ ধরনের বানানো যুক্তির উত্তরে এইটুকু বলা যায় যে পরপর ২/৩ বৎসর অল্পবৃষ্টি হলেও বিকেন্দ্রিক ব্যবস্থা সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারে। Percolation
tank -এর যে পরম্পরা ছিল, তাতে বাষ্পীভবন এড়িয়ে, ভূগর্ভে জল সংরক্ষণ করে এ ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। সরকার এতদিন conjunctive storage of water) অর্থাৎ খালবিল-পুকুরে surface
storage —এর সঙ্গে ভূগর্ভে জলসংরক্ষণ—ব্যাপারে যে অমৃতবাণী পরিবেশন করছিলেন, তাতে সরকারের নিজেরই বিশ্বাস এত ঠুনকো ছিল?
যদি ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসর অল্পবৃষ্টির বদলে সম্পূর্ণ শুষ্কতার মতো অভাবিত ঘটনা ঘটে, তা হলে নিউক্লিয়ার লবণমুক্তি (nuclear

desalination)
মারফত সমুদ্রজলকে ব্যবহারযোগ্য করার যে সুমহান উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়, সেই technique কে ব্যাপকভাবে প্রয়োগযোগ্য করার দিকে মনঃসংযোগ করা যায় না? হিমবাহের জল পাওয়ার ভরসায় বিপুল ব্যয়ে এই যে নদী-সংযোগ করা হচ্ছে, সে গুড়েও তো বালি পড়ছে—climate পরিবর্তনের কারণে হিমালয়ের snowline
যে পিছু হটছে। সুতরাং অভূতপূর্ব অতি ভয়ঙ্কর জলসংকটের কল্পনা করে অতি-বড় দৈত্য-প্রকল্পে শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় না করে, বর্তমানের চেয়ে কিছু কঠোর জলাভাবের মোকাবিলা করার জন্য সর্বপ্রকার বিকেন্দ্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত নয় কি? তা যদি করি, সেইটিই হবে প্রতি গ্রামে ''জলের স্বরাজ''।
বিকেন্দ্রিক ব্যবস্থা বলতে বোঝায় চেক ড্যাম, rooftop water harvesting
খাল, ঝিল, ঈরি, বাউড়ি, পাহাড়ের পাদদেশে circular পরিখা, farm pond, সিমেন্ট-করা catchmentও জালি (sieve) সমন্বিত drug well, percolation tanks, ভূগর্ভস্থ structure এবং auifier এ জলসংরক্ষণ ব্যবস্থা। (খেতি জমিতে soil organic matter বাড়ালে তার spongy
চরিত্রের জন্য প্রচুর জল সংরক্ষণ হয়, তাতে কৃষিরও সুবিধা হয়।) এই প্রকার বিবিধ ব্যবস্থা নিলে সকল প্রকার ন্যায্য চাহিদা — পানীয় জল, মানুষ ও পশুর স্নানের জল, মিতব্যয়ী সেচের জল, run of the way
technique -এ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জলের চাহিদা মিটবে।
এখন আসা যাক মৌলিক প্রশ্নে, যে-আলোচনা সর্বপ্রথমে না করে শেষ দিকে করছি। নদীর কাজ কী? তা শুধু শহরে-নগরে জল সরবরাহ করা ও গ্রামে সেচের জলের সিংহভাগ সরবরাহ করা নয়। নদীর প্রধান কাজ : (১) অববাহিকার salts and toxins সমুদ্রে নিয়ে ফেলা; (২) নদীর মোহানায় (estuaries) -
এ মিষ্টি জল বয়ে নিয়ে যাওয়া, যাতে সমুদ্রের লোণাজল ও এই মিষ্টি জলের মিলনজনিত উথলপাথলের ফলে মাছ, seafowl, কাঁকড়া, ঝিনুক প্রভৃতি জলজ প্রাণী প্রজননের মহোৎসবে মেতে ওঠে (যাতে স্থলজ ও জলজ প্রাণীর খাদ্যভাণ্ডার ভরে ওঠে); (৩) hydrological cycle
রক্ষা করা; (৪) সমুদ্রে detritus (বালি নুড়ি জাতীয় পদার্থ) বয়ে নিয়ে যাওয়া, সেখানে phytoplanktons-এর খাদ্য হিসাবে। নদীর হালকা মিষ্টি জল যদি সমুদ্রে না যায়, তা হলে সমুদ্রে বাষ্পীভবনের প্রক্রিয়া কমে যাবে, ফলে স্থলাঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণও কমবে। সমুদ্রের phytoplanktons যদি তাদের খাদ্য না পায়, তা হলে তারা oxygen
ছাড়তে পারবে না। মনে রাখা দরকার, পৃথিবীতে যত oxygen, তার বৃহত্তর অংশ এই phytoplanktons দেরই দান।
যদি নদীর জল সমুদ্রে পড়তে না পেরে এই network -এর মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে, তা হলে যে সব salts and toxins সমুদ্রে যেতে পারত, তা না গিয়ে সেচের জমিতে জমে থাকবে। ফলে ক্ষুদ্র মেসোপটেমিয়ার ভাগ্যে যা ঘটেছিল, সমগ্র ভারতের ভাগ্যে সেই দশা ঘটবে। আমরাই বৃষ্টিপাত কমিয়ে দেওয়ার কারণ ঘটিয়ে নিজেদের ভাগ্যকে seal করে দেব। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ অধ্যায়ে ''রোগশয্যা''য় লিখেছিলেন :
''যমরাজ দিল যবে ধ্বংসের বিধান
আপন হত্যার ভার আপনিই নিল মানুষেরা।''
এই প্রকল্প তার-ই এক দৃষ্টান্ত।
জনগণের এ কথা মনে রাখা দরকার যে প্রতিটি নদীর আপন বিশিষ্ট বৈভব (properties) আছে, যা অন্য সব নদীর থেকে পৃথক। এই বৈভবের প্রকৃতি নির্ভর করে তার উৎপত্তিস্থল এবং তার অববাহিকার চরিত্রের উপর।
শুধু জলেরhardness বা softness-এর তফাত নয়, তফাত আছে তার mineral
contents, তার স্বচ্ছতার এবং ফলত aeration (হাওয়া খেলার) এবং oxygenation -এর পরিমাপে, তার electro-chemical বৈভবে। এই সব বৈভব-পার্থক্যের ফলে বিভিন্ন নদী বিভিন্ন প্রকার জলজ প্রাণীর লীলাক্ষেত্র। গঙ্গায় যে ইলিশ মাছ জন্মে, অন্য নদীতে তা জন্মে না। Dolphins পাওয়া যায় মাত্র কয়েকটি নদীতে, তা-ও আছে তাদের মধ্যে প্রকারভেদ। জলজ কোনও প্রাণী ও জলস্তরোপরি বিচরণশীল কোনও পক্ষী বা পতঙ্গ সমগ্র জীবনপ্রবাহে—এমনকী মানবহিতে—কী ভূমিকা পালন করে বা করবে, তা আমরা কেউ জানি না। সুতরাং কোনও প্রাণীরই জন্ম বা বিচরণক্ষেত্র নষ্ট করে দিলে নিজেদেরই ক্ষতি। উল্লেখ্য যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বহু মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে Tellico
dam তৈরি যখন শেষ হতে চলেছে, এমন সময় কোর্ট আদেশ দিল এ বাঁধ রাখা চলবে না কারণ dart
fish নামক এক অতি ক্ষুদ্র মাছ শুধু ওই নদীতেই পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যদি আমরা নদীগুলির বৈশিষ্ট্য লোপাট করে দিই, তা হলে বহু প্রকার মাছ, শামুক, পাখি, পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। কী অমূল্য সম্পদ হারাব, তা অজানা থাকবে।
পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েও বলি, অন্যায্য চাহিদা ওঠে যখন পাঞ্জাবের মতো অনতিপ্রচুর বর্ষণের এলাকায় ধান চাষ করা হয়, তামিলনাড়ে একই বৎসরে ধানের পর ধানের চাষ করা হয়, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটকে আখের চাষ ব্যাপক হয়। এই ধরনের অস্বাভাবিক কৃষি

তে শুধু যে ভূমি অনুর্বর হয় তা নয়; সমাজের balanced
food উৎপাদনও বিঘ্নিত হয়। এর বিকল্প আছে, যা সব দিক দিয়ে শ্রেয়, এমনকী চাষির অর্থাগমের দিক দিয়েও।
খ্যাতনামা কৃষিবিশেষজ্ঞ ড. আই সি মহাপাত্র বলেছেন, ‘‘কর্ণাটকে সেচবিহীন বারিনির্ভর এলাকাতে রাগি, জোয়ার, বজরা, কুলত্থ কলাই, অড়হর, চিনাবাদাম, রেড়ি ও নারিকেল চাষ করা যায়। সেচসিক্ত জমিতে চাষিরা আখ, মকাই (ভুট্টা), বেগুন, লঙ্কামরিচ, তুঁত, টোম্যাটো, আলু, হলুদ, আদা, আঙ্গুর, কলা ও পান (betel) এর মধ্যে বেছে নিতে পারেন। তামিলনাড়ে নদীর অববাহিকায় (b asin) শতকরা ৬২ ভাগ ক্ষেত্রে তিনবার ধান চাষ হয়—কুরুবাই, থালাদি এবং শম্বা; অথচ এমনভাবে চাষ করা যায় যে এক শম্বা ধানই থালাদি ও কুরুবি শস্যের চেয়ে অনেক বেশি ফসল দিতে পারে। ধান ছাড়াও এ রাজ্যে রাগি, চিনাবাদাম, তিল, রেড়ি, মাশ কলাই, মুগডাল ও তুলা চাষ করা যায়। তুলা এই সকল শস্যের মধ্যে একটি শস্যের স্থান পেতে পারে।’’ ড. মহাপাত্র আক্ষেপ করে বলেছেন যে কর্ণাটকে ১১ হাজার waterharvesting
structures বুজে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা জানি, তামিলনাড়ে যে ঈরি system-এর কার্যকারিতা এক সময় বিস্ময় উদ্রেক করত, সেগুলিও মজে যাচ্ছে। তামিলনাড় নদীর বুকে ব্ধক্রস্তুশুব্ত্রক্তজক্তন্ত(বালিখনন) করতে দিয়ে নদী নষ্ট করেছে। অপরিশুদ্ধ ময়লা জল (untreated
effluents) নদীতে হরদম ঢালতে দিয়েছে। চেন্নাই শহরের বুক দিয়ে যে ‘‘কুম’’ নদী বয়ে চলেছে, তাকে নদী না বলে পূতিগন্ধময় খোলা নর্দমা বলা যায়। এ ভাবে নদী ও জলাধার নষ্ট করে ও অসঙ্গত শস্যের খেতি করে জলাভাবের জন্য বিলাপ অশোভন।
উত্তর ভারতের নদীসমস্যা গত সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে। তাদের ব্দনপুব্ধত্রব্ধনপ্স ব্জত্রব্ধন্দ্ব পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশি। নদীর অগভীরতার কারণে বর্ষাকালে বাঁধ উপচিয়ে প্লাবন আসে আবার অন্য ঋতুতে জলাভাব ঘটে। সুতরাং সেখানে প্রাথমিক কর্তব্য স্তুব্জত্রস্তুন্ধন্দ্ধ ও নদীর উভয় তীরে উৎস হতে বদ্বীপ পর্যন্ত সুপরিসর বনসৃষ্টি। এ সমস্ত জরুরি কাজ অবহেলিত হবে নদী-সংযোগের আড়ম্বরে।
এক কথায়, এই প্রকল্প অভূতপূর্ব অর্থব্যয়ে জাতিকে দেউলিয়া করার প্ল্যান, বহু সহস্র বৎসরের জন্য ভারতের উর্বর ভূমিকে ঊষর করার প্ল্যান, বহুবিধ প্রাণীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত করার প্ল্যান — ভারত ধবংসের প্ল্যান, অভিপ্রায়ে না হলেও বাস্তবত।
প্রাণীহিতে প্রকৃতির উদার দাক্ষিণ্য
এই রচনার প্রথম পর্বেই বলেছিলাম, ‘‘প্রাকৃতিক ব্যবস্থার মধ্যেই জীবনপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যথাযোগ্য সম্পদের আয়োজন আছে। প্রকৃতির নিয়ম পালন করে চললে সমাজে অনটনের কোনও সম্ভাবনা নেই। অবশ্য তাতে অতিপ্রাচুর্যের ব্যবস্থা নেই; তা থাকলে দায়িত্বজ্ঞানহীন ও বেহিসাবি খরচের অবকাশ থাকত।’’ এ কথার মধ্যে পৃথিবী বা তদন্তর্ভুক্ত কোনও ecosystem-এর carrying
capacity-র সীমাবদ্ধতার অস্বীকৃতি নেই। জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি ঘটলে—প্রাণী (animal) জগতের পিরামিডের শীর্ষদেশ অতি ভারাক্রান্ত হলে সব কিছু ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও স্থৈর্য নষ্ট হয়ে যাবে, এ সত্যেরও অস্বীকৃতি নেই। মানুষ apex
animal, তার জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি ঘটলে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম ‘‘inter-species
balance’’ বিঘ্নিত হবে। সে জন্যই তা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তবে দারিদ্র ও অপুষ্টি দূরীভূত হলে ও gender
equality প্রতিষ্ঠিত হলে মনুষ্যজনসংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই সীমিত হয়ে যাবে।
প্রকৃতির মধ্যে জীবনপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে কী বিস্ময়কর
আয়োজন ও সুষম বিধান আছে, তার সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেব। এই পরিচিতি থাকলে প্রকৃতিজয়ী বিজ্ঞানের কথা মনে কখনও স্থান পেত না।
পৃথিবী (The Earth) নামে আমাদের এই গ্রহ সৃষ্টির প্রথমকালে বায়ুমণ্ডলে carbon
dioxide ছিল অত্যধিক, oxygen ছিল না বিশেষ। ধীরে ধীরে CO2 শুষে নেওয়ার ও বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ছেড়ে দেওয়ার জন্য উদ্ভিদের জন্ম হল। অক্সিজেনের আবির্ভাবে অক্সিজেন-নির্ভর প্রাণীদের জন্ম সম্ভব হল। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ ও আত্মিক যোগাযোগের ভিত্তি পরিবর্ধিত হল carbon-oxygen-hydrogen
cycle-এ। সূর্যালোকের সাহায্যে উদ্ভিদের পাতাগুলি বায়ুমণ্ডল থেকে CO2 টেনে নিয়ে আপন মূল থেকে তুলে আনা জলের oxygen ও hydrogen উপাদানগুলি সংযুক্ত করে তৈরি করে স্তুব্জজস্কুড়ভ্তস্তুব্জত্রব্ধন্দ্ব প্লপ্সপুন্দ্বস্তুত্তপুন্দ্বব্দ, কয়েকটি প্রক্রিয়ায়। সেই carbohydrates প্রথমে উদ্ভিদ দেহে অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে ভোজ্য হিসাবে সব প্রাণীকে ছ্রুনস্থ্রপুগ্ন স্তুব্জজস্কু সরবরাহের উৎস হয়।
কার্বন ছাড়া কোনও জীবকোষ তৈরি হতে পারে না, এই কথা মনে রাখলে এই photosynthesis প্রক্রিয়ার গুরুত্ব বোঝা যাবে।
স্থলে যেমন মাটিভিত্তিক উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল থেকে CO2টেনে নিয়ে carbohydrates তৈরি করে, সমুদ্রের phytoplanktons সেইভাবে সমুদ্রজলে মিশে থাকা (dissolved) CO2টেনে নিয়ে চারপাশের জল থেকে পাওয়া oxygen,
hydrogen-এর সঙ্গে বিভিন্ন reaction প্রক্রিয়া মারফত carbohydrates তৈরি করে। সেখানে উৎপন্ন carbohydrates মাছ ও জলজ প্রাণীর দেহপুষ্টি করে; আর সমুদ্রোপরস্থিত বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেওয়া oxygen জলভাসি প্রাণীর শ্বাসের কাজে লাগে।

এই photosynthesis process আজও এক বিস্ময়; আর তৎসৃষ্ট chemical energy of carbon bonds আরও এক বিস্ময়। এই স্তুজস্কৃ এর অভিযান molecule থেকে molecules-য়ে জীবকোষ থেকে জীবকোষে; প্রাণী থেকে প্রাণীতে; প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ক্রমারোহী ধারায়। অবশেষে উদ্ভিদ ও প্রাণীর এবং তৎসহ decomposer জাতীয় প্রাণীর শ্বাসপ্রশ্বাস মারফত বায়ুমণ্ডলে carbon-এর প্রত্যাবর্তন carbondioxide রূপে।

উল্লেখ্য যে উপরি-উক্ত carbohydrates আবার sugar, starch, cellulose, lignin হিসাবে বিভক্ত হয়। তাদেরও ভিন্ন ভিন্ন কাজ আছে। সেই broken-down পদার্থসমূহের কাজের আলোচনা ছেড়ে দিয়ে এখানে শুধু এইটুকু বলা দরকার যে অন্য এক cycle থেকে নাইট্রোজেন এলে তবেই এই ব্দন্ত্তন্ধব্দ্জ-এ প্রাণসঞ্চার হয়। আর তখনই নাইট্রোজেন-উদ্বুদ্ধ শর্করা nucleic acid & protein -এর সংশ্লেষণে ছব্দস্তব্ধড়ন্দ্বব্দন্বগ্গ প্রবৃত্ত হতে পারে। Carbon-oxgen-hydrogen চক্র এইভাবে জীবনসৃষ্টি ও জীবনরক্ষা করে। তবে সেখানেও অন্য চক্র থেকে সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

এখন আসতে হয় ত্তন্দ্ধজস্সন্ধব্ধ চক্রে। এই ট্রস্তত্তপ্তন্দ্ব -এর ক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও বিস্ময়কর। মনে হয় প্রকৃতি যেন এখানে মূর্ত হয়ে উঠে প্রতিটি পদ নিজেই স্তন্দ্বব্দনন্ধ করছে, নিজেই পরিচালনা করছে। নাইট্রোজেন গ্যাস বায়ুমণ্ডলের ৭৮ ভাগ জুড়ে আছে। এই গ্যাস বড় অলস ও অ-মিশুক। অন্যের সঙ্গে সহজে জ্বন্দ্ব্রস্তব্ধ করতে চায় না। অথচ বায়ুস্তর থেকে একে নীচে না নামালে nucleic acids , proteins -এর সংশ্লেষণ হবে না। ফলে কোনও living tissues তৈরি হবে না। তাকে ভূমিস্তরে আনার জন্য প্রকৃতির কত রকম ব্যবস্থা! বজ্রনির্ঘোষে, বিদ্যুৎস্পর্শে photochemical reaction ঘটিয়ে তাকে নামিয়ে দিতে হয় ভূমিস্তরের দিকে। চন্সব্দন্মাড়ন্দ্বজন্দ্ব-এ ন্দ্ধজস্সন্ধব্ধ পৌঁছালে প্তন্দ্বন্ধত্তপ্রন্স্সত্তব্দ জাতীয় ছোট ছোট গাছ ও তৃণগুল্মের মূলস্থিত স্সস্তত্তপ্তন্দ্ব-এ যেব্রস্তব্ধন্দ্বজন্দ্র থাকে, তারাই তাকে টেনে নিয়ে মাটিতে প্রোথিত ছন্দ্রন্প্রগ্ন করে। ক্ষুদ্রব্রস্তব্ধন্দ্বজন্দ্র-র এ এক অভাবিত শক্তি!

তবুও শুধুমাত্র স্সস্তত্তপ্তব্ধন্দ্বস্তব্রস্তব্ধন্দ্বজন্দ্র-র উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর না করে প্রকৃতি কয়েক প্রকার ন্দ্রন্দ্বজ্ঞব্রপ্তন্ধন্দ্ব (শ্যাওলার জাত) ও কিছু ন্দ্রজন্দ্বন্দ্ব-প্তন্নন্দ্ধ (অর্থাৎ স্সস্তত্তপ্তন্দ্ব বহির্ভূত) ব্রস্তব্ধন্দ্বজন্দ্র কেও — যথাব্রপ্রস্সব্ধস্ত্রস্তব্ধন্দ্বজ, ত্তপ্তস্সব্দব্ধজনস্তন্ত্তপ্প প্রভৃতিকেও এই একই শক্তি দিয়ে রেখেছে। আবার বিভিন্ন গাছপালা, তৃণগুল্ম ও প্রাণীদের মৃতদেহ পচনের সময় স্তন্দ্বত্তস্সপ্রন্মস্সব্দন্দ্বজ জাতীয় বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী (micro-organisms) ওই সব দেহের অন্য উপাদান থেকে nitrogen -কে পৃথক করে mineral nitrogen -এ পরিণত করে। তার পরের অধ্যায়ে শুরু হয় ন্দ্ধজস্সন্ধব্ধ কে মাটির সঙ্গে আবদ্ধছস্তব্ধত্তস্তগ্ন অবস্থা থেকে মুক্ত করে তাকে গাছপালার ব্যবহারযোগ্য করে তোলা।

মাটিতে ন্দ্রনপ্রন্দ্বস্ত অবস্থা থেকে ন্দ্ধজস্সন্ধব্ধ কে এক ধাপে মুক্ত হওয়ার উপায় প্রকৃতি দেয়নি। কিছু ন্দ্ধজস্সন্ধব্ধ মুক্তি পায়ব্রপ্পপ্প স্সন্দ্র হিসাবে; ন্দ্ধজস্সন্ধব্ধ-এর অপর অংশকে মুক্তি পেতে হয় ধাপে ধাপে, প্রথমে ন্দ্ধজন্দ্বন্দ্ব রূপে। পরে ন্দ্ধজব্রব্ধন্দ্ব রূপে। সব রকমের মুক্তি ঘটে ব্দস্সনপ্ত প্পনস্তজস্সন্ধব্দ-এর মাধ্যমে। বলে রাখা ভাল যে, যে-নাইট্রোজেন মাটি থেকেব্রপ্পপ্পস্সন্দ্র হিসাবে মুক্তি পায়, তা-ও পরে nitrate এ পরিণত হয়ে protein তৈরি করে। সেখানেব্রপ্পপ্পস্সন্দ্র ব্ধস্স ন্দ্ধজব্রব্ধন্দ্ব ব্ধস্স ন্মজস্সব্ধন্দ্বন্দ ব্ধস্সব্রপ্পপ্পস্সন্দ্র র এক ছোট চক্র বৃহত্তর ন্দ্ধজস্সন্ধব্ধ ত্তস্তত্তপ্তন্দ্ব এর মধ্যে কাজ করে।

প্রকৃতির কাজের ধারা বোঝার উপর বারে বারে গুরুত্ব দিয়েছি। বুঝতে হবে প্রকৃতি কেন বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাসকে নিষ্ক্রিয় থাকার ব্যবস্থা করেছে। নাইট্রোজেন যদি সক্রিয় অর্থাৎ সহজে জ্বন্দ্ব্রস্তব্ধনস্স -উন্মুখী হত, তা হলে কি ঘটত? বন্দি নাইট্রোজেনকে মাটি থেকে ধাপে ধাপে মুক্তি না দিয়ে যদি এক সঙ্গে মুক্তি দেওয়া হত, তা হলে কী ঘটত? বিভিন্ন রূপেই বা বন্দি ন্দ্ধজস্সন্ধব্ধ কে মুক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা হল কেন?

প্রথমত, প্রকৃতি যদি বায়ুমণ্ডলের ন্দ্ধজস্সন্ধব্ধ ন্ধব্দ -কে নিষ্ক্রিয় থাকার ব্যবস্থা না করত, যদি তা সহজেই অন্যের সঙ্গে মিলিত হতে পারত, আর তাকে সহজেই ত্তস্সব্দন্মাড়ন্দ্বজন্দ্ব-এ স্তন্মাব্ধত্তজন্দ্ব করা যেত, তা হলে সারা পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে যেত আর সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ন্দ্ধজস্সত্তব্দ স্সপ্রনস্তন্দ্বব্দ তৈরি হত, যে স্সপ্রনস্তন্দ্ব-গুলি স্সব্রস্সন্দ্ব স্তরকে সৃষ্টির প্রথম যুগেই ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। বায়ুমণ্ডলে প্রচুর যে ন্দ্ধজস্সন্ধব্ধ, তা সক্রিয় হলে বহু প্রকারের ন্মজস্সব্ধন্দ্বন্দ্ব তৈরি করত, যা সমস্ত জীবজন্তু ও উদ্ভিদের পক্ষে ব্ধস্সপ্রনস্ত হয়ে উঠত। পৃথিবীতে জীবনকে স্থায়িত্ব দিয়েছে সজীব ও নির্জীব প্পব্ধব্ধন্দ্বজ-এর যে মিথস্ক্রিয়া ছন্দ্ব্ধন্দ্বজ্ব্রস্তব্ধনস্সগ্ন, সেই নন্দ্ব্ধন্দ্বজ্ব্রস্তব্ধনস্স-এর ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে যেত।

দ্বিতীয়ত, নাইট্রোজেন যদি মাটি থেকে এক ধাপেই ন্দ্ধজব্রব্ধন্দ্ব হিসাবে মুক্তি পেত, তা হলেও বিষে ভরে যেত। বিভিন্ন শক্তি মাটির রসে ছব্দস্সনপ্ত ব্দ্রন্মগ্ন যে পরিমাণে ব্দত্তন্ধব্রজব্দ, ন্দ্ধব্রস্তপ্রন্দ্বব্দ জন্দ্বপ্তন্দ্ব্রব্দন্দ্ব করছে, তার তুলনায়—অর্থাৎ আনুপতিকভাবে—বেশি পরিমাণে ন্দ্ধজব্রব্ধন্দ্বব্দ জন্দ্বপ্তন্দ্ব্রব্দন্দ্বস্ত হয়ে আসত। সেই ন্দ্ধজব্রব্ধন্দ্ব-কে ন্মপ্তন্দ্ব্ধব্দব্রব্ধস্সজক্র করতে পারত না। তাতে ন্মপ্তন্দ্ব পুষ্টির কাজ তো হতই না, বরং উল্টা ফল ফলত। মাটি থেকে সেই ন্দ্ধজব্রব্ধন্দ্ব প্তন্দ্বত্তড়ন্দ্বস্ত স্সত্তব্ধ হয়ে যেত। ভূগর্ভস্থ জলস্তরে চলে গিয়ে

ন্ধজপ্সক্তস্তভ্রন্ধন্দ্বজ বিষাক্ত করত, নতুবা খালে-বিলে চলে গিয়ে ল্প্পন্ধজ্জন্ধন্দ্ব ন্মাপ্সনন্দপ্সন্দন্ধ ঘটাত।
প্রকৃতির বিধানে নাইট্রোজেন শেষ পর্যায়ে ল্প্পন্ধজ্জন্ধন্দ্ব নপ্সক্ক হিসাবে মুক্তি পায় যাতে ন্মাপ্তুন্ধ জপ্সপ্সন্ধ ড্ডুনজন্দ তাকে টেনে নিয়ে আত্মস্থ করতে পারে। ত্মপ্সপ্সন্ধ ড্ডুনজন্দ টেনে নিতে পারে শুধু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অদৃশ্য ন্মত্রজন্ধনন্তপ্তন্দ্বন্দ-কে, যারা ন্দপ্তন্দ্বন্তন্ধজনন্তপ্তপ্তন্ত ন্তড্রুজন্ধন্দন্ত. এইভাবে ন্তড্রুজন্ধন্দন্ত না হলে জপ্সপ্সন্ধ ন্তন্দপ্তপ্তন্দ-এ প্রবেশ করার মতো ন্দন্দ্বজন্ধন্দ্বন্ধনন্তন্দ (শক্তি) যে তাদের থাকবে না। মাটিতে ল্প্পন্ধজপ্সন্ধন্দ ন্দ্রনপ্রন্ধনপ্সক্ক-এর পরে এই দ্বি-ধাপ মুক্তিকে বলে ল্প্পন্ধজনন্দ্রনন্ত্রন্ধনপ্সক্ক. এই কাজের জন্য নিযুক্ত ভ্রন্তন্ধন্দ্ব জন্দ্র -দের বলা হয় ল্প্পন্ধজনন্দ্রক্তন্দ্বত্রন্তন্ধন্দ্বজন্দ্র.
তারপরে আরও কথা আছে। এত কড়াকড়ি ব্যবস্থা সত্ত্বেও যদি কোনও কারণে মাটিস্তরে ল্প্পন্ধজ্জন্ধন্দ্ব-এর পরিমাণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকত, তা হলে বিষ ছড়িয়ে পড়ত, মাটিওভ্রন্তনস্তনন্ত হয়ে যেত। তাই সেই ন্মাপ্তুন্ধ -এর অব্যবহার্য ল্প্পন্ধজ্জন্ধন্দ্ব -কে প্লপ্সপ্তন্দ্বন্ত ত্তপ্ত্রজ ল্প্পন্ধজপ্সন্ধন্দ-এ রূপান্তরিত করে বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রকৃতি সেই কাজটি দিয়েছে স্তন্দ্বনন্ধজনন্দ্রক্তন্দ ন্ধত্রন্তন্ধন্দ্বজন্দ্র-র উপর।
যেখানে নাইট্রোজেন সম্বন্ধে এত কারণে প্রকৃতির এত বেশি কড়াকড়ি, সেখানে যখন কোনও বিজ্ঞানীকে বলতে শোনা যায়, ''যদি নাইট্রোজেন তৈরি করে ভরিয়ে দিতে পারতাম, তা হলে কতই না ভাল হত'', তখন বুঝতে বাকি থাকে না বিজ্ঞান কীভাবে অ-বিজ্ঞান হয়ে যায়। তবে এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায়, আমরা যদি প্রকৃতির বিধান বুঝে দেশে আরও বেশি ন্তপ্সপ্লন্মাপ্সন্দন্ধ সার তৈরি করতাম, স্তুন্তন্দ্ব ন্ধজন্দন্দ্বত্রপ্তন্ধন্দ্ব ওত্রপ্সপ্তপ্ত ন্মান্দ্রন্ধ ন্দ্রন্দ্বজ -এর চাষ করতে পারতাম, প্তন্দ্বন্ধত্তপ্লন্দপ্সত্তন্দ ন্মাপ্তুন্ধন্দ চাষে উৎসাহ দিতাম, বহু প্রকারে লভ্য প্সজন্ধনন্ত সার ব্যবহার করতাম, তা হলে দেশ জুড়ে সুষমভাবে ল্প্পন্ধজপ্সন্ধন্দ ন্দ্রনপ্রন্ধনপ্সক্ক-এর ব্যবস্থা হতে পারত। (প্রকৃতির বিধান না মেনে ফ্যাক্টরিতে তৈরি ন্দ্রন্দ্বজন্ধনপ্তনন্দন্দ্বজ — যার ব্যবহারে এত ন্ধন্দ্রন্দ্বন্ধন্ত্রজন্ত কখনও থাকতে পারে না তা যে কী সর্বনাশ করেছে, সে আলোচনা ভবিষ্যতে করা যাবে।)
ফসফরাস সম্বন্ধে প্রকৃতির ব্যবস্থা অন্য রকম। ফসফরাস বড় মিশুক, বড় জন্দ্বন্তন্ধনন্দ. তাই বায়ুমণ্ডলে তার প্রবেশের অনুমতি নেই — শুধু স্তুন্তন্দন্ধ রূপে ছাড়া। ত্মপ্সন্তপ্স ন্মাড়প্সন্দন্মাড্রুন্ধন্দ্ব স্তন্দ্বন্মাপ্সন্দনন্ধন্দ স্থানে স্থানে আছে। মাটিতে যা প্সজন্ধনন্ত ন্মাড়প্সন্দন্মাড়প্স জপ্সত্তন্দ আছে, তাকে অবক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য ন্মাড়প্সন্দন্মাড্রুন্ধন্দ্ব ন্ধপ্তন্দ এর স্থায়ী রূপ দিয়ে মাটির সঙ্গে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা আছে। সে দায়িত্ব পালন করে ন্মাড়প্সন্দন্মাড্রুন্ধনন্দন্দন্ধত্রন্তন্ধন্দ্বজন্দ্র. তারপর বৃষ্টি শুরু হলে সেই ন্মাড়প্সন্দন্মাড্রুন্ধন্দ্ব -কে দ্রবীভূত করে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নপ্সক্ক -এ পরিণত করা হয়। এ কাজ করে ন্মাড়প্সন্দন্মাড্রুন্ধপ্সন্ধত্রন্তন্ধন্দ্বজ এবং অনুরূপ ন্দপ্সনপ্ত প্লনন্তজপ্স-প্সজন্ত্র ল্প্পন্দপ্লন্দ। তারা ন্দন্দ্রন্তপ্লন্দ নিঃসৃত করে এই কাজ সম্পন্ন করে। ঝাড়ুদার যেমন জঞ্জাল একত্র করে, তেমনই এই সব ন্দপ্সনপ্ত প্লনন্ত জপ্স-প্সজন্ধনন্দপ্লন্দ উদ্ভিদের চারিধারের ন্মাড়প্সন্দন্মাড্রুন্ধন্দ্বন্দ একত্র করে।
প্রকৃতির আর এক আশ্চর্য দান প্লন্তন্তপ্সজজড়নন্ত্রপ্ত ন্দ্রক্তন্ধন। যখনই মাটিতে ল্প্পন্ধজপ্সন্ধন্দ, ন্মাড়প্সন্দন্মাড্রুন্ধন্দ্ব বা অন্য কোনও ন্তন্ধজ নন্দন্দন্ধন্দ -এর অভাব ঘটে, যার ফলে নির্দিষ্ট মাটিতে বেড়ে ওঠার হকদার গাছ পুষ্টিলাভ করতে পারছে না, তখনই মাটির নীচে প্লন্ধ -এর মতো বিছানো এই প্লন্তন্তপ্সজজড়নন্ত্রপ্ত ন্দ্রক্তন্ধন এক অদ্ভুত কর্মকাণ্ডে মেতে ওঠে। তারা অতি সূক্ষ্ম সূতার মতো। এরা গিয়ে ন্মাপ্তুন্ধ ন্তন্দপ্তপ্তন্দ আক্রমণ করে আত্মবিলুপ্তির জন্য। সেখানে জপ্সপ্সন্ধ ন্তন্দপ্তপ্ত গুলি তাদের টেনে নিয়ে আত্মস্থ করে নেয়। ত্তন্ধ জনন্দন্ধন্দ -এর অভাব ঘুচে যায়। তারা এই কাজ করে কারণ উদ্ভিদের সঙ্গে এদের ভাগ্য জড়িত। উদ্ভিদ থেকে এরা ন্তজন্মাড়ন্তন্ত জ্জন্ধন্দ্ব গ্রহণ করে কিন্তু বিশেষ কোনও কোনও ন্তন্ধজনন্দন্ধন্দ-এর অভাবে যদি উদ্ভিদ গড়ে উঠতে না পারে, তা হলে তারাও ন্তজত্ব প্সড়ন্তন্তজ্জন্ধন্দ্ব থেকে বঞ্চিত হয়। মজার কথা, ন্মাজপ্সন্ধন্দ্বন্দ ন্দন্তন্ধড়ন্দ্বন্দনন্দ-এর জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থ— ল্প্পন্ধজপ্সন্ধন্দ, ন্মাড়প্সন্দ ন্মাড্রুন্ধন্দ্বন্দ প্রভৃতি পদার্থ যদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, সেখানে কিন্তু প্লন্তন্তপ্সজজড়নন্ত্রপ্ত ন্দ্রক্তন্ধন বাড়তে পারে না। এইভাবে শুধু ন্তন্ধজনন্দন্ধন্ধ অভাবগ্রস্ত জায়গাতেই প্রকৃতি এদের বিকাশের ব্যবস্থা করে রেখেছে।
প্রকৃতির ব্যবস্থায় যেমন গাছের পাতার মাধ্যমে একটা গড়ে তোলার ছন্তুনপ্তস্তন্দন্ধ ত্তন্মাগ্ন ন্মাজপ্সন্তন্দ্বন্দন্দ আছে — যার ফলে ট্রজত্ব প্সড়ন্তন্তজ্জন্ধন্দ্বন্দ, ন্মাজপ্সন্ধন্দন্দ, ন্দ্রন্ধন্দ ইত্যাদি এবং গাছের কাঠামো গড়ে ওঠে—তেমনি উল্টা এক ন্মাজপ্সন্তন্দ্বন্দন্দ-ও আছে। তাকে বলে স্কুন্দ্বপ্সন্দন্ধ স্তুপ্সভ্র ন্মাজপ্সন্তন্দ্বন্দন্দ। এর ফলে জৈব পদার্থকে ভেঙে অ-জৈবিক অবস্থায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্লনন্দ্বজ্জপ্ত ন্ধপ্তন্ধন্দ -এ পরিণত করা হয়। তুড়প্সন্দন্মাড়প্সজপ্সত্তন্দ, ন্মাপ্সন্ধন্দন্দনত্তপ্ল, ন্তপ্তন্তনত্তপ্ল, প্লন্ধন্দ্বন্দন্দ, ন্দপ্সন্তনত্তপ্ল, নজপ্সক্ক, প্লন্ধন্দ্বন্দনত্তপ্ল, স্ত্রন্দন্ত, ন্তপ্সন্মান্দ্বজ, স্তাজপ্সক্ক প্রভৃতি রূপে তারা সঞ্চিত থাকে, যাতে পরে তাদের নপ্সনন্দন্ত অবস্থায় রূপান্তর ঘটিয়ে ন্মাপ্তুন্ধ জপ্সপ্সন্ধ ড্ডুনজন্দ টেনে নিয়ে আত্মস্থ করতে পারে। এই বিভিন্ন ন্ধপ্তন্ধ -এর বেশ কিছু অংশ ভবিষ্যতে কাজে লাগার জন্য মাটির তলায় সঞ্চিত থাকে। অতি হীন ছন্মাপ্সপ্সজন্দ্বন্দন্ধ প্সন্দ্র ন্ধড়ন্দ্ব ন্মাপ্সপ্সজগ্ন ন্ধপ্সন্মান্দপ্সনপ্ত -এর নীচেও এই জন্দ্বন্দন্দ্বজ্জন্দ্বন্দ থাকে, যাকে ব্যবহার করতে হয় গভীরে শিকড় পাঠাতে দক্ষ গাছপালার সাহায্যে। তা ছাড়া ন্দ্বজন্ধড়ভ্রপ্সজপ্লন্দ এর মতো প্রাণী আছে, যারা মাটিকে উর্বর করে। দন্দ্বজপ্লনন্তন্দন্ধ অতি সমৃদ্ধ জৈব সার। কৃষিকে ন্তড়ন্দ্বপ্লনন্তপ্তনন্ধন্ধনপ্সক্ক -এর পথে নিয়ে যাওয়ার পর সাধারণ মানুষ যখন দেখতে পেল যে বহু দিক দিয়ে সর্বনাশ ঘটছে, তখন জৈব কৃষিতে ফিরে এসে ন্দ্বজপ্লনন্তন্দন্ধনন্দন্ধ-এর সাহায্যে (কেঁচোর তৈরি মাটির ছাঁচ) অনেক বেশি ফসল পেতে শুধু করছে।
এই প্রাকৃতিক পথে গেলে ''ওজন্দ্বন্দ ন্তপ্সক্তন্ধন্দ্বজ-জন্দ্বপ্সপ্তন্তন্ধনপ্সন্দ'' এর পথে যেতে হত না। আজও ন্ধন্দন্দ্বন্ধনন্ত ন্দন্ধন্দন্দ্বন্দ্বজ

ন্দ্ধএর পথে যাওয়ার কোনও প্রয়োজনই নেই।

প্রকৃতির কর্মকান্ড চলে বৈচিত্রের মাধ্যমে। জড় ও জীবজগৎ—অর্থাৎ জড় পরিবেশ এবং উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানুষ নিয়েই এই বৈচিত্র। তাদের মধ্যে এবং সেইসঙ্গে সৌরশক্তির সঙ্গেও এদের প্রতি অংশের নিত্য আদানপ্রদান। আর প্রকৃতির কর্মনীতি ত্মন্দ্বস্তুস্তুপ্তন্দ্ধ, ত্রস্তুপ্সন্ত্বপ্সব্দন্ব ওক্রব্ধনন্ত্বপ্সব্দন্ব—এই তিন নীতির আশ্রয়ী। তাই যাঁরা নিজেদের জড়পরিবেশ ও আঞ্চলিক উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের সম্পদকে রক্ষা করেন এবং প্রকৃতির উক্ত ত্রয়ী নীতির সার্থক প্রয়োগে সক্ষম হন, তাঁরাই দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধির শিখরে যেতে পারেন। এর মধ্যে শুধু একটি দিক নিয়ে ১৯৯৬ সালে গোয়ার বড়ন্দ প্সব্ধড়ন্দ্বজ ঢস্তুন্দ্র চস্পস্প্স ত্রব্ধপ্সজন্দ 'বড়ন্দ প্সজন্ধক্লন্ত্ত থ্রজপ্লন্দ্ধ ত্রপ্সত্তজস্তুন্দ চস্পস্প্স' নামে একটি বই প্রকাশ করেছিল। তারপরে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণ আরও চমকপ্রদ। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইল।

ডারউইনের একদেশদর্শিতা ও খণ্ডিত বিজ্ঞানের উৎপত্তি

এই ধারাবাহিক সন্দর্ভ পাঠকদের কাছ থেকে যে সমাদর পাচ্ছে, তা আমাকে গভীর প্রেরণা দিয়েছে। তবে আমার সুপরিচিত একজন ''মার্ক্সবাদী''ত্রস্তব্ধন্নন্দব্ধ আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে সমালোচনা পাঠিয়ে এক মৌলিক দিক আলোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। প্রারম্ভে (৬১ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যায়) ''পরিবেশ বিজ্ঞান উন্নত সভ্যতা স্থাপনের দিগ্‌দর্শন'' শিরোনামায় মার্কস, লেনিন ও মাও-সে-তুং-এর দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার আলোচনা করে লিখেছিলাম ''সহজাত প্রকৃতিসম্পদের মধ্যে যে সব গুণ আছে .... তাতে বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু সংখ্যায় বিকেন্দ্রিক/ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা যায় যার দূষণ সামান্য, পরিবেশবিজ্ঞান থেকে আসে। মহামনীষী কার্ল মার্কস প্রকৃতির এই গুণের সন্ধান পাননি। তাই বিশাল শিল্পগঠনে তাঁর সম্মতি ছিল আর কেবল জাতীয়করণের মধ্যে সমস্যার সমাধান ও শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি খুঁজেছিলেন। ...... জাতীয়করণের নামে রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা সমর্পণের ফরমুলা হয়েছিল তাঁর একমাত্র সম্বল, যার বিষময় পরিণতি পরে প্রত্যক্ষ হয়েছিল।'' সমালোচক বন্ধু লিখেছেন, ''আপনার কথা মানতে গেলে তো ডারউইনকে অস্বীকার করতে হয়।'' প্রথমে কথাটা আমার বুঝতে কষ্ট হয়েছিল। ডারউইনকে অস্বীকৃতির কথা আবার কোথা থেকে এল? পরে উপলব্ধি করলাম, ডারউইন-পাঠে প্রকৃতিকে রুক্ষ, কঠোর ও জীবজগতের প্রতিকূল মনে হতে পারে। ১৯৪০ সালে যখন আমি প্রথম কমিউনিস্ট পার্টির জন্দ্বস্তুজত্তন্দ্ধ হতে চলেছিলাম, তখন আমাকে বলা হয়েছিল : ভ্রড্রব্ধ প্পু ড্রব্দ প্পুস্তন্দ প্সন্দ প্পু .. শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রাম যখন শেষ হয়ে যাবে, তারপর থেকে চলতে থাকবে শুধু প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম। প্রকৃতি নির্মম, নিষ্ঠুর এই ছবি আঁকা হয়েছিল। আমার প্রবন্ধে বিপরীত কথা—প্রকৃতির মধ্যে আছে প্তনন্দ্রন্দ-ব্দত্তস্মাম্প্সজব্ধ ব্দস্তব্দব্ধন্দপ্প, আছে মিতাচারী জীবনযাত্রার সব উপাদান বৈষম্যহীন বন্টনের মাধ্যমে।

ডারউইন তত্ত্বে জীব বনাম প্রকৃতির অবধারিত প্রতিকূল সম্পর্কের কথা ছিল না। প্রাণীজগতের সমস্ত ব্দম্মান্দ্বস্তুনন্দ্বব্দ এর মধ্যে প্রতিযোগিতার কথা ছিল। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য ব্দম্মান্দ্বস্তুনন্দ্বব্দ-দের মধ্যে সে প্রতিযোগিতা।

ইতিহাসে ডারউইনের স্থান থাকবে এক বিশেষ কারণে। ''ঈশ্বর প্রতিটি ব্দম্মান্দ্বস্তুনন্দ্বব্দ কে পৃথক মনোযোগ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন'', প্রচলিত এই ধারণাকে তিনি উল্টে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, উত্তরে ত্নন্দব্ধন্দ্বজ ন্জপ্সম্মাপ্সব্ধপ্সন্দ (যিনি রাশিয়ান অভিজাতবংশজাত হয়েও চাষিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, সে জন্য দেশে বিদেশে জেল খেটেছেন এবং নিজের ত্নজন্স্তুন্দ উপাধি ত্যাগ করেছিলেন) বহু উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে বিবর্তনে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা উভয়ের ভূমিকা ছিল কিন্তু সহযোগিতার ভূমিকাই ছিল সমধিক। আজ পর্যন্ত কেউ ন্জপ্সম্মাপ্সব্ধপ্সন্দ কে ভুল প্রতিপন্ন করতে পারেননি। সে জন্য সর্বব্যাপী ও সর্বনিয়ামক প্রতিযোগিতার দর্শনকে সঠিক বলে মেনে নেওয়া যায় না।

স্বার্থসাধনাই আত্মরক্ষার মূলমন্ত্র, এ বক্তব্য ডারউইন তত্ত্বের একটি স্তম্ভ। ডারউইন নিজেই ১৮৫৯ সালে বলেছিলেন, ''আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, নিজের জীবনের ঝুঁকি আছে জেনেও যদি কোনও ব্দম্মান্দ্বস্তুনন্দ্বব্দ স্রেফ পরার্থপরতার প্রেরণায় চালিত হচ্ছে, এমন একটি ব্দম্মান্দ্বস্তুনন্দ্বব্দ -ও যদি পাওয়া যায়, তা হলে আমার থিওরি বাতিল বলে পরিগণিত হবে।''

ছত্ত্বব্ধত্তজ্রপ্ত ত্রন্দ্বপ্তন্দ্বস্তব্ধনপ্স স্তুস্পব্ধ স্মাপ্সব্দব্দনস্তুন্তু স্মাজপ্সস্তুত্তস্তুন্দক্রস্তু প্পপ্সস্তুন্দ্রনস্তব্ধনপ্স ন্দ্র ব্দম্মান্দ্বস্তুনন্দ্বব্দ ন্দপ্রস্তুপ্তত্তব্দন্নন্দপ্তস্তু ন্দ্রপ্সজ ব্ধড়ন্দ হ্মপ্সপ্সস্তু প্সন্দ্রক্সপ্সব্ধড়ন্দ্বজ ব্দম্মান্দ্বস্তুনন্দ্বব্দ, ব্ধড়প্সত্ত্বহ্মড় ব্ধড়জপ্সত্ত্বহ্মড়প্সত্ত্বব্ধ ত্ত্বব্ধত্তজন্দ প্সন্দ ব্দম্মান্দ্বস্তুনন্দ্বব্দ ন্দ্বস্তুন্দ্বব্দব্দ্র জনপ্তস্তু ব্ধপ্সন্দ্বব্দত্রস্তুব্ধব্দ্ধন্দ প্সন্দ্রক্রস্তু স্মাজপ্সন্দ্রনব্ধব্দ স্তু ব্ধড়ন্দ ব্দব্ধজত্ত্বস্তুব্ধত্তজন্দ প্সন্দ্র প্সব্ধড়ন্দ্বজব্দ ..... ঢন্দ্র নব্ধ স্তুপ্সত্তপ্তস্তু ন্দ্ধ স্মাজ স্পুন্দ্বস্তু ব্ধড়ব্ধ ব্ধড়ন্দ ব্দব্ধজত্ত্বস্তুব্ধত্তজন্দ প্সন্দ্রক্রস্তু প্সন্দ ব্দম্মান্দ্বস্তুনন্দ্বব্দ ড্রস্তু হ্মন্দ্ধ ন্দ্রপ্সজপ্লন্দ্বস্তু ন্দ্রপ্সজ ব্ধড়ন্দ ন্দপ্রস্তুপ্তত্তব্দন্নন্দ হ্মপ্সপ্স স্তু প্সন্দ্রক্সপ্সব্ধড়ন্দ্বজ ব্দম্মান্দ্বস্তুনন্দ্বব্দ, নব্ধ ভ্রপ্সত্তপ্তস্তুক্রন্দড়নপ্তব্ধন্দ প্পস্তু ব্ধড়ন্দপ্সজস্তু ন্দ্রপ্সজ ব্দত্তস্তুড় স্তুপ্সত্তপ্তস্তু স্পব্ধ ড্রন্দ হ্মন্দ্ধ স্মাজ প্সস্তুত্তস্তুন্দ্বস্তু স্তুব্ধত্তজ্রপ্ত ব্দন্দ্বপ্তন্দ্বস্তব্ধনপ্স.'গ্ন আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ় তাঁর এই উক্তির ফলে বহু বিজ্ঞানীই আজ তাঁর ত্রব্ধত্তজ্রপ্ত ব্দন্দ্বপ্তন্দ্বস্তু ব্ধনপ্স ব্ধড়ন্দ্বপ্সজস্তু বাতিল করে দিচ্ছেন কারণ জীববিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করেছেন ''পরোপকারে আপন সার্থকতা'' নীতির অনুশীলন করেই বেঁচে আছে, এমন কতিপয় প্রাণী। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ত্রস্তুজনস্মাম্মাব্দ ঢন্দব্ধনব্ধত্তব্ধন্দ প্সন্দ্র থস্তুন্দ্রপ্সন্ধক্স্মাড় স্তুর বিজ্ঞানী ট্রপ্সভ্রস্তু স্মনপ্পব্ধহ্মড় এরূপ কয়েকটি ব্দম্মান্দ্বস্তুনন্দ্বব্দ এর বিবরণ দিয়েছেন। স্মপ্সভ্রন্দ্বজ ট্রপ্তনন্দ্রপ্সজন্দ্র র হ্মপ্সপ্তস্তুন্দ্ধ প্স ন্দ্বপ্তস্মা স্মান্দ্বজস্তুড়, ত্নন্দ্ধস্তুন্দ্বজব্দন্দক্সব্দ ব্দড়জ্জনপ্পস্মা. একজাতীয় মাকড়সা এবং স্ত্র ত্রন্দ্বপ্সজনব্ধ নামক এক প্রাণীর মধ্যে তিনি এই প্রকার ঝুঁকি নিয়েও পরোপকারী ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছেন। লক্ষ লক্ষ ব্দম্মান্দ্বস্তুনন্দ্বব্দ -এর মধ্যে মাত্র এই কয়েকটি ব্যতিক্রম নয়।

এ শুধু এক জায়গায় এক বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধানে প্রাপ্ত কয়েকটি ব্দন্মান্দন্তুনন্দব্দ -এর তালিকা।

পূর্বেই বলা হয়েছে বিবর্তনতত্ত্বের মূল কথা ছিল, প্রকৃতির অনুগ্রহ সেই সব জ্জন্তুন্দ পায়, যারা স্বতন্ত্র গুণের অধিকারী আর সেই স্ব তন্ত্র গুণগুলি তারা পায় উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যে। ডারউইনপন্থীরা ত্তন্দুস্তুন্দপুক্ষ ন্ধন্দুন্দব্ধনন্তুব্দ ভালভাবে মেনে নেওয়ার ফলে ড়ন্দজন্দস্তুনব্ধজন্তু বৈশিষ্ট্যের উৎস দাঁড়াল ন্ধন্দুস্পপ্নন্দঅর্থাৎ ব্ধস্পব্ধপুনব্ধস্তু স্পন্দ্র ন্ধন্দুন্দব্দ, তা হলে ডারউইন তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যাপারটা দাঁড়াল প্রাণী ছব্দন্মন্দন্তুনন্দব্দ বা জ্জন্তুন্দগ্ন প্রকৃতির অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয় শুধু ন্ধন্দুস্পপ্নন্দ-এর গুণে। এতে পরিবেশের প্রভাব নেই, স্তুস্তুপুব্ধস্তুজ্জপ্ত ত্তন্মাজ্ঞন্দন্ধন্দ্ধ-এর কোনও দান নেই। গুন্দুন্দ-ই সর্বনিয়ামক।

উল্লেখ্য যে, ডারউইনের পূর্বে গ্নন্দ্ধ ত্রন্মাব্ধনব্দব্ধন্দ ন্তুপ্পজন্তুন্স নামক এক ফরাসি প্রাণীবিজ্ঞানী ছন্ত্রস্পস্পপ্তস্পন্ধন্দব্দব্ধগ্ন ঠিক উল্টো কথা বলেছিলেন। ডারউইনের বক্তব্য ছিল, ন্দন্দ্রস্পজপ্পব্ধনক্ষ অর্থাৎ নির্দেশ সব সময় প্রবাহিত হয় ভিতর থেকে বাহির অভিমুখে। মেন্ডেলীয় পরিভাষায় ডারউইনের বক্তব্য দাঁড়াল, ন্তুস্তুপুন্দনন্তুব্রন্তুনস্তু থেকে নির্দেশ যায় ন্মাজস্পব্ধন্দন্দব্দ-এ, তারপর সমগ্র দেহযন্ত্রে এবং আরও বাহিরে। লামার্ক বলেছিলেন, নির্দিষ্ট পরিবেশে বাস করতে গিয়ে প্রাণী কিছু অভাব বোধ করে এবং সেই অভাব পূরণের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকে। পরিবেশপ্রেক্ষিত একটানা ক্রিয়াকর্ম সুদীর্ঘকাল ও বহু প্রজন্ম ধরে চলতে থাকলে প্রাণীর মধ্যে এক প্রবণতা জন্মে এবং তার অবয়বেও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটতে থাকে—প্রথমটা অবশ্য অলক্ষে, পরে দৃশ্যত। ফলে তার সন্তানসন্ততির মধ্যে অবয়বী ও ব্যবহারিক পরিবর্তন সঞ্চারিত হয়। লামার্কের এই তত্ত্ব ন্দড়ন্দজনব্ধস্তুন্দ স্পন্দ্রন্তুস্তুনজন্দস্তু স্তুড্রব্জন্তুব্ধন্দ জনব্দব্ধনস্তুব্দ নামে পরিচিত। লামার্কের মতে ব্রজন্ত্রব্ধনক্ষ এর নির্দেশ আসে বাহির থেকে ভিতরে—পরিবেশ থেকে, স্তুস্তুপুব্ধস্তুজ্জপ্ত ত্তন্মাজ্ঞন্দন্ধন্দ্ধ জনিত প্রেরণাশক্তি থেকে—প্রাণীর অন্তর্নিহিত জীবনীশক্তিতে। লামার্ক কখনও প্রাণীকে— তার মধ্যে মানুষকেও—ন্ধন্দুন্দ নিয়ন্ত্রিত বস্তু বানিয়ে ছাড়েননি, যা ডারউইন-ভক্তরা করছেন। লামার্ক প্রাণীর কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে বর্তমান লেখকের ধারণা ব্রজন্ত্রব্ধনক্ষ -এর নির্দেশ একটি ব্ধভ্রস্প-ভ্রুস্তু ন্মাজস্পস্তুন্দব্দব্দু ন্দ্রন্দন্দস্তুক্সন্স এর ধারা বহে ভিতর থেকে বাহিরে, আবার বাহির হতে ভিতরে। লামার্ক অবহেলিত হয়েছেন বলে ডারউইন আলোচনায় লামার্কের উল্লেখ করতে হল।

ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের আরও দিক আছে। যা পরবর্তীকালে ধোপে টেকেনি। আকস্মিক ন্দস্তুপ্নন্ম এর সম্ভাবনা তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও আজ তা স্বীকৃত। তবে সে আলোচনায় এ প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত না করাই ভাল।

ডারউইনের একদেশদর্শী সত্যানুসন্ধান, সর্বত্রই রক্তচক্ষু প্রতিযোগিতা দর্শন, সহযোগিতার দৃষ্টান্তসমূহের প্রতি অন্ধত্ব ও স্বকীয় স্বার্থচেতনার ন্মাস্পব্দনব্ধনুন্দ শুক্তপুনব্ধস্তু র গুণগান সমাজের পক্ষে বিষময় হয়েছে। শোষকশক্তি এই বৈজ্ঞানিক অর্ধসত্যকে তাদের কাজের সাফাই হিসাবে ব্যবহার করতে পারছে। পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ দাবি করতে পারছে, তারা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, উচ্চ কর্মদক্ষতা ও সৃজনীশক্তির জোরে স্বদেশে ও বিদেশে ক্ষমতায় সমাসীন; সুবিধাবাদের নীতিভ্রষ্টতা তাদের স্পর্শ করতে পারেনি কারণ তারা যা করেছে তা শুধু আত্মরক্ষার কর্তব্যপালনে। সফল ব্দব্ধস্পস্তুস্জ্ঞস্পস্পন্দজ এর পুঞ্জীভূত ধনরাশি তাদের বুদ্ধিবৃত্তির সমুচ্চতার ফল, ব্দস্তুজ্ঞন্ম্রপ্ত স্পন্দ্র ব্ধড়ন্দ ন্দ্রনব্ধব্ধন্দব্দব্ধ -এর নিদর্শন। আর দরিদ্র জনতা অসীম দুঃখভোগ করে কারণ তাদের ন্ধন্দুন্দ নিম্নস্তরের, তাদের বুদ্ধিকম, কর্মদক্ষতা কম, জন্ম থেকেই তারা ড়নব্ধড্রন্তুড়নন্দ্বনন্দপ্নন্দব্দ এ অপারগ। সমাজব্যবস্থার — উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার—কোনও দোষ নেই! প্রকৃতি-বিজয়-অভিলাষী, অতি-পুঁজি-অনুরাগী, জনমারণমুখী, পরিবেশবিধবংসী প্রযুক্তিবিদ্যার আজ বিপুল সমাদর যে দর্শনের কল্যাণে, তারও কোনও দোষ নেই! বর্তমানের একমাত্র কাজ ''ভজ ন্ধন্দুন্দ -কৃষ্ণ, জপ ন্ধন্দুন্দ -কৃষ্ণ'' কারণ ন্ধন্দুন্দ-ই ভিতর থেকে বাহিরের সব কিছুকে— দেহযন্ত্র ও কৃষি থেকে বিশ্বব্যবহারকে—নিয়ন্ত্রণ করে না কি? ডারউইন ও মেন্ডেলের শিক্ষা যে ছিল ''From in to the out''.

এই ''একপেশে'' শিক্ষা যারা ধ্রুব হিসাবে মনে করে গুন্দুন্দ এর মধ্যে সব সমস্যার উৎপত্তি এবং ন্ধন্দুন্দ বদলের মধ্য দিয়ে সব সমস্যার নিষ্পত্তি খোঁজেন—যাঁরা মনে করেন ন্ধন্দুন্দ ব্ধড়ন্দজ্জন্মাস্তু তে রোগ সারাবেন, শস্যবৃদ্ধি করবেন—তাঁদের কে বোঝাবে যে ছনগ্ন স্পজন্ধনব্দপ্নব্দ -এর ব্দব্ধজস্তুস্তুব্ধস্তুজ্জপ্ত স্তুস্তুন্দন্মাজন্দ্ধ এ কোনও ন্ধন্দুন্দ এর অপরিবর্তনীয় স্থান ছস্তুস্পন্দব্ধস্তুজ্ঞ নেই; (ii) পরিবেশের সহিত জীব ছস্পজন্ধনন্দপ্নগ্ন সমূহের সব সময় আদান-প্রদান ও অদল-বদলের পালা চলছে এবং সেই পালার অঙ্কে জীবকে ব্রস্তুন্দস্তুব্দব্ধ করতে হয় এবং সেই ব্রস্তুন্দস্তুব্দব্ধপ্নন্দন্ধ-এর কারণে জীবের মধ্যে ন্ধন্দুন্দব্দ ও ন্ধন্দুস্পপ্নন্দ এর ব্রব্ধন্দ ব্দন্দশুস্তুন্দুস্তুন্দ (অনুক্রম)-এর পরিবর্তন ঘটে; (iii) কোনও ন্ধন্দুন্দ-ই বিশেষ কোনও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্তুস্পন্দ্বজস্পপ্ত করে না, কারণ ন্ধন্দুস্পপ্নন্দ-এর ব্দব্ধজস্তুস্তুব্ধস্তুজ্জপ্ত পুনর্বিন্যাসে — অর্থাৎ পরিবর্তিত ব্দন্দশুস্তুন্দুস্তুন্দ -এ — একই ন্ধন্দুন্দ ভিন্ন ধরনের ব্যবহার করে; (iv) কোনও ন্ধন্দুন্দ বদল করলে পরিবর্তিত ন্ধন্দুস্পপ্নস্তু এবং স্তুন্দপুপুস্তুপ্পজ কাঠামোয় নতুন নতুন রোগজীবাণু ছন্দ্রব্ধড়স্পন্ধন্দুগ্ন সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠবে। শুধু ন্ধন্দুন্দ নিয়ে কোনও স্পজন্ধনব্দপ্ন হয় না। কীভাবে স্পজন্ধনব্দপ্ন বিকাশলাভ করে, সে প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে চলবে কেন?

ব্রিটেনে থন্মান্দ্ধ হুন্নন্দজব্দনব্ধস্তু'র অধ্যাপিকা এক খ্যাতনামা জীববিজ্ঞানী ডজ্জ ত্তন্দক্র-ড্রন্স -র অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক বিশ্লেষণের উল্লেখ এখানে করতেই হয়। পাশ্চাত্যের ভাবধারার প্রবণতা আছে বহুমুখী বাস্তবতার একটিমাত্র গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা এবং সেদিকে সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করা। ফলে অন্য দিকগুলি বাদ পড়ে যায়। এই ধরনের প্রবণতার ফলে সপ্তদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে এসেছে তিনটি বিশেষ স্তুস্পস্তুব্ধজন্দ, যাদের কেন্দ্রবিন্দুতে বসানো হয়েছে এবং যাদের একদেশদর্শী বাণী ''খণ্ডিত বিজ্ঞানে

র'' ছজন্দ্বস্তুত্তস্তব্ধনপ্সুন্বব্ধ ব্দস্তনন্দ্ধস্তন্দ্ব তথান্দ্রজ্জ্রষ্ক্প্নন্দ্ধব্ধন্দ্বস্তু ব্দস্তনন্দ্ধস্তন্দ্ব -এর) জন্ম দিয়েছে। এই তিনটি হল ত্বন্দ্বভ্রব্ধপ্সন্দ্রু প্লন্দ্ব স্তড্রুনস্তব্দ ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব (যা থজ্জনন্ধন্দ প্সন্দ্র ব্দম্নান্দ্বস্তনন্দ্বব্দ স্তুত্রব্ধত্তজ্জ্রপ্ত ব্দন্দ্বপ্তন্দ্বস্তব্ধনপ্সু এ বিধৃত); এবং ত্তন্দ্ধস্তন্দ্বপ্ত এর গুন্দ্ধন্দ্বব্ধনস্তব্দ.

(ক) ত্বন্দ্বভ্রব্ধপ্সন্দ্রু প্লন্দ্বস্তড্রুনস্তব্দ এর কেন্দ্র হচেছ ন্দ্রপ্সজ্জস্তন্দ্ব—ন্দ্রপ্সজস্তন্দ্ব প্সন্দ্র ঋজ্জ্বনব্ধস্ত এবং তৎসঙ্গে প্তুভ্র প্সন্দ্র প্লপ্সব্ধনপ্সু। সুতরাং চাপ, তাপ, বেগ ছম্নাজ্জন্দ্ববব্দস্তজ্জন্দ্ব, ব্ধন্দ্বপ্লম্নন্দ্বজ্জ্রব্ধত্তজন্দ্ব, ন্দ্বপ্তপ্সস্তনব্ধস্তা জাতীয় কয়েকটি স্ক্রজ্জ্রপ্লন্দ্বব্ধন্দ্বজ্জ এবং শুব্ধুব্ধনব্ধব্ধ ন্লন্দ্ব ন্দ্ববদব্ধনপ্লব্ধনপ্সু (পরিমাণগত পরিমাপ) হচেছ বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র, যা ঔপ্সু-প্তন্লন্দ্ধ ব্দস্তব্দব্ধন্দ্বপ্লব্দ (যথা স্নাপ্তুন্দ্বব্ধজ্জস্ত স্ত্মাস্তনন্দ্বব্দ ও প্লব্ধস্তড়ন্দ্ববদগ্ন অনুসন্ধানের পক্ষে উপযোগী। প্রাণীজগতের ছম্নাপ্তুন্দ্ব ওক্রনপ্লপ্ত জগতের) অনুসন্ধানক্ষেত্রে এই মন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় প্রতিবন্ধক, কারণ সেখানে থাকে অগণিতত্রজন্দ্রস্তন্দ্ববদ, অঙ্কে যার পরিমাপ সম্ভব নয়। তা ছাড়া নিউটনীয় বিজ্ঞান রূপ, রস, গন্ধ অর্থাৎ শুত্রপ্তনব্ধস্ত সম্পর্কিত সব কিছুকেই বিজ্ঞানের আওতা থেকে নির্বাসন দিয়েছে।

(খ) ডারউইনের বিবর্তন থিওরি—প্রতিযোগিতায় দক্ষতা যেখানে জীবনরক্ষার উপায়, স্বকীয় স্বর্গে মগ্নতা যেখানে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম—বলা যায় ঐশ্বরিক বিধান। (রবীন্দ্রনাথ ''স্বার্থমগ্ন যে জন, বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখন-ও শেখেনি বাঁচিতে'' বললে কী হবে?)

(গ) মেন্ডেলের গুন্দ্ধন্দ্বব্ধনস্তব্দ, যাতে মনে হয় জীব যেন শুধু ঋন্দ্ধন্দ্বব্দ-এর সমষ্টি। জীবনের বহুবিধ জটিলতা থেকে বিচিছন্ন করে ঋন্দ্ধন্দ্ব-কে দেখার শিক্ষা দেয় এই তত্ত্ব। গুন্দ্ধন্দ্ব-সমূহের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার ছন্দ্বব্ধন্দ্বজ্জ্রস্তব্ধনপ্সগ্ন কথা ভুলিয়ে দিতে চায় এই শিক্ষা। জীবকোষ ও জাগতিক পরিমণ্ডলও যে ঋন্দ্ধন্দ্ব এর প্রকাশভঙ্গি নির্ধারণ করে, সে কথা অস্বীকার করে এই তত্ত্ব। ত্নড়স্তব্দনপ্সপ্তপ্সন্ধনস্ত্রপ্ত, স্নাড়স্তব্দনপ্সস্তড়ন্দ্বপ্লনস্ত্রপ্ত, স্নাব্দস্তস্তড়প্সস্তত্তপ্তব্ধত্তজ্জ্রপ্ত দিকগুলি ঢাকা পড়ে যায়। (অবশ্য ত্তন্দ্ধস্তন্দ্বপ্ত নিজেই স্বীকার করেছিলেন, তাঁর দৃষ্টি ছিল সীমিত ক্ষেত্রে।)

এই ত্রয়ীর সংযোগ ত্মন্দ্বস্তুত্তস্তব্ধনপ্সুন্বব্ধ বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে। এই বিজ্ঞানের মূল কথা ছন্ধত্তনস্তুন্দ্ধ স্নাজন্দস্তনস্নাপ্তন্দ্বগ্ন হচেছ যে জটিল ব্দস্তব্দব্ধন্দ্বপ্ল-কেও ভালভাবে বোঝা যায় তার ব্দনপ্লস্নাপ্তন্দ্ববব্ধ ক্তনব্ধব্দ অধ্যয়ন করে (স্তুজন্দ্বস্তুত্তস্তন্দ্ধ ব্ধড়ন্দ্ব ব্দস্তব্দব্ধন্দ্বপ্ল ব্ধপ্স নব্ধব্দ ব্দনপ্লস্নাপ্তন্দ্ববব্ধ স্ক্রজব্ধব্দগ্ন। ছেঁটে দেওয়া অংশগুলি সাধারণ মানুষের ছস্তপ্সপ্লপ্লপ্সু স্নান্দ্বপ্সস্নাপ্তন্দ্বগ্ন জীবনধারণ ও মর্যাদাপ্রতিষ্ঠাভিমুখী পথের উপর আলোকসম্পাতের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। ''খণ্ডিত বিজ্ঞানের'' স্ক্রজ্জ্রস্তনন্ধপ্ল -এর ছত্রতলে ভৌতিক বিজ্ঞান ও শক্তি প্রয়োগ-সম্পর্কিত প্রযুক্তিবিদ্যাসমূহের ছম্নাড়স্তব্দনস্ত্রপ্ত ব্দস্তনন্দ্ধস্তন্দ্ববদ্রুস্ত ন্দ্রপ্সজস্তন্দ্বত্রম্নাম্নাপ্তনস্ত্রব্ধনপ্সু-প্সজনন্দ্ধন্দ্ব স্তু ব্ধন্দ্বস্তড়প্সপ্তপ্সন্ধনস্তব্দগ্ন প্রভূত উন্নতি ঘটলেও জীববিজ্ঞানের ছপ্তনন্দ্রন্দ্ব ব্দস্তনন্দ্ধস্তন্দ্ববদগ্ন বিকাশ ব্যাহত হয়। ফলে মানবমুক্তির পথেও বাধা এসে যায়।

সেকুলারিজ্‌ম বনাম ধর্মনিরপেক্ষতা

দেবী প্রসাদ রায়

::::

স্বাধীন ভারত যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৫০ সালে গৃহীত সংবিধানের উদ্দেশিকা অনুযায়ী স্বাধীন, সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে যে রাষ্ট্র তার সব নাগরিকের জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ন্যায় নিশ্চিত করবে, চিন্তা বিশ্বাস ও ধর্মাচারণের স্বাধীনতা প্রদান করবে এবং আত্মমর্যাদা ও জাতীয় ঐক্যকে নিশ্চিত করার জন্য সৌভ্রাতৃত্বের পথ অনুসরণ করবে। সেকুলারিজম্‌-এর কোন কথা তখন সংবিধানে ছিল না। ছাবিবশ বছর পর বিয়াল্লিশতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সোভারিনিটি (সার্বভৌমত্ব)-র পরই 'সেকুলার' এবং 'সোস্যালিস্ট' শব্দদুটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন এই সংযোজন হ'ল তার কোন গ্রহণীয় বিশদ ব্যাখ্যা বা বক্তব্য পাওয়া যায় না। বস্তুত পক্ষে প্রাথমিক উদ্দেশিকার ব্যাখ্যায় প্রশাসন ও ধর্মচারণ সম্পর্কের কথা বলা হ'য়েছে যথেষ্টভাবে — ছাবিবশ বছর পরে 'সেকুলার' শব্দটির সংযুক্তি উদ্দেশিকাকে সুস্পষ্ট অর্থবোধক কোন নতুনতর মাত্রা দিতে পারে নি বরং অভিজ্ঞতা বলছে অভাবিত এক বিভ্রান্তির অবকাশ সৃষ্টি ক'রেছে। 'সোস্যালিস্ট' শব্দটির অনুপ্রবেশও সমান্তরাল অর্থনৈতিক আদর্শের অনুল্লেখে অস্পষ্ট এবং ঘোলাটে থেকে গেছে। যে সময়ে শব্দ দুটি সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে তার সংগে বর্তমান কালের বিশ্ব পরিস্থিতির তুলনা করলে ঐ সংযোজনের তৎকালীন যান্ত্রিকতা ও দূর-ভবিষ্যৎব্যাপী-উদ্দেশ্যহীনতাই প্রকটিত হয়, বিশেষ ক'রে সোভিয়েট রাশিয়ার বিলুপ্তিতে এবং পূর্বইউরোপীয় দেশগুলিতে সোস্যালিজমের দূরবস্থার নিরিখে। অপ্রয়োজনীয় অতিরক্ত এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ব'লে ঐ শব্দদুটিকে বর্জন করার দাবীও একেবারে অযৌক্তিক তা মনে হয় না।

দেখা যাক, 'সেকুলার' শব্দটির সংযোজন কতটা অর্থবহ বা তাৎপর্যপূর্ণ হ'তে পেরেছে আমাদের জাতীয় জীবনে।

'সেকুলার' শব্দটি বিদেশী ভাষা লাটিন Seculum থেকে নেওয়া। খৃষ্টীয় পরিভাষায় এর অর্থ হ'ল — যা চার্চ সংক্রান্ত নয় বা যাজকীয় নয় — Non-ecclesiastical বা Non religious বা Non-Sacred (অপবিত্র) Profane রোমান ক্যাথলিক চার্চের ধর্ম-যাজকদের ভ্রষ্টাচারে ইউরোপের সাধারণ মানুষ যখন উৎপীড়িত, ক্লিষ্ট এবং হতাশাগ্রস্ত তখন চার্চের প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনই রাষ্ট্রীয় আদর্শের ক্ষেত্রে Non-ecclesiastical (Secular) সেকুলার রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভব ঘটায় যা প্রথম দিকে যতটা না ঈশ্বর-বিরোধী ছিল তার চাইতে অনেক বেশী ছিল চার্চবিরোধী। শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, সমাজচিন্তায় এই চার্চবিরোধী মানসিকতা শেষাবধি ঈশ্বর-নিরপেক্ষতায় বা ঈশ্বরবিরোধীতায় উত্তীর্ণ হ'য়ে 'Secular' শব্দটিকে একটি রেঁনেশাঁধর্মী মহিমা প্রদান করে। ইতালীতে মেকিয়াভেল্লিই প্রথম রাজনীতিকে ধর্ম বা নীতিশাস্ত্রের আনুগত্য থেকে মুক্ত করা প্রয়াস পান। সেকুলার বা ধর্মহীন রাষ্ট্রনীতির জন্ম এভাবেই হয় ইউরোপে। কিন্তু এই 'সেকুলার' রাষ্ট্রনীতি সুস্পষ্ট এক অবয়ব পেতে সময় নিয়েছিল বহুমুখী আন্দোলন সমৃদ্ধ প্রায় দুইশতাধিক বছর। সেকুলার রাষ্ট্রদর্শ অনুযায়ী মানুষই সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে তাদের সুখ শান্তি নিরাপত্তা ও জাগতিক উন্নতির জন্য, সমাজকে ধারণ ক'রে রাখে ধর্ম নয় — মানুষ রচিত বিধিবিধান ও নীতি — ঈশ্বরের অস্তিত্বই অনাবশ্যক, অযৌক্তিক। চিন্তার পথ যুক্তির পথ, যুক্তির পথ বিজ্ঞানের পথ, বিজ্ঞানের পথই কল্যাণের পথ, চিন্তা করতে সক্ষম, সমস্ত জীবজগতের মধ্যে একমাত্র মানুষ। মানুষই সব, সুতরাং ঈশ্বর বা ধর্ম অপ্রাসংগিক, সেকুলার চিন্তার এই হ'ল মূলমন্ত্র, এই হ'ল ভিত্তি। বাস্তু বিজ্ঞানভিত্তিক এই রাষ্ট্রাদর্শ, ধর্মকেন্দ্রিক সংঘর্ষ যুদ্ধ খুনোখুনী-ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে একশো ভাগই গ্রহণীয়। কিন্তু আজ বিজ্ঞান প্রযুক্তির অতি দ্রুত এবং অভাবিত উন্নতির যুগেও ধর্ম নিয়ে সংঘাত, বিশেষ বিশেষ ধর্মের অধীনে সমগ্র বিশ্বকে আনার প্রাতিষ্ঠানিক সুকৌশলী প্রয়াস, রক্তক্ষয়ী প্রয়াসও এখনো বিদ্যমান কেন? তাহ'লে কি সেকুলার রাষ্ট্রচিন্তায় অথবা তার রূপায়ণ প্রয়াসে কোন দুর্বল দিক থেকে গেছে? এ প্রশ্নটি আজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাপক গবেষণার বিষয় হওয়া উচিৎ। এ'কথা প্রায় অনস্বীকার্য যে সেকুলার রাষ্ট্রচিন্তার উদ্ভবের পথ ছিল সঠিক কিন্তু সে চিন্তার বাস্তবায়ন এবং ব্যাপকীকরণ প্রক্রিয়ায় বিবর্তনের ইতিহাসে মানব প্রজাতির মানসিকতার বর্তমান অবস্থানের ধর্ম ও ঈশ্বরচিন্তার প্রভাবের মাত্রার মূল্যায়ণ হয় নি ঠিক মত। যে ধৈর্য্য এবং স্থৈর্য্যের সাথে মানুষের অন্তর্লোকে বিপ্লব ঘটানোর দরকার ছিল তা হ'তে পারে নি। মানবপ্রজাতির উপর ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রভাবের কথা চিন্তা ক'রেই সম্ভবতঃ ঈনলক, ভল্‌টেয়ার, মণ্টেস্কু, ডি এলামবার্ট, রুশো প্রমুখেরা ধর্মহীনতার চাইতে পরমধর্মসহিষ্ণুতার উপর জোর দিয়েছিলেন। স্বয়ং লেনিনও মার্ক্সীয় আদর্শ গ্রহণ ও তার রূপায়ণের দায়িত্ব নিয়েও বাস্তবতার বিচারে সেকুলার বা ধর্মহীনতার প্রবক্তা হন নি অন্ততঃ তাঁর ১৯০৫ সালের বক্তব্যে তাই মনে হয়। রাশিয়ায় জারের কাছে বিপ্লবীদের পেশ করা দাবীগুলির প্রসঙ্গে লেনিন লিখেছিলেন / The State must not concern itself with religion; religious Societies must not be connected with the State powers. Every one should be absolutely free to profess whatever religion he prefers or recognise no religion ……. There must be no discrimination whatever in the rights of citizens on religious grounds …… no state grants must be made to ecclesiastic and religious Societies which must become absolutely

independent, voluntary associations of like minded citizens.* বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় লেনিনের মৃত্যুর আগেই ধর্ম বা ধর্মাচরণ-সম্বন্ধীয় বিধিনিষেধের পরিকাঠামো তৈরী হ'য়ে গিয়েছিল। নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপনের পর স্ট্যালিনের নির্দেশে ১৯২৯ সালে গঠিত হ'ল 'The League of militants Godless.' ঈশ্বরহীনতা প্রচারের জন্য স্লোগান চালু হ'ল 'The fight for godlessness is a fight for socialism.' কিন্তু রাষ্ট্রীয় বিপুল উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন স্তরের মানুষের এমন কি দলীয় উচ্চ স্তরের মানুষের মনের গভীর থেকে ধর্মের অস্তিত্ব মুছে গেল — এমনটা হ'ল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সংগে সংগেই বহু নিন্দিত, সমালোচিত জাতীয়তাবাদ তথা স্বদেশভক্তিকে স্থান দিতে হ'ল এবং ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কঠোরতাকে অনেকাংশে শিথিল করতে হ'ল। অর্থাৎ এত তাড়াতাড়ি ধর্মবিহীন বস্তুবিজ্ঞাননির্ভর সমাজ গঠন করা যাবে না — এ সত্য প্রকটিত হ'ল এবং হ'তে থাকলো। ১৯৫৩ সালের মে মাসে অর্থাৎ স্ট্যালিনের মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে কট্টর মার্ক্সবাদীদের প্রবক্তা সেলপিন(komosomol -এর প্রথম সেক্রেটারী) জানান্ দিলেন / War against religious prejudice is an integral part of the fight for the communist education of the working class, for the education of active and conscientious builders of communism free of any and all links to the past.* ষাটের দশকে দেখা গেল 'fight for godlessness' অতি দ্রুত ক্ষীয়মান পরিসংখ্যান বলছে শিশুদের মধ্যে ৬০ ক্সকে চার্চ 'ব্যাপ্ টাইজ্' করেছে — ১৫ ক্সবিবাহ এবং ৩০ ক্সমৃত্যু-অনুষ্ঠান চার্চ মতোই সম্পন্ন করা হ'য়েছে। কট্টরপন্থীরা তথ্য পেল ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাসীদের ৭০ ক্সই চল্লিশ বয়োসোধর্ব, মোট জনসংখ্যার ৬ ক্সযে মহিলারা তাদের ৭০ক্সঈশ্বরবিশ্বাসী। শত চেষ্টা সত্ত্বেও পারিবারিক স্তর থেকে ধর্মাচারণকে ধর্ম বিশ্বাসকে হঠানো গেল না। আর আজ গ্লাসনস্ত, পেরস্ত্রৈইকা পেরিয়ে এসে ভেঙ্গে যাওয়া সোভিয়েট ইউনিয়নের রাশিয়াতে ধর্ম ফিরে এসেছে বিপুলভাবে লেনিনগ্রাড্ শহরের নাম হ'য়েছে সেন্ট পিটার্সবার্গ।

সেকুলার বা ধর্মহীনতা-দর্শনের এই ঐতিহাসিক পরিণতি প্রত্যক্ষ ক'রেও কেন 'সেকুলার' শব্দটি ভারতীয় সংবিধানে ঢুকে পড়লো — এটি আশ্চর্যের বিষয়। পণ্ডিত নেহরু ছাড়া আমাদের সংবিধান প্রণেতারা কেউই 'সেকুলার' শব্দটিকে আমলই দেননি — সংবিধানের আদি উদ্দেশিকায় স্পষ্ট হয়েই আছে। বস্তুতপক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা বা পরধর্মসহিষ্ণুতার কথাই প্রকারান্তরে স্থান পেয়েছিল। নেহেরুর অভিলাষ পূরণের জন্যই অথবা রাজনৈতিক হিসেবনিকেশ মোতাবেক মার্ক্সবাদীদের খুশী করার জন্যই এবং সেই সঙ্গে তথাকথিত প্রগতিশীলতা তুলে ধরতেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানের ৪২-তম সংশোধন ঘটিয়ে 'সেকুলার' শব্দটি ঢুকিয়ে ছিলেন কিনা তা অবশ্যই চর্চার দাবী রাখতে পারে।

সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে একমাত্র পণ্ডিত নেহরু ছাড়া আর সবাই উদ্দেশিকায় সন্নিবেশিত প্রতিশ্রুতির মধ্যেই রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা ও সহিষ্ণুতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন — অবাস্তব ব'লেই সম্ভবত ধর্মহীনতা বা সেকুলারিজ্মকে গুরুত্ব দেন নি। ৪২-তম সংশোধনে 'সেকুলার' শব্দটি যোগ করার পর ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মসহিষ্ণুতা এবং ধর্মহীনতার এক বিচিত্র সমাবেশ রাজনৈতিক নেতাদের হাতে সংবিধানকে ইচ্ছামত ভাষ্যপ্রদান করার এক অস্ত্র তুলে দিল। সংবিধানের অন্তর্নিহিত বক্তব্যের সংগে সংগতিহীন সামঞ্জস্য-হীন বহু ঘটনা ঘটতে লাগলো। ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিত এইবার প্রাসংগিকতার মধ্যে এসে যাচ্ছে।

১৯৪৯ সালে বাবরি মসজিদে রামলালার মূর্ত্তির অনুপ্রবেশ, সোমনাথ মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটনে রাষ্ট্রীয় প্রধানদের সংযুক্তি, হিন্দু কোডবিল পাশ — রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে উপেক্ষা ক'রে — আইনের সাম্যকে অর্থহীন ক'রে তুলে মুসলীম পার্সোন্যাল ল'-এর সংরক্ষণ — শাহবানু মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়কে রাজনৈতিক স্বার্থে বানচাল করা — এ'সবই সেকুলারিজমের নামে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দ্বিচারিতা মাত্র। বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন অনুশাসন রীতি নীতি থাকতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রের সার্বিক অগ্রগতি ও কল্যাণের স্বার্থে কোন ধর্মের কোন প্রতিবন্ধকতা মানা হবে না এটাই ধর্মনিরপেক্ষতা, রাষ্ট্র এই অর্থেই ধর্মের উর্দ্ধে থাকবে, রাষ্ট্রীয় পরিচয়টাই মুখ্য হবে — ধর্মীয় পরিচয় হবে গৌণ। কিন্তু খুবই দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় এবং উদ্বেগের বিষয়ও এই যে ভারতীয় নাগরিকের একটি অংশ প্রথম পরিচয় হিসেবে ধর্মকেই মুখ্য মনে করে — ভারতীয়তাকে গৌণ মনে করে। এটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মূলে কুঠারাঘাতের তুল্য, কারণ প্রথম অংশের সাথে দ্বিতীয় অংশের সংঘাত অনিবার্য। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবহমান সংঘর্ষের মূল কারণ এটাই। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের এ ব্যাপারে কোন মাথাব্যাথা নেই — এবং ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিচয়কে এটাই আব্ছা করে দিচ্ছে আর এই আলো-আঁধারীকেই রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারে আগ্রহী রাজনৈতিক নেতারা। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের স্বার্থে কিছু রাজনৈতিক দল তথা নেতা কখনো সেকুলারিজমকে তুলে ধরে কখনো বা ধর্মনিরপেক্ষতার ধূয়ো তুলে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠমানুষের আশা আকাঙ্খা ভাবাবেগকে তুচ্ছ ক'রে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় উগ্রতাকে পরোক্ষভাবে প্ররোচনা দিতে থাকলো — রাষ্ট্রের সাধারণ স্বার্থকে বলি দিয়েও একাজ চলতে থাকলো। সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষজন দেখেছে উদ্বেগের সংগে, কী ভাবে পশ্চিমবঙ্গে এবং অন্যান্য সীমান্ত রাজ্যগুলিতেও বহিরাগত মুসলীমরা রাজ্যের জনচিত্রের চরিত্র পাল্টে দিয়েছে, দিচ্ছে, বিশেষ করে আসাম, ত্রিপুরা

ও পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ভয়াবহ। বহিরাগত মুসলীমরা যে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই এখানে ঢুকতে বাধ্য হ'য়েছে এমন সরলীকৃত ব্যাখ্যা যে প্রযোজ্য নয় পরিকল্পিত ভাবে জনচিত্র পাল্টানোর ব্যাপারটিও আছে যার সংগে প্যান ইস্লামিক জগতের বৃহত্তর স্বার্থ এবং বৈরী পাকিস্তানের কূট অভিসন্ধিও জড়িত — এটি একটি নির্মম এবং অতি বাস্তব সত্য। আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তা আজ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হ'য়েছে। এই রকম একটা পরিস্থিতিতেও আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি বালিতে মুখ গুঁজে এসব না দেখার ভান ক'রে এসেছে এবং এখনও করছে। ঐ ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে, সেকুলারিজমের নামে না হ'লে বহিরাগতরা অতি দ্রুত রেশন কার্ড পেয়ে স্বল্পায়াস এবং অনায়াসে ভারতীয় নাগরিকত্বও অর্জন করতে পারছে, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছে কি করে? সংখ্যালঘু-ভোট ব্যাংক গড়ে তোলার দিকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক দলগুলির এই যে দ্বিচারিতা ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজমের নামাবলীর আড়ালে তা সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ আজ ক্রমশঃ বুঝতে পেরেছে এবং নিজেরাই তার প্রতিকার কল্পে ব্যবস্থা নিতে শুরু ক'রেছে তাদের সীমাবদ্ধ চিন্তানুযায়ী।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষজন দেখেছে কাশীরে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পণ্ডিত উৎখাত হ'য়ে আশ্রয় শিবিরে বাস করছে এবং সেকুলারিজমের স্বার্থে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বিকার থেকেছে আবার গুজরাটের সাম্প্রতিক দাংগায় হাজার হাজার মুসলিমদের আশ্রয় শিবিরে যেতে হ'য়েছে দেখে ঐ রাজনৈতিক দলগুলিই সোচ্চার হ'য়েছে ঐ সেকুলারিজম'-র জন্যই — কাশীরে বেছে বেছে হিন্দু গণহত্যায়, মন্দিরের হিন্দু পুরোহিতদের শিরশ্ছেদে যারা নির্বাক থেকেছে, গোধরায় করসেবকদের পুড়িয়ে মারায় যারা নির্লিপ্ত থেকেছে — বাংলা দেশে হাজার হাজার মা-বোনেরা লুণ্ঠিতা ও ধর্ষিতা হচ্ছে জেনেও যারা স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন ক'রছে 'সেকুলারিজমের' স্বার্থে তারাই আবার মার্কিন বোমায় বিধবস্ত আফগানদের জন্য প্রতিবাদ মিছিল করছে, গুজরাটের ঘটনাবলীর জন্য প্রতিবাদের ঝড় তুলেছ — এগুলি কি অত্যন্ত দৃষ্টিকটু নয়? গুজরাটে নাকি 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' চলছে। বিজন সেতুতে আনন্দমার্গী-সন্ন্যাসীদের পুড়িয়ে মারা-নানুরের হত্যা, ছোট আঙারিয়ার হত্যাকাণ্ড — এরকম আরো আরো ঘটনা-এগুলি কি 'প্রগতিশীল সন্ত্রাস' বলে উপভোগ্য? সেকুলারিজম, ধর্মনিরপেক্ষতার ও মানবতাবোধের এই সব 'ন্যক্কার-জনক' উদাহরণ বৃহত্তর জনসমাজের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিয়েছে। ১৯৯২ সালের বাবরি মসজিদের ধ্বংস সাধন এবং ২০০২ সালের গুজরাটের দাংগার চরিত্র তার উদ্বেগজনক পরিণাম। স্বার্থান্ধ বিকৃত 'ধর্মনিরপেক্ষতা, সেকুলারিজম্ এবং মানবতাবোধ' থেকে সাধারণ মানুষ নিষ্কৃতি পেতে চাইছে তার স্তরের ভাবনাচিন্তা অনুযায়ী।

কিন্তু কেন এমন হ'ল? আমরা কি 'সেকুলারিজম' অনুসরণ করার অযোগ্য? ধর্মনিরপেক্ষতার মানে বুঝতে কি অপারগ?

আসলে খুব ভাল ক'রে বিশ্লেষণ করলে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আমাদের দেশে জনজীবনের 'ধর্মহীনতা' বা 'সেকুলারিজম' একেবারেই অপ্রযোজ্য — ধর্মনিরপেক্ষতা বা পরধর্মসহিষ্ণুতার তবুও একটা আবেদন আছে। সেকুলারিজম বা ধর্মহীনতা অপ্রযোজ্য — তার কারণ এটিকে কৃত্রিমভাবে এবং অনুপযুক্ত সময়ে সংবিধানে ঢোকানো হয়েছে শুধুমাত্র ইউরোপীয় সেকুলার রাষ্ট্রাদর্শকে প্রগতিশীলতার প্রতীক হিসেবে সামনে রেখে। ইউরোপে সুদীর্ঘ দুই শতক ধরে সেকুলারিজম-এর আন্দোলন চ'লেছে বহু উত্থানপতন অতিক্রম করে এর যথার্থতা জনসাধারণ স্বীকার ক'রেছে। এই স্বীকৃতির অনুকূল একটা বাতাবরণও ছিল। সেটি হ'ল সেখানের জীবনচর্যা অনেকাংশে বস্তুবিজ্ঞান আধারিত। কিন্তু আমাদের দেশের জীবনচর্যা প্রধানতঃ আধ্যাত্মবিজ্ঞান বা দর্শন আধারিত এবং বহু প্রাচীন কাল থেকে, যে কালে ইউরোপীয় সভ্যতার উদ্ভবই ঘটেনি। সুতরাং শিল্প বিপ্লবের পর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ঘাত্ এসে পড়লেও প্রায় সাত হাজার বছর ধরে অনুশীলিত দর্শন, ভুল হোক আর ঠিকই হোক, হঠাৎ করে শূন্যে বিলীন হ'তে পারে না। দীর্ঘস্থায়ী যে আন্দোলন অনুশীলিত দর্শনকে পর্য্যায়ক্রমে প্রতিস্থাপন করতে পারতো সে আন্দোলনই হয়নি। নেহরুরই সমকালীন এবং এদেশে সেকুলার চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা এম. এন. রাও এ আন্দোলন করতে পারেন নি — সীমিত ভাবে কয়েকজন চিন্তাবিদ্দের মধ্যেই এটা সীমিত ছিল। সুতরাং অতি মুষ্টিমেয় কয়েকজন, যেমন একজন নেহরু, চাইলেই জনসাধারণ এবং সব নেতারা সেকুলার হয়ে যাবেন তাতো হয় না। যারা 'সেকুলার' হয়ে যান সময় বিশেষে তারা প্রকৃত অর্থে কতটা সেকুলার? সেকুলার এক রাজনৈতিক দলের নেতা এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী 'শাহবানু'দের চোখের জল মোছাতে পশ্চাৎপদ হলেন কেন? সেকুলার অপর এক 'প্রগতিশীল' রাজনৈতিক দল নির্বাচনের সময়ে ধর্মসম্প্রদায় বিশেষের প্রধানের কাছে ভিখারী হয় কেন? যাদের দর্শন তাদের প্রশাসন দক্ষিণ বংগে 'বনবিবি'র উৎসবে মেতে ওঠেন কোন্ 'সেকুলার' আদর্শের তাড়নায়? ধর্মের বিপন্নগামীতা বা ভ্রষ্টাচার থেকে মুক্ত হ'য়ে 'সেকুলারিজমের' ভণ্ডামীর খপ্পরে পড়া এটাই কি কাম্য ছিল? এ যেন অথবা টকের জ্বালায় পালিয়ে এসে তেঁতুল তলায় বাস!

এই বিকৃত সেকুলারিজম পক্ষপাতপূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষতার জন্যই স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরেও জাতীয় সংহতি বোধ, ভারতীয়বোধ এক প্রশ্ন চিহ্নের সম্মুখীন। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনসাধারণ এবং মুখ্য সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলীম জনসাধারণ উভয়েই বিপুল ক্ষতি এব

ং ক্ষতচিহ্ন নিয়েপারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ নিয়ে আজ মুখোমুখী। জাতীয় স্বার্থে এই অবস্থার সদর্থক পরিবর্তন দরকার, প্রি তকার দরকার — দরকার পারস্পরিক কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে বাস্তব অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন এবং তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণে র সুস্থ পরিবেশ তৈরী করা। এ কাজ বর্তমানে কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের মানসিকতা বুঝতে হবে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অন্যদিকে সংখ্যালঘু মুসলিমদের চিন্তাভাবনার সীমাবদ্ধতা বুঝ তে হবে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের। সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত ভাবে ধর্মীয় কারণে দাংগার মাধ্যমে ভারত ভাগ করার জন্য যে বেদনাবোধ হিন্দুদে র আছে এবং তারপরেও ভারতে থেকে যাওয়া মুসলিমদের দিক থেকে যে সহযোগিতামূলক আচরণ হিন্দুরা প্রত্যাশা করেছিল তা রাজনৈতিক দলগুলির স্বার্থান্ধ আচরণে ও হস্তক্ষেপে ও পাকিস্তানের প্ররোচনায় যে ভাবে বিপথগামী হয়েছে তার অনুধাবন করতে হবে ভারতীয় মুসলিম সমাজকে, অপরদিকে শিক্ষায় অনগ্রসর দারিদ্র্যপীড়িত ও হীনমন্যতাবোধে আক্রান্ত মুসলিম সমাজের যুগো পযোগী সামাজিক পরিবর্তনে প্রগতিশীল মুসলিম ব্যক্তিদের সহযোগিতায় হিন্দু শিক্ষিত সমাজকেও উদ্যোগী হতে হবে। এ কাজ, যে টি সত্যিকারের সংহতি রক্ষা ও বৃদ্ধির কাজ, তা হচ্ছে না — পরন্তু অশিক্ষা ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট মুসলিম আমজনতার ধর্মীয় বোধে সু ড়সুড়ি দিয়ে তাদের ভোট ব্যাংক হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এ জন্যই যেখানে হিন্দু সমাজে রামমোহন বিদ্যাসাগর দেবেন্দ্রনাথ বি বেকানন্দ ইত্যাদির উত্থান সম্ভব হয়েছে — মুসলিম সমাজে তা হ'তে পারে নি। এটা সম্ভব করার জন্য মুসলিমদের চাইতে হিন্দুদে র দায়িত্ব বেশী — কারণ ''পশ্চাতে রেখেছে যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে'' — অপর পক্ষে মুসলিম সমাজের আলোকপ্রাপ্ত অংশকে অগ্রণী হ'তে হবে হিন্দু মুসলিম যৌথ উদ্যোগে মুসলিম সমাজে অতি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনার জন্য। ইংরাজ স্থাপিত বি শক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইংরাজ বিচার ব্যবস্থায় মুসলিমদের প্রাধান্য দিয়েছিল, হিন্দুকে দিয়েছিল রাজস্ব ব্যবস্থার। 'দশশালা' বন্দোবস্ত চালু হওয়ার পর দেখা গেল রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হিন্দুদের আর্থিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হ'ল আর সময় মত খাজনা দিতে অক্ষম হওয়ায় মুসলিমরা আর্থিক দিক থেকে পংগু হতে থাকলো। কিছুকালের মধ্যেই এক স্পষ্ট আর্থিক পুনর্বিন্যাস সাধিত হ'ল য াতে করে অবস্থা ভাল হওয়া হিন্দুরা ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণা বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হ'ল অন্যদিকে ক্ষুব্ধ, শাসকশ্রেণী থেকে বিচ্যুত মুসলিমরা ইংরাজী শিক্ষা ব্যবস্থা বর্জন ক'রে সংকীর্ণ ধর্মীয় বেড়াজালে আবদ্ধ করতে থাকে নিজেদের। ঊনবিংশ শতকে ভারতীয় নবজাগরণ যা মূলতঃ বাংলাকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে ওঠে তা কার্য্যত হিন্দু নবজাগরণে পরিণত হ' ল। হিন্দু মুসলিম সমাজের মধ্যে এই বৌদ্ধিক পার্থক্য ধীরে ধীরে একটা স্থায়ী রূপ পেতে থাকে — মানসিক দূরত্বও ক্রমবর্দ্ধমান হ' তে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য এবং ঐক্য স্থাপনের জন্য গা ন্ধীজী খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করেন — হিন্দু মুসলিম কাছাকাছি আসার একটা সম্ভাবনা দেখা দিলেও শেষ অবধি ওয়াহবি আন্দে ালনের প্রভাবে সে সম্ভাবনা বিনষ্ট তো হ'লই উপরন্তু খিলাফৎ আন্দোলনের সুবাদে সংগঠিত হওয়া মুসলিম সমাজে ধর্মীয় উগ্রতা ঠাঁই করে নিল, যার প্কাশ দেখা যায় কেরালার মোপালা বিদ্রোহের সাম্প্রদায়িক চরিত্রে — বহু হিন্দুর নিধনে এবং বলপূর্বক ধর্মা ন্তকরণে। ধর্মান্তরিত হিন্দুদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে শেষ অবধি খুন হ'লেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। কিন্তু কেন খিলাফৎ আন্দে ালন ধর্মীয় আন্দোলন ধর্মীয় উগ্রতায় পর্যবেশিত হ'ল? এটি ব্যাখ্যার জন্য আমাদের যেতে হবে মুসলিম ধর্ম বিস্তৃতির গোড়ার দিকে র ইতিহাসে।

হজরত মহম্মদের জীবন দর্শনের দুটি অধ্যায় (১) মক্কার অধ্যায় এবং (২) মদিনার অধ্যায়। মক্কার মহম্মদ সত্যদ্রষ্টা-মানবপ্রেমিক নী তির প্রবক্তা আর মদিনার বিজয়ী বীর ও রাষ্ট্রনায়ক। মুসলিম সমাজ গ'ড়ে উঠেছে মদিনার বিজয়ী রাষ্ট্রনায়ক মহম্মদের আদর্শে, যে খানে প্রয়োজনীয় ছিল পৌত্তলিক আরব ইহুদিদের নির্মম শত্রুতার বিরুদ্ধে অন্ধ আনুগত্য ও বিপক্ষের প্রতি সন্দেহশীলতা — এটি ছিল তৎকালীন প্রয়োজনে সাময়িক ষ্ট্র্যাটেজি — যদিও মুসলিম সমাজে এটাই স্থায়ীত্ব পেয়ে যায়। যেমন মদিনায় অবতীর্ণ একটি স ুরার শেষে বলা হয়েছে ''হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহর রোষে যারা পতিত হ'য়েছে সেই দলের লোকেদের সংগে বন্ধুত্ব ক'রো না'' (৬০ ঃ ১৩) টীকাকার বলেছেনএখানে ইহুদিদের কথাই বলা হ'য়েছে — সমসাময়িক মুসলমানেরা হয়ত এই কথাই ভাল করে বুঝেছি ল এবং তাদের অনুবর্ত্তিতায় পরবর্তী মুসলমানেরা হয়ত বুঝে নিয়েছে — যারা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত নয় তাদের সংগে বন্ধুত্ব ক' রো না। কিন্তু এটিও সার্বিকভাবে সত্য ছিল না। বিচার বুদ্ধি সমন্বিত সুফী মতবাদ যার প্রবক্তা ছিলেন ইমাম আবুহানিফা, তার প্র ভাবও ব্যাপক ছিল। ভারতবর্ষে সুফী মতবাদই প্রাধান্য পাচ্ছিল ধীরে ধীরে। এর প্রমাণ, যে সময়ে গজনীর মাহমুদ হিন্দুমন্দির ধ্বং স ও ধনরত্ন লুঠ করছিল ঠিক সেই সময়েই আলবিরুণী বিশেষ শ্রদ্ধায় ও যত্নে হিন্দু জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ ক'রে তাঁর দেশকে সেই জ্ঞানে সমৃদ্ধ ক'রছিলেন। তবে এ কথাটাই চরম সত্য যে বিচার বিশ্লেষণ ও মধ্যপন্থা বাদ দিয়ে কঠোর ভাবে শাস্ত্রপন্থীরাই (মদিনা) শেষ অবধি ইমাম গাজ্জালী তথা ত্রয়োদশ শতকের শেষে আবির্ভূত ধর্মগুরু ইবানে ইমাম তায়মিয়ার প্রভাবে মুসলিম সমাজকে গঠ ন করেন। ভারতে সুফি মতবাদের প্রভাব এক সময় থাকলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তায়মিয়ার ভাবশিষ্য আবদুল ওয়াহবির প্রচেষ্টায় ভারতে সুফী মতবাদের অবলুপ্তি ঘটে। ভারতে ওয়াহবি আন্দোলনের গতি প্রকৃতি অনুধাবন করলেই তা বোঝা যায়। এককালে ভ ারতকে ''দারুল হর'' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, পরে ''দারুল ইসলাম'' বলে গ্রহণ করে দ্রুত ইসলামীকরণের উপর সমধিক গু

রুত্ব দেওয়া হয়। অনেক মুসলমান জমিদার ও সাধারণ মানুষ বৃহৎ হিন্দু সমাজের সংস্পর্শের কারণে হিন্দু পূজা পার্বণকে গ্রহণ করে রছিলেন বিশেষ ক'রে বাংলা দেশে। হিন্দু মুসলিম সৌহার্দ্যের একটি সংস্কৃতি রূপ নিচ্ছিল। কিন্তু ওয়াহবি আন্দোলন তাকে ব্যাহত করে এবং ভারতীয়ত্ব নির্মাণে সেটিই এক বাধায় পরিণতি হয় এবং এখন সেই বাধাই মুখ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে কট্টরপন্থীদের নিরন্তর প্রয়াসে। — ধর্মীয় কট্টরপন্থীদের মধ্যেই বিধর্মীদের বিরুদ্ধে 'জিহাদের' অনুপ্রেরণায় জন্ম নিয়েছে উগ্রপন্থা, গোটা বিশ্ব আজ যে ত্রাসের সম্মুখীন, ভারত তো বটেই। এইরকম জটিল পরিস্থিতি থেকে আমরা কি মুক্তি পাব না ? মাঝে মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাংগার কবলে পড়াই কি আমাদের ভবিতব্য? এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হ'লে 'তত্ত্বজ্ঞান' নয় কিছু কাণ্ডজ্ঞান নিয়েই আমাদের কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে এবং প্রধানতঃ মুসলিম সমাজকে। এটা কোন পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভংগি ভাবলে ভুল হবে। ৮ মানুষের সংগে সব ব্যাপারে পাল্লা দিয়ে তুলনা করাটা সমীচিন হয় না — হ'তে পারে না। একজন হিন্দু পাকিস্তানে কেমন আছে, বাংলাদেশে কেমন আছে, তালিবান শাসনাধীন আফগানিস্থানে কেমন ছিল তার তুলনায় একজন মুসলিম ভারতে কেমন আছে — এটা ভাবলেই সঠিক দৃষ্টিভংগির উদ্ভব ঘটবে। কাণ্ডজ্ঞানই দিক্‌নির্দেশক হবে। দাঙ্গা ঘটিয়ে ভারত ভাগ করার পরও পর্যায়ে পর্যায়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে কারা — হিন্দু না মুসলিম? কেন প্রতিবেশী মুসলিম দেশগুলিতে হিন্দু সংখ্যা ক্রমাগত ক'মেছে অথচ ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ব্যাপক ভাবে বেড়েছে এর কারণ হৃদয়ংগম করা দরকার নয় কী? ভারতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দের সংগে সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরী ক'রে থাকার জন্য সংখ্যালঘুদের প্রতি আবেদনকে ''ব্ল্যাকমেলিং'' বলে চিহ্নিত করতে রাজনৈতিক ধান্দাবাজের অভাব নেই — আপাতঃ গ্রাহ্যযুক্তিও খাড়া করা যায় কিন্তু ঠান্ডা মাথায় ভাবলে এর যৌক্তিকতাকে অস্বীকার করা যায় কি? এ আবেদন অতীতেও করা হয়েছিল। একটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯৮৩ সালে একটি খৃষ্টান মাইনোরিটি ডেলিগেশনের কাছে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন / …….. Minority can not claim to be safe by constantly irritating the majority* ইন্দিরা গান্ধী কি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ কথা বলেছিলেন না বাস্তব অবস্থার দিকে ইংগিত করেছিলেন? শিক্ষিত এবং অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা এই সত্য উপলব্ধি করেন অনেকেই। সাধারণ মুসলিম জনসাধারণও অনেকাংশে তা করে, কিন্তু করতে চায় না রাজনীতি সর্বস্ব মুসলিম নেতারা যাদের ধর্মীয় উস্কানির ফলে উপলব্ধ সত্য অন্তরালেই থেকে যায়। 'Rediscovery of India-র লেখক, সুদীর্ঘকাল U. N.
O তে কাজ করার বিপুল অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ মানুষ আনসার হোসেন খান তাঁর বইতে লিখেছেন / …….. Mr. Sahabuddin and Mr. M. J. Akbar, leave alone the Imam of the Shahi mosque in Delhi, were barking up the wrong tree ……. They were only leading the community of Indian Muslims astray by legislations ……. Those who took the line might get leadership but that road was destructive. It should be abandoned at one land the foundations laid for a permanent reconciliation. Failing that, the flames would rise higher and in the end we could predict exactly which community would suffer most and count the greater number of corpses …… India Muslims must remember that their forefathers or rather their medieval Coreligionistveminority rulers or India were beastly and frightful to the Hindus (with exception such as Akbar). No Islam sanctioned their conduct. Temples were indeed demolished and their stones often used to construct mosques on the very site.* দেশ ভাগের রক্তাক্ত পটভূমিতে প্ররোচনা থাকা সত্ত্বেও হিন্দুরাষ্ট্রের দাবী ওঠেনি — এখনো সে দাবী নেই বললেই চলে। কিন্তু কে বলতে পারে নিরবচ্ছিন্ন সংখ্যালঘু ধর্মীয় উগ্রতা, অসহযোগিতা এবং জংগীপনার প্রতিক্রিয়া আগামী দিনে এ দাবীকে অনিবার্য করবে কিনা! সেই পরিস্থিতি কি মুসলিমদের কাছে বাঞ্ছনীয় হবে?

তথ্যসূত্র ঃ

(১) /Sotsializmi reliigiya" in Polnoe sobranie Sochineii Moscow 1960 : Radical Humanist Vol 41 No. 2
(২) Kommunist No. 7 (1953)
(৩) হিন্দু মুসলমানের বিরোধ — কাজী আব্দুল ওদুদ (বিশ্ব ভারতী প্রকাশনা)
(৪) সেকুলার রাষ্ট্র ঃ সেকুলারিজম ও ধর্ম — 'ভাবনা-চিন্তা' ১লা জুন, ২০০০
(৫) Rediscovery of India – Ansar Hossain Khan (Orient Longman)
(৬) পুরোগামী — জানুয়ারী, ১৯৯০

ধর্ম, সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ
বিজয় দত্ত

ঘরটির চেহারা সম্ভ্রম উদ্রেককারী। অত্যাধুনিক বাতানুকুল ব্যবস্থাতো বটেই কিন্তু ঘরে ঢুকেই তাপমাত্রার পরিবর্তনে যে শিহরণ জাগে তার চেয়েও নাড়া খেয়ে যায় চোখ, ঘরের সচেষ্ট বৈভব-বিজ্ঞাপনহীন আসবাবে, মন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে দেওয়ালের রঙে (দেওয়ালের রঙ বোধহয় বলে না, কী জানি বলে?), বাহুল্য বর্জিত অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জায়।

আমি তখনও ঘরে ঢুকিনি। শুধু বাঁশি শুনেছি মানে কিঞ্চিৎ আঁচ পাচ্ছি। বেশ কয়েকজন লাইন দিয়ে বসে, সবারই পোশাক-আশাক পরিপাটি। বাইরে খান কয়েক টয়টো ডাটসন অপেক্ষমান। ওদের দেওয়া সুদৃশ্য কার্ডগুলি নিয়ে যে সুদর্শন যুবক ওই ঠান্ডা ঘরে অর্ধেক ঢুকেছেন এবং বেরিয়ে আসছেন তাঁর মুখ চোখের তটস্থ ভাব ভেতরের ওজন জানিয়ে দিচ্ছে।

আমার তো, কী বলে গিয়ে, কার্ড নেই, ঝোলা ব্যাগ থেকে ডায়রির পাতা ছিড়ে লিখে দিলাম, পশ্চিমবঙ্গের গণমাধ্যমের সাথে জড়িত, কথা বলতে চাই।

আসলে, এবারের বাংলাদেশ ভ্রমণে দ্বিতীয় দিনেই এমন এক ব্যাক্তির মুখোমুখি হব, ঠিক ভাবিনি। বনগাঁ হয়ে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে প্রথম দিনটি কাটালাম যশোরে। আজ সকালে এসেছি কুষ্টিয়া। আর বাঙালির কাছে কুষ্টিয়া মানেই তো শিলাইদহ আর লালন মাজার। তা, সে সব ছুঁয়ে সন্ধেতে এসেছি বাসের অগ্রিম টিকিট কাটতে। রাতটা কাটিয়ে কাল সকালের বাসেই ঢাকা। ওই টিকিট কাটতে গিয়েই জানতে পারলাম বাস কোম্পানির মালিক একটা দৈনিক সংবাদপত্রেরও মালিক-সম্পাদক। উপরন্তু তিনি বর্তমান বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের বেশ ওজনদার সদস্য। ও বাবা, এ যে একের ভিতর তিন। কৌতুহল হল। ভাবলাম, কথা বলতে পারলে মন্দ হয় না। অতএব ঠান্ডা ঘরে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায়।

যে ভাবে লাইন পড়েছে, বুঝলাম বেশ কিছুক্ষুণ অপেক্ষা করতে হবে। ঠিক আছে, আমার সময়ের অভাব নেই, একটি চেয়ারেরও যখন জুটেছে, সামনের টেবিলের ওপর রাখা সেদিনের কাগজটা টেনে নিলাম। ইতিমধ্যে সেই সুদর্শন যুবকটি জিজ্ঞেস করেছেন, আপনার কতক্ষণ লাগবে? বললাম, তা তো বলতে পারছি না, দু-চার মিনিটেও হয়ে যেতে পারে আবার — মানে ইট অল ডিপেন্ডস — দু-তিন মিনিট পরেই ডাক পড়ল। ঢুকলাম সেই তাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে। বাস কোম্পানির মালিক রাজনীতিবিদ সম্পাদক মশাই উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানালেন, আসেন আসেন, বসেন। হাত মিলিয়ে বসতেই বললেন কী খাইবেন কন, ঠান্ডা? চা? কফি? সঙ্গেই বাড়িয়ে ধরলেন বিদেশি ব্র্যাণ্ড বেনসন অ্যান্ড হেজেস-এর খোলা প্যাকেট আর দামি লাইটার।

এই সুযোগে ওজন বুঝে নিতে চাইলাম। কোটিপতি কিনা জানি না তবে লক্ষ লক্ষ পতিতো বটেই। হু, এঁরাই তো রাজনীতি করবেন। বয়স, যোগ-বিয়োগ চল্লিশ। এককালের লড়াকু চেহারা। বর্তমানে একটু আয়েশ, একটু মেদ, অকটু অ্যালকোহল ইত্যাদি ইত্যাদি।

ওর ঘরে ছিলাম প্রায় দেড় ঘন্টা। কথাবার্তা হল অনেক এবং যথেষ্ট খোলামেলা। বাংলাদেশে গত নির্বাচনে পূর্বতন শাসক দলের প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, নির্বাচন পরবর্তীকালে সংখ্যালঘুদের ওপর ব্যাপক পরিকল্পিত অত্যাচার নির্বাচনের ছয়মাস পরে একেবারে বর্তমান অবস্থা এমনকী কুষ্টিয়ায় সরস্বতী। কথাবার্তাই ছিল রাজনৈতিক, চালু রাজনৈতিক কথা, পার্টিবাজির কথা, বিরোধী দলের ওপর সব দায় চাপানোর কথা, নিজের এবং নিজের দলের প্রচারধর্মী কথা। কিছু নতুন এবং হতে পারে একতরফা তথ্য জানা গেলেও মূলত সবটাই ছিল গতানুগতিক রাজনৈতিক কচকচি। এর অনেকটাই বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা ছিল বা আন্দাজ ছিল।

আমার বিস্ময় ও বিপন্নতা অন্য জায়গায়। ভদ্রলোক একেবারে আজকের রাজনীতিবিদ, ভোটের রাজনীতিবিদ, ক্ষমতাসন্ধানী রাজনীতিবিদ, ন্যায়-নীতি বিবেক বর্জিত কট্টর রাজনীতিবিদ। আমাদের এই দেশে, আমাদের চারপাশে যে সব রাজনীতিবিদ দেখি, যাদের দুবেলা গালাগাল দিই আবার যাদের অনুগ্রহেই প্রায় আমাদের জীবনযাপন, এদেরই যেন কাউন্টার পার্ট বা মাসতুতো ভাই, একটা তফাৎ সহ।

কী সেই তফাৎ? ভদ্রলোক ঘন্টা দেড়েক কথা বললেন। প্রতি পাঁচটা বাক্যে একবার অন্তত আল্লার নাম নেওয়া, আল্লার দোহাই দেওয়া, আল্লাকে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করা। আমাদের এদিককার ধর্মব্যবসায়ীদের মতো, গুরুঠাকুরদের মতো, অমুক বাবা, তমুক বাবাদের মতো। কথায় কথায় আল্লা, কথায় কথায় আল্লা মেহেরবান, আল্লার দোয়া, কথায় কথায় কোরানের কোটেশন। যেন ইনি যা কিছু করেন, তা সরস্বতী পুজোয় যারা বাধা দিচ্ছিল তাদের তুলে আনাই হোক, ওর ভাষায় দুষ্কৃতিদের, অবশ্যই বিরোধী দলের, এলিমিনেট করাই হোক, সবই করছেন আল্লার নির্দেশে, আল্লার ইমানের খাতিরে। ঠিক যেন 'সবই তাঁর ইচ্ছা'। আমার কাছে অবাক করা পরিস্থিতি।

আমাদের এ দেশে কোন রাজনীতিবিদের মুখে, অন্তত অমুসলিম রাজনীতিবিদের মুখে, ডান-বাম যে পন্থীই হোন না কেন, এমনকি ইদানিংকালের হনুমান বাহিনীর মুখেও এত বেশি ধর্মের ধুয়া, ধর্মের অজুহাত পাওয়া যায় না। প্রতিমুহূর্তের জীবনে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে ধর্মের এই অনুপ্রবেশ কেন? প্রতিটি অসৎ কর্মে ধর্ম কখনও তরবারি রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেন? কী ভাবে? এর প্রয়োজনীয়তা কতটা? এর ফল কী? এর ফলে কোথায় পৌঁছচ্ছে মানব সমাজ।

গুণীজনেরা বলেন ধর্ম হল একটা দর্শন, একটা আধার যা সমাজকে ধারণ করে, ধরে রাখে। বিজ্ঞানের ভাষায় ধর্ম হল পদার্থের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। নিজস্ব গুণ। পদার্থের এই ধর্ম আবার পরিবেশের সঙ্গে, আরোপিত পরিস্থিতির সঙ্গে পাল্টায়। ভারত মহাসাগর থেকে এক আজলা জল হিমালয়ের বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে গেলে বরফে পরিণত হবে। বিজ্ঞান এও দেখিয়েছে, আরোপিত পরিবেশ বা প্রতিক্রিয়ার দ্বারা যদি রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটান যায় তবে পদার্থের পূর্বতন ধর্মের মৌলিক বা চিরস্থায়ী পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে পারে।

মানব সমাজে ধর্মের এই ভূমিকাটি অনেক জটিল, অনেক ভঙ্গুর, অনেক স্পর্শকাতর। তবু মনে হয়, বিজ্ঞানের মূল সূত্রটি চেতন সমৃদ্ধ সমাজের ধর্মেও প্রযোজ্য।

মানুষের ধর্ম কী? এ নিয়ে লক্ষ বছর ধরে লক্ষ কোটি কথা বলা হয়েছে, বলা হচ্ছে, বলা হবেও। এই সমস্ত কথা যোগ করে একক থায়, একেবারে এককথায় বলা যায় কি — মানুষের ধর্ম বেঁচে থাকা? এবং মানুষ যেহেতু চেতন প্রাণী, চিন্তা শক্তি সম্পন্ন প্রাণী, তাই তাঁর বেঁচে থাকা হওয়া চাই আনন্দের। আর মানুষের চেতনাই তাকে শিখিয়েছে আনন্দ কখনও একা হয় না। আনন্দ যত ভাগ করা যায়, যত বন্টন করা যায়, ছড়িয়ে দেওয়া যায়, জড়িয়ে নেওয়া যায় ততই বাড়ে, পরিপূর্ণ হয়। মানুষ এও জেনেছে আপন দুঃখের ভার ভাগ করে নিতে পারলে কমে, সহনশীল হয়। আর তাই মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সুখে দুঃখে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল মানুষ।

এটাই মানুষের ধর্ম, মানবিক ধর্ম, মৌলিক ধর্ম যা সমাজকে ধরে রাখে, মঙ্গলময় বাঁধনে বাঁধে। ভৌগোলিক পরিবেশের বিভিন্নতা হেতু, অর্থানৈতিক বিকাশের অসমান স্তরের কারণে সভ্যতার ক্রমবিকাশ সব জায়গায় সমান গতির হয়নি কিন্তু মানুষের এই মূল ধর্ম, মানবিক ধর্ম — এ কিন্তু চেতনার মৌল গুণ, বিকাশের মৌলিক আধার।

মানব সভ্যতার এই ক্রমবিকাশ অবশ্যই সোজাপথে এগোয়নি। সমস্যা এসেছে। আদিম সাম্যবাদের কাল পেরিয়ে যাযাবর জীবন ত্যাগ করে মানুষ শিখল এবং উদ্বৃত্ত মজুত করতে জানল। একই সঙ্গে পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার সাথে সাথেই সমস্যার বিস্তার। পরিবার ভিত্তিক গণ্ডীবদ্ধতা সামাজিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিল, নজরের চৌহদ্দি গেল ছোট হয়ে, আনন্দ বেদনার উৎস আর তত সামাজিক রইল না। মনুষ্য ধর্ম অবহেলিত হতে থাকল, মানুষ অ-সামাজিক হতে শুরু করল, অর্থনীতির ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত হয়ে গেল।

এই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যে শ্রেণি ইতিমধ্যে সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছেছে, ক্ষমতায় আছে, উৎপাদনের মূল উৎসগুলি কুক্ষিগত করতে পেরেছে তাঁরা তাঁদের অবস্থানকে দৃঢ় করতে, মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় — মানুষের ধর্মকে চাপা দিতে, বিদ্রোহ ঠেকাতে কিছু আপাত সুদর্শন, নির্মল ব্যক্তি চরিত্রের মানুষের মাধ্যমে আরোপিত ধর্মের প্রচার শুরু করে। এইসব ধর্ম মানবিক ধর্মের জাগরণ ঘটাল না, যে যে কারণে মানুষ শ্রেণিবিভক্ত হয়ে গেল সেই সব অসাম্য দূর করার কার্যকরী উপায় দেখাল না। এই সব ধর্ম মানুষকে ফলের আশা ছাড়াই কর্ম করতে বলল, আজকের জীবনের সব কষ্টকে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়ে অলীক এক বেহেস্তের স্বপ্ন দেখাল,

সামাজিক অন্যায়ের প্রতিরোধে না গিয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করে এড়িয়ে যেতে শেখাল। মূল কথা এটাই, বর্তমান অবস্থাটা, এই শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাটা বজায় থাকুক, তুমি অসাম্যের বলি হও কিন্তু বিদ্রোহ করো না, ত্যাগ ও তিতিক্ষার তত্ত্বে নিজেকে ধোঁকা দিয়ে ি স্থতাবস্থা, যে অবস্থায় সামান্য কিছু মানুষের প্রচুর লাভ তাকে বজায় রাখ। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এই সব আরোপিত ধর্ম বৃহৎ মনুষ্য সমাজের কোন কল্যাণ সাধন করতে পারেনি বরং ক্ষতিসাধন করেছে অনেক অনেক।

এইসব ধর্মগুলি মানুষের আঞ্চলিক চরিত্র অনুধাবন করে, ভৌগোলিক বিশেষত্বকে নজরে এনে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃি তর, যে সংস্কৃতি প্রতিদিনকার জীবনযাপনে হাসি-কান্না আনন্দবেদনার অনুভূতি থেকে গড়ে উঠেছে, সেই সংস্কৃতির মিশেল দিয়ে, স্থ ানীয় অনুষঙ্গ সাথে নিয়ে মানুষকে এক স্বপ্নের জগতের বাসিন্দা হওয়ার লোভ দেখাল। কিছু বিশেষ আচরণ, পোশাক আশাকের ি নর্দিষ্ট ঢং, পূজা-অর্চনা-উপাসনার বিশেষ কতগুলি ভঙ্গি এমনকি অনেক সময় মনুষ্য চেহারায় চিহ্নের মাধ্যমে তাদের এক একটি গে ষ্ঠীকে আবদ্ধ করল। কিছু মানুষের সুচিন্তিত বিভাজনের কায়দায় পৃথিবীর অন্যতর মানুষ থেকে তারা হয়ে গেল আলাদা। শিখ-পা ঞ্জাবিদের এমনই চুল দাড়ি পাগড়ির স্টাইল, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে তাকে দেখেই বোঝা যাবে যে সে শিখ ধর্মাবলম্বী। এতে দুই অপরিচিত শিখ হয়তো-বা প্রথম দর্শনেই কিছুটা আত্মীয়তাবোধ করতে পারেন, গোষ্ঠীর নিরাপত্তাবোধ করতে পারেন, কিন্তু ওরা দু জন যে বৃহৎ জনগোষ্ঠী থেকে একটু আলাদা হয়ে গেলেন সেটা ভেবে দেখলেন কি?

এভাবেই, যারা ঠিক আমার ধর্মের লোক নয়, তাদের সঙ্গে দুরত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকল। আমার গোষ্ঠীতে আরও বেশি মানুষ আসু ক, এই স্বাভাবিক আকাঙ্খা থেকে ধর্মপ্রচারের যে সমস্ত পদ্ধতি পাওয়া গেল তার সবগুলিতেই মনুষ্যধর্ম অস্বীকৃত হল। কেন না আ মার ধর্মই শ্রেষ্ঠ এই ঘোষণার মধ্যেই, বলা হোক বা না হোক, অন্য ধর্মগুলি শ্রেষ্ঠ নয় — এই বয়ান থাকছেই। কার বেহেস্ত কত হু র পরি দ্বারা বেষ্টিত এসব লোভ দেখানতো থাকলই, জাগতিক সুখভোগ বা অস্ত্রের ঝনঝনানিও প্রয়োজনে কাজে লাগান হল।

এইসব ধর্মাচরণ যতক্ষণ একান্তভাবেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকে, যদি তার কোন বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ না ঘটে অন্তত ততক্ষণ সমস্যাট াও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে, সমাজের ওপর তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। কিন্তু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস, ধর্মাচরণ সমষ্টির ওপর প্রভাব ফেলবেই — অচেতনভাবে বা সচেতনভাবে। আর আছেন আমাদের সমাজপতিরা, অর্থনৈতিক সু বিধাভোগী শ্রেণির মানুষেরা, রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সু ব্যাক্তিরা। তাঁরা চাইবেন, অত্যন্ত সচেতনভাবেই চাইবেন, অত্যন্ত সুপরিকল্পি তভাবেই চাইবেন ধর্মের সামাজিকীকরণ, উৎপাদন সম্পর্কের শ্রেণিবিভাগকে গুলিয়ে দিতে উৎপাদক সম্পর্করহিত কতগুলি অলী ক ধর্মভিত্তিক শ্রেণি বা গোষ্ঠীতে সমাজকে বিভক্ত করতে, আসল সমস্যা থেকে মনোযোগ ঘুরিয়ে দিতে, অর্থনৈতিক শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখতে।

ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে সমস্যা যেমন একটাই। একশ কোটি মানুষের খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়ের কোন সমস্যা নেই। বুদ্ধির বিকাশ, চেতনা র বিকাশ, সৌন্দর্যবোধের বিকাশের কোন সমস্যা নেই। মানবিক ধর্মেরও কোন সমস্যা নেই। অহো! কী সুখের কাল কাটাইতেছি আমরা। সমস্যা শুধু একটাই। এই বিশাল ভারতবর্ষের এক বিশেষ ভূমিখণ্ডে একটি মসজিদ হইবে না একটি মন্দির হইবে? যে মস জিদটি ছিল সেটিইতো বানর সেনার দাপটে গিয়াছে। কী আর করা যাইবে, দেশে নব অপেক্ষা বানর-এর সংখ্যাই যখন বর্ধমান। অ বশ্য মসজিদ বলে আমার মনে বিশেষ কোন দুর্বলতা বা অনুরাগের সৃষ্টি হয় না তবে একটি ঐতিহাসিক ভবন এভাবে নষ্ট করা হল — এ আমার সারা জীবনের লজ্জা। আচ্ছা, ওখানে বুলডোজার চালিয়ে একটা খেলার মাঠ বা স্টেডিয়াম করে দিলে হয় না?

বাংলাদেশে দেখলাম ধর্মের সমস্যা দ্বিমুখী।

বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষের যে ধর্ম, তার উৎসভূমি পশ্চিম এশিয়া। সেখানকার চরম জল-বায়ু, মরুভূমি প্রায় ভূ-প্রান্তর, ে সখানকার রুক্ষ কঠোর জীবনশৈলীকে আধার করে যে ধর্মের বিকাশ তার পরতে পরতে রয়েছে সেই সংস্কৃতির ছোঁয়া। অস্ত্রের ঝন ঝনানিতে তার প্রসার। কারবালার প্রান্তরে যে বিষাদ সিন্ধু রচিত হল সেখানেও কিন্তু হত্যা আর প্রতিশোধের লড়াই, ক্ষমতা-অধি কারের লড়াই, আধিপত্যের লড়াই। রুখু-শুখু প্রকৃতির বুক থেকে জীবনরস ছিনিয়ে নেওয়ার লড়াই থেকে যে সংস্কৃতির বেড়ে ওঠা — তার প্রতিফলন তো সেখানকার আরোপিত ধর্মে থাকবেই। তারপর একদিন দ্রুতগামী অশ্বের খুরধবনির তাল মিলিয়ে অস্ত্রের ঝনঝনানির সাথে সেই ধর্ম আছড়ে পড়ল ভারতবর্ষে। জলজঙ্গল আর নদী নালা খাল বিলে ভরা পূর্বভারতের এই বাংলা অঞ্চলে ক একসূত্রে বাঁধল সুলতানি রাজশক্তি। সুবে বাংলা শব্দটির প্রচলনও বোধ করি তখন থেকেই।

বাংলার লক্ষ মানুষ এই নতুন ধর্মের প্রতি আকর্ষিত হল প্রধানত দুটি কারণে। তৎকালীন হিন্দু সমাজ ধর্মের দোহাই দিয়ে অজস্র জাতপাতে বিভক্ত করে রেখেছিল সমাজকে। বহু মানুষকে, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষকে অন্ত্যজ শ্রেণী করে রাখা হয়েছিল যুগ-যুগ ধরে। বর্ণহিন্দুদের গোষ্ঠী সেই ধর্মের দোহাই দিয়েই তাদের মনুষ্যেতর জীবন যাপনে বাধ্য রেখেছিল। শ্রমের মূল্যটুকু দেওয়া হয়নি তাদের এমনকি মনুষ্যত্বের সাধারণ সম্মানটুকু দেওয়া হয়নি তাদের। মাথা উঁচু করে বাঁচার তাগিদে এইসব মানুষেরাই আশ্রয় নিল ইসলাম ধর্মের। প্রলোভন ছিল আরও একটা। রাজার ধর্ম গ্রহণ করলে হয়তো-বা রাজ অনুগ্রহ জুটতে পারে। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে মানবিক ধর্ম ছাড়া কোন আরোপিত ধর্মই মানব সমাজের প্রাথমিক চাহিদাগুলি মেটাতে সাহায্য করে না, উন্নত সাধন করে না। সামাজিক পরিকাঠামো বদল করে, অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসের কোন কাঙ্খিত পরিবর্তন এই সব ধর্ম সমর্থন করে না বরং, শাসন শোষণের বর্তমান স্থিতাবস্থা বজায় রাখতেই ধর্মের পরিকল্পিত সৃষ্টি। বাংলার মানুষের অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। বরং বলা যায় জীবন যন্ত্রণা একটু বাড়ল, এল সাংস্কৃতিক সংকট।

নদীমাতৃক বাংলার ভূ-প্রকৃতির বিশিষ্টতা, এই নরম মাটিতে উৎপন্ন ফসলের দ্বারা গড়ে ওঠা খাদ্যভ্যাস, সবুজ শ্যামল প্রকৃতির নয়নশোভন বাতাবরণ, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা বাংলার মানুষের প্রকৃতি স্বাভাবিকভবেই পেলব ও নমনীয়। এই মাটি ছুঁয়ে বেঁচে থাকা মানুষগুলোর চেহারা, খাদ্যভ্যাস, পোশাক আশাক, মুখের বুলি, আচার ব্যবহার, আনন্দ বেদনার প্রকাশভঙ্গি, জীবনচর্চা প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে তাই হল বাংলার সংস্কৃতি, বাঙালির সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি তার মাছে ভাতে, তার রসগোল্লা সন্দেশে, তার পাট পাতার বড়া আর মোচার ঘন্টে, তার দাড়িয়াবান্ধা, গোল্লাছুটে, তার বাউলের দেহতত্ত্বে, আববাসউদ্দনের পল্লীগানে, তার লালন-চর্চায়, পীর ফকির সুফি সন্তদের জীবনমুখী গানে। এ সংস্কৃতি তার রবীন্দ্রনাথের জীবন সন্ধানে, হিজল শাপলার ভিজে গন্ধে, তার সন্ধ্যা প্রদীপের নরম আলোয়, তার প্রাণ ভরা মা ডাকে, তার বাংলা ভাষায়। হাজার বছরের জীবনচর্চার মঙ্গলময় দিকগুলিকে নিয়ে, ক্ষণগুলিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এই সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি বাঙালি জীয়নরস। এ সংস্কৃতির বিহনে বাঙালির উৎসটি যাবে শুকিয়ে। বাঙালি আর বাঙালি থাকবে না।

ধর্ম যদি মানব চেতনার কোন স্খলন পরিমার্জনে উদ্বুদ্ধ করে, যদি জীবনদর্শনে চিরায়ত মানবিক গুণাবলীর বিকাশে সাহায্য করে, নানাবিধ লোভ আর ক্ষুদ্রচিন্তার আক্রমণ থেকে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করে তবে ধর্মের সেই সার অংশের অনুধাবন করা যেতে পারে একান্তই ব্যক্তিগত স্তরে। কিন্তু যখনই ধর্মকে সামাজিক ক্রিয়া কলাপের হাতিয়ার করে তোলা হয় তখনই আসে গণ্ডীবদ্ধতা আর সংকীর্ণতা।

স্বাভাবিক মানবিক ধর্মের অধিকারি মানুষ কোনও রকম আরোপিত ধর্মবিশ্বাস ছাড়াই চলতে পারে। ধর্মবিশ্বাস একান্ত ব্যাক্তিগত স্তরে রেখে প্রকাশ্যে তার বিজ্ঞাপন না করেও মানুষের দিন চলে। কিন্তু যে মাটিতে আমার জীবনধারণ সেই মাটি থেকে উদ্ভূত সংস্কৃতি বাদ দিয়ে আমি যে এক পা চলতে পারি না, সামাজিক থাকতে পারি না। আমার ধর্মবিশ্বাস যদি থাকতেই হয়, যেন আমার সংস্কৃতির পরিপন্থী না হয়, যেন আমার প্রতিমুহূর্তের জীবনযাপনে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

বাংলাদেশে এই বৈপরীত্য, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব বড় বেশি চোখে পড়েছে, প্রাণে বড় বেজেছে। এক আরোপিত ধর্মকে বজায় রাখতে গিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দুই সংস্কৃতির দোটানায় মনে হয়েছেবাংলাদেশকে, বাঙালিকে। নামাজ পড়তে হবে পশ্চিমমুখো হয়ে। কেন? আল্লা কি শুধু ওইদিকেই আছেন? অন্যদিকে ফিরে নামাজ পড়লে আল্লা কি অসন্তুষ্ট হবেন? আল্লা কি এতই সংকীর্ণমনা? নাকি ওই ধর্ম পালন করতে হলে পশ্চিমদিকের বিশেষ স্থানটিকে, বিশেষ সংস্কৃতিটিকে প্রাধান্য দিতেই এই নিদান?

দুর্বোধ্যতার আড়ালে এক ধরনের সম্ভ্রম সৃষ্টি করার প্রয়াস চলে। এদিকে দেখি ঈশ্বর আরাধানার সব শব্দই সংস্কৃততে। সংস্কৃত নাকি দেবভাষা, বিশেষ কজন লোকই ওই দেবভাষায় পারঙ্গম। আমরা আমজনতার শুধু ওই ভুল হোক শুদ্ধ হোক, উচচারণ শুনে, অর্থ না বুঝেই পুনরাবৃত্তি করেই সন্তুষ্ট থাকব এই ভেবে যে আমার কথা আমার প্রার্থনা আমার স্তব ঠিক জায়গায় পৌঁছেছে। কেন? ঈশ্বর কি এতই স্বল্পজ্ঞানী যে ঠিক ওইভাবে ওই শব্দে না বললে শুনবেন না, বুঝবেন না? গোটা প্রক্রিয়াটি পরিকল্পিতভাবে সাধারণের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে একটি বিশেষ সংস্কৃতির প্রভাব বজায় রাখার জন্য এবং এতদ্বারা বিশেষ কিছু মানুষের, বিশেষ এক শ্রেণীর সুবিধার জন্য। এবং সে সুবিধা একান্তই ইহলৌকিক, বস্তুগত এবং বলাই বাহুল্য, অর্থনৈতিক। বাংলাদেশে এই সমস্যার চক্রব্যূহ যেন আরও জটিল।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম হল ইসলাম। কথায় কথায় বলা ইসলামিক স্টেট। সেটা কী বস্তু? খায় না মাথায় দেয়? রাষ্ট্র তো একটা যন্ত্র,

শাসনযন্ত্র। মার্কসবাদী শ্রেণিচেতনা নিয়ে বলা যায় শোষণযন্ত্র। ক্ষমতাসীন শ্রেণি কর্তৃক অন্য শ্রেণির ওপর শোষণ বলবৎ রাখার যন্ত্র হল রাষ্ট্র। এইটাই রাষ্ট্রের সৃষ্টির ইতিহাস, এইটাই তার সংজ্ঞা। মার্কসবাদ তাই বলে, এই রাষ্ট্রযন্ত্র কোন শ্রেণির অধীনে থাকে ব সেটাই বিবেচ্য। মুষ্টিমেয় পরান্নভোজী ব্যাক্তির, না যারা শ্রমে-স্বেদে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায় সেই শ্রমিক-কৃষকের হাতে?

এ কথা কিন্তু সাধারণ বোধবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই বোঝেন যে চরিত্র যাই হোক রাষ্ট্র একটি যন্ত্র। একটি ব্যবস্থা। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের সব কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হবে।

প্রত্যেকটি যন্ত্রের একটি স্বাভাবিক ধর্ম থাকে। যে কাজের জন্য যন্ত্রটি তৈরি করা হয়েছে সেই কাজটি করা সেই যন্ত্রের ধর্ম। যন্ত্রের আর কোন ধর্ম থাকে না। আর কোন ধর্ম হয় না। ড্রিলিং মেসিনে নাম বা বাহ্যিক রঙচঙ যাই হোক না কেন। এমনকি সেই মেসিনে র অপারেটর বা চালক লুঙ্গিই পরুন বা উপবীত ধারণ করে গায়ত্রী জপেই আসুন; আল্লা-আল্লাই করুন বা রাম-রামই বলুন। ভার তবর্ষের রাষ্ট্রকাঠামো ধনিকশ্রেণির স্বার্থে গঠিত। নাম তার গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, সোনার পাথর বাটি বা কাঁঠালের আমসত্ব ইত্যাদি যাই হোক না কেন। এ রাষ্ট্রব্যবস্থা ধনিক শ্রেণির স্বার্থ দেখার জন্য তৈরি। সংবিধানের প্রথম প াতায় যতই জনগণের দ্বারা দিয়া কর্তৃক লেখা থাকুক না কেন এ রাষ্ট্রযন্ত্র, এমনকী — চালক পালটালেও, কতবারইতো কতরঙের জামাকাপড় পরে চালক এলেন, যন্ত্র তার নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ীই কাজ করবে। আমরা পশ্চিমবঙ্গেই দেখছি, একেবারে ছাপমারা আম াদের চালক দিয়ে দেখছি — যন্ত্র তার কাজ করেই যাচ্ছে। তফাৎ কি হয়নি কিছুই? হ্যাঁ, হয়েছে। বহুদিন ধরে চালাতে চালাতে চা লক বুঝছেন না যে তিনি আর চালাচ্ছেন না, যান্ত্রই তাকে চালাচ্ছে। আর এত পতাকা, মুষ্টিবদ্ধ হাত আর শব্দ দিয়ে যন্ত্র সাজানো হয়েছে যে বোধহয় ন্যাবা ধরে গেল, চোখেও, বোধেও। ভাবছি, কে জানে কোন দাড়িওয়ালা খটোমটো জার্মান ভাষায় কবে কী ি লখেছিলেন — যন্ত্র ভেঙে টেঙে আমাদের প্রয়োজন অনুসারী মৌলিক যন্ত্র গড়তে হবে — আর ওসবের দরকার নেই, বেশ তো আছি, এই ড্রিলিং মেসিন দিয়েই সেপিং করা যাবে, দেশের দশের সেপটা পালটে দেওয়া যাবে।

বাংলাদেশে তো গোদের ওপর বিষফোড়া। পাকিস্তানি শোষণের জোয়াল ঠেলে ফেলে যদি-বা মাথা তুলে দাঁড়াল বাংলাদেশ, সাংি বধানিক মূল কাঠামোটি রইল একই, কিছু উর্দু বলা মানুষের বদলে বাংলা বলা মানুষের দাপট শুরু হস। এদেশে '৪৭-এর পর আ মরা যেমন সাদা চামড়ার বদলে বাদামি চামড়া পেয়েছি। ব্রাউন-মিলার-হেনরীদের বদলে পেলাম বিড়লা-টাটা-আম্বানিদের। মেসি নটা কিন্তু ড্রিলিং রইল। বাংলায় ড্রিল করলে বাঙালির রক্তক্ষরণ কি কম হয়? বিষফোড়াটি তো আরও মারাত্মক। এ তো সংস্কৃতি র সমস্যা, আইডেনটিটির সমস্যা।

ইসলাম ধর্মের সৃষ্টির ইতিহাস, পরিস্থিতি, পরিবেশ পর্যালোচনা করে একথা অবশ্যই বলতে হবে পরিবেশ পরিস্থিতি বদলের সাথে, সময়ের এই ধর্মের ব্যবহারিক আচরণবিধি আধুনিক হয়নি। এই একুশ শতকে, হাতের মুঠোয় অনুভব করা যায় যে পৃথিবীর নাগি রক হয়ে এইসব অনুশাসন ক্রমশই কি বিভেদ তুলছে না? দিনে পাঁচবার নমাজ, বছরের একমাস রোজা, বিশেষ দিনে পশুহত্যার মহোৎসব — এমনই আরও কত বিধিনিষেধ। এবং, এর সবটাই সোচ্চারে, গোষ্ঠীবদ্ধভাবে, সামাজিক ক্রিয়াকলাপে পরিণত করে। বলা যেতেই পারে, এসব অনুশাসন মানলেই বা কী ক্ষতি? হ্যাঁ, ক্ষতি আছে।

ইতিহাস প্রমাণ দিচ্ছে, অতিরিক্ত অনুশাসন, বাহ্যিক বিশেষ আচরণবিধি মানুষকে মহীয়ান করে না, দৃষ্টির প্রসারতা বাড়ায় না বরং তাকে কূপমণ্ডুক করে তোলে। কূপমণ্ডুক মানুষের অজ্ঞতা আর গোঁড়ামি জন্ম দেয় বিচ্ছিন্নতার। বিচ্ছিন্নতা থেকে আসে নৈরাজ্য, নৈরাজ্য জন্ম দেয় উগ্রতার, সন্ত্রাসের, মানুষ তার হুঁস হারিয়ে ফেলে।

মানুষ তার বাঁচার প্রয়োজনে লতাপাতা খায়, ফলমূল খায়, মাছ মাংস ডিম খায়। এককথায় বলা যায় মানুষ কী খায়। এর পিছনে তার স্বাদ, উপকারিতা, পাওয়া না পাওয়া, অভ্যাস ইত্যাদি বিষয়গুলি কাজ করে। তা, আমি আমরা রুচি অনুযায়ী কোন খাদ্য গ্রহণ করলে অন্যের চোখে হেয় বা ঘৃণ্য হব কেন? আমার উপাসনা গৃহের সামনে যদি কেউ আমার অপছন্দের মাংস, অবশ্য কেন অপ ছন্দ সেটাই পরিষ্কার নয়, ফেলে যায় তাহলে সেই সামান্য ঘটনাকে ঔদার্যের সাথে গ্রহণ না করে দাঙ্গায় মেতে উঠি কেন? যে ধর্মী য় অনুশাসন আমাকে সহনশীলতা না শিখিয়ে ডমিনেট করতে, দাঙ্গা করতে প্ররোচিত করে সেই ধর্ম না থাকলে কী হয়?

বাংলাদেশে দেখলাম কথায় কথায় কোরাণের উদ্ধৃতি, হাদিসের কোটেশন। দিচ্ছে কারা? যারা প্রতিমুহূর্তে অন্যায় করছেন, অত্যা চার করছেন, সমস্ত রকম দুর্নীতিতে সিদ্ধহস্ত এবং এরা এ সমস্ত কিছুই করছেন ইসলামকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, বোরখায় রূ

পান্তরিত করে।

জিরায়ত, এহরাম, জোহরা, লাববায়েক, ইবাদত, আছর, তাওয়াফ, মাগরিফ, খুৎবা, তাকওয়া, মাকবুল, মাসনুন, শিরকে খফী, এ শা, নাসিল, আরাফার, কুফরী ইহরাম, তালবিয়াহ ..... ইত্যাদি ইত্যাদি। এই শব্দগুলো এবং এরকম আরও অনেক শব্দ আজ বাং লাদেশের হাওয়াতে পাওয়া যাবে। কুষ্টিয়ার একের ভিতর তিন ভদ্রলোকের মতো বিশেষ কিছু মানুষের মুখে খই ফোটার মতো এ ই ধরনের শব্দ ফুটতে শুনেছি। শব্দগুলি আরবি শব্দ।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে, সাগরদাড়ির পথে, নড়াইলে মধুমতি পাড়ের গ্রামে, পটুয়াখালি পেরিয়ে কুয়াকাটার পথে, বিক্রমপুরের এ কাধিক গ্রামে, চট্টগ্রামের রাঙামাটির অঞ্চলে, টেকনাফের গভীরে বা কুষ্টিয়া থেকে শিলাইদহের পথে বহু গ্রামীণ মুসলমানের সঙ্গে কথা বলেছি। এইসব শব্দের অর্থই তাঁরা জানেন না। কয়েকজন সসংকোচে এও জানিয়েছেন, ওই যে দিনে পাঁচবার মসজিদ থেকে মাইক সহযোগে কিংবা মাইক ছাড়াই বিশেষ সুরে ছন্দে নমাজ পড়া হয় তার অর্থ তাঁরা বোঝেন না। লজ্জা মিশ্রিত গর্বের সঙ্গে এও বলেছেন —নমাজ, সে তো পড়তেই হবে, আল্লার কাছে দোয়া মাঙা, খেয়াল করতে হবে শব্দটি প্রার্থনা নয় দোয়া, আমি বুঝি না বুঝি আল্লাতালা তো বুঝবেন।

এইখানে সমস্যা। জীবন চলছে বাংলায়, সবকিছুই হচ্ছে বাংলায় কিন্তু ধর্ম বিষয়ক, ইসলাম সম্পর্কিত কথাবার্তা বলতে হবে অধি কাংশের দুর্বোধ্য আরবিতে। তাহলেই বোধকরি আল্লাতালার আরও কাছের লোক, নিজের লোক হওয়া গেল, আরও একটু মুসল মান হওয়া গেল। এবং এভাবেই ধাপে ধাপে পশ্চিম এশিয়দের মতো দাড়ি, লম্বা লম্বা পোশাক, প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় মাংসের প্রাধান্য । অথচ নদীমাতৃক দেশের শ্যামল কোমল বাঙালি থাকতেও চেয়েছে। সেখানে সারাদিন নাম তার রবীন্দ্রনাথ, তার জসীমউদ্দিন। তাঁদের কথায় তার আত্মার মুক্তি, তাঁদের সুরে তার প্রাণের আরাম।

ঢাকার সবচেয়ে বড় বাস আড্ডা গাবতলির সাকিল ভাই-এর কথা মনে পড়ছে। ওর কাজ যাত্রী ধরে আনা। কই যাইবেন? কুষ্টিয়া ? খুলনা? আসেন আসেন, ভাল সিট আছে। দ্যান, সুটকেসটা আমারে দ্যান, এখনই যামু গিয়া। জি? অ, বেনাপোল যাইবেন? কই বেন তো? চলেন চলেন। কখন যাইবো? কী যে কন কর্তা, এই তো গেছি গিয়া।

এমনই হাজার কথা বলে, প্রায় বগলদাবা করে বাসের সিটে বসিয়ে তবে তার হাত থেকে ছড়ান। এইভাবে সারাদিনে কমিশন বাব দ ওর হাতে আসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা। কিছু বাঁচাতে পার? কী যে কন কর্তা, এক বেলা খাইতেন — কেন? একবেলা খেতে এত লা গবে কেন, এর কমেও তো হয়। হয়, তবে মাংসতো হয় না। তা রোজ রোজ মাংস নাই-বা খেলে। কী যে কন কর্তা, মাংস ভাত না খাইলে হয়?

সামান্য তথ্য। কিন্তু সুদূরপ্রসারী এত তত্ত্ব এর উৎসে। বিপরীতমুখী দুই সংস্কৃতির টানাপোড়েন বাংলাদেশ কোথায় দাঁড়িয়ে, বাঙালি কোথায় পৌঁছল?

ধর্মের নামে এই বিজাতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসী ভূমিকা থেকে সাবধান হতেই হবে। ইউরোপ তার অন্ধকারময় চার্চের যুগ পেরিয়ে এ সেছে। বর্তমান ভারতে নতুন করে ধর্মের ঠ্যালায় আমাদের শান্তি বিঘ্নিত। তথাকথিত হিন্দুধর্মের বহুধা বিকাশের ফলে, ভারতবর্ষে র বহুজাতিক চরিত্রের বলে, বিচিত্রধর্মের সাংস্কৃতিক জীবনশৈলীর কল্যাণে এই ধর্মীয় সংকীর্ণতাবাদ সমাজের নিয়ামক শক্তি হয়ে উ ঠতে পারবে না — এ বিশ্বাস আমার দৃঢ়।

বাংলাদেশ সমাজজীবনে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ধর্মের এই ক্রমশ সর্বগ্রাসী ভূমিকা — বুঝতেই হবে, মঙ্গলময় পথের দিশা এটা নয়। বা ঙালির সংস্কৃতির ধ্বংস করে, বাঙালির চরিত্র পালটে দিয়ে বাংলাদেশকে পিছন ফিরিয়ে দেওয়ার এই যে চক্রান্ত, তাকে ব্যর্থ করতে হবে বাঙালিকেই।

দু-একটি সাম্প্রতিক তথ্য জানা যাক। বর্তমান বাংলাদেশের শাসকশ্রেণী একটি অংশে যারা নিজেদের ষোলো আনা মুসলমান মনে করেন এবং তালিবান-আত্মীয়তার কথা সগর্বে ঘোষণা করেন তারা, জমায়েত ইসলামীরা, বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে পৌত্তলিকতা আবিষ্কার করে এটি পরিবর্তনের কথা বলেছেন। বাংলা নববর্ষ এদের বিবেচনায় এবং বর্জনযোগ্য। একুশে ফেব্রুয়ারী ে

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের অনুষ্ঠান পরিকল্পনাও এদের না-পসন্দ।

বাংলা-একাডেমি বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল। বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলা ভাষা এবং বাঙালি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের বাংলা একাডেমি পরিচালিত বাংলাদেশ গ্রন্থমেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কোরাণ, গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক থেকে পাঠ হত। এবার শুধুমাত্র কোরাণ পাঠ হল, আমন্ত্রণপত্রে বিসমিল্লাহ ..... বসান হল। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তৎকালীন বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ঠিক নৈকুষ্যকুলীন মুসলমান বলে মানতেন না। বলা হত, এরা বড় বেশি বাঙালি। তাই কি এই মরণঝাঁপ? ডলার, পেট্রোডলার ভূমিকা কে জানে?

আমাদের কুষ্টিয়ার একের ভিতরে তিন দাদা বললেন, দ্যাখেন ভাইয়া, আমরা মুসলমান, ইমানের জন্য আমরা সব করতে পারি। আমরা হইলাম গিয়া ধর্মভীরু জাত। আল্লার রহে আমরা সব করতে পারি। শোনেন, হয়রতের বিদায় হজ্বের বাণী — হে মুসলমানগণ, হুঁশিয়ার। নেতৃ-আদেশ কখনও লঙঘন করিও না। যদি কোন কর্তিত নাসা কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের আমীর করিয়া দেওয়া হয়এবং সে যদি আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদিগকে চালনা করে, তবে অবনত মস্তকে তাহার আদেশ মানিয়া চলিবে।

অ্যালকোহল লাঞ্ছিত চোখের কাঁপিয়া গভীর ধর্মানুরাগীর মোলায়েম হাসি সহ আমাদের আলোচনা শেষ হল।

আমি আতঙ্কিত হই। মনে পড়ে গেল বাংলাদেশের আর এক মুসলমানের, নাকি বাঙালির কথা — 'ভাষা আন্দোলনের মূল চেতনা ছিল অসাম্প্রদায়িকতা — বাঙালিত্বের সবচেয়ে বড় পরিচয়। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে সেই চেতনাই প্রতিফলিত হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পর, মুক্তি যুদ্ধের তিরিশ বছর পর বাহান্ন ও একাত্তরে চেতনাবিনাশী চক্রান্ত যদি আমরা প্রতিহত করতে না পারি বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি ধবংস হয়ে যাবে। এ ভূখণ্ড পরিচিত হবে ভিন্ন কোন নামে, এদেশের মানুষ পরিচিত হবে বিজাতীয় কোন দর্শনের অনুসারী হিসাবে। বাংলা, বাঙালি ও বংলাদেশকে বাঁচাতে একে প্রতিহত করতেই হবে।

স্বরূপের বিবর্তনঃ অসাম্প্রদায়িকতা থেকেধর্মীয় জাতীয়তা

গোলাম মুশরিদ

১৯৫৮ সালে নতুন ধরণের একটি অক্সফোর্ড রেফারেন্সডিকশনারির সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এতে বাংলাদেশের কী পরিচয়দেওয়া আছে, তা জানার কৌতুহল হয়েছিল। খুলে দেখি, প্রথমেই বাংলাদেশেরপরিচয় দেওয়া আছে- এটা একটা মুসলিম রাষ্ট্র। : ধর্মনির পেক্ষতার : নীতি তার আগেই মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউররহমানের দৌলতে খন্ডিত হয়েছিল। কিন্তু তবু বাংলাদেশ : তখনো সরকারীভাবে মুসলিম রাষ্ট্রহয়নি। তাই আমার দেশের এই পরিচয় দেখে আমি হতাশ হয়েছিলাম। মুসলমান -প্রধান : দেশ বললে আমার হতাশারকারণ হতো না। ভাবলাম, এ হয়তো : এইঅভিধানের সম্পাদকদের নিজস্ব বিচার। দেখা যাক, ভারতের পরিচয় কী লেখাআছ? দেখলাম, না, ভারত হিন্দু রাষ্ট্র নয়। নেপাল হিন্দুরাষ্ট্র নয়। সিংহল বৌদ্ধ রাষ্ট্র নয়। সবচেয়ে আশ্চর্যেরবিষয়, ইসলামী প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তানও মুসলিম রাষ্ট্র নয়।গোটা উপমহাদেশের মধ্যে এক মাত্র বাংলাদেশেরই পরিচয় ধর্ম দিয়ে। : তার মানে এই যে, শেখ মুজিবেরমৃত্যুর পরথেকে বাংলাদেশের সরকারগুলো ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবেব্যবহার করার জন্য ইসলামী জিগির শুরু করেছিল (সরকারী কর্তারাব্যক্তিগত জীবনে যতই অন-ইসলামী হোন না কেন), তা এক দশকের আগেই : আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

:::::::::: অথচ বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল একটিভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলস্বরূপ। স্বাধীনতাযুদ্ধ শেষ হবার এক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের যে- সংবিধান রচিত হয়, তাতেওবাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে : ঘোষণা করা হয়েছিল। যদিও ততদিনে এটাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলযে, বাংলাদেশ সরকারীভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হলেও এই দেশরজনসংখ্যার : শতকরা : ৮৫ ভাগই যেহেতু মুসলমান, সুতরাং এটিপ্রধানত একটা মুসলিম দেশ। প্রতিদিনের সরকারী ক্রিয়াকর্মে, সরকারী মাধ্যমে : সর্বত্রই : ততদিনে মুসলমানী জীবনধারার প্রতিফলনঘটছিল সন্দেহাতীতভাবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোনির্দ্বিধায় যোগ দিয়েছিল। রাষ্ট্রীয় : জীবনে মুসলমানী জীবনধারার এই প্রতিফলন দেখে তারা তখনকতটা হতাশ হয়েছিল, সঠিক জানা নেই। তবে, ধারণা করি , আংশিকভাবেহতাশ হলেও , এটাকে এই সম্প্রদায়গুলো একেবারে : অপ্রত্যাশিত বলে মনে করেনি। সুতরাংসংবিধানেধর্মনিরপেক্ষতা র বিধান থাকলেও , সেই সংবিধানেরপ্রণেতারা এবং দেশের জনগণ ভালো করেই জানতেন যে, সংবিধানে যে-ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গৃহীত হয়েছে, সেটা তত্ত্বগতভাবেই স্বীকৃতহয়েছে। এমন কি, ততদিনে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এইধর্মনিরপেক্ষতা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার মতো অতটাধর্মনিরপেক্ষ নয় - অর্থাৎ কোনো ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মে : রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণা করাহবে না, বাংলাদেশ তা মানবে না। বস্তুতঃ বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবততদিন ঈদ, ঈদে মিলাদ-উন নবী থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি ইসলামীউৎসবই : তাঁর এবং রাষ্ট্রপতিরসরকারী বাসভবনে সরকারী খরচে পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এমন কি,বাংলাদেশের ফৌজি বাহিনীর ক্যাডেটরা ততদিনে তাদের শিক্ষা সমাপনকরছিলেন যে-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বললেও বাড়িয়ে বলাহয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও , কোনো কোনো ব্যাপারে দেশের উদার বুদ্ধিজীবীএবং সংস্কৃতমনা মানুষরা তাঁদের দেশকে ধর্মনিরপেক্ষ একটি দেশ হিসেবেপরিচয় দিতেই আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের বাঙালি পরিচয়, তাঁদের ধর্মীয়পরিচয়ের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।

:::::::::: কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরিবেশ এবংআর্ন্তজাতিক কুটনীতি এর অনুকুল ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশঅচিরেই তাই যাত্রা শুরু করেছিল যেখান থেকে তিন দশক আগে তার আগেরপ্রজন্ম তাদের যাত্রা আরম্ভ করেছিল । চল্লিশের দশকে বাঙালিমুসলমানরা তাঁদের বাঙালিত্বকে বিসর্জন দিয়ে তাঁদের ধর্মীয় পরিচয়কেই বড়করে তুলেছিলেন এবং দেড় হাজার মাইল দূরের একটি ভিন্ন ভাষী : জাতির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন। কিন্তু দুদশক যেতে না যেতে, তাঁরা আবার ধর্মের বদলে : তাঁদের ভাষিক পরিচয়কে বড় করে স্বতন্ত্র দেশ গড়েছিলেন, যে- দেশে : অন্য : সম্প্রদায়কেও তাঁরা তাঁদের জাতির অভিন্ন অংশ হিসেবে আলিঙ্গনকরেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হতে যতটা সময় লেগেছিল,বাংলাদেশ থেকে ফের পাক - বাংলা হতে সময় লেগেছিল তার চেয়ে ঢের কম।

:::::::::: এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের উজানপথে যাওয়ার প্রক্রিয়া বিশ্লেষন করব দু ভাগে। প্রথম ভাগে দেখাযাবে, রাজনৈতিক, সামাজিক, এবং আর্ন্তজাতিক : কারণ কিভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে : কাজ করেছিল । আর দ্বিতীয় ভাগে দেখা যাবে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষণার ধর্মীয় মদ সাধারণ মানুষেরজাতীয়তা বাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে কিভাবে ঘোলাটে করেছিল।

২

বাংলাদেশস্বাধীন হবার মাত্র বছর কয়েক পরে শামসুর রহমান তাঁর স্বদেশকে অদ্ভুত : উটের পিঠে চড়ে অজানা দেশে যাত্রা করতে দেখেছিলেন। এতে তাঁর মনে যে শোক : জেগে উঠেছিল , তাই থেকে ওর নামে তাঁর একটি বিখ্যাতশ্লোকের জন্ম । তাঁর এই শ্লোকরপটভূমি আমার একেবারে অজানা ছিলনা, তবু ঘোড়ার মুখ থেকেই শুনতে চেয়েছিলাম। সেজন্যে : তাঁকে ১৯৮৬ সালে জিগে

্যসকরেছিলাম এরপটভুমি সম্বন্ধে। তখন জানতে পেলাম, স্বদেশকে উটের পিঠে দেখারযে-কথাটি তিনি বলেছিলেন , সেটা পুরোপুি র প্রতীকী ছিল না।বাস্তবেও ও ধরণের একটা ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন।একদিন : তাঁর ডি আই টিরঅ্যভেনিউর অফিসে বসে আছেন, : এমনসময়ে দেখলেন, রাজধানীর সেই প্রশস্ত এবং অভিজাত রাজপথ দিয়েসত্যি সত্যি উট : নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।এসব পি বত্র উট আমদানি করা হয়েছিল পবিত্র পাকিস্তান থেকে পবিত্রকোরবানি উপলক্ষ্যে। কারণ পূর্বপুরুষেরা : এত শতাব্দী ধরে আল্লাহ ার নামে গোরু-ছাগল উৎসর্গ করলেও : , মুজিব -পরবর্তিকালে বাংলাদেশে গোরু-ছাগলকোরবানি দিয়ে মনের খায়েশ যেন ঠিক পূরণ হচ্ছিল না। তাই একেবারেখোদার (মাপ করবেন, আল্লাহর) দেশের পবিত্র জন্তু এনে মনেরঅভিলাষ পূরণের চেষ্টা করেছিে লেন দু-ধরণের লোকেরা। বাংলাদেশেরজন্মের ফলে একচেটিয়া : ব্যবসাআর ইন্ডেটিং : করে যাঁরা নব্যধনীহয়েছিলেন তাঁরা, আর ধর্ম প্রচার বা চাকরি সূত্রে মধ্যপ্রাচ্যেরপেট্রো ডলারের আর্শীবাদ পেয়েছিলেন যাঁরা সেই ভাগ্যবানরা।

:::::::::: খেঁজুর খেলে সওয়াব হবে অথবা উটকোরবানি দিলে ইসলামী জোশ মজবুত হবে-- এই মানসিকতা বাঙালি মুসলমানদে র মনেএকেবারে নতুন, তা অবশ্য বলা যায় না। ১৯৪০-এর দশকে প্রকাশিত একটিগল্পে শওকত ওসমান এ রকমের চরিত্র অঙ্কন ক রেছেন, যার মধ্য দিয়ে এইমানসিকতার পরিচয় মেলে। চালের মধ্যে ভেজাল দিয়ে : বিক্রি করে এমন একজন লোক তার কুকর্মসপ ক্ষে এই যুক্তি দেখিয়েছেন ঃ চালের মধ্যে কাঁকর মেশানো আছে ঠিকই ,তবে সে কাঁকর একেবারে খোদ আরব দেশ থেকে আনা। তার মানে, সে চালবিক্রিতেও পুণ্য, আর খেলে তো কথাই নেই। ১৯৪০ -এর দশকের এই মানসিকতারএকটা ব্যাখ্যা আমি মনে ম নে খাড়া করতে : পারি। তখন অর্থনৈতিক , রাজনৈতিক এবং সামাজিক -সব দিকদিয়েই : বাঙালি মুসলমানরা পিছিয়ে : : ছিলেন। তাঁদের সেই পিছিয়ে থাকা অবস্থানটা : কোথায় : সেটা তাঁবা পড়শি হিন্দুদের সঙ্গে তুলনা করে দিনের আলোর মতপরিষ্কার দেখ তেও পাচ্ছিলেন। তখন জমিদারের প্রায় সবাই হিন্দু ,উচচশ্রেনীর চাকরিবাকরির তো কথাই নেই , সাধারণ চাকরিবাকরিরমঝেও খুব কমই মুসলমানদের। ১৯৪৪ সালে সমগ্র বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার,উড়িষ্যা-এই বিরাট ভুভাগ থেকে এম এ, বি এ নয়, ম্যাট্রিক পরীক্ষাদিয়েছেন মাত্র হাজার চারেক মুসলমান। সুতরাং তাঁদের মনে ক্ষোভ থাকতেপারে, তাঁরা এককাট্টা হতে পারেন দেড় হাজার মাইলের দূরের মুসলমানদেরসঙ্গে। পূর্বপুরুষরা আরব-ইরাণ থেকে এসেছেন , আর নিজের মাতৃভাষা পাকজবান উর্দূ নিজেদের এই স্বরূপের কথা ভেবে গর্ব বোধ করতে পারেন,সান্ত্বনা পেতে পারেন। কিন্তু একবার পাকিস্তানী নৌকায় চড়েভরাডুবি হবার পর আবার মাগরেবী হবার মানসিকতা আসে কোথা থেকে, সেটাবোঝা মুশকিল। বস্তুত, যে - দেশ জন্ম নিল ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবা দেরনিশান উড়িয়ে এবং জন্মের পরেই যে তার সংবিধানের অন্যতম মূলনীতিহিসেবে গ্রহণ করল ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে, সেই দেশ কীভাবেক'বছরের মধ্যেই মৌলবাদের খর স্রোতে ভেসে যেতে আরম্ভ করল, সেটাপ্রায় রহস্যের ব্যাপার।

:::::::::: কয়েকটা কারণ অবশ্য সহজেই চোখেপড়ে। ৭১-এর যুদ্ধের সময়ে ভারত কৃপা করে এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয়এবংখা দ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল- বাংলাদেশের বেশির ভাগ লোক এটা দ্রুত ভুলেগিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য একটা কথা মনের মধ্যে তাঁরা পাকাপাকি জায়গাদিয়েছিলেনঃ ভারত : ডিসেম্বরের যুদ্ধেবাংলাদেশকে জিতিয়ে দিয়েছিল আপন স্বার্থে , বাঙালিদের প্রতিআন্তরি ক কোনো প্রেমে নয়।

:::::::::: শতাব্দীর পর শতাব্দী বাস করলেও,হিন্দুদের মধ্যে নেড়েদের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ আর মুসলমানদেরমধ্যে মালাউনদের প্রতি নির্ভেজাল ঘৃণা বিদ্যমান ছিল চিরদিনই। কেবল দেশবিভাগের পর অনুকূল পরিবেশে অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন ঘটেছিল। তখনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার মাঝেমধ্যে মুসলমানরা হিন্দুদের বা হিন্দুরামুসলমানদের রক্ত পাত ঘটাননি, তা নয়; তবে প্রাত্য হিক জীবনেপারস্পরিক প্রতিযোগিতা কমে গিয়েছিল খুবই , বিশেষ করে পূর্ববাংলায় । বরং প্রতিযোগিতা এবং শোষনের উৎস হ য়েছিলেন পশ্চিমপাকিস্তানী মুসলমানরা। এই অনুকুল পরিবেশে, ১৯৬০ -এর দশকের শেষদিকে হিন্দুদের প্রতি ঘৃণা এবং অবিশ্বাস সাময়িকভাবে ধামাচাপা দিতেহয়েছিল। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় , সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে : মালাউনের আতিথ্য নিতে : মুসলমানদের আপত্তি হয়নি। বাঙালিয়ানারযে-জোয়ার এসেছিল, : : সে পরিবেশে নেড়েদের সাহায্য দিতেও হিন্দুদেরমনে দ্বিধা দেখা দেয়নি। কিন্তু তবু সাম্প্রদায়িকতার সর্বধ্বংসী লাভা স্রোতঅন্তরের মধ্যে সঞ্চিত ছিল সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো। যুদ্ধের পর সেইঘৃণা এবং অবিশ্বাসই আবার দাঁত মেলে দেখা দিয়েছিল।

:::::::::: বাঙালি মুসলমানদের মনে প্রথমআশঙ্কা হলঃ ভারতীয় সৈন্যরা শিগগির অথবা আদৌ তাঁদের দেশ ছেড়ে যাবেকিনা। অ নকেই ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকেন ঃ শেষ পর্যন্ত এই সৈন্যরাবাংলাদেশেই থেকে যাবে। কিন্তু ৭২-এর মার্চে ভারতীয় সৈন্যরা যখন চ লে গেল,তখন ঝড় সামলানোর বিষয় হলঃ আমাদের কোটি কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র(অর্থাৎ পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র) ওরালুট করে নিয়ে গেছে। ভারতের ফৌজি বাহিনী পাকিস্তানী দখলদারবাহিনী, যদিও সাময়িকভাবে । এমতবস্থায় , তারা দেশ স্বাধীন করে দেবারপর তাদেরই বিরুদ্ধে (বাংলাদেশের তিন দিকে তো তারাই)সম্ভাব্যলড়াইতে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যেআম াদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে গেলে, আমাদের জন্যে বেশভালোই হত। তবে, সেটা কোন বুদ্ধিমান লোক কেন করবে, আমার কম বুদ্ধিদিয়ে আমি তা বুঝতে পারছিনে।

:::::::::: সে যা-ই হোক , সৈন্যপ্রত্যাহার নিয়ে যখন সাম্প্রদায়িক জিগিরটা জোরদার করা গেল না অথবা হলনা, তখন দেখা দিল তার চেয়েও গুরুতর পরিস্থিতি। যুদ্ধ বিধবস্তবাংলাদেশের উৎপাদন এবং বন্টন ব্যবস্থা উভয়েই বোধগম্য কারণে ভেঙেপড়েছিল।অ

ভিজ্ঞতাবিহীন : লোকদের হাতেদেশ এবং শিল্প পরিচালনার ভার পড়ায় এই সমস্যা আরও গুরুতরহয়েছিল। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা তা এবং অসাধারণ ক্যারিসম্যাটিক নেতাহলেও, শেখ সাহেব দক্ষ সংগঠক অথবা প্রশাসক ছিলেন না। তাঁরঅনুরাগীদের পক্ষেওসে কথা বলা মুশকিল। তদুপরি, বোঝার ওপর শাকেরআঁটির মত সমস্যাকে জটিলতর করেছিল আওয়ামী লীগের স্বজনপ্রীতি এবংদুর্ন ীতি।বাংলাদেশের কোনো নেতা গণতন্ত্রের জন্যে শেখ : সাহেবের মতো জেল খাটেননি। কিন্তু তিনি যখন সর্বোচ্চক্ষমতার অধিকার ী হলেন, তখন খুব গণতান্ত্রিক নেতার মতো আচরণকরেননি। বস্তুত, তাঁর আধা-সামন্ততান্ত্রিক নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় আওয়ামীলীগে র স্বজনপ্রীতি , চোরাকারবার , দুর্নীতি এবং ফ্যাসিবাদ নতুনবৃষ্টির পর আগাছা যেমন হু হু করে বেড়ে ওঠে : , তেমনি রাতারাতি ে বড়ে উঠেছিল। আওয়ামী লীগের নেতা,পাতি-নেতা এবং যুবনেতারা এক -এক জন এ সময়ে যে-আচরণ করেছিল,কোনো : গোস্টা পো তাকে হার মানাতেপারে না।

:::::::::: যুদ্ধের ফলে আর একটা মস্তবড় ক্ষতি হয়েছিল আমদানি-রপ্তানির। দু'দেশের মধ্যে এই ব্যবস্থাএকটা শক্ত ভিতের ওপর দঁ াড় করাতে সময় লাগে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেরমধ্যে এই পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য বস্তুত বহু বছরের ব্যাপক আলা পআলোচনার দরকার। ওদিকে ন'মাসের যুদ্ধের সময়ে দেশ থেকে ভোগ্যপণ্যধীরে ধীরে : বলতে গেলে নিঃশেষিতহয়েছিল। যুদ্ধের পরেই টুথ পেস্ট আর কাপড়-কাচা সাবান থেকে আরম্ভকরে কাপড়-চোপড় পর্যন্ত অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিশই বাজারথেকে ড ধাও হয়েছিল। হন্যে হয়ে খুঁজে ক্রেতারা তাঁদের পুরোনো : : ব্র্যান্ডগুলো বাজারে পাচ্ছিলেন না। পেলেন বাড়ির পাশেরভারতথে ক আনা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল কিছুমালামাল। এগুলোর কিছু এসেছিল সরকারী পথে, কিন্তু বেশীর ভাগই এসে ছলচোরাকারবারিদের চোরাই পথে। ভারতের এইসব মালামাল গুণগত দিকদিয়ে ছিল পশ্চিমী, জাপানী, অথবা চীনা পণ্যেরতুলনা য় নিম্ন শ্রেণীর । তাছাড়া, প্রথমে দামে শস্তা হলেও, পরে এগুলোও মহার্ঘ বলে বিবেচিতহয়। তবে তা স্বত্ত্বেও , বাংলাদেশেরবাজার ভারতীয় এইসব পণ্যেই প্লাবিতহয়। কথায় বলে যারে দেখিতে নারি, তার চলন বাঁকা। এমনিতেই হিন্দু তথাভারত বিদ্বেষ ছিল আ মাদের মজ্জাগত । তার ওপরে ভারতীয় পণ্যের এইপ্লাবন আমাদের মনে হিন্দু তথা ভারত বিদ্বেষেরও প্লাবন নিয়েএসেছিল।এই প রবেশেই : অনেকে বলতে শুরুকরেন ঃ এর চেয়ে পাকিস্তানের আমলেই ভালো ছিলাম।

:::::::::: অনেকের মনে আবার কাজ করছিলআর একটি বিশাল জুজু -ভারত হয়তো আমাদের দেশটাকে দখল করে নেবে। অথবা আমাদের স্বাধীনতা : হবে নামে মাত্র,-কার্যতএবং আসলে আমরা থাকব ভারতের একটি রাজ্যের মতো। অনেকের বিশ্বাস ছিলএর চেয়েও সরল। তাঁরা আশঙ্কা করতে আরম্ভ করলেন , দেশ বিভাগেরপর থেকে হিন্দুদের যত জমিজমা তাঁরা আত্মসাৎ করেছেন, অ থবা নিলামে কিনেছেন,এবার বোধ হয় : , সাবেক : মালিকরা ভারত থেকে এসে সেসব দখল করেনেবেন। এই প্রসঙ্গে দুটি ঘটনাম নে পড়ছে। যুদ্ধের পর জেনারেল জয়ন্তচৌধুরী এসেছিলেন : তাঁর বাল্যকালেরশহর ঢাকায় বেড়াতে। গোপনে একদিন রিকশায়কে র তিনি বেড়াতে বেরহয়েছিলেন আবদুল : গাফফার চৌধুরীরসঙ্গে। ইত্তেফাক অফিসের : সামনে এসে তিনি তাঁদের পুরোনো বাি ড়টাচিনতে পেরে আনন্দ এবং বিস্ময় প্রকাশ করেন। সেখবর যখন ইত্তেফাক -এর মালিকদের কাছে পৌঁছেগেল তখন পরের দিনই তাঁরা সম্পাদকীয় প্রকাশ করলেনঃ কীভাবে হিন্দুরাদলে দলে তাঁদের পুরোনো সম্পত্তি দখল করতে আসছেন সে সম্পর্কে। আমার একশিক্ষক এবং নিকট-আত্মীয় আর পাঁচজন নব্য মুসলমান মধ্যবিত্তের মতোদেশত্যাগী হিন্দুদের : জমি নিলামে : এবং বেনামীতে ি কনেছিলেন। যুদ্ধের পরে তিনিধীরে : ধীরে বেশ সাম্প্রদায়িক হয়েপড়লেন। আজীবন তাঁর কাছ থেকে অসংখ্য বার অসাম্প্রদায়িক তার কথা শুনেছি। এবংযেকোনো দাঙ্গা দেখা দিলে তিনি হিন্দুদের আশ্রয় দিতেন নিজের : জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কা লে,পাছে : তাঁর জমিজমা হাতছাড়া : হয় এই আশঙ্কা : : তাঁকে কেবল ভারতবিরোধীই নয়, এমনকি , হিন্দু বিরোধী করেতোলে। ই ন্দিরা গান্ধীর নাম শুনলে এ সময়ে তিনি অকৃত্রিম বিজাতীয় ঘৃণাপ্রকাশ করতেন। আবার মুখুজ্জে, বাড়ুজ্জেরা দেশে এসে : চাকরিবা করিতে ভাগ বসাবে, এমন আশঙ্কাওতাঁর মনে দানা বেঁধেছিল। তখন বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীতে এক জনউচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন জেনারেল দত্ত। তিনি পাকিস্থানি নিরাপত্তাবাহিনীর কর্মচারী ছিলেন। এবং মুক্তিযুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। অনেকের মে তাআমার এই আত্মীয় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলেন যে, ইনি হয়তো ভারতীয় সেনাবাহিনীর থেকে বাংলাদেশে প্রেরিত হয়েছেন। আসলে ভারতভীতি এবংভারতের প্রতি অবিশ্বাস এ সময়ে কার্যকারণে কী যে ঘনীভুত হয়েছিল,সেটা বলে বোঝানো যাবে না। এই ভারতভীতি এবং ভারতের প্রতি অবিশ্বাসের চেতনা যে নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং বহু শতাব্দীর বিদ্বেষ থেকে জন্মনিয়েছিল, সে সম্পর্কে : সন্দেহ নেই। এমনকি,ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ যে -মৈত্রী চুক্তি করেছিল, সেটাকেও মৈত্রীরপ্রতীক মনে না করে বাংলাে দেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো ভারতেরকাছে দাসখত দেওয়ার সমান বলে গণ্য করেছিল।

:::::::::: আমার ধারণা , যুদ্ধ পরবর্তীবাংলাদেশে মুসলমানদের মনে কেবল সাম্প্রদায়িক চেতনাই দানা বাঁধেনি , সেই সঙ্গেনিজেে দের স্বরূপ সম্পর্কেই বোধ হয় একটা সংকট দেখা দিচ্ছিল। মনে আছে, ১৯৭৩সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজলা গেটে মহর মের পালন করতে আরম্ভকরলেন স্থানীয় লোকেরা। অথচ তার আগে অত বছর কোনো মহরম উৎসবএই এলাকায় দেখিনি। পরব র্তী ক'বছর এই উৎসবের মাত্রা আস্তেআস্তে বাড়তে থাকল। এই মুসলমানরা সবাই সুন্নি। এবং মহরম কোনো ধর্মীয়উৎসবও নয়। তা স্বত্ত্বেও , এই যে নতুন করে মহরম পালনের সিদ্ধান্ত এঁরানিলেন , তা তাঁদের নিজেদের স্বরূপ জাহির করার মানসিকতা এবং : তাঁদের মধ্যে এক নয়া সাম্প্রদায়িকতারউন্মেষই প্রমাণ করে। তাঁরা যে মুসলমান - এই : পরিচয়টাকেই তাঁরা যেন কানে তালালা

গানোঢাকের শব্দ দিয়ে জাহির করতে চাইছিলেন। এখানে রাজশাহীর একটিছোট ঘটনার উল্লেখ করলেও, এধরণের অংসখ্য ঘটনা ই ঘটতে আরম্ভ করেছিলদেশের সর্বত্র।

:::::::::: দেশ যে উজান স্রোতে উল্টোমুখে যেতে শুরু করেছে, সেটা বোঝার জন্যে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধেরপরে বেশি দিন অপেক্ষা করে ত হয়নি। যুদ্ধের কয়েক মাস পরেই আমরালক্ষ্য করলাম যে, বাংলাদেশ তার ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ থেকে দূরে সরেযাচ্ছে। এ বিষয়ে . আলোচনা করার উদ্দেশ্যে রাজশাহীতে আমরা যে -বন্ধুরা : যুদ্ধের ঠিক আগের মুহূর্তে বিদ্যাসাগর সার্ধ - শতবার্ষিকী স্মারক : গ্র ন্থটি প্রকাশ করেছিলাম, তাঁরাসবাই মিলে একটা কিছু করার কথা চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলাম।শেষ পর্যন্ত সাহিত্যসংসদের স ম্পাদক হিসেবে আমি ১৯৭২ সালের আগষ্টমাসে তিন দিনের জন্যে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলাম। তার মানে অতোঅ াগেই আমরা বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার অবক্ষয় লক্ষ করেশঙ্কিত এবং হতাশ হয়েছিলান। এই সেমিনারের প্রবন্ধ এবংআলোচনা গুলো দু'বছর পরে আলি আনোয়ারের সম্পাদনায়ধর্মনিরপেক্ষতা নামে প্রকাশিত হয় : বাংলা অ্যাকাডেমির : আনুকূল্যে। বস্তুত, ে সই বইটি একটি ঐতিহাসিক দলিল হিশেবে : কাজ করতে পারে। : কেউ আগ্রহী হলে এ-বইয়ের লেখা থেকেইবুঝতে পারবেন, ত খন কী কী কারণে নতুন করে হিন্দু তথা ভারত বিরোধীমনোভাব দানা বাঁধছিল এবং এই মনোভাব কোন কোন চেহারায় প্রকাশপাি চ্ছল।

:::::::::: দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা,চোরাকারবার, রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে বাংলাদেশের ওপর ভারতেরপ্রভাব খাটানোর প্রয়াস , ভারত এবং হিন্দুদের প্রতিবাংলাদেশের মুসলমানদের অবিশ্বাস এবং ঘৃণা - এসব স্বদেশী : কারণ ছাড়াও , সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্পবাংলাদেশের পরিবেশকে দূষিত করার আর একটি মস্ত বড় উপকরণএসেছিল বাইরে থেকে। এই উপকরণের উৎস মধ্যপ্রাচ্য । ১৯৭৩ সালেরঅক্টোবর মাসে ইসরায়েলের কাছে দারুণ মার খাবার পর, পেট্রোলিয়াম উৎপাদনকারী আরব দেশগুলো পেট্রো লকেচাইল রাজনৈতিক হাতিয়ার হিশেবে ব্যবহার করতে। যুদ্ধের সময়ে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমা দেশগুলো ইসরায়েলকে মদত দিয়েছিল বলেআরব দেশগুলো এই রাজনৈতিক : হাতিয়ার দিয়ে তার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। ওপেকতাই নতুন স্ট্র্যাটেজি নিল পেট্রোলের উৎপাদন কমিয়েপেট্রোলের দাম বেঁধে দেবার। বস্তুত , অক্টোবর মাসেই শতকরা ৭৫ভাগ , ডিসেম্বরে আরও ১৩০ ভা গ। তারপর দফায় দফায় সেটা বাড়তে বাড়তেসাত বছরের মধ্যে ৩ ড লারের : একব্যারেল পেট্রোলের দাম দাঁড়াল ৩০ ডলারে। তখনও মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি রেগানোমিক্সের কল্যাণে দেউলে হয়ে যায়নি। : তা সত্ত্বেও, : পেট্রোলের এই দাম দেখে সেই সর্বশক্তিমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রওদারুণ বেকায়দায় পড়েছিল। বাংলাদেশের তো কথাই নেই। পেট্রলের দাম এতবেড়ে যাওয়া স্বত্ত্বে ও তৃতীয়বিশ্বের দেশগুলোর অবস্থা যেমনই হোক নাকেন, এত দিনের সাহায্যনির্ভর : আরবদেশগুলো এক নিমেষে আঙুল : ফুলে কলা গাছহবার মতো রাতারাতি ধনী দেশে পরিণত হল। এবং এইরূপান্তরের পর প্রথমেই এই দেশগুলো নিজের নিজের দেশেপ্রচু র অর্থ ব্যয় করে : অনেক : সংস্কার কর্মসূচী হাতে নিল।প্রতিরক্ষা জোরদার করল, তারপর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিশেবেইতারা নিজেদে র প্রভাব বিস্তার করার কাজ শুরু করল। এক ধরণেরসীমিত মাত্রার নয়া সাম্রাজ্যবাদ : আর কী!তবে এই প্রভাব বিস্তার করার জন্য : পাশ্চাত্যখুব উর্বর জায়গায় ছিল না। সেটা করা গেল তৃতীয়বিশ্বের দেশে দেশে। লটারিতে টাকা জিতে দ্বিতীয়া স্ত্রী আনতে গেলে গরীবেরসুন্দরী মেয়েই সবচেয়ে সুবিধাজনক পাত্রী।

:::::::::: আরব দেশগুলোর সাংস্কৃতিকসাম্রাজ্যবাদের অবশ্য একটা সীমাবদ্ধতা ছিল- গণতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধদিে য় প্রভাব বিস্তার করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, -এসবেরঅনেক ব্যবহার পশ্চিমা দেশগুলো আগেই করে ফেলেছিল। সেজন্য সৌ দী আরব,ইরান, লিবিয়া, এমনকী সীমিত মাত্রায় ইরাকও , মিশরসহ আফ্রিকার কোনোকোনো দেশ থেকে আরম্ভ করল। এই পণ্যে র অনেক উৎপাদন বহু শতাব্দি আগেইএসব দেশে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। এখন কেবল নতুন প্যাকিং-এ নতুন চেহারায় মৌলবাদ রপ্তানীর দরকার হল। এর জন্য খরচও লাগল প্যাকিং : করার মতো সামান্যই। ধর্ম প্রচারেরনাম করে, মসজিদ- মাদ্রাসা নির্মাণের নাম করে, মোট কথা পরকালের নাম করেএই আরব দেশগুলো পেট্রোল থেকে পাওয়া : উইন্ডফলের সামান্য এক অংশ এসব দে শ ব্যয় করতে আরম্ভ করল।প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য , বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী এবং বেসরকারীবিভিন্ন মানের যেসব মাদ্রাসা আ ছে, তাদের সংখ্যা অন্তত কুড়ি হাজার।সম্ভবত, তার চেয়েও বেশি। অথচ এখন থেকে পনেরো বছর আগেও বাংলাদেশেমাদ্রাসার স ংখ্যা ছিল দু'হাজারেরও কম। আশ্চর্যের বিষয় , এই পনেরোবছরে মাদ্রাসার সংখ্যা দশ গুণ বৃদ্ধি পেলেও উচচ বিদ্যালয়ের : সংখ্য া বলতে গেলে আদৌ বাড়েনি। এসব মাদ্রাসার : সংগঠন এবং পরিচালনার অবশ্য সরকারীঅনুদানও একটা বড় ভুমিকা পালন কে র। কিন্তু তবু : মাদ্রাসা আর মসজিদের প্রধান মূলধন আসে মধ্যপ্রাচ্যথেকেই। মধ্যপ্রাচ্যের দালাল হিশেবে যাঁরা ইসলাম প্রচারের ভ ারনিয়েছেন, তাঁরা হয়তো বলতে পারবেন কী পরিমাণ টাকাপয়সা এসেছেবাংলাদেশে। কিন্তু টাকার পরিমাণ যা-ই হোক , বাংলাে দশের মাটি অত্যন্তউর্বর বলে : দেখতে না- দেখতে মৌলবাদেরনতুন চারা, কচি পাতা, এমন কী ফুল এবং ফল দিগন্ত পর্যন্তঅনেকট া এলাকা দখল করে ফেলেছে। এবং নিত্য নতুন এক-একটা রাজনৈতিক এবং/ অথবা সামাজিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ফসলেরপ ্রসার ঘটেছে : জ্যামিতিক হারে। যাঁদের বয়স বেশি হয়েছে ,পরকালের চিন্তা যাঁদেরপেয়ে বসেছে, তাঁদের কথা আলাদা। : : কিন্তু কুড়ি/পঁচিশ বছরের তরুণরা : এখন যেভাবে তবলিগের নেশায় বুঁদ হন, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাকালো বোরকায় নিজেদেব . ঢে কে রাখেন, তা থেকেই আমাদের সংস্কৃতিরওপর আরব প্রভাবের মাত্রা অনুমান করা সম্ভব।

:::::::::: বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আওয়ামীলীগের আনুকুল্যেই সাম্প্রদায়িকতা লালিত হতে আরম্ভ করেছিল, ঠিকই । তবুমুজিব সরকার প্রত্যক্ষভাবে দেশকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে খুব একটাসরে যেতে দেননি। বরং যুদ্ধের পরে জামাতে ইসলামীসহ ইসলাম-পছন্দ দলগুলোকেসরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। অবশ্য তার মানে এ নয় যে, নিষিদ্ধ ঘোষণাকরার ফলে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি সক্রিয় ছিল না। প্রকৃতপক্ষে,জামাতা - সহ : সবগুলো সাম্প্রদায়িকদলই ১৯৭২ সাল থেকে তলে তলে তাদের কাজকর্ম আরা করে। হতে পারে তারজন্য তখন তাদের একটা মুখোশ পরতে হয়েছিল এবং সরাসরি বক্তব্য রাখার জন্যএকটি ভাড়া- করা প্লাটফর্মের দরকার হয়েছিল। কিন্তু সেইপ্লাটফর্মের জোগাড় করা তাদের পক্ষে আদৌ : শক্ত হয়নি। তথাকথিত ''প্রগতিশীল''বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোই এ সময়ে সরকারের বিরুদ্ধে নিজেদেরকন্ধে পাওয়ার উদ্দেশ্যে জামাত এবং অন্য সাম্প্রদায়িক দলগুলোর : ধবজা বহন করেছে। এবং পর আশ্চের্যের বিশয়,শেখ মুজিবের পতনের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের অস্তিত্ব স্বীকারকরেনি কেবল কট্টর বাম আর গোঁড়া ডানপন্থী দলগুলো। হাজার হাজারমাইল দূরে অবস্থিত তাদের মদত-দাতারা চীন এবং সৌদী আরবের : ইঙ্গিতে ইএটা করেছে কিনা আমার তা জানানেই। কিন্তু ১৯৭০ -এর দশকের শেষ দিকেই ইসলামী মৌলবাদ বাংলাদেশে এত শক্তএবং মোটা শিকড় গেড়ে বসেছিল যে, মধ্যপন্থী দলগুলোকেও আপোশ করেকমবেশি ধর্মের গীত গাইতে হয়। মনে আছে, মোটামুটি এ সময়েইমস্কোপন্থী মোজাফর ন্যাপও গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে''ধর্ম, কর্মও সমাজতন্ত্র''-এর স্লোগান তুলেছিল।

:::::::::: সেখ মুজিব এবং আওয়ামী লিগেরপতনের পর সাম্প্রদায়িতার উত্থান আরম্ভ হয় সরাসরি রাষ্ট্রীয়পৃষ্ঠপোষনায়। শেখ মুজিব তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিলেননানাভাবে, একদলীয় শাসন প্রবর্তন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটিপদক্ষেপ। বস্তুত, বাকসাল-ভীতি শিক্ষিত- অশিক্ষিত : সাধারণ মানুষের অনেকেই বিহ্বল করেছিল। তাসত্ত্বেও দেশবাসীর কাছে মুজিবের আবেদন তখনো কতটা প্রবল ছিল, খোন্দকারমোশতাক তা ভালো করেই জানতেন। সে জন্যে গদিতে বসেই তিনিভারত-বিরোধী ইসলামি ও আওয়ামী লীগ-বিরোধী যত রকমের মনোভাব ছিল,সেগুলো যদ্দুর সম্ভব কাজে লাগাতে চাইলেন। জাতির উদ্দেশ্যে তাঁরপ্রথম টেলিভিশনে ভাষণ মোশতাফ শুরু করলেন সজোরে বিসমিল্লাহ্ বলে,মুসলমানরা অনেকে কোনো কাজ শুরু করার আগে বিসমিল্লাহ্ বলেন। সুতরাং এতেকোনো আপত্তির কারণ নেই। কিন্তু সশব্দে বিসমিল্লাহ্ বলে মোশতাক ইসলামী প্রতিকব্যবহারের নতুন নজির রাখলেন। রাতারাতি বাংলাদেশ বেতার রেডিওবাংলাদেশে : পরিণত হলো, কারণ তা হলেসেটাকে শুনতে অনেকটা রেডিও : পাকিস্তানের মত হবে, তাঁর ভাড়াটে : এক সেনাপতি জাতীয় সঙ্গিত এবং জাতীয়পতাকা পরিবর্তনেরও জোর চেষ্টা চালাতে আরম্ভ করল। মোট কথা ,স্বাধীন হবার পরে এই একটি সরকার প্রথমে সরাসরি রাষ্ট্রীয়পৃষ্ঠপোষনায় ধর্মনিরপেক্ষতার বারোটা বাজানোর চেষ্টা শুরু করলে। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্র থেকে ইসলামীকরণেরপ্রতি অনুকুল : সাড়াও পেয়েছিলেন।বাংলাদেশের জন্ম মুহূর্তে - ১৯৭১ সালে- চীন এবং সৌদী আরব : বাংলাদেশের তীব্র বিরোধিতা করেছিল।(চীনের প্রথম ভিটো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে) । খোদপাকিস্তান বাংলাদেশকে মেনে নেবার পরেও এই দুটি দেশ বাংলাদেশকেস্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু খোন্দকার মোশতাক বিসমিল্লাহ্ : বলার সঙ্গেই অলৌকিভাবে এই দু'দেশেরস্বীকৃতি এসে গেল। সুযোগ পেলে তিনি ক্ষমতায় থাকার জন্য আর কী কীভোজবাজি দেখাতেন , সেটা এখন কেবল অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু ক্ষমতার : খেলায় তিনি ডিগবাজি খেলেন। গদি থেকেতাঁর সরে যেতে হল।

:::::::::: রাষ্ট্রীয়পৃষ্ঠপোষনায় ইসলামের তথা সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ ঘটানোর নীতিরশ্রীবৃদ্ধি ঘটান মুক্তি যুদ্ধের বীর সৈনিক- কিন্তু ক্ষমতালোভী : --জিয়াউর রহমান। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বেমাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষনায় : বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তিডাবল মার্চ করে ইসলামী পরিচয়ের দিকে এগিয়ে যায়। ক্ষমতায় বসারঅল্প দিন পরেই জিয়া বাংলাদেশের নাগরিক পরিচয়ের নাম পরিবর্তন করেবাঙালির বদলে বাংলাদেশী করেন। অথচ বাঙালি পরিচয়কে কেন্দ্র করেই ১৯৭১সালের স্বাধীনতার লড়াই : হয়েছিল। এবংএ পরিচয় নিয়ে বাঙালিদের গর্বের সীমা ছিল না। কেবল তাই নয়, ১৯৭৭ সালেরশুরুতে জিয়া রাষ্ট্রপতির ফরমান জারি করে বাংলাদেশের সংবিধানেরবড় রকমের : পরিবর্তন করেন। এরমধ্যে একটি হল সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতাকে তিনি কলমেরএক খোঁচায় বদলে গিয়ে আল্লাহ্কে সরকারী স্বীকৃতি : দিয়ে যান। আপাতদৃষ্টিতে : মনে হতে পারে, এ স্বীকৃতি না পেলে আল্লাহ্যেন ঠিক আপন মহিমায় থাকতে পারছিলেন না।

:::::::::: কেবল সংবিধানের পরিবর্তন নয় ,বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে পাল্টে দেবার জন্য এবং সেই সঙ্গে জাতীয়তাবাদীজোশে ইসলামী মশলা দেবার জন্য তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের জায়গায় আমদানিকরলেন বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ। মুজিবের আমলেও কেউ পূব বাংলা আর পশ্চিমবাংলার মিলন ঘটিয়ে এক অখন্ড বঙ্গ গড়ে তোলার দাবি জানান নি। তখনওধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের আড়ালে মুসলমান -প্রধানবাংলাদেশের ধারণাটাই বদ্ধমূল : ছিল। সেদিক দিয়ে বিচার করলে মুজিবের বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর জিয়ার বাংলাদেশীজাতীয়তাবাদে পার্থক্য সামান্যই। কিন্তু জিয়া সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণটিকেচোখা করে তুললেন তা দিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থক (তথাকথিতভারতপন্থী) শিক্ষিত সম্প্রদায়কে বিঁধে ফেলার জন্য। শাহ আজিজথেকে আরম্ভ করে আওয়ামী লীগের দলছুট : অনেক দালালকেই তিনি খুব সহজে তাঁর ধারালো ইসলামী : বড়শি দিয়ে গেঁথে ফেললেন। এই ইসলামীদৃষ্টিকোণটা তাঁর বাংলাদেশী পরিচয়কে এত সাম্প্রদায়িক চেহারাদিয়েছিল যে, তাঁর প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজ সংসদে একদিন : বলেই ফেললেনঃ তাঁদের ভাষার নাম হলবাংলাদেশী ভাষা। এ থেকেই বোঝা যায়, পশ্চিমবঙ্গ থেকে নিজেদের পরিচয়কেসযত্নে : একেবারে

. আলাদা করে দেখানোই : ছিল জিয়ার আসল উদ্দেশ্য। এ দিয়ে তিনিদেশের একটি বড় জনগোষ্ঠীর এবং আর্ন্তজাতিক একটি বড় জোটের : অন্ধ সমর্থন আশা করতে পারতেন।আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রেও জিয়া যে-কৌশল : নিয়েছিলেন তা ছিল ইসলামী দেশগুলো , বিশেষ করে : সৌদী আরব আর পাকিস্তান , এবংচীনের প্রতি আনুগত্য এবং ভারত ও সেভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিবৈরী মনোভাব দেখানোর। তিনি প্রায় উপযাচক হয়ে যেভাবে ইসলামীসংহতি জোটে গিয়ে তরবারি ঘোরাতে থাকেন, তাও বাংলাদেশের ভাবমুর্তি কবদলে দিতে সাহায্য করেছে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত চতুর ব্যাক্তি। তাঁরইসলামী লেবাস দিয়ে তিনি তাঁর ফৌজি উর্দিকেও ঢেকে ফেলতে পেরেছিলেন।তাঁর সব দোষ : ঐ এক জিগিরে চাপা পড়েছিল।এবং এর ফলে , যত দিন তাঁর বন্ধুরা তাঁকে পেছন থেকে ছোরা না মেরেছেন,তত দিন তিনি ভালোভাবেই ক্ষমতায় টিকে ছিলেন। কিন্তু তার দামদিয়েছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদ।

::::::::::: মোট কথা, জিয়াউর রহমানধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের জন্যে পরিজন ফেলে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়েমুক্তিযুদ্ধ করলেও, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য প্রথম সুযোগেই তিনিআল্লাহকে তাঁর স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। : কিন্তু এরশাদ সাহেবের ক্ষমতায় টিকে থাকারজন্যে ইসলামী কার্ডের দরকার ছিল আরও বেশি। কারণ তাঁর মধ্যে না ছিল শেখমুজিবের ক্যারিসমা, না-ছিল জিয়ার মুক্তিযোদ্ধার পরিচয়। বস্তুত, তাঁর মতোন্যূনতম জনসমর্থন নিয়ে বাংলাদেশের গদিতে কেউ বসেননি। সে জন্যেই , তিনিপিরের কাছে ধর্ণা দেওয়া থেকে আরম্ভ করে : রবীন্দ্রজয়ন্তীতে রবীন্দ্রনাথের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেমিলাদের আয়োজন পর্যন্ত অনেক রঙ্গ দেখান। ব্যাক্তিজীবনে এরশাদ খুব ধার্মিকছিলেন, তাঁর এমন সাক্ষী কমই পাওয়া যাবে । মনে হয় না, ইসলামেরপ্রতি তাঁর খুব মহববত ছিল। যতদিন তিনি আওয়ামী লীগ এবং বি এন পি-র নেত্রীদের আলাদা করে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, ততদিন তিনি কেবল জিয়ারইসলামী এবং : বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদেরনিশান উড়িয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এ দু'দল যখন এক দফা আন্দোলন আরম্ভ করল , অর্থৎ এরশাদ -বিরোধী আন্দোলনে এককাট্টা হল, তখন এরশাদ বিপদেরগন্ধ পেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনজোরদার হবার মুখে তিনি তাইতুরুপের তাস হিশেবে সংবিধানের আর এক দফা পরিবর্তন করলেন ১৯৮৮ সালের৭ই জুন। : মেজর জেনারেল জিয়া আল্লাহকেসর্বোচ্চ আসন দিয়েছিলেন। লেফটেনেন্ট জেনারেল এরশাদ বাংলাদেশকে রীতিমতোইসলামী দেশের মর্যাদা দান করলেন। তাতে করে তাঁর ভরাডুবি : রক্ষা না পেলেও, ধর্মনিরপেক্ষতাএবং অসাম্প্রদায়িকতার যা ক্ষতি হবার নিশ্চিন্ত ভাবেই তা হল।

::::::::::: বস্তুত, শেখ মুজিবের পতনের পর,সেনাবাহিনীর যে-অধস্তন বীরপুঙ্গবরা ক্ষমতা দখল করেছিলেন, টিঁকেথাকার উদ্দেশ্যেই তাঁদের মুজিব-বিরোধী এবং ভারত-বিরোধী জনগোষ্ঠিরসমর্থন পাওয়া দরকার ছিল। এবং সেটা তাঁরা এবং তাঁদের পরে জিয়াউররহমান ইসলামের ধুয়ো তুলেই করেছিলেন। এরশাদ ক্ষমতায় আসেন এরকয়েক বছর পর। মার্কাস ফ্র্যান্ডে -র মতে, সামান্যতম জনসমর্থন নিয়ে।স্বভাবতই, কবিতার আড়ালে , তাঁরও ভারতবিরোধী এবং ইসলামপন্থীস্লোগান সকাল সন্ধ্যেয় জপ করতে : হয়েছিল। সত্যি সত্যি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শেখ মুজিবের : পরবর্তী সরকারগুলো ইসলামের যেচরম ব্যবহার করেন, তা ভন্ডামির নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। এর ফলেইসলাম ধর্মের কতটা শ্রীবৃদ্ধি : হয়েছিল,আমার সঠিক জানা নেই, কিন্তু দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত পরিবেশ আবারফিরে এসেছিল। লাখ লাখ লোকের প্রাণ এবং লাখ লাখ মা-বোনের ইজ্জতেরবিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েও বাংলাদেশে কখনো জনগণের দ্বারা , জনগনের জন্যে সরকার গঠিত হয়নি। (১৯৯০ এরনির্বাচনই ছিল একমাত্র ব্যাতিক্রম। তবে নির্বাচনে শেষ পর্যন্ত সরকারেরকাজকর্ম এক পথে যাবে, এমন গ্যারান্টি কে দেবে?) : পাকিস্তানী ঐতিহ্য ধরেই সেখানেআধা-সামরিক কাজকর্ম আধা-সামরিক, আধা-বেসামরিক একটি নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রতৈরি হয়েছে। জনগণ : যে - সরকারেরপ্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করেননি, অথবা অংশগ্রহণ করতেপারেননি, সে জন্যে সরকারের ব্যর্থতা ঢাকার : উদ্দেশ্যেই একের পরএক সরকারগুলোকে কোনো না কোনোধুয়ো তুলে জনগণের দৃষ্টিকে অন্যত্র সরিয়ে রাখতে হয়েছে। কখনো খাল খনন,কখনো বিদেশী ফুটবল - ক্রিকেট দল এনে হৈ চৈ , কখনো বা তরুণদেরদৃষ্টিকে : অন্য দিকে সরিয়ে রাখারউদ্দেশ্যে যুব মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা - এ ধরণের কয়েকটিদৃষ্টান্ত।

::::::::::: কিন্তু যা সবচেয়ে সহজ ব্যাপকজনগোষ্টীর : মনোযোগ আকর্ষণে সমর্থহয়েছে তা ইসলামের ডুগডুগি। এব্যাপারে সরকারের দুটো সুবিধাও ছিল।অন্যান্য কাজে পুরোটা টাকা দিতে হয় সরকারকে। কিন্তু এ কাজে নানা পথেপেট্রো-ডলারের আর্শীবাদও পাওয়া যাচ্ছিল এন্তার। তা ছাড়া, ধর্মেরএকটা নেশা আছে, যা : অন্যান্য মাদকদ্রব্যের মতোই যত সেবন করা যায়, ততই বাড়ে, ধর্মীয়কাজে ব্যয় করার জ্যন্যদেশের মধ্যেও লোকের কোনো অভাব হচ্ছিল না। আয়কর ফাঁকি দেবার জন্যযে-লোক দুই প্রস্থ হিশেবের খাতা রাখে, সেই হয়তো বেবেস্তেএকটা বার্থ রিজার্ভ : করার জন্য একটামসজিদ করে দিয়েছে, : অথবা নিদেনপক্ষে : একটা মাদ্রাসা। এভাবেইবাংলাদেশের বিরাট একটা জনগোষ্ঠি ধর্মের : পথে প্রায় উল্কার গতিতে এগিয়ে গেছেন। তবে কোন্আসমানের দিক তাঁরা যাবেন, কলকাঠি নেড়ে তাঁদের সেই দিক নির্দেশকরেছেন অংশত সেই রাজনীতিকরা, ধর্মের নাম ব্যবহার করে যাঁরারাতারাতি ক্ষমতা লাভের খোয়াব দেখেছেন; আর সেইধর্মব্যবসায়ীরা, সৌদি আরব, লিবিয়া, ইরান এবং ইরাকের যৎকিঞ্চিৎ : দক্ষিনা যাঁরা লাভ করেছেন।

::::::::::: ইসলামীকরণের যে-প্রক্রিয়াস্বাধীনতা যুদ্ধের ঠিক পরেই শুরু হয়েছিল, তার ফলে সবচেয়েক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দুটি গোষ্ঠী-অসাম্প্রদায়িক বুদ্ধিজীবীরা আরসংখ্যালঘু সম্প্রদায়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগ ছিলেন মু

সলমান , কারণ জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই মুসলমান।কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রীষ্টানরাও এ যুদ্ধে সমান : উৎসাহেই যে াগ দিয়েছিলেন, প্রাণের : সমান ঝুঁকি নিয়ে, বাংলাদেশী : জাতীয়তাবাদ মনোবল ভেঙে দিয়েছে সবচেয়েসংখ্যালঘুদের। পাকিস্তানে র আমলে তাঁরা তো দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকছিলেনই, যে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের জন্যে তাঁরা রক্ত এবং প্রাণদিয়েছিলেন, তাঁদে র সেই সাধের বাংলাদেশেও তাঁরা আবার দ্বিতীয় শ্রেণীরনাগরিকে পরিণত হলেন। তাঁরা না-পারলেন নিজেদের সত্যিকার বাংলাে দশীহিশেবে সনাক্ত করতে, না তাদের চারিদিকের বিপুল জনগোষ্ঠী তাঁদেরমেনে নিতে পারলেন নিজেদের দেশপ্রেমিক ভাই বলে। এ ই আশাভঙ্গ এবংবিশ্বাসঘাতকতায় অনেক কিছুই ভুমিকা পালন করেছে, কিন্তু রাজনীতিকদের.ক্ষমতা-লোভ সবচেয়ে বেশী দায়ী। ে দশে যে কোনো জনগনের সরকার তৈরীহল না, কোনো সরকারই যে কেবল সাধারণ মানুষের ওপর নির্ভর করেথাকতে পারল না ,এবং ক্ষমতায় যার প্রয়াসের ব্যয় হল , সে না-পারলদেশের অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে, না-পারল ধর্ম পালনের কাজটাকে সাধারণম ানুষের হাতে ছেড়ে দিতে। ক্ষমতায় থাকার অন্যতম প্রধানহাতিয়ার হিশেবেই তার মরণাস্ত্রের সঙ্গে ধর্মের আফিমও : ব্যবহৃত হতে থাকল সরকারীপৃষ্ঠপোষনায়। এমন ধর্মবিরোধী কাজ সাধারণ চোর-ডাকাত -খুনীরআয়ত্তের একেবারে বাইরে সত্যি বলতে কী, তা রা এটা ভাবতেও পারে না।

:::::::::: ৪

:::::::::: ধর্মের প্রতি এই উৎসাহএমনিতে মোটেই খারাপ নয়। কিন্তু তার উল্টো পিঠে আছে অন্যসম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বে ষ। সেটাই পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে।ধর্মের উদারতাকে নয়, ধর্মের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকেই এ ক্ষেত্রেব্যবহার করা হয়েছে। যে বস্তু রোগ সারায়, তাই মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বিষাক্তহয়ে ওঠে।

:::::::::: ধর্মের : নাম করে রাজনৈতিক ফয়দা লোটার সরকারী ভন্ডামীর স্বরূপসরল জনগন সামান্যই বুঝতে পেরেছেন। তাঁরা বর ং দিনরাত্তির সরকারীপ্রচারযন্ত্রে ইসলামী অর্কেষ্ট্রা : এবং মধ্যপ্রাচ্যের বেতনভুক মওলানাদের ওয়াজ শুনে শুনে : ক্রমবর্দ্ধমান মাত্রা য় কেবলার দিকেই ঝুঁকেপড়েছেন। যে-অর্থনৈতিক : সংকট : এবং জানমালের নিরাপত্তার অভাবের মধ্যেতাঁরা দিন কাটাচ্ছিলেন , তাতে ইহলোকের সমস্যা সমাধানে পরলোকেরদাওয়াই থেকে তাঁরা ভালোই ফল পাচ্ছিলেন। মনের সান্ত্বনাই তো মানুষকেসুখী অথবা দুঃখী করে।

:::::::::: মোট কথা, ১৯৫২ সালে ভাষাআন্দোলনের পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে ভালোবেসেএবং পশ্চিম পা কিস্তানের : শোষনএবং দুঃশাসনের : মুখে ইসলামীসাম্রাজ্যবাদকে কদলী দেখিয়ে বাংলাদেশের মতো একটা ধর্মনিরপেক্ষ : দেশের উদ্ভব : হয়েছিল, মুজিবের পতনের এক দশকের মধ্যে তা বলতে গেলেপুরোপুরি লোপ পেয়েছিল। যা বাকি থাকল, জাতীয় পতাক া এবং জাতীয়সঙ্গিত ভিন্ন হলেও, তার নাম পাকিস্তান হলেও ক্ষতি ছিল না।

:::::::::: পেছনে ফিরে ১৯৪৭ থেকে ১৯৯২ সালপর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দীর ইতিহাসের দিকে তাকালে সহজেই চোখেপড়ে বাঙালি মু সলমানরা ১৯৪০-র দশকে : কীভাবে নিজেদের সাম্প্রদায়িক পরিচয়কেই একমাত্র পরিচয় বলেগণ্য করেছিলেন। তারপর, ভাষা আন্দোলনে এবং পশ্চিম পাকিস্তানীপ্রতিকূলতাকে কেন্দ্র করে কীভাবে তাঁরা ধর্মীয় : পরিচয়ের চেয়েও নিদেদের ভাষিকপরিচয়কেইব ড় করে তুলছিলেন। এই পরিচয়কে বড় করতে গিয়েইতাঁদের সাময়িকভাবে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে চাপা দিতে হয়েছিল। যুদ্ধের ঠিক আগে অথবা যুদ্ধের সময়ে মনে হয়েছিল হয়তো এই বাঙালি পরিচয়স্থায়ী মর্যাদা পাবে এবং দেশের দুই প্রধান সম্প্রদায় : অত ন্ত ধর্মের নামে একে অন্যের মাথাফাটাবে না, কিন্তু ভারতের মৌলবাদী জঙ্গী হিন্দুরা অযোধ্যার মসজিদ ভাঙায়বাংলাদেশের সাধা রণ মুসলমানরা তাঁদের বাড়ির পাশের নির্দোষ হিন্দুদেরপ্রতি একেবারে যে আচরণ করেছেন, তা থেকেই বোঝা যায়, ১৯৬০ এরদ শকে আমরা যেটুকু অসাম্প্রদায়িকতা অর্জন করেছিলাম, তা অনেক আগেই ধুয়েফেলেছি।

:::::::::: আমরা এগিয়েছি না পেছিয়েছি , তাবোঝার জন্যে একটা তুলনাই এখানে যথেষ্ট। ১৯৪৬ সালে অনুরূপ এক ঘটনায়-কা শ্মীরে হজরতের চুল খোয়া যাওয়ায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদেরবিরুদ্ধে দাঙ্গা হয়েছিল। এবং সরকার : নিষ্ক্রিয় থেকে সে দাঙ্গা : হবার সুযোগ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও : সেই দাঙ্গার প্রতি শিক্ষিত লোকদের ঘৃণা ছিলসর্বসম্মত । আমীর হোসেন চৌধুরী র মতো লোক তখন আপন প্রাণদিয়ে হিন্দুদের রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর একেবারে কাছে এসেযখন দাঙ্গা : হল ত খন খুব কম শিক্ষিতলোকই দাঙ্গার : বিরুদ্ধে নির্ভেজাল : ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। অথবা এরপ্রতিবাদে রাজপথে নেমেছেন । বাবরি মসজিদ যারা ভেঙেছে, : তাদের মধ্যে একদল : ধর্মান্ধ, একদল আমাদের ধর্মব্যবহারকারী রাজনীতিকদের মাসতুতোভাই। ধর্ম প্র তিষ্ঠা করার জন্যে নয়, রাজনৈতিক মুনাফা লাভেরজন্যেই তারা বাবরি মসজিদ : ভেঙেছিল।কিন্তু বাংলাদেশের মৌলবাদীরা : নির পরাধ হিন্দু প্রতিবেশীর গায়ে : হাত দেবার আগে : এটামোটেই বিবেচনা করেন নি যে, বাবরি মসজিদ অনেক পুরাণো হলেও , ১৯ ৪১ সালথেকে সে মসজিদ অব্যবহৃত। : সে মসজিদে : নিরাকার আল্লাহার উপাসনা হয়নি, : বরং রামের মূর্তিই : সেখানে স্থান ে পয়ে : এসেছে। এ সত্ত্বেও : যে-মুসলমানরা শুধুমাত্র ধর্মীয় আবেগে দাঙ্গা করেছে, তাদের অপরাধওসম্ভবত লঘু করে দেখা যায়। ি কন্তু যারা ভয় দেখিয়ে হিন্দু প্রতিবেশীকেতাড়িয়ে দিয়ে তার সম্পত্তি অধিকার করার লোভে দাঙ্গা করেছে, তাদেরঅপরাধ একেবারে র অমার্জনীয়।

:::::::::: বস্তুত, গত চার দশকেরসাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ বিশ্লেষন করলে দেখা যায়, যুদ্ধের আগে পর্যন্তসাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ধর্মীয়

আবেগ কাজ করত- হিন্দুদের পারলে মেরে ফেলাই ছিলদাঙ্গার প্রধান উদ্দেশ্য,। এখনকার দাঙ্গায় হিন্দুদের না মেরে তাদেরবাড়িঘ র, দোকানপাট লুট করে তার পরে তাতে আগুন লাগানো এবং ভয়দেখিয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করানো বোধ : হয় প্রধান উদ্দে শ্য। কারণ , তা হলে তাদের সম্পত্তি দখলকরার মওকা মেলে । সেদিক দিয়ে বিচার করলে , বর্তমান সাম্প্রদায়িকতাআগের তুলন ায় অনেক বেশি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করা এবংসুপরিকল্পিত। এটাকে আগেকার প্রগতিশীলতা বিনষ্ট করা বললেযথেষ্ট : হয় না, এটা সত্যিকারঅর্থেই উজান স্রোতে একেবারে উল্টোমুখে ছুটে চলা।

:::::::::: সাম্প্রদায়িকতা ঘরে ঘরেপ্রাত্যহিক জীবনে প্রসার লাভ করেছে নানা চেহারায়, নানা রঙে।এককালে পাকিস্তানী আমলে অ ামরা যেমন : সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটা কথা বলে শিক্ষিত : সমাজের ব্যাপক সমর্থন, এমনকী , প্রশংসাপেতে পারতাম, এখন সে সম্ভাবনা সীমিত হয়ে এসেছে । কেবল একটি এলাকায় এখনোসাম্প্রদায়িকতা : অথবা ধর্মান্ধতা : নাক গলাতে পারে নি- সে আ মাদের সাহিত্য।আল মাহমুদের মতো ব্যতিক্রমের কথা ভুলে যাচ্ছিনে। : কিন্তু সাধারণ ধারাটা মোটেই সে রকমের নয়। কিন্তুকার ণটাকী? আমাদের সাহিত্যিকরা কি বাস্তব জীবন থেকে সরে গেছেন?নাকি , আমাদের জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতার যে মহামার ী লেগেছে, সেটাসাময়িক এবং এখনো : সমাজের মর্মকে স্পর্শকরতে পারেনি? ধরে নিচ্ছি, পরেরটা সত্যি। এবং যদি তাই হয়, তা হলে চারদিকের নীরন্ধ্র অন্ধকারে সেটাকেই একমাত্র আশার ক্ষীণ আলো বলে দেখতেপাচ্ছি।

:

ঐতিহ্যের সংঘাত
সালাহ্উদ্দিন আহ্মেদ

:
ঊনবিংশ শতক ও তৎপরবর্তী কালে বাঙালি মুসলিম সমাজ ভাবনায় আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সংঘাত
:
পঞ্চদশ শতকের ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক বিকাশকে রেনেসাঁস বা পূনর্জন্ম আখ্যা দেওয়া খানিক পরিমাণে বিভ্রান্তিকর, কারণ অতীতের পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। বস্তুত, ইতিহাসে পুনরুজ্জীবনের স্থান নেই। অতীত থেকে প্রেরণা পাওয়া যায়, শিক্ষা গ্রহণ করা যায়,কিন্তু তার পুনর্জন্ম ঘটানো সম্ভব নয়। পঞ্চদশ শতকের ইয়োরোপীয় রেনেসাঁস আন্দোলনের ফলস্বরূপ প্রাচীন গ্রীক-রোমান সভ্যতার পুনরুজ্জীবন ঘটেনি; ইয়োরোপীয় ইতিহাসের সভ্যতার সমাপ্তি এবং আমরা যাকে আধুনিক সভ্যতা বলি তার আরম্ভ এ সূচিত করে। আধুনিকতার বিশেষ লক্ষণ হল মানবতাবাদ, ইহজাগতিকতা ও গণতন্ত্র। এদের উৎস খুঁজতে গেলে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার কথা ভাবতে হয় যার স্ফুরণ হয়েছিল সক্রেটিশ, প্ল্যাটো ও অ্যারিস্টোটালের কালে। পঞ্চদশ শতকে যে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া রেনেসাঁস আন্দোলনের সঙ্গে শুরু হয়েছিল তা অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে তিনটি বিপ্লবে পরিণতি লাভ করে। এগুলি হল (১) বৌদ্ধিক বিপ্লব, (২) শিল্প বিপ্লব বা অর্থনৈতিক বিপ্লব এবং (৩) ফরাসি বিপ্লব বা বুর্জোয়া বিপ্লব। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আধুনিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

এই প্রেক্ষাপটে অনুসন্ধান করা সমীচীন কীভাবে বাঙালি মানস, বিশেষত বাঙালি মুসলিম মানস, রেনেসাঁসের ভাবাদর্শ দ্বারাপ্রভাবিত হয়েছে। এখানে আমরা বাঙালি মুসলমান সমাজকে আলোচনার লক্ষ্য বস্তু হিসাবে নিচ্ছি এ - কারণে যে গত শতকের শেষ দশকগুলিতে এ-বিষয়ে প্রধানত হিন্দু পণ্ডিত জনেরা অনেক গবেষণা করেছেন, অনেক নিবন্ধ লিখেছেন।

আমরা জানি যে ঊনবিংশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে ইংরেজি শিক্ষার অভিঘাতে এবং সমকালীন ইয়োরোপীয় উদারনৈতিক ধ্যানধারণা প্রভাবে বাঙালি হিন্দু সমাজে যে বিরাট বৌদ্ধিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল তা-ই 'বাংলার রেনেসাঁস' আখ্যা লাভ করে। এই আন্দোলনের প্রবক্তারা ছিলেন উত্থানশীল শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনুষ এবং হিন্দু সমাজে সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রবল পক্ষপাতী ছিলেন।

সাধারণত এটা ধরে নেওয়া হয় যে ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগের এই রেনেসাঁস বাঙালি হিন্দু বৌদ্ধিক জগতে গভীর আলোড়ন আনলেও সমকালীন মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা এর মধ্যে বিশেষ অংশ নেন নি, কারণ তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল, পশ্চান্মুখী এবং আধুনিকতা বিরোধী। মুসলিম রক্ষণশীলতা সম্পর্কে এই ধারণার প্রধান উৎস উইলিয়াম হান্টারের বই The Indian Mussalmans (১৮৭১-এ প্রকাশিত) : সেই ইংরেজ সিভিলিয়ান তাঁর বইতে মুসলিমদের অবস্থাটাকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে-সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ ছিল মুসলিম সমর্থন লাভ করা। বলা হয়ে থাকে যে হান্টার বইটি তাড়াহুড়ো করে, মাত্র কয়েকসপ্তাহ সময় নিয়ে লিখেছিলেন। তাঁর বইতে হান্টার মুসলিম অবনতির কারণ দিতে গিয়ে কিছু একপেশে উক্তি করেছেন যেগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই বলে পরবর্তীকালে প্রতিপন্ন হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, হান্টার লিখেছিলেন ১৭৯৩ - এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এবং তৎপরবর্তীকালের ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির রাজস্বনীতির ফল স্বরূপ, বাংলার মুসলিম জমিদাররা নাকি সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। এটা কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য নয়।

বস্তুত নবাব মুর্শিদ কুলি খান (১৭০০-১৭২৭)-এর সময় থেকে, অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার আগেই, বাংলার জমিদারদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মুসলিম জমিদারদের বিপর্যয় ডেকে এনেছিল এমন বলাটা ঠিক নয়।

হিন্দুদের তুলনায় মুসলিদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল খানিকটা দুর্বল। অতীতে মুসলিমরা যে - অধিপত্য দেখিয়েছে তার ভিত্তি ছিল মুসলিম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর এই কর্তৃত্বের অবসান হল। যে - কর্তৃত্বের উপর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত ছিল তা ভেঙে পড়ার ফলে মুসলিমদের অবস্থার সাধারণ অবনতি ঘটে। তা সত্ত্বেও মুসলিমদের অবনতির কারণস্বরূপ হান্টারের একপেশে বক্তব্যকে অনেকেই স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিয়েই, বিশেষত মুসলিম নেতা ও পণ্ডিতজনেরা, তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের অবনতির কারণ হিসাবে ব্রিটিশ ও হিন্দুদের দায়ী করার জন্য ব্যগ্র ছিলেন। তখন থেকেই ইতিহাসে প্রতি এই নঞর্থক ও অগভীর দৃষ্টিভঙ্গী মুসলিম ভাবনাকে অধিকার করে আছে।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা শুধু বিদেশি আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা নয়; তা পশ্চিমী সভ্যতার সান্নিধ্য নিয়ে এল এই অঞ্চলকে। ব্রিটিশ শাসন ও পশ্চিমী অভিঘাতের প্রতিক্রিয়া হিন্দু ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে অভিন্ন হয় নি এবংএই ব্যবধান দুটি সম্প্রদায়ের পরবর্তী বিকাশকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। হিন্দুরা যেখানে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠাকে সাধারণভাবে স্বাগত জানিয়েছে মুসলিমরা সেখানে একে দেখেছে দুর্দৈব হিসাবে। বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং তদনুসারে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধনে মুসলিমদের অক্ষমতা তাদের সমূহ ক্ষতি করেছে। এ থেকে উদ্ধার লাভে তাদের দীর্ঘ সময় লেগেছে।

ঊনবিংশ শতকে বাংলার মুসলিমদের পশ্চাৎপরতার আসল কারণ তাদের নেতৃস্থানীয়রা এক সঙ্কট ও প্রতিকূলতার মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছেন। মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সাধারণভাবে পূর্বগানুকারী। সমকালীন এক নিরীক্ষকের কথা উদ্ধৃত করে বলা যায়, ''একপ্রাচীন বিজয়ী জাতি সহজে তার সুসময়ের স্মৃতি ত্যাগ করতে পারে না।''১ এমন উপলব্ধি কোনো সম্প্রদায়ের প্রগতির সহায়ক হতেপারে না। ''বস্তুত আধুনিক ভাবনার সঙ্গে মিলন সাধনে ব্যর্থতার কারণে''২ মুসলিমরা এক সাংস্কৃতির বিচ্ছিন্নতার শিকার হল --- এটাই শেষে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের আবির্ভাবে ইন্ধন জুগিয়েছে।

প্রত্যুত, হিন্দুদের ছিল ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তারা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে এবং নতুন শাসকদের ভাষা আয়ত্ত করার কাজে বিপুল আগ্রহ দেখিয়েছে। কলকাতার হিন্দু নেতাদের উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হল হিন্দুদের মধ্যে পশ্চিমী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসার কল্পে। এই প্রতিষ্ঠানটি হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে সমকালীন পশ্চিমী ভাবধারা সঞ্চারে বড় ভূমিকা নিয়েছে; এর ছাত্ররাই অনেকে সংস্কারপন্থী এবং মৌল পরিবর্তন পন্থী (র‍্যাডিক্যাল) আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। বস্তুত, ঊনবিংশ শতকের বাংলার হিন্দু সমাজ ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে প্রভূত মাত্রায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যের চর্চা ও তার বিকাশে হিন্দুরা অতীব উৎসাহ দেখায়। নতুন শিল্প আন্দোলন শহরে আরম্ভ হলেও অচিরেই গ্রামীণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। শহরের উচচবর্গীয় হিন্দুদের ভাষা গৌণ প্রভেদ বাদ দিলে গ্রামের হিন্দুদেরও ভাষা হওয়ার কারণে মূল ভাবধারা বয়ে নিয়ে যেতে প্রভূত সাহায্য করেছে। কিন্তু বাংলার মুসলিমদের বেলায় এটা ঘটেনি। শহরবাসী মুসলিম উচচবর্ণের ভাষা ছিল প্রধানত উর্দু, ফলে তাদের সঙ্গে গ্রামের মুসলিম অধিবাসী যাদের ভাষা ছিল বাংলা সামান্যই মেলামেশা ছিল। বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠী ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক একবিভাজন রেখায় দ্বিখণ্ডিত ছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের বিকাশ এ - কারণে মন্থর হয়ে পড়েছিল।৩

পশ্চিমী অভিঘাত যে হিন্দু সম্প্রদায় ও মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর ভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার কারণ বুঝতে চেষ্টা করতে হলে এই দুই মহান ধর্মীয় ব্যবস্থা, হিন্দুত্ব ও ইসলাম, এদের কিছু মৌল বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা উচিত হবে। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে হিন্দু ধর্ম প্রচলিত এবং এ পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগুলির অন্যতম। এ হল এক প্রশস্ত সাংস্কৃতিক স্রোত যার মধ্যে নানা ভাব,রীতি এবং পূজাপার্বণ স্থান পেয়েছে যেগুলি সামাজিক বিকাশের নানা স্তরের ভিতর দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। বাইরে থেকে উপাদান নিয়ে আত্তীকরণের অসীম ক্ষমতা আছে এর; হিন্দু সভ্যতা এভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। বর্ণভেদ প্রথার প্রতিকূল প্রভাব এবং নানা কুসংস্কার ও বিধিনিষেধের প্রচল সত্ত্বেও চিরদিনই হিন্দু ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তায় বড় মাত্রায় নমনীয়তা ও উন্মুক্ততা বিদ্যমান। এর ফলে হিন্দু দার্শনিক ও সংস্কারকদের পক্ষে হিন্দু ধর্মকে যুগোপযোগী করে পুনর্ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে। এখানেই রয়েছে হিন্দু ধর্মের শক্তি; এ - কারণে বাইরে থেকে নানা ঘাত - প্রতিঘাত এলেও হিন্দুধর্মের পক্ষে অটুট থাকা সম্ভব হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্য হল তার ঐতিহাসিকতা। পূর্বকালের অন্য পয়গম্বর যাঁরা প্রাগৈতিহাসিক কালে ছিলেন,যেমন কৃষ্ণ, বুদ্ধ, জরথুষ্ট্র, মোজেস ও যীশু, তাঁদের মতো না হয়ে মোহম্মদ ছিলেন একান্তভাবেই ইতিহাসের মানুষ। ইসলাম অত্যন্ত সংগঠিত এক ধর্ম এবং এর ইতিহাস অনেকাংশেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ঐস্লামিক ধর্মীয় মত ও আচারাদি মানবজীবনের সমগ্র কালের --- শৈশব থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত -- জন্য এত স্পষ্ট করে বলা আছে, নির্দেশ করা আছে যে এর কোনো মুখ্য সংস্কার বা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অবকাশ নেই। বস্তুত, গোঁড়া মুসলিম বিশ্বাস অনুসারে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌তে যে বিধি ও প্রতিষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া আছে সেসব চিরকালে গ্রাহ্য এবং অনমনীয় আর তাই তাদের পরিবর্তন সম্ভব নয়। হয়তো বলা যায় যে এখানেই রয়েছিল ইসলামের শক্তি যেমন তেমনি তার গলদ।

কিন্তু আমরা যদি ইসলামের বৌদ্ধিক ইতিহাস পর্যালোচনা করি তা হলে দেখতে পাব যে ঐস্লামিক ধর্মীয় বিধানের গোঁড়ামিসত্ত্বেও মুসলিম সামাজিক ভাবনায় নানা ধারা কাজ করেছে যেগুলি মুসলিম সম্প্রদায়ের মন ও চরিত্রের উপর অনপনেয় চিহ্ন রেখে গেছে। এই ধারাগুলিকে নিম্নলিখিত শিরোনামে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে ঃ (ক) গোঁড়া মৌলবাদী, (খ) আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী, (গ) রক্ষণশীল সংস্কারবাদী, (ঘ) আধুনিক সংস্কারবাদী এবং (ঙ) ইহজাগতিক যুক্তিবাদী।

(ক) গোঁড়া মৌলবাদী ঃ যাঁরা গোঁড়া বা মৌলবাদী ইসলামের প্রতিভূ তাঁরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে কুর'আন ও সুন্নাহ্‌-র নির্দেশ অন্ধভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং নিখুঁতভাবে অনুসরণ করতে হবে। তাঁরা সমগ্র মানবজাতির ঐক্যে বিশ্বাস করেন না। বস্তুত, গোঁড়া ইসলাম মানবজাতিকে স্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত করে ঃ (১) মুসলিম উম্মাহ্‌ অর্থাৎ ইসলামে বিশ্বাসীরা এবং (২) অবিশ্বাসীরা অর্থাৎ মানবজাতির বাকি অংশ।৪ মৌলবাদীরা চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী নন। তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসের প্রতি এতই কঠোরভাবে আসক্ত যে তাঁদের বিবেচনায় যা সত্যিকারের ঐস্লামিক ব্যবস্থা তা প্রতিষ্ঠা বা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অমুসলিম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (জেহাদ) ঘোষণাকে তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। ইতিহাস আমাদের বলে যে যখনই মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির অবনতি ঘটেছে বা মুসলিম সমাজ বহিঃশত্রুর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে তখনই ঐস্লামিক মৌলবাদ শক্তি সঞ্চয় করেছে। আমরা যাকে ওয়াহাবি আন্দোলনে বলি তার উত্থান ঘটে যখন অষ্টাদশ শতকে পুরো আরবদেশ তুর্কী আধিপত্যে আসে এবং অটোমান শক্তি ক্ষীয়মান হতে শুরু করে। অনুরূপভাবে রায় বেরেলির সৈয়দ আহ্‌মদ ওয়াহাবি আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তরভারতে উনিশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে তারিকা - ই- মুহম্মদিয়া আন্দোলন শুর করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে মুসলিমদের অবনতির প্রধান কারণ পয়গম্বর মোহম্মদের প্রচারিত মূল ইসলাম থেকে বিচ্যুতি এবং অমুসলিমদের সংস্পর্শে এসে নিজেদের পৃথক সত্তার প্রায় অবলুপ্তি

। তাই তিনি মনে করতেন যে ইসলামের সংস্পর্শে এসে নিজেদের পৃথক সত্তার প্রায় অবলুপ্তি। তাই তিনি মনে করতেন যে ইসলামের গৌরব ফিরে পেতে হলে পয়গম্বর ও প্রথম চার আদর্শ খালিফা (খালিফা - ই - রাশেদীন)-দের সময়কার জীবনধারায় মুসলিমদের ফিরে যেতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই সৈয়দ আহ্মদ তাবিকা মোহম্মদিয়া (মোহম্মদের পথ) প্রবর্তন করেন। অমুসলিমদের দ্বারা শাসিত ভারতকে তখন দার - উল - হার্ব বা শত্রু- অধিকৃত অঞ্চল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সৈয়দ আহ্মদের আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল একে দার - উল - ইসলামে রূপান্তরিত করা, অর্থাৎ পুনরায় ঐস্লামিক শাসনাধীনে আনা। কিন্তু সৈয়দ আহ্মদ যখন বুঝতে পারলেন যে ভারত থেকে শক্তিধর ব্রিটিশদের উৎখাত করা খুবই দুরূহ কাজ, তখন তিনি ধর্মযুদ্ধ (জেহাদ) ঘোষণা করলেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিখদের বিরুদ্ধে। শিখরা তখন উপমহাদেশের পাঞ্জাব ও উত্তর - পশ্চিম অঞ্চলের শাসনক্ষমতায় ছিল যেখানে জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিল মুসলিম। জানা গেছে যে বেশ কিছু বাঙালি মুসলিম তাঁর এই জেহাদে শামিল হয়েছিল। সেই সময়ে পুরো অঞ্চলটি ছিল মহারাজ রণজিৎ সিংহের হাতে শিখ শাসনাধীন। ১৮৩১ সালে শিখদের বিরুদ্ধে বালাকোটের যুদ্ধে সৈয়দ আহ্মদ এবং তাঁর অনুগামীদের অধিকাংশই মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়দ আহ্মদের বেশ কিছু বাঙালি শিষ্য ছিলেন; এঁদের অন্যতম মীর নিশার আলি যাঁকে সাধারণত তিতুমীর নামে অভিহিত করা হয়। তিনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের এক গরীব চাষী পরিবারের মানুষ। জমিদারদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু ; তাদের ও ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারে অনেক গরীব চাষী ও তাঁতী তিতুমীরের নেতৃত্বে সঙঘবদ্ধ হয়। জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে কলকাতার অদূরবর্তী কিছু এলাকায় তারা পরপর আক্রমন চালায়। সৈয়দ আহ্মদের মতেই তিতুমীর শাহাদত বরণ করেন ১৮৩১ সালে কোম্পানি ফৌজদের সঙ্গে বারাসতের নিকটবর্তী এক জায়গায় লড়াইয়ের পর।

পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী আরও বিস্তৃতভাবে অনুরূপ আন্দোলনে শামিল হয়। এর সূচনা করেন হাজি শরিয়াতুল্লাহ্। তিনিও ছিলেন গরীব মানুষ। একে ফরাইজি আন্দোলন নামে অভিহিত করা হয়; কুর' আন - নির্দেশিত ঐস্লামিক রীতিনীতির পুনরুদ্ধার ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু অচিরেই এ - আন্দোলন এক কৃষি বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে। এই ধর্মীয় - কৃষি আন্দোলনগুলি শেষে ব্যর্থ হয় এই কারণে যে এদের নেতৃত্বে ছিলেন এমন মানুষ যাঁরা 'অজ্ঞ ধর্মোন্মাদ'।৫ বস্তুত, এই পশ্চাদ্মুখী আন্দোলন শহরের শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মুসলিমদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। এমন কী গ্রামাঞ্চলের মুসলিমদের অধিকাংশও --- যাঁরা ধর্মীয় আচরণে গোঁড়া ছিলেন না এবং স্থূল সমন্বয়বাদী ও লোকাচার ভিত্তিক ইসলাম অনুসরণ করতেন --- তাঁরাও এই আন্দোলন শামিল হন নি।৬

এই মৌলবাদী ধর্মীয় আন্দোলনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ নেতারা সমকালীন পরিস্থিতির বাস্তব চরিত্রর অনুধাবনে অক্ষম ছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে ঊনবিংশ শতকের ব্রিটিশ ভারতে যে জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল তা বিগত দিনের সরল ও অপরিবর্তনীয় ধর্মীয় অনুশাসন দিয়ে সমাধান করা সম্ভব ছিল না। প্রকৃত পক্ষে, এই পশ্চাদ্মুখী মৌলবাদী ধর্মীয় আন্দোলন মুসলিম সম্প্রদায়ের অগ্রগতিকে শ্লথ করে দিয়েছিল। এটা বললে খুব মিথ্যা বলা হবে না যে আজ আমরা যে ধরনের ঐস্লামিক জঙ্গী আন্দোলন দেখতে পাচ্ছি তা ঊনবিংশ শতকের পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনেরই উত্তরসূরি।

(খ) আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী ঃ ঐস্লামিক মৌলবাদ থেকে ভিন্নতর সূফীবাদ ছিল ঐস্লামিক ভক্তিবাদ যার প্রবক্তা ছিলেন সূফীরা। এঁরা বিস্বাস করতেন যে ঈশ্বর যেহেতু সর্বাধিক কারুণিক, সর্বাধিক দয়ালু (আর - রহ্মান - ইর্ - রহিমা) তিনি ভয় পাওয়ার বস্তু নন, ভালোবাসার বস্তু এবং তাই তাঁর সঙ্গে মানুষ মিলতে পারে শুধু প্রেম ও ভক্তির মাধ্যমে। সূফীরা এক প্রকারের আধ্যাত্মিক মানবতাবাদে বিশ্বাস করতেন। তাঁদের শিক্ষার কেন্দ্রিক বিষয়কে সংক্ষেপে এভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ (ক) ঈশ্বরের অনন্যতা (ওয়াহাদুল - আল - ওয়াদুদ); (খ) পূজার বহিঃপ্রকার ও আচারাদির অর্থহীনতা; (গ) মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে আত্মশুদ্ধি এবং ঈশ্বরের প্রতি পরম ভক্তি।বস্তুত সূফী ভাবনায় সারকথা অনেকাংশে হিন্দু ভক্তিবাদের অনুরূপ। সূফীদের ধ্যানধারণা ও আচারাদি এতই বিচিত্র যে তাঁদের কোনো একটি মাত্র বর্গে স্থাপন করা সম্ভব নয়। কিন্তু কালক্রমে তাঁরা একাধিক সম্প্রদায় বা তারিকা-য় বিভক্ত হলেন। পি.কে. হিট্টির মতে, ''ইসলামের বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র বাগদাদ সূফীদের আদিতম সম্প্রদায়কে লালন করেছে এবং এক কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে কাজ করেছে যেখান থেকে তারা সকল দিকে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে। এই স্থান - কাল থেকেই বিজয়ী সুফীবাদ পৃথিবী জুড় বিস্তার লাভে অগ্রসরহয়। ইসলামের এক লোকায়ত রূপ হয়ে দাঁড়াল এটি।''৭ প্রকৃতপক্ষে এক বৈশ্বিক ধর্ম হিসাবে ইসলামের প্রসারে প্রথাবিরোধী সুফীরা সবচেয়ে উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছে। বাংলা অঞ্চলের ক্ষেত্রে এ কথাটা বিশেষভাবে খাটে, যেখানে দরবারপন্থী সূফী সন্ত, পীর - ফকির, আউল - বাউল এবং দরবেশদের কাজকর্ম মৌলবাদী মোল্লাহ্দের তুলনায় ইসলামের প্রসার সাধনে অনেক বেশি কার্যকর হয়েছে।যে ধর্মীয় ঐতিহ্য এই সূফী সন্তরা সৃষ্টি করেছিলেন তা হল আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ ও সহিষ্ণুতার ঐতিহ্য যা বাঙালি মানসে ও চরিত্রে চিরস্থায়ী অভিঘাত রেখে গেছে এবং সমন্বয়বাদী ও মানবতাবাদী বাঙালি সংস্কৃতির সৃজনে সহায়ক হয়েছে।৮

(গ) রক্ষণশীল সংস্কার পন্থী ঃ ঊনবিংশ শতকের পরের দিকে, বিশেষত ১৮৫৭ সালের বিরাট ব্রিটিশ - বিরোধী বিদ্রোহ (যাকে 'মিউটিনি' বলা হয়) তার পর ব্রিটিশ শাসনের প্রতি মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গীতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিতে এ-উপলব্ধি দেখা দেয় যে তাদের অবস্থার উন্নতিকল্পে মুসলিমদের উচিত পাশ্চাত্য বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করা এবং ইংরেজি শেখা। তৎকালীন বাংলার প্রধানতম মুসলিম নেতা আব্দুল লতিফ (১৮২৪ - ১৮৯৩) এই অভিমত সর্বাপেক্ষা কার্যকরভাবে ব্যক্ত করে

ন। যদিও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তিনি প্রশাসনে অপেক্ষাকৃত নিম্নতম পদে ছিলেন, তিনি অনেকখানি প্রভাব ঘটাতে পেরেছিলেন । ভারতের মুসলিমদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার কল্পে যে মুসলিম নেতারা আন্তরিক প্রয়াস নিয়েছিলেন তিনিই ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম। আব্দুল লতিফের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু ছিল রক্ষণশীল। গোঁড়া মুসলিম মতের প্রবল বিরোধিতা না করে তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে যুক্তি ওআপোষের ক্রমিক পথ অবলম্বন করেছিলেন। তাই যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষার বাস্তব উপযোগিতার কথা মনে রেখে তিনি তার প্রসারে আগ্রহী ছিলেন, পশ্চিমী উদারনৈতিক ভাবধারা সম্বন্ধে তিনি ছিলেন উদাসীন। এর ফলে অবশ্য একটা অসম্ভব পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। ইয়োরোপীয় এক ভাষা আয়ত্ত করবে কিন্তু যে-ভাষা যে - ভাব বহন করে তা উপেক্ষা করবে কারও পক্ষে এটা কেমন ভাবে সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে সমকালীন পশ্চিমী উদারনৈতিক ভাবধারা নিশ্চিতভাবে উত্থানশীল, ইংরেজি শিক্ষিত মুসলিম তরুণ সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করেছিল এবং মুসলিম রক্ষণশীলতাকে দুর্বল করেছিল। এই সম্ভাবনা আব্দুল লতিফের খুবই অপছন্দ ছিল।এদিক থেকে তাঁকে ঊনবিংশ শতকের অন্য এক বাঙালি শিক্ষার বিস্তার সাধনে যিনি সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন কিন্তু হিন্দু গোঁড়ামিরছিলেন কট্টর সমর্থক। আবদুল লতিফের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল রক্ষণশীল। তাঁর সমকালীন উত্তরভারতীয় মহান সয়ীদ আহ্মদ খান(১৮১৭-১৮৯৮)- এর প্রতিরূপে তিনি মুসলিম সংস্কার ও গোঁড়ামির সঙ্গে মানিয়ে নিতে চাইছিলেন তাদের বিরুদ্ধতা না করে। একজনউদারনৈতিক ব্রিটিশ সাংবাদিক ডব্লু. এস. ব্লান্টের মতে (ইনি ১৮৮৩ সালে কলকাতায় এসেছিলেন) আবদুল লতিফ ''প্রাচীনপন্থী মুসলিমদের'' নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সৈয়দ আমীর আলি ও তাঁর বন্ধুদের তিক্ত সমালোচনা করেন এই কারণে যে ''তাঁরা ইংরেজি পোষাকও আচারাদি গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন এবং নিজেদের সংস্কারক বলে দেখাতে চাইতেন।''৯ আবদুল লতিফ বিশ্বাস করতেন যে ''সংস্কারের সূচনা করবেন ধার্মিক মানুষরা, অধার্মিকরা নন; অন্যথা এ- সংস্কারের কোনো প্রভাব পড়বে না জনগণের ওপর।''১০ তিনি ছিলেন পরম্পরাশ্রয়ী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার বড় সমর্থক এবং আমীর আলি ও তাঁর বন্ধুদের যে প্রয়াস ছিল একে ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে প্রতিস্থাপনের তার বিরোধিতা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রধান আবদুল লতিফের প্রভাবেই বাংলায় দুটি সমান্তরালশিক্ষা ব্যবস্থা, একটি সাধারণ ও অন্যটি মাদ্রাসা ব্যবস্থা, চিরস্থায়ী রূপ গ্রহণ করে।

(ঘ) আধুনিক সংস্কারপন্থী ঃ- ঊনবিংশ শতকের মুসলিম ভাবধারার আধুনিক সংস্কারপন্থী দিকটি ব্যক্ত হয়েছে দু'জন অসামান্য মুসলিম চিন্তকে ভাবধারা ও কাজকর্মে। এঁরা হলেন উত্তর ভারতের সয়ীদ আহ্মদ খান (১৮১৭-১৮৯০) এবং বাংলার সৈয়দ আমীর আলি (১৮৪৭ - ১৯২৮)। সমকালীন প্রতিকূলতার আলোকে তাঁরা ইসলামের পুনর্ব্যাখা করতে চেয়েছেন। যে-যুগে বিজ্ঞানের লক্ষণীয় বিকাশ ঘটেছে এবং উদারনৈতিক ভাবনার প্রসার ঘটেছে, সে সময়ে এটা প্রমাণ করা প্রয়োজন ছিল যে ইসলাম বিজ্ঞান ও প্রগতিরবিরোধী নয়। সয়ীদ আহ্মদ খান, যিনি ভারতে মুসলিম রেনেসাঁসের জনক বলে স্বীকৃত কুর'আন-এর উপর তাঁর বিখ্যাত ভাষ্যে গ্রন্থটির একটি যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। তিনি মনে করতেন যে ঈশ্বরের বাণী (কুর'আন) এবং ঈশ্বরের কৃতি অর্থাৎ প্রকৃতি এ দুয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য থাকার প্রয়োজন নেই। রামমোহন রায়ের মতো সয়ীদ আহ্মদ খান বিশ্বাস করতেন যে ধর্মীয় মত যুক্তি দিয়ে ওসাধারণ বৃদ্ধি দিয়ে বিচার করতে হবে এবং সমকালীন জ্ঞান ও প্রয়োজনের নিরিখে তাদের পুনর্মূল্যায়ন সমীচীন। সয়ীদ আহ্মদ খানের সমকালীন অনুজ সৈয়দ আমীর আলি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে উনিশ শতকের উদারনৈতিক ও যুক্তিবাদী প্রাণসত্তার আলোকে ইসলামের পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমীর আলি সয়ীদ আহ্মদের থেকে এক পা এগিয়ে গেছেন। ডব্লু. সি. স্মিথ যেমন বলেছেন, ''স্যার সয়ীদের মত ছিল যে ইসলাম উদার প্রগতির পরিপন্থী ছিল না। আর আমীর আলি যে ইসলামকে উপস্থিত করলেন তা প্রগতিরই নামান্তর।''১২ আমীর আলি বিশ্বাস করতেন যে মুসলিমদের উচিত আপন বিচারবুদ্ধি (ইৎজিহাদ) প্রয়োগ করা এবং ইসলামকে ব্যাখ্যা করা আধুনিক পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের আলোকে, ''যে মানুষরা নবম শতকে বেঁচে ছিলেন তাঁদের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর না করে।''১৩ আমীর আলি দ্বিধাহীনভাবে ইসলামের গোঁড়া বা মৌলবাদী ব্যাখ্যাকে বর্জন করেছেন। তিনি এই চমকপ্রদ ও অত্যন্ত অর্থপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ঃ

পশ্চিম বিশ্বে রেনেসাঁস রিফর্ম্যাশন নিয়ে এসেছিল এবং ইয়োরোপ যখন পুরোহিততন্ত্রের শৃঙ্খল ছুঁড়েফেলে তখনই তার প্রগতি শুরু হয়। ইসলামের বেলাতেও সংস্কারের পূর্বে আলোকপর্ব আসতে হবে, এবং ধর্মীয়জীবনের নবীভবনের আগে বহু শতকের আক্ষরিক ব্যাখ্যা এবং 'প্রথানুগতার' নিয়ম মনের উপর যে বন্ধন আরোপ করে আছে তা থেকে প্রথমে তার মুক্তি আবশ্যক। যে অনুষ্ঠানিকতা পূজকের হৃদয় আকর্ষণ করে না তা পরিত্যাগ করতে হবে, বাহ্যিক আচার আন্তরের অনুভূতির অধীন হবে; নমনীয় মনের উপর নীতিশাস্ত্র পাঠের ছাপ পড়তে হবে; শুধু তখনই আমরা ইসলামের পয়গম্বরের শেখানো কর্তব্যের নীতিগুলি সম্পর্কে উৎসাহবোধ আশা করতে পারি। ইসলামের সংস্কার আরম্ভ হবে যখন এটা বোঝা যাবে যে ঈশ্বরের বাণী যে ভাষায়ই অনুবাদ করা হোকনা কেন তাদের দৈব চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত অঞ্জলি যে কোনো ভাষায় উচচারিত হোক না কেন ঈশ্বর তা গ্রহণ করবেন.....।

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে একটা সহমত ছিল যে অর্থ না বুঝে ভক্তি নিবেদন করলে তা বৃথা যাবে। ইমাম আবু হানিফা নামাজ পাঠ এবং খুত্বা বা উপদেশ পাঠ যে কোনো ভাষায় বিধিসম্মত ও গ্রাহ্য বিবেচনা করতেন। আবু হানিফার শিষ্য, আবু ইউসুফ ও মোহম্মদ, একটু পরিবর্তন সহ তাঁদের গুরুর মতাদর্শ গ্রহণ করেছেন।তাঁরা বলে গেছেন যে - ব্যক্তি আরবি ভাষা জানে না, সে অন্য যে -

কোনো ভাষায় তার ভক্তি নিবেদন করতে পারে।১৪

আমীর আলি প্রথাসিদ্ধ মাদ্রাসা শিক্ষা পছন্দ করতেন না, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন এ ছিল সম্পূর্ণ প্রাচীনপন্থী এবং কোনো কাজে লাগত না। তিনি তাই এর অবসান চেয়েছিলেন, মত দিয়েছিলেন যে সম্পূর্ণ প্রাচ্য বিদ্যালয়গুলির পেছনে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তা ব্যয় করা উচিত ''উচচ ইংরেজি ও কারিগরি শিক্ষার''১৫ পেছনে। সম্পূর্ণত প্রাচ্য শিক্ষাদনের জন্য প্রতিষ্ঠান চালনা ''সরকারের পক্ষে অবিবেচক কাজ, কারণ এ মানুষের মধ্যে পুরাতন বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব সঞ্চার করে।১৬ উনিশ ও বিশ শতকের ইংরেজি - শিক্ষিত মুসলিমদের মনে এরূপ আধুনিক ও প্রগতিশীল ভাবধারা গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

(ঙ) ইহজাগতিক যুক্তিবাদী ঃ- ইস্লামিক ধর্মীয় অনুশাসনে যদিও বিশেষ নময়ীয়তা নেই, তবু মুসলিম চিন্তাধারায় যুক্তিশীলতার এক টা উপাদান বরাবরই বিদ্যমান ছিল। এই ধারার আদিতম প্রকাশ দেখা গেছে আরবের নবম ও দশম শতকের মূতা - জিলা মতাদশের মধ্যে মূতা - জিলা দার্শনিকরা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন প্রাচীন গ্রীক যুক্তিবাদী চিন্তার দ্বারা--- বিশেষত অ্যারিস্টোটলীয় ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারা --- এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে কীভাবে যুক্তির সঙ্গে মেলানো যাবে এই যুগপ্রাচীন উভয় সঙ্কটের সমাধান খুঁজেছেন। কিন্তুগোঁড়ায় ইসলামের প্রবক্তাদের দিক থেকে প্রবল বিরোধিতায় এই সাহসিক প্রয়াস সফল হয় নি। কিন্তু এটি একেবারে লুপ্ত হয়ি ন এবং ঐস্লামিক বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে রইল। উনিশ শতকের ভারতের উদারনৈতিক পরিমণ্ডলে এই যুক্তিবাদী ধারা উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। এভাবে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে আমরা একজন উল্লেখ্য মুসলিম র‍্যাডিক্যাল চিন্তকের কথা জানতে পারি, তিনি আবদুল রহিম।১৭

আবদুল রহিমের জন্ম ১৭৮৫ -র কাছাকাছি সময়ে (হিজরী ১২০০ অব্দে) উত্তর ভারতের গোরখপুরে। তাঁর বাবা ছিলেন পেশায় তন্তুবায়। ছেলেবেলায় রহিম ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান; সে কারণে তাঁর বাঁ হাত অবশ হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনার ফলে তাঁর জীবনধারা পাল্টে যায়। যেহেতু পারিবারিক পেশা গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তিনি ভালো করে লেখাপড়া করার দিকে মন দিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌ ও দিল্লির বিখ্যাত কয়েকটি মাদ্রাসায় পাঠ গ্রহণ করেন এবং অচিরে ঐতিহ্যাশ্রয়ী ঐস্লামিক বিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী বলে খ্যাত হন। আরবি ও ফারসির মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানাহরণ করেন। শুধু উচচতর ধর্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলিই নয়, তৎকালে প্রাপ্তব্য আরবি ও ফারসি ভাষা দর্শন ও বিজ্ঞানের পুরাণ গ্রন্থগুলিও তিনি পাঠ করেন। তিনি বিশেষ করে মূতা - জিলা-র যুক্তিবাদী দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শেষে সকল ধর্মে তিনি বিশ্বাস হারান। বস্তুত, যে আবদুল রহিম তরুণ বয়সে ধর্মপ্রাণ মুসলিম ছিলেন তিনি মুক্তমনা ও যুক্তিবাদীতে পরিণত হলেন। তাঁর ধর্মবিরোধী মতের কারণে তিনি দহ্রি বলে খ্যাত হলেন, অর্থাৎ এসব মানুষ যিনি পয়গম্বর ও শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করেন না। আবদুল রহিমের মতে ভগবান্ বা পরম সত্তার ধারণা ইমাম বা পুরোহিতদের মস্তিষ্ক প্রসূত। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির বিধানে। তাঁর মতে সূর্যই হল সকল সৃষ্টির উৎস।

:

১৮১০ সালে আবদুল রহিম কলকাতায় চলে আসেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল এখানেই কাটান। কলকাতায় তিনি স্বগৃহে রয়েছেন এমন মনে করতেন, কারণ এই নগরে, নতুন ব্রিটিশ শাসকদের তৈরি এই বহুজাতিক মহানগরে বহুমতের নানা রকমের মানুষ আকৃষ্ট হত। এ - শহর অ-সাধারণ ও ধর্মদ্রোহী মানুষদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। জানা যায় যে সয়ীদ আহ্মদ দিল্লিতে আবদুল রহিমের সহপাঠী ছিলেন। তিনি ১৮২০ সালে কলকাতায় এসে আবদুল রহিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেন --- উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে বুঝিয়ে ইসলামের চৌহদ্দিতে ফিরিতে আনতে। কিন্তু আবদুল রহিম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি, তাঁর ধর্মদ্রোহও বর্জন করেন নি।১৮

মৌলানা এবাইদ ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেডেন্ট ছিলেন দশ বছর। তাঁর উদ্যোগেই ১৮৭৩ সালে ঢাকা সমাজ সম্মেলনী প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল সমাজসংস্কার কল্পে স্থাপিত সাধারণের সমিতি। ওবাইদ আবার ঢাকা মুসলিম সুহৃদ সম্মেলন, Calcutta Muhammedan Literary Society এবং Bengal Social Science Association --- এদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের খ্যাতনামা নেতা রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ওবাইদের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। তাঁর অনুরোধে মৌলানা রামমোহন রায়ের বিখ্যাত পুস্তক তুহ্ফাতুল - মুইয়াহিদিন --- যা লেখা ছিল ফারসিতে, আরবি ভূমিকা ও শিরোনাম হসহ --- ইংরাজিতে অনুবাদ করেন।

আবদুল রলিম দহ্রির মৃত্যুর পর মুসলিম ভাবনার যুক্তিবাদী ধারাটি লুপ্ত হয়নি। মুসলিম বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের উপর এর খানিকটা ক্ষীণ প্রভাব এরপরও অক্ষুণ্ণ থাকে। উনিশ শতকের শেষে আমরা এর দৃঢ় প্রভাব লক্ষ করি দেলওয়ার হোসেন আহ্মদের (১৮৪০-১৯১৭) রচনায়। তাঁকে সঠিক অর্থে রেনেসাঁস ব্যক্তিত্ব হিসাবে বর্ণনা করা যায়। দেলওয়ার হোসেন পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় একমধ্যবিত্ত পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৬১ সালে প্রথম বিভাগ বি. এ. পাশ করেন। খুব সম্ভবত তিনি ভারতের প্রথম মুসলিম স্নাতক। দেলওয়ার হোসেন ছিলেন সাহসী ও মৌল চিন্তক এবং মুসলিম সমাজের বিধি - বিধান ও প্রতিষ্ঠানগুলির আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। ১৮৮৯ সালে দুই খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বই Essays on Muhammedan Sccial Reform -এ দেলওয়ার হোসেন স্পষ্ট ভাষায় তাঁর ভাবধারা ব্যক্ত করেন। সমকালীন পাশ্চাত্য যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী দর্শন দ্বারাতিনি অ

নকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন। দেলওয়ার হোসেন সম্ভবত প্রথম মুসলিম বুদ্ধিজীবী যিনি স্পষ্টভাবে লেখার সাহস দেখিয়েছেন যে ই হবাদী বিধিবিধান ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে এক পরিবর্তনশীল সমাজের বৈ ষয়িক প্রয়োজনগুলি কোনো স্থবির ধর্মীয় বিধান মেটাতে সক্ষম নয়। তাঁর অভিমত ছিল যে মুসলিমদের প্রতিপত্তি হ্রাসের কারণত াদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপর ধর্মের প্রবল প্রভাব; পক্ষান্তরে ইয়োরোপীয় দেশগুলির অগ্রগতি হয়েছে এই কারণে যেতারা ধর্মকে রাজনৈতিক ও নাগরিক বিধান থেকে ক্রমশ দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। দেলওয়ার হোসেনের ভাষায় ঃ

...পৃথিবীর প্রতি অংশে সামাজিক রীতি ও নাগরিক বিধানের সঙ্গে ধর্মের মিলনে মুসলমানদের পক্ষে সর্বাধিক অনিষ্ট সাধিত হয়েছে , এবং শীঘ্র ও সময়মতো এদের বিচ্ছিন্ন না করলে মুসলমান শব্দটি কথার -কথা দাঁড়াবে এবং সভ্য জাতিগুলির মধ্যে মুসলিম নরে গাষ্ঠীগুলি পরিহাসের বস্তুতে পরিণত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।২০

দেলওয়ার হোসেনের মতে মুসলিমদের অবনতির কারণ তাদের সঙ্কীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতা। অধিকাংশ মুসলিম দেশে স্বৈরাচারী শাসনের প্রচলনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন এটা হয়েছে আত্মবিশ্বাস ও স্বাবলম্বনের অভাবের কারণে। আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছেন ঃ

কোনো মুসলিম জাতিই কখনও রাজাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয় নি। সবচেয়ে অগ্রসর খৃস্টান দেশগুলিতে সার্বভৌমের ক্ষমতা--- তাঁর নাম সম্রাট, রাজা বা রাষ্ট্রপতি যা-ই হোক না কেন --- কম - বেশি মাত্রায় আইনের শৃঙ্খলে সীমাবদ্ধ; কিন্তু মুসলিম দেশগুলিতে সার্বভৌম আইনের ঊর্ধ্বে এবং তিনি কী করতে চান বা না চান তার জন্য কারও কাছে তাঁর দায়বদ্ধতা নেই।২১

প্রকৃতপক্ষে দেলওয়ার হোসেন ছিলেন ইহবাদিতার পরম সমর্থক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের মিলনে মুসলিমদের নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে। আবার তাঁর মতে মুসলিমরা আধুনিককালে বিশেষ অবদান রাখতে পারে নি মুসলিম সমাজে বৌদ্ধিক স্বাধীনতার অভাববশত।

দেলওয়ার হোসেন যদিও উচ্চবর্ণের সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে এসেছিলেন তিনি এটা বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে মুসলিমসমাজের সাধারণ উন্নতির জন্য শহুরে ভদ্রোলোক ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের অভাবটা পূর্ণ করতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমেই এটা করা যাবে। তিনি এটাও বিশ্বাস করতেন যে অগ্রগতি আনতে হলে মুসলিমদের একই সঙ্গে ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাই শিখতে হবে। আমীর আলির মতো তিনিও মাদ্রাসাতে যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হত তার প্রবল বিরোধী ছিলেন। তিনি এগুলি তুলে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন এবং বলেছিলেন এদের পরিবর্তে কলকাতা ও অন্য শহরগুলিতে নতুন কলেজ স্থাপিত হোক যেখান ইংরেজি ও অন্য আধুনিক বিষয়ে শিক্ষাদান করা হবে। দেলওয়ার হোসেনের মতে, মাদ্রাসায় যে শিক্ষা দেওয়া হত তাছিল ''সম্পূর্ণত কালের অনুপযোগী এবং যার বর্তমান মূল্য নেই, ভবিষ্যতেই যার ব্যবহার হবে না, লোককে এমন কিছু দেওয়া সম্পদের অপচয় মাত্র।''২২

বাংলা ভাষা শিখতে এগিয়ে আসার জন্য দেলওয়ার হোসেন মুসলিমদের আহ্বান জানান। তিনি দেখালেন যে উচ্চবর্ণের দ্বারা বাংলা ভাষার অবজ্ঞার ফলে বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। শহুরে উচ্চবর্গ ও গ্রামীণ নিরক্ষর জনগণের মধ্যে ব্যবধান এভাবে বেড়ে গিয়েছিল। হোসেন বুঝতে পেরেছিলেন যে বাংলার মুসলিমদের উর্দূকে বাদ দিয়ে বাংলাকেই প্রথমভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।২৩ তিনি ভেবেছিলেন যে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শুধু সাধারণ মানুষ আধুনিক জ্ঞান - বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে, কারণ সকলের পক্ষে ইংরেজি শেখা সম্ভব নয়। তাই তাঁর সুপারিশ ছিল যে - দেশবাসী ইংরেজিতে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন তাঁরা বিজ্ঞান, দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ের মৌল গ্রন্থাদি বাংলায় অনুবাদের দায়িত্ব নিন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই প্রক্রিয়াতেই পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল ধ্যান - ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসারিত করা যাবে।২৪

সমাজ সংস্কারেও দেলওয়ার সংস্কারেও দেলওয়ার হোসেন গভীর আগ্রহ দেখান। মুসলিম উত্তরাধিকার আইন যা সম্পত্তির অধিকারীকে আপন সম্পত্তি বিক্রির বা ইচ্ছামতো উত্তরাধিকারীকে দানে বাধা দেয় তিনি তার পরিবর্তন চেয়েছিলেন। তাই তিনি ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের অনুরূপ এক ইহবাদী আইন দিয়ে তার প্রতিস্থাপন চেয়েছিলেন।২৫ তিনি মহিলাদের অন্তঃপুরে রাখা (পর্দা প্রথা) ও বহুবিবাহ প্রথারও ঘোর বিরোধী ছিলেন।

বাংলার অপর দুই মুসলিম নেতা, আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলির তুলনায় দেলওয়ার হোসেনের ধ্যান - ধারণা ছিল অনেকখানি অগ্রসর এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আমরা জানি আবদুল লতিফ মুসলিমদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার চাইছিলেন স্রেফ বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে। কিন্তু তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। তিনি মুসলিমদের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের সঙ্গে আপোষ করতে চেয়েছিলেন, তাদের অতিক্রম করা নয়। তাঁর পীড়াপীড়িতেই পুরোনো আমলের মাদ্রাসা শিক্ষা বাংলায় চলতে লাগল, যদিও তাঁর দুই সমকালীন সৈয়দ আমীর আলি ও দেলওয়ার হোসেন এর প্রতিস্থাপন করে যুগের বাস্তব প্রয়োজন মেটানার উপযোগী আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিলেন। আবদুল লতিফের তুলনায় আমীর আলির মতামত ছিল অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ও প্রগতিশীল। আমরা আগেই আমীর আলির সংস্কারমূলক ধর্মীয় অভিমতের কথা বলেছি, সমকালীন পশ্চিমী যুক্তিবাদী ভাবনার আলোকে ইসলামের পুনর্ব্যাখার আহ্বানের কথা বলেছি। কিন্তু তিনি স্পষ্ট ও সঠিক ভাষায় বলে যান নি, হয়তো বলতে স

াহস পান নি, ইসলামের কোন্ বিধি ও আচার সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তন বা বর্জনের প্রয়োজন ছিল।
তুলনামূলকভাবে দেলওয়ার হোসেনের ভাবনা - চিন্তা ছিল স্পষ্টতর এবং পরিস্থিতির বাস্তবতা সম্বন্ধে অধিকতর সচেতনতাসঞ্জাত। সেসব ছিল র‍্যাডিক্যাল এবং খানিকটা বৈপ্লবিক। দেলওয়ার হোসেন বোধ হয় ছিলেন প্রথম মুসলিম চিন্তক যিনি শুদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন প্রতিষ্ঠান ও আচারাদি পরিবর্তন বা বর্জনের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গেলে এর প্রয়োজন ছিল। তিনি দেখিয়ে গেছেন যে তাদের জন্য অধিকতর সংখ্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠার স্থাপন করলে বা নানানা সরকারি চাররিতে অধিকতর সংখ্যায় তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করলেই মুসলিমদের পশ্চাৎপরতা দূর করা যাবে না। তাঁর বিশ্বাস ছিল মুসলিমদের উন্নতির প্রথম শর্ত হল সেই সব প্রতিষ্ঠান ও আচারাদির পরিবর্তন বা বিলোপসাধন যেগুলি অগ্রগতির পথে অন্তরায়স্বরূপ বলেছেন ঃ
মুসমলানদের জন্য আমরা অধিকতর সংখায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারি, অথবা তাদের কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট বা জজ বানাতে পারি কিন্তু আমরা সামূহিকভাবে তাদের গুরুত্ব বাড়াতে সক্ষম হব না যদি ভারতের মুসলমানরা তাদের পশ্চাৎপরতার আসল কারণ উপেক্ষা করে অথবা তাদের বিধান ও প্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন সাধনে গা - জোয়ারি অপারগতা দেখায়। ২৬
এটা আশ্চর্যের নয় যে দেলওয়ার হোসেনের র‍্যাডিক্যাল মত সমকালীন মুসলিম সমাজের পছন্দ হয় নি, কারণ সে - সমাজ মূলত রক্ষণশীল রয়ে গিয়েছিল। আবার যেহেতু দেলওয়ার হোসেন সম্পূর্ণত ইংরেজিতে লিখতেন, তাই তাঁর ভাবধারা সাধারণ জনের কাছে পৌঁছতে পারে নি। এতৎসত্ত্বেও এটা অস্বীকার করা যাবে না যে তাঁর ভাবনায় ভবিষ্যতের জন্য বৈপ্লবিক সম্ভাবনার বীজ উপ্ত ছিল। তাঁর মৃত্যুর প্রায় দু'বছর আগে দেলওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য করেছিলেন যার মধ্যে তাঁর প্রত্যয়ের সাহসিকতা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি লিখলেন ঃ
বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী যে কোনো মানুষের কর্তব্য হল সত্যের অন্বেষণ এবং যখন তা পাওয়া গেল সে কথাটা ঘোষণা করা। আমি সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছি এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের হাতে তা তুলে দিতে অমি দায়বদ্ধ।২৭
আবদুল রহিম দহ্‌রি, সৈয়দ আমীর আলি ও দেওয়ার হোসেনের যুক্তিবাদী, সংস্কারপন্থী ও র‍্যাডিক্যাল ভাবধারা পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জাগরণ সাধনের জন্য তাঁরা তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।
বিংশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে, বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, বাংলার মুসলিম সমাজের মধ্যে একটা আলোড়ন এসেছিল। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন নাম্নী এক সাহসিকা মহিলা (১৮৮০ - ১৯৩২) নারীমুক্তি সাধনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে অগ্রগতির অপরিহার্য প্রাক্‌শর্ত হল শিক্ষা। তাই ১৯১১ সালে সামান্য সম্পদ্ নিয়ে মেয়েদের জন্য কলকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন (পরে এর নাম হয় সাখাওয়াৎ স্মারক বালিকা বিদ্যালয়)। স্কুল টি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম মেয়েদের মধ্যে উপযোগী শিক্ষার বিস্তার সাধন। মুসলিম নারীদের পশ্চাৎপদ করে রেখেছিল তাদের বিরোধিতা জ্ঞাপন। তাঁর সময়কার পুরুষ - শাসিত মুসলিম সমাজে নারীদের প্রতি যে নিষ্ঠুর ও অন্যায় আচরণ করা হত রোকেয়া তার বিরুদ্ধে জোরাল প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে নারীদের নিম্নতর অবস্থার জন্য সামাজিক পরিস্থিতিই দায়ী, কোনো অন্তর্নিহিত ত্রুটি নয়। তৎকালীন মুসলিম সমাজে নারীদের দুরবস্থার নিন্দা করে তিনি তিক্ততার সঙ্গে প্রশ্ন করছেন ঃ
আমরা কি সত্যি বিশ শতকে বাস করছি? পৃথিবী থেতে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়েছে এমন বলা হয়, কিন্তু আমাদের দাসত্ব কি লুপ্ত হয়েছে? ---না।২৮
বেগম রোকেয়া বিশ্বাস করতেন যে পুরুষরা যেসব বিধান তৈরি করেছে যে সবই নারীদের হীনাবস্থার জন্য দায়ী। যিনি দেখালেন যে পুরুষরা চিরদিনই নারীদের নিম্নতর মানুষ হিসাবে গণ্য করেছে। নারীদের নিম্নাবস্থায় রাখার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান দায়ী বলে তিনি বিশ্বাস করতেন সেসবের তিনি সমালোচনা করেছেন। যে সকল কারণে নারীরা তাদের ন্যায্য অধিকার প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে সে সববিশ্লেষণ করে রোকেয়া একটি সাহসিক ও স্পষ্ট মন্তব্য রেখেছেন ঃ
আমরা যে আমাদের দাসত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি না তার প্রধান কারণ হল যখনই কোনো নারী মাথা তুলতে চেয়েছে সে মাথাকে ধর্মের নামে বা ধর্মীয় বিধান প্রয়োগ করে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ... আমাদের অনেক অগ্রহণযোগ্য বিষয়কে গ্রহণ করতে হয়েছে কারণ সেগুলি ছিল ধর্মীয় বিধানে নির্দেশিত। কোনো মা যখন তাঁর অপারগ শিশুকে ঘুম পাড়াতে চান তখন তিনি তাকে বলেন, 'মুমোও, নয়তো এক বিরাট সিংহ এসে তোমাকে ধরে নেবে।' এটা তাকে চোখ বন্ধ করে থাকতে বাধ্য করে। অনুরূপভাবে, আমরা যখন মাথা তুলে অতীত বর্তমানের দিকে তাকাতে চাই, তখন সমাজ চিৎকার করে বলে, 'ঘুমোও, নয়তো তোমাকে নরকে যেতে হবে।' এর ফলে কথাটা আমাদের বিশ্বাস্য মনে না হলেও আমাদের চুপ করে থাকতে হয়। ... ধর্মের অন্তনিহিত অর্থ বা আধ্যাত্মিকতা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। আমি শুধু ধর্মের সামাজিক বিধানগুলি নিয়ে আলোচনা করব, তাই ধার্মিক মানুষদের ভয় পাবার কিছু নেই...।
পুরুষদের নির্দেশমতো নারীদের চলতে হবে ভগবানের এই আদেশ কেন আমেরিকা বা উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত অন্য কোনো দেশে ঘোষিত হয় নি? ভগবান কি তা হলে শুধু এশিয়ারই ভগবান? আমেরিকা কি তাঁর এলাকার বাইরে? ...সে যা-ই হো

ক, আমরা আর পুরুষদের মাতববরি যা ধর্মের নামে আরোপিত সহ্য করতে পারি না। এটা সত্যি যে নারীদের সবচেয়ে বেশি নিপী ড়ন সহ্য করতে হয় সেসব স্থানে সেখান ধর্মের রাশ কঠোর। ... যেখানে এ রাশ শিথিল, সেখানে নারীরা পুরুষদের প্রায় সমকক্ষ। ধ র্ম বলতে এখানে বুঝতে হবে ধর্মভিত্তিক সামাজিক বিধান।

কেউ বলতে পারেন : 'আপনি ধর্ম নিয়ে কেন আলোচনা করছেন যখন কথা বলছেন সামাজিক সমস্যা নিয়ে?' উত্তর হল : ধর্ম আম াদের দাসত্বের বাঁধনকে শক্ত করেছে। পুরুষরা নারীদের উপর খবরদারি করছে ধর্মের নাম নিয়ে। এ - কারণেই আমাদের আলোচ নায় ধর্ম এসে পড়ে। আশা করি ধার্মিক মানুষরা আমাকে মার্জনা করবেন।২৯

তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রোকেয়া তাই ছিলেন বৈপ্লবিক নারী। দেলওয়ার হোসেনের মতো তিনি বিশ্বাস করতেন যে নাগরিক ি বধান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধর্মের প্রভাব থেকে বাইরে রাখতে হবে।

যে হীনমন্যতা থেকে নারীরা ভুগতেন বেগম রোকেয়া ছিলেন তারও সমালোচক। মহিলাদের গয়নাগাঁটি নিয় অত্যধিক হ্যাংলামির তিনি বিরোধী ছিলেন। রোকেয়ার মতে গয়নাগাঁটি ছিল দাসত্বের প্রতীক। তাঁর সময়ে বহুল প্রচলিত পর্দা প্রথারও তিনি ছিলেন সম ান সমালোচক। সমাজিক প্রগতির এক প্রধান অন্তরায় বলে তিনি একে দেখতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই অশুভ প্রথা মুসলিম জ নসমষ্টির প্রায় অর্ধভাগকে সকল উৎপাদন ক্রিয়া থেকে দূরে রেখেছে।

বেগম রোকেয়া ছিলেন স্ত্রীশিক্ষার প্রবল সমর্থক। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে শিক্ষা মহিলাদের আপন অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করবে এব ং তাদের মুক্তির সহায়ক হবে। বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের এক অনুজ্জ্ব ল চিত্র তুলে ধরেন এবং এই বলে পরিতাপ করেন যে যদিও ইসলামের পয়গম্বর পুরুষ ও নারী উভয় সমাজকেই জ্ঞানার্জনের নিদে র্শ দিয়ে গেছেন, মুসলিমরা তার অনেকটাই উপেক্ষা করছে। তাঁর প্রশ্ন ঃ

যে মুসলিমরা পয়গম্বরের প্রতি (বা এক প্রাচীন মসজিদের ইষ্টক খণ্ডের প্রতি) অসম্মান হয়েছে বিবেচনা করলে প্রাণ বিসর্জন দিতে এগিয়ে আসেন তাঁরা কেন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর নির্দেশ পালনে অপারগ?৩০

বেগম রোকেয়া নারীদের আর্থিক স্বাধীনতার উপরও জোর দিয়েছেন। মোতিচূর নামক তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে তিনি সাহসের সঙ্গে ে ঘাষণা করেছেন ঃ

পুরুষদের সমকক্ষ হওয়ার জন্য যা কিছু করা উচিত আমরা তা করব। যদি স্বতন্ত্রভাবে জীবিকার্জন আমাদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে , তবে আমরা তা-ই করব। দরকার হলে আমরা মহিলা করণিক, মহিলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহিলা ব্যারিস্টার, মহিলা বিচারক --- এমন স ব কিছু হব। ...সরকারি অফিসে যদি আমাদের চাকরি না জোটে তা হলে আমরা চাষবাস করব। আপনাদের কন্যার জন্য পাত্র না ে পলে আপনারা কাঁদতে বসেন কেন?' কন্যাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করুন এবং নিজেদের জীবিকার্জন করতে দিন।৩১

১৯০৪ থেকে ১৯৩০ -এর মধ্যে বেগম রোকেয়া নারীদের সমস্যা নিয়ে অনেকগুলি বই ও প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বোধ হয় এশিয়াতে নারীবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ।

১৯২০-র দশকে মুখ্যত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের একটি গোষ্ঠী বুদ্ধিমুক্তির এক আন্দোলনশুরু করে ন। উনিশ শতকের মুসলিম অগ্রণীদের --- বিশেষত সয়ীদ আহ্মদ খান, সৈয়দ আমীর আলি ও দেলওয়ার হোসেনের আধুনিকীকর ণের সংস্কারমূলক ও র‍্যাডিক্যাল ভাবধারা এ আন্দোলনে প্রভূত প্রেরণা জুগিয়েছে। অনেক পরে, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্থাপিত হ ওয়ার পর, পূর্ববঙ্গের মুসলিমরা এক সাংস্কৃতিক রেনেসাঁসের শামিল হন যা ইহবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপট জুটিয়েছে; এরই পরিণতিতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মৌলবাদী ও জঙ্গী ইসলামের অভ্যুত্থান বাঙালি মুসলিমদের যুগ-পুরাতন সহিষ্ণু, সমন্বয়বাদী ও মানবতাব াদী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর আঘাত হিসাবে দেখা দিয়েছে। ইতিহাস বলে যে ঐস্লামিক মৌলবাদ শুধু তখনই গুরুত্ব পায় যখনকি ছু কায়েমি স্বার্থ--- মুসলিম সমাজের মধ্যে থেকে শুধু নয়, বাইরের কিছু অংশ থেকেও--- পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন পায়। উনিশ শত কেব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক স্বার্থ ছিল মুসলিম সমাজের রক্ষণশীল অংশের পৃষ্ঠপোষণ। মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিশ শতকেও কংগ্রেসের ব্রিটিশ - বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য ব্রিটিশদের কাছ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা ে পয়েছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক শান্তিকে বিঘ্নিত করে। তখন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ছিল কমিউনিস্ট রাশিয়ার প্রভাব প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের ঐস্লামিক সামরিক জমানাকে সমর্থন করা । অনুরূপভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে মদত জুগিয়েছে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা ক রেছে এই আশঙ্কায় যে স্বাধীন বাংলাদেশ সোভিয়েত গোষ্ঠীতে যোগ দেবে।

তার জন্মকাল থেকেই বাংলাদেশকে ভেতর বাইরে দুদিক থেকেই শত্রু মোকাবেলা করতে হয়েছে। বাংলাদেশের কিছু লোকছিল প াকিস্তানের প্রতি যাদের আনুগত্য ছিল অবিচল। তারা বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। এরা পাকিস্তান, সৌদি আরব ও অন্য কয়েকটি দেশ থেকে সমর্থন পেয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি অংশ যা পাকিস্তানপন্থী ও ভারতবিরোধী মনে াভাব পোষণ করত তারাও এদের সমর্থন করেছে। ১৯৭৫ -এর সেনাবাহিনীর 'ক্যু দে-তা' যা বাংলাদেশের স্থাপয়িতা মুজিবুর রহম

ান ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যের নৃশংস হত্যার রূপ নেয় এবং আওয়ামি লীগের ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের পতন ঘটায় সে টা ছিল এসব লোকদের ষড়যন্ত্রের ফল। ক্ষমতা দখলের অল্প পরেই নতুন সামরিক শাসকরা নিজেদের আসন শক্ত করার মানসে যে নীতি গ্রহণ করে তাকে ইসলামমুখী ও পাকিস্তানমুখী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। যদিও অসামরিক শাসন বাংলাদেশে ফিরে এসেছে প্রায় দুই দশকের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ সামরিক শাসনের পর, তবু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ রূপটি ফিরে আসে নি বা আসতে পারেনি। রক্ষণশীল ঐস্লামিক গোষ্ঠীরা বাংলাদেশী সমাজ ও প্রশাসনের উপর তাদের দখল শক্ত রেখেছে বলে মনে হয়। ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল শক্তিগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়।

পরিশেষে এটা বলা যায় যে অন্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ঐতিহ্যবাহী ও পুনরুজ্জীবনবাদী অংশগুলি মুসলিম সমাজের রেনেসাঁস বা আধুনিকীকরণের শক্তিগুলির সঙ্গে সহাবস্থান করেছে। বস্তুত সর্বত্রই মুসলিম সমাজ সর্বদাই অতীত ও বর্তমান এই দুই বিপরীত দিক থেকে আকর্ষণের কারণে উভয় সঙ্কটে পড়েছে। মুসলিম সমাজকে তুলনা করা যায় প্রাচীন রোমান দেবতা জোনাস - এর সঙ্গে যাঁর এক মুখ তাকিয়ে আছে সমুখ পানে, অন্য মুখ পেছন দিকে। একটি অতীদের দ্বারা আকর্ষিত হচ্ছে, অন্যটি বর্তমানের আহ্বানে সাড়া দিতে চায়।

:

সন্ত্রাসের শিকড় সন্ধান ও প্রতিকার

অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়

::::

:

সন্ত্রাসের অর্থ সন্ত্রাস, সন্ত্রাসবাদী ইত্যাদি শব্দ সাধারণত আভিধানিক অর্থেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকা প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন কে কার চোখে সন্ত্রাসবাদী সেটা বিশেষ কিছু দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করতে যাঁরা জীবনপণ করেছিলেন ইংরেজের চোখে তাঁরা সন্ত্রাসবাদী, কিন্তু আমাদের চোখে বীর।

:

সন্ত্রাসের চরিত্র নির্ণয় -- প্রতিকারের প্রথম পদক্ষেপ

সুরুতেই মেনে নিতে হবে সন্ত্রাসের প্রতিকার রাষ্ট্রের বিবেচনাধীন বিষয়। যে- কোনো রাষ্ট্র বা নেশন-- সে গণতান্ত্রিকব্যবস্থায় পরিচালিত হোক বা অন্য প্রক্রিয়ায়, তার রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যসমূহ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বদলাতে পারে কিন্তু সেই বদল কোনো অবস্থাতেই সেই রাষ্ট্রের অখণ্ডতায় আঘাত হেনে নয়। আবার দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে সন্ত্রাস রুখতে হলে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারটাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সন্ত্রাসের প্রতিকার ততদিন পর্যন্ত কঠিন হবে যতদিন না সুগঠিত এবং সুপরিচালিত সন্ত্রাসকদল নিজেরাই অনুধাবন করবেন আক্রমণাত্মক পথে ফল লাভের আশা ক্ষীণ। একটা দুভাবে সম্ভব। প্রথম, সন্ত্রাসদমনকারী শক্তি এতটাই প্রবল পরাক্রান্ত যে, সন্ত্রাসকদল সন্ত্রাস ছড়াতেই ভয় পাচ্ছেন। দ্বিতীয়, সন্ত্রাসকদল অনুভব করেছেন যাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সেই সরকার বা রাষ্ট্র পরিচালনকারীরা সদা সিদ্ধকাম না হলেও ঠগ, জোচ্চোর, অসাধু, হৃদয়হীন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত অশুভ শক্তি নয়--- ফলত, হিংসার পথ পরিত্যজ্য।

:

প্রথম সম্ভবনা অতি স্বল্প মেয়াদে ক্বচিৎ যদি বা দৃশ্যমান হয় তার ধারাবাহিকতার স্বপ্ন দেখা আজকের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির সর্বাঙ্গীন ব্যাপ্তি তথা আন্তর্জাতিক স্বার্থ, অর্থনীতি ও বাণিজ্যের ঘোলা জলের বিচিত্র তরঙ্গের নিরিখে একেবারেই অলীক ভাবনা। দ্বিতীয় সম্ভাবনাই সন্ত্রাসের প্রতিকারের দীর্ঘমেয়াদী গোড়া-মারা পথ বলে ধরে নেওয়া সমীচীন। কারণ, এক্ষেত্রে সন্ত্রাসকদল উপলব্ধি করতে পারেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় দৃষ্টিভঙ্গির নমনীয়তা কঠিন বাঁধন ছাড়িয়ে একটা সীমা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে প্রস্তুত।

:

এখন প্রশ্ন, আভিধানিক অর্থে সন্ত্রাসবাদী কেন ‘uses or favours violent and intimidating methods of coercing a government or
community?’ একটা বিজাতীয় বোধ থেকে কি ? জাতি প্রকৃত অর্থে কী? যেসরকার বা জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তার লড়াই, সে কেন নিজেকে তার অন্তর্গত মনে করে না? উত্তর খুঁজতে বহু পঠিতসেই ‘The
Prince’ -এর দোরে মাথা না ঠুকে উপায় নেই। পঞ্চদশ- ষোড়শ শতাব্দীতে যখন ইতালীয়রা জাতীয়তা সম্পর্কে আদপেই ভাবিত নয়, ম্যাকিয়াভেলী মত প্রকাশ করলেন, ধর্ম এবং বিভিন্ন নীতির বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত রাখতে হবে রাষ্ট্রকে। তাতেই জাতীয়তাবাদের উত্থান। তাঁর কথায়, “Where it is an absolute question of the welfare of our country, we must admit of no considerations of justice or injustice, of mercy or cruelty, or ignominy, but putting all else aside must adopt whatever course will save its existence and preserve its liberty.’

প্রথমেই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন এমন রাষ্ট্র গড়তে কী লক্ষ্যপথ হওয়া উচিত। এমন দেশ রাষ্ট্র গড়া কি আদপেই সম্ভব ? সমস্যা কোথায় ? পাশ্চাত্য ইতিহাস স্মরণ করলে দেখা যায়, ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সে সময়ে ছিল একই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বহু ভাষার সহাবস্থানের সমস্যা। রাজা ও রাষ্ট্র এই সমার্থক দুই ভাবনার সমস্যা। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডেএবং পরে ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্র রাজার রইল না, জনতার হল---জাতীয় রাষ্ট্র বা পিতৃভূমি বলে বিবেচিত হল। নতুন এক জাতীয়তাবোধে মতাদর্শের পার্থক্য ও বিভিন্নতার উপর সভ্যতার একটাপলেস্তারা পড়ল। পার্থক্য ও বিভিন্নতা নির্মূল হল না কিন্তু তখন পরস্পরের কাছে তা বিজাতীয় ঠেকল না। আদতে কিন্তু পাশ্চাত্যের ইতিহাস থেকে মারামারি, হানাহানির চিহ্ন মুছে গেল না। রোখা গেল না বিজাতীয় বোধের ফিরে ফিরে আসা। ভারবর্ষের মতো বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু স্বার্থভারাক্রান্ত রাষ্ট্রে গোষ্ঠীস্বার্থের বিচারে বিজাতীয় বোধ নির্মূল করা অত্যন্ত কঠিন অথচ সর্বাধিক জরুরি কাজ।

:

এই বিজাতীয় বোধ ব্যাপারটার ভালোমতো বিশ্লেষণ প্রয়োজন কারণ সন্ত্রাসোদ্ভূত হানাহানি, লুঠতরাজ আর সাধারণ ডাকাতি-রাহাজানিঘটিত অস্থিরতায় আদর্শগত বিস্তর প্রভেদ। সন্ত্রাস চালিয়ে যাবার প্রয়োজনে সন্ত্রাসকদল ডাকাতি-রাহাজানির পথ অবলম্বন

করে প্রায়শই অর্থ সংগ্রহ করে। কিন্তু ডাকাতদল নিজেদের ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সদস্য মনে করে না যেটা সন্ত্রাসকদল অনেক সময়ই করে। ম্যাকাইভার এবং পেজ মানুষের এই ধরনের বিজাতীয়বোধের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন। 'Man becomes socialized as the member of A group, first a very near group, the family or the kinsfolk, and then of a wider group, the local committee, the social class, the ethnic group, the nation. He learns to belong, but in learning to belong he learns also to exclude. He divides the people into the "we" and the "they', the "in-group" and the "out-group", His devotion to the "we" easily becomes dislike or hostility to "they". His pride in the "we" is fostered by his contempt for the "they'. Thus group prejudice is developed on every scale of belonging, from the family to the nation and perhaps to the "race"—the 'race" we belong to.

:

এ কথা বিশদভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না, আজকের বিশ্বজোড়া সন্ত্রাসের মূল সমস্যাটাই এই 'দ্বন্দ্ব' এবং 'they' বোধজনিত। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে লাগসই কিছু সূত্র ওপর ওপর খোঁজা---বর্ষাশেষে শহরের খোয়া ওঠা রাস্তায় আপাত প্রতিকার হিসাবে পিচ্ - খোয়ার হাল্কা স্তর বিছোনোর মতোই ক্ষণস্থায়ী সমাধান।

:

রাষ্ট্রবিরোধ

সন্ত্রাসের সমাধান খোঁজের আগে যদি খতিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়, যাঁরা রাষ্ট্রের বা সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে হিংসার পথ বেছে নিয়েছেন তাদের চাহিদা কী কী, তার কতটা ন্যায্য দাবি, কতটা রাষ্ট্র বা সরকারের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব, প্রতিকারের উপায় খোঁজে তাতে সুবিধেজনক হতে পারে। পাশাপাশি অন্যায্য দাবি সমূহের খোলামেলা বিশ্লেষণে এবং অপূরণযোগ্য দাবি অপূর্ণ রাখার কারণ খোলামেলাভাবে রাষ্ট্র বা সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্লেষিত এবং প্রচারিত হলে সন্ত্রাস বিষয়ে জনমত গঠিত হতে পারে। জনমতের জোরে কালক্রমে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে গোষ্ঠীর মধ্যে ভাঙন ধরা সম্ভব এবং হিংসার পথে অংশগ্রহণে গোষ্ঠীর এক পক্ষের অনীহা বিরুদ্ধশক্তির রূপ নিয়ে সন্ত্রাসের প্রতিকার রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করতে পারে। রাষ্ট্রের এই ধরনের ইতিবাচক ভূমিকা সন্ত্রাসের মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক শক্তিজোট গড়ে তুলতে পারে এবং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পরিসরে আলোচনার মাধ্যমে সন্ত্রাসদমনে কাযকর ভূমিকা পালন করতে পারে। যদিও এই তত্ত্বগত সম্ভাবনা ব্যবহারিক দিক দিয়ে কতটা অর্থবহ হবে সে ব্যাপারেওএকটা প্রশ্ন থেকে যায়।

রাষ্ট্র বা সরকার জনমত গড়ে তোলার বিশ্লেষণমুখী খোলামেলা পথ পরিহার করে কড়া দমনকারীর ভূমিকা পালন করতে গেলে ' we'এবং they' এদের ব্যবধান বৃহত্তর হবে। নতুন নতুন 'we'

দল নিত্যনতুন দাবি নিয়ে প্রকাশ্য বা গোপনে আবির্ভূত হয়ে রাষ্ট্র, শাসনযন্ত্র এবং সাধারণ নাগরিকের জীবনে অস্বস্তি এবং অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে। 'we' এবং 'they'

বোধতাড়িত সন্ত্রাসবাদী হয় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রভিত্তির জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত থাকতে চায় না আইডেনটিটি বা বিশেষ পরিচয় খোয়া যাবার . ভয়ে, নয়তো বিপরীত পক্ষে রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ শরিক হিসেবে নিজেদের বিবেচনা করে শাসকশ্রেণী তাদের প্রতি অমনোযোগী এবং বৈরী মনোভাবাপন্ন এই উপলব্ধি থেকে সন্ত্রাস ছড়ায়। যাদের হাতে শাসনযন্ত্র তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় অক্ষম ধরে নিয়ে তাদের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় সন্ত্রাসবাদী তক্মা গ্রহণ করে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদের শিকড় ওঠা বিশেষ একটা জাতীয়তাবোধের থেকে ভেঙে বেরোতে চায়, নয়, প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবোধকে এক ধরনের উগ্র জাতীয়তার নতুন বোধের জোয়ারে ভাসিয়ে দিতে চায়।

দেশজ এবং আমদানিকৃত সন্ত্রাস

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, জাত-বর্ণ-ধর্ম সম্পর্কিত অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং অসহিষ্ণুতা সন্ত্রাস সৃষ্টির এক পক্ষের কারণ। অন্য পক্ষেরকারণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেঁচে থাকার জন্যে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং এসব থেকে জন্ম নেওয়া পরাধীনতার বোধ। এই দু ধরনের কারণই জন্ম নিতে পারে রাষ্ট্রের অভ্যন্তর থেকে যার পিছনে থাকে ঐতিহাসিক সত্যাসত্য। আবার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বণিক দুনিয়ার অভ্যুত্থানের পরে ব্যবসায়িক স্বার্থে সন্ত্রাসের এই কারণগুলো ভালো করে বুঝে নিয়ে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সন্ত্রাসকদল সৃষ্টি করল কোনো স্বার্থান্বেষী শক্তি---এ ঘটনাও বিরল নয়। এই আমদানিকৃত সন্ত্রাসের আলোচনা পরে। আপাতত, দেশজই হোক আর বাইরের থেকে আগতই হোক, যে যে বিষয়কে ঘিরে সন্ত্রাস উদ্ভূত হবার সম্ভাবনা তাদের গভীরে প্রবেশ করা যাক।

:

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ধর্মীয় বিদ্বেষ ও বিভেদ

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে আর্থর দ্য গোবিন্যো জাতীয়তাবোধে রক্তের গুরুত্ব সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করলেন। তাঁর এই বিচিত্র অভিমত সে সময়ের সামাজিক অবস্থার সমর্থনে। সভ্যতার ব্যাপ্তি সীমিত। উচ্চ-নীচভেদে বৈষম্য। স্বভাবতই সৃষ্টিশীল চিন্তার প্রকাশ

উচচবর্ণের মধ্যেই ঘটত। এই সহজ সত্য তাঁর চোখে পড়ল না। তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহের ব্যাপারে উচচ-নীচ বিচারে কড়া কড়ি ছিল এবং টিউটোনিক বা জার্মান জাতির মনে এই কারণেই ছিল খাঁটি রক্তের অহমিকা তথা নেতৃত্বে স্বাভাবিক অধিকারবোধ । ফরাসি দেশে অ্যান্টি-সেমাইটদল ইহুদিদের ইয়োরোপ ভূখণ্ডে বাইরের লোক বলে হিহ্নিত করল। ১৮৯৪ সালে আলফ্রেড ড্রেফুসের মৃত্যুদণ্ডাদেশের মধ্যে দিয়ে ইহুদিদের প্রতি অ্যান্টি-সেমাইটদের এই বিদ্বেষের চরম প্রকাশ ঘটল। ফরাসি সৈন্যবাহিনীর একমাত্র ইহুদি অফিসারের এই মৃত্যুদণ্ডে অ্যাংলো - স্যাক্সন, জার্মান এবং প্রোটেস্টান্ট্দের ঘটানো। ড্রেফুস হত্যাকাণ্ডের দু বছর পরে অষ্ট্রিয়ান সাংবাদিক থিওডোর হার্জল্ (Herzl) প্রচার করলেন--- যে জাতির ভূখণ্ড নেই তাদের জন্যে চাই মনুষ্যহীন ভূখণ্ড। এদিকে তার আগেই রাশিয়ায় জায়োনিস্ট্ দল (Zionist) নতুন জাতির অভ্যুত্থান ঘটাতে প্যালেস্টাইনের পথে পা বাড়িয়েছে। ততদিনে জার্মানিতে অ্যান্টি - সেমাইট দলের ভালোমতো প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে যার ফলশ্রুতি হিসাবে শরু হয়ে গেছে ইহুদি - খেদাও আন্দোলন। ১৮৭৯ সালে ঐতিহাসিক হেনরিক ফল ট্রেটস্কি 'The Jews are our misfortune' নামে একটি জ্বালাময়ী নিবন্ধ রচনা করলেন। অথচ তার ষোল বছর আগে ১৮৬৩ সালে লুই জোলি 'অন দ্য প্রিন্সিপল্ অব ন্যাশনালিটিজ' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'The fusion of races, as it happened in France, Britain, and the United States, is one of the great beneficial factors of history. The leading powers in the world are the very ones where the various nationalities and racial strains which entered into their formation have been extinguished as far as possible and have left traces.' অর্থাৎ, ইতিহাস থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যাচ্ছে একদল স্বপ্ন দেখে, শক-হূণদল-পাঠান-মোগল এক দেহে লীন হোক আর অন্যদল মদত দেয় বিভিন্নতা জাগিয়ে রাখায়। দ্বিতীয় দলের কারণে সন্ত্রাসের জন্ম আর প্রথম দলের প্ররোচনায় সন্ত্রাসের প্রতিকারের আশা ও ভাবনা।

:

ধর্ম বিষয়ে বিভেদ সন্ত্রাসের আলোচনায় অতি মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমা ধর্মের ইতিহসে খ্রিস্টীয়, ইহুদীয় এবং মহম্মদীয় ধর্মীয় বিশ্বাসে সহনশীলতার অভাব এবং ঘন ঘন হিংসাশ্রয় যেমন সর্বজনবিদিত, ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গাও তেমন ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়ে চলেছে বারবার। আজও পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের শান্তিসহাবস্থান কঠিন রাস্তা পুরোপুরি পার হতে পারেনি। ইংরেজ দেশ ছেড়ে যাবার আগে পূর্ব ও পশ্চিম ভূখণ্ডে ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ করার যে সুযোগ নিল তার বীজ তারা নিজেরাই পুঁতেছিল আগের শতাব্দীতে । একথা ভুলে গেলে চলবে না আলিগড় আন্দোলনের পুরোধা সৈয়াদ আহমেদ প্রথম দিকে বলেছিলেন---Hindus and muslims are the two eyes of India- injure the one and you will injure the other.
দেশ শাসন করতে ইংরেজের প্রয়োজন ছিল বিভেদ সৃষ্টি করে ফায়দা তোলার। তাদের নিজেদের ইতিহাসে ধর্মভিত্তিক বিভেদের নজির তাদের পরিচিত পথ। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অথবা পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মোন্মাদ হতভাগ্য ভারতবাসী নিজেদের ভারতবাসী হিসেবে না দেখে হিন্দু অথবা মুসলমান হিসেবে দেখল। ইংরেজের পাতা ফাঁদে পা দিল। যে পথ দিয়ে হাঁটলে একতা, সার্বিকতা এবং জাতীয়তারর একটা অখণ্ড দৃষ্টান্ত তৈরি করা যেত সে পথ পরিহার করে ঘৃণা ও লজ্জার ইতিহাস রচনা করার পাকা ব্যবস্থা করে দিল। সেই অপরিণামদর্শিতার মাশুল এখনো দিয়ে যেতে হচ্ছে, গুজরাটের সাম্প্রতিক ঘটনায় যার সমর্থন মেলে।

:

আরও এক মারাত্মক ভাবনার বিষয় জাত-বর্ণ -ধর্মের ছুঁৎমার্গ এবং অসহিষ্ণুতা। পূর্বোল্লিখিত 'ভ্রন্দ্ব' এবং 'they' বোধ থেকে জন্ম নওয়া 'in group' এবং 'out group' যার বাংলা তর্জমা করলে মিত্রদল এবং শত্রদল গোছের ভাব ফুটে ওঠে। তা আসলে এই অসহিষ্ণুতার নেতিবাচক ফল অথবা সোজা কথায় কুফল। আজকের তথ্য প্রযুক্তির অনায়াস বিচরণের দিনে, পারস্পরিক রাজনৈতিক আদান-প্রদান তথা নির্ভরতার আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাত-বর্ণ-ধর্মের বিদ্বেষ অনেক বেশি বিধবংসী ভূমিকা নিতে প্রস্তুত। যে কটি প্রতিপক্ষ এই বিদ্বেষের শিকার হয়ে পড়ে তারাকোনো ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে যখন যেখানে মিলিত হয়ে তাদের মধ্যে বিদ্বেষ এবং লড়াইয়ের মনোভাব অব্যাহত থাকে। এমনকী একটি প্রতিপক্ষের বন্ধু বলে চিহ্নিত জাতি বা রাষ্ট্র অন্য প্রতিপক্ষের অথবা অন্যপ্রতিপক্ষের বন্ধু রাষ্ট্রের শত্রুতে পরিগণিত হতে পারে। যেমন ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালের ঘটনা প্যালেস্টাইনের জমির লড়াই, প্যান ইসলামিক সৌহার্দ্য---এররকম অনেক বিষয়ের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

:

বর্ণসচেতনতা সন্ত্রাসের আরও একটা কারণ। দক্ষিন আফ্রিকা বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণসচেতনতা অসহিষ্ণুতার কুফল এবং সেও 'in group' এবং 'out group' বোধজনিত। বলাই বাহুল্য, ধর্মের মতো বর্ণ সম্পর্কিত এই পারস্পরিক বিদ্বেষও একটা জমাট রাষ্ট্র বা নেশন গড়ে তোলার পক্ষে মস্ত বাধা। সন্ত্রাস যার অবশ্যম্ভাবী ফল। রুশোর মতে, জন্মের আভিজাত্য নয়, বুদ্ধির প্রাখর্য নয়, মানুষের সদ্গুণ, সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তি, পারস্পরিক বন্ধন, রাষ্ট্র গঠনের মূল ভিত্তি। তাঁর স্বপ্নের রাষ্ট্রের প্রতিটি সভ্য যে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে সেই দেশপ্রেম হবে পু

ণ্যবৎ। তাঁর কথা, ‘How can we live at peace with those, we believe to be damned?”

:

রুশোর স্বপ্নের রাষ্ট্রে পৌঁছতে না পারি, যাত্রা অবশ্যই হবে সেই অভিমুখে যদি সন্ত্রাসের প্রতিকার লক্ষ্য হয়।

:

অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ন্যূনতম সুযোগ- সুবিধার অভাব

অর্থনৈতিক বৈষম্য বলতে এমন কথা মাথায় রাখলে চলবে না, ধনী-দরিদ্র-উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত সমাজ থেকে সম্পূর্ণ মুছে যাবে। কিন্তু একদল দুবেলা আধপেটাও খেতে পায় না আর একদল বিলাসিতার আধুনিকতম সরঞ্জামের বা ব্যবস্থার শরিক হতে পারে ইচ্ছে মতো, একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়---গোলযোগটা এখানেই। অমুক ধনী, আমি গরীব। ততক্ষণ সহ্যের সীমায় থাকে যতক্ষণ অমুকের ধন আর আমার দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক ভাবনার ত্রুটি বা অন্যায় উলঙ্গভাবে প্রকাশ না পায়। যেদিনই মনে প্রশ্ন এল, এটা কেন, ওটা কেন, কেন এই অবিচার--সেদিন থেকেই মনে ক্ষোভ জন্ম নিল। সে ক্ষোভ প্রথমে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি, পরে গোষ্ঠি বিশেষের প্রতি এবং সবশেষে রাষ্ট্রবিরোধী ঘৃণার চরম প্রকাশে রূপান্তরিত। প্লেটোর রিপাবলিক্-এ উল্লিখিত হয়েছে প্রাচীন গ্রীসের প্রতিটি শহর অর্থে একটি ধনী-শহর, আর একটি দরিদ্র - শহরের যুদ্ধক্ষেত্র। এই যুদ্ধই আমাদের পরিচিত অর্থে সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসদমন বা পাল্টা সন্ত্রাস।

:

বেঁচে থাকতে হলে যে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন দারিদ্র্য ছাড়া সেইসব প্রয়োজনের অভাবহেতুও ক্ষোভ জন্মনেয়। রবীন্দ্রনাথের পল্লীসেবা থেকে পল্লী প্রকৃতি বিষয়ে সামান্য উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক হবে। ‘যাদের আমরা ছোটো করেরেখেছি. তাদের দোহাই দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অর্থসংগ্রহ করি কিন্তু তাদের ভাগ্যে পড়ে বাক্য, অর্থটা অবশেষে আমাদেরদলের লোকের ভাগ্যেই এসে জোটে। মোট কথাটা হচ্ছে দেশের যে অতি ক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানববই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি অথচ আমাদের এক দেশ নয়।’ এমন ব্যবধানের অজস্র উদাহরণ সহজেই মেলে এই ভারতবর্ষেরই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং সমগ্র পৃথিবী থেকে। এই ব্যবধান থেকে জন্ম নেয় এক ধরনের পরাধীনতার বোধ যার উর্বর ক্ষেত্রে রস খুঁজে পায় ভবিষ্যৎ সন্ত্রাসের বীজ।

:

অস্ত্রের ব্যবসা ও আমদানিকৃত সন্ত্রাস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে জাতি সম্পর্কিত নিরাপত্তার প্রশ্ন বহু আলোচিত। নিরাপত্তা বিষয়ে মিত্রতার যেসব সূত্রনির্ণয় করা গেছে যার মধ্যে পারস্পরিক সামরিক সাহচর্যের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, সেসবের গায়ে ইচ্ছেমতো রঙ লাগিয়ে তার চরিত্র বদলে দিতে বাণিজ্যিক খলচাতুরী এবং ধূর্ত অমানবিকবোধের সময় লেগেছে মাত্র কয়েক দশক। সন্ত্রাস সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা যদি নাও বা থাকে, ‘সন্ত্রাস যুগ যুগ জিও’ ধবজা তুলে ধরে আছে যে, আজকের দুনিয়ার পাশ্চাত্য প্রভাবিত অর্থনীতি এবং ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। The American Prospect, Winter 2002

সংখ্যায় প্রকাশিত বিশ্বায়ন সম্পর্কিত প্রবন্ধে ডক্টর অমর্ত্য সেন উল্লেখ করেছেন বিশ্বব্যাপী অস্ত্র ব্যবসার মধ্যে বিশ্বশক্তিগুলির সংশ্লিষ্ট থাকা অন্যায়। তাঁর মতে সন্ত্রাসবাদ, আঞ্চলিক সংঘাত, সামরিক সংঘর্ষ এগুলো শুধুমাত্র আঞ্চলিক উত্তেজনার সঙ্গে নয়, বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বিশ্বের অস্ত্র রপ্তানি ব্যবসার ৮১ শতাংশের অংশীদার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী রাষ্ট্রসমূহ। বিশ্বের মোট অস্ত্র রপ্তানির ৮৭ শতাংশের বিক্রেতা জি-৮ ভুক্ত দেশসমুহ যার প্রায় অর্ধেক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একাই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রর অস্ত্র রপ্তানি ব্যবসার ৬৮ শতাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ঘিরে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব কোফি আন্নান-প্রস্তাবিত ছোট অস্ত্রের বেআইনি বিক্রয়ের উপর একটিযুগ্ম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রর সম্মতি পায়নি।

:

কেন এই অসম্মতি? সন্ত্রাসবাদ, সংঘর্ষ পৃথিবী থেকে নির্মূল হয় গেলে অথবা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেলে অস্ত্র ব্যবসা কিভাবে চলে ! কথায় কথায় আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে সামরিক অভ্যুত্থান, এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ধর্ম, বর্ণ, জাতির নামে কাটাকাটি, হানাহানি জারি রাখার আসল তাগিদ এই অসম্মতির মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট নয় কি ? ইদানীং কালে হাজার গণ্ডা টিভি চ্যানেলের কল্যাণে ইচ্ছেমতো নির্বাচিত দৃশ্য প্রদর্শনের সাহায্যে রাষ্ট্রেই এর প্রভাবে প্রবল অসন্তোষ আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, এমনকী সন্ত্রাস সৃষ্টি করা সম্ভব যার সুদূরপ্রসারী ফল অবশ্যই অস্ত্রের ব্যবহার। চাহিদা আর যোগানের সম্পর্ক নির্ণয় অর্থনীতির প্রাথমিক কথা। চাহিদার সৃষ্টি রহস্য অবশ্যই অর্থনীতির পাঠ্য বিষয় নয়। তবে, বাজার অর্থনীতি বলে সাম্প্রতিককালে বহু আলোচিত বিষয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই চাহিদা সৃষ্টি রহস্যের আবর্তে ঘূর্ণায়মান হলে অবাক হবার কিছু নেই।

:

সন্ত্রাসের প্রতিকার ---প্রথম পদক্ষেপ

এই পর্যন্ত সন্ত্রাস সৃষ্টির মূলে যে কারণগুলো খোঁজার চেষ্টা করা হল সেই কারণগুলোর উৎপত্তি সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রথম পর্যায়। এই কারণগুলোর একটি বা দুটিই দ্বিতীয় পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্ম দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এইসাম্প্রদায়িক মনোভাব তৃতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মনে বিজাতীয় বা বৈরী মনোভাব আনে, চতুর্থ পর্যায়ে যার ফলে প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি হিংসার প থ বেছে নেয়। দীর্ঘ মেয়াদে সন্ত্রাসের প্রতিকার করতে হলে যে-কোনো ক্ষোভ বা অসন্তোষ কোন পর্যায়ে রয়েছে প্রথমেই সেটা বুঝে নিয়ে প্রতিকারের তাৎক্ষণিক উপায় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য, সেটা কদাচিৎ ঘটে। ফলত সন্ত্রাসের প্রতিকার প্রায়শই সন্ত্রাস দমন বা পাল্টা সন্ত্রাসে পর্যবসিত হয়।

:

সন্ত্রাসের প্রতিকার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তা হল সন্ত্রাসের ব্যাপ্তি অর্থাৎ সন্ত্রাসকদলের হাত ক তদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে তার সম্বন্ধেপরিস্কার ধারণা থাকা। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যার উৎস সন্ধান কব . তে গিয়ে অনেকেই মনে করছেন এগুলো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইঙ্গিত বহন করে। এমন মনে করার যুক্তি এই, বহু অসন্তোষের প্র কাশ যেমন অঞ্চলকেন্দ্রিক সমস্যা, দাবি-দাওয়া ইত্যাদিকে ঘিরে, অপরাপর ক্ষেত্রে অসন্তোষের চরিত্র ভিন্ন। বহু ক্ষেত্রে সমস্যার প্রস ার রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে দেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক রূপ পেতে চায়। আলাদা খলিস্তানের দাবীকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবের স ন্ত্রাস অবশ্যই কাশ্মীরের সন্ত্রাসের মতো আন্তর্জাতিক প্রচার পায়নি। ফলে, কাশ্মীরের সন্ত্রাস দমন করতে অনেক বেশি বেগ পেতে হ চ্ছে। আন্তর্জাতিক সমালোচনা, প্যান্ - ইসলামিক চোখ রাঙানি, মার্কিন দাদাগিরি অবহেলা করার শক্তি প্রদর্শনে এ দেশ প্রস্তুত নয় । দেশের অর্থনৈতিক বহু বিষয়ে দেশবাসীর ভবিষ্যৎ এখন যত না গুরুত্বপূর্ণ তার থেকে বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে মার্কিন দুনিয়ার আস্থা অর্জনের প্রচেষ্টা। মোট কথা, সন্ত্রাস যখন বহুজাতিক রূপ পেয়ে যায়, তখন তার প্রতিকার আজকের দিনে অনেক বেশি কষ্টসাধ্য। সু তরাং, অসন্তোষ, ক্ষোভ, খণ্ডবিদ্রোহের সূত্রপাতেই ঝাঁপিয়ে পড়া এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা ও প্রতিকার ছাড়া আজ কের দিনে অন্য পথ খুঁজে পাওয়া সন্ত্রাসেরপ্রতিকার বিষয়ে দুষ্কর। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করার অর্থ কতগুলো বি ভেদ ও পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। গোঁড়ামিটা এ বিষয়ে অহিযুঃতাতেই এবং গোলমালের সূত্রপাত এখান থে কেই। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে ি বন্যস্ত করিয়া, সংযত করিয়া, তরে তাহাকে ঐক্যদান করা সম্ভব। সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না। যাহারা এক হইবার নহে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের উপায়---তাহাদিগকে পৃথক অধিকারের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া। পৃথককে বল পূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সে বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে। ভারতবর্ষ মিলন সাধনের এই র হস্য জানিত। ফরাসি বিদ্রোহ গায়ের জোরে মানবের পার্থক্য রক্ত দিয়া মুছিয়া ফেলিবে মনে স্পর্ধা করিয়াছিল, কিন্তু ফল উলটা হ ইয়াছে----'

:

রবীন্দ্রনাথের অভিমত মেনে নিয়ে যদি এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় যখন বিভেদ এবং পার্থক্য সত্ত্বেও একটা সার্বিক ঐক্যের বন্ধন তৈরি করা যাবে তখনই সত্যি সত্যি সন্ত্রাসের গোড়া কেটে দেওয়া সম্ভব হবে।

:

শিক্ষার গুরুত্ব

শিক্ষাক্রমে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশ, বিরুদ্ধ প্রবণতা এবং টানাপোড়েন শিক্ষাকে অখণ্ড নেশন গড়ার লক্ষ থেকে বহুদূরে সি রয়ে রাখে। রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাই একাধারে শিক্ষার্থীর আসল শিকড় ও স্থানীয় ইতিহাস সম্বন্ধে তাকে সচেতন করতে পারে আবার জাতীয়তাবোধ বা দেশপ্রেমের বোধ তার মধ্যে জাগ্রত করতে পারে। এই জাতীয়তাবোধ চাপিয়ে দেওয়া জাতীয়তাবোধ হবে না। ব ংশানুক্রমিকভাবে শিক্ষা সুস্থভাবে এ কথাই প্রচার করবে, প্রতিটি দেশবাসী যে বৃহত্তর জাতীয় গোষ্ঠীর সদস্য তার অন্তর্ভুক্ত ছোট বা আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রভেদ সামান্য, মিল এত বেশি যে, পারস্পরিক শ্রদ্ধার বিনিময়ে স্বাভাবিকভাবেই একটি বিশেষ ও বৃহ ত্তর জাতীয়তাবোধের স্রোতস্বিনী নদীতে সকলের সদা-অবগাহন সম্ভব। সে অবগাহন স্ব-ইচ্ছায়, দেশের শরিক হবার অধিকারবোধ, কর্তব্যের টানে এবং সর্বোপরি নিরাপত্তা জীবনধারণের সামাজিক তথা সার্বিক প্রয়োজনে। ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে বলা যায়, শিক্ষাক্রে ম সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর প্রাদেশিক ভাষা ও তথ্য সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণের সঙ্গে একটি সর্ব ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা গ্রহণেরপ্রয়োজন, য াতে শিক্ষার্থী সমগ্র ভারতবর্ষকে মানসিকভাবে তার নিজের দেশ বলে মনে করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক দ ল ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠায় এবং শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও রাজনীতির পথ পরিহার করতে কোনো দলই প্রস্তুত না থাক ায়, একটি গ্রহণযোগ্য জাতীয় শিক্ষাক্রম তৈরি করার পথ আজকের ভারতবর্ষে সহজলভ্য নয়।

:

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় পরিচিতি

'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাবণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে সমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আ ছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা তাহাও লাভ

করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।' এ প্রসঙ্গে আমাদের পাঠক্রমে কিছু বিষয়ের অন্তর্ভু ক্তি প্রয়োজন। যেস ব মানুষ প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে উদাসীন, মাধ্যমিকস্তর থেকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের তাদের দোরগোড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক আবশ্যিকভাবে। প্রতিবার একমাস হিসেবে স্নাতক স্তর পর্যন্ত মোট তিনমাস প্রতিটি ছাত্রছাত্রী তাদের পাঠক্রমে র আবশ্যিক বিষয় হিসাবে এই কাজে যোগদান করতে বাধ্য থাকবে। ছাত্রছাত্রীরা এই বাধ্যতামূলক কাজে সংযুক্ত হলে নিজেদের পরিচিত গণ্ডীর বাইরে বৃহত্তর সমাজব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে জানতে শিখবে। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরিয়ে ফি রিয়ে তাদের পাঠাতে পারলে ছাত্রাবস্থা থেকে বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে তাদের ব্যবহারিক আদান-প্রদানের সুযে াগ হবে এবং নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে আটকে পড়ে না থেকে মানুষের পক্ষে বৃহত্তর গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবেনিজেকে মনে করার পথ প্রশস্ত হবে। ছাত্রছাত্রীদের জন্যে এই ফিল্ড ওয়ার্ক সুপারিশ মূল্যায়ন করার জন্যে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম এবং পরীক্ষার ব্য বস্থা রাখা প্রয়োজন, যাতে এই ফিল্ড ওয়ার্ক নিতান্ত হুল্লোড় পরিণত না হয় ।যদিও প্রাসঙ্গিক নয় তবু উল্লেখ করা যেতে পারের সর কারের অর্থাভাবে যদি প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে বিঘ্ন ঘটেথাকে, এই ফিল্ড ওয়ার্ক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সাময়িক পরিবর্ত-ব্য বস্থাও হয়ে উঠতে পারে।

:

সংস্কৃতির ভূমিকা : সরকারি ও বেসরকারি

সুস্থ শিক্ষা বিতরিত হলে সংস্কৃতিরও সুস্থ প্রকাশ ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক। যে যে মাধ্যম সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে সাহায্য করবে সে প্রি ন্ট মিডিয়াই হোক অথবা অডিও ভিস্যুয়াল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া---জাতীয় স্তরে সেই সেই মাধ্যমের প্রসারের জন্যে সরকারি, বেসর কারি সব রকম প্রচেষ্টা দরকার। এ ছাড়াও জনসংযোগের ভূমিকা এক্ষেত্রে অতি গুরুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতি বিকাশের পথ মূলত প্রচারধর্মী। কিন্তু প্রচার অভিযানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রায়শই যে মিথ্যে ও একপেশে নীতি স্থান পায় সে বিষয়ে সচেতন থেকে সুস্থ সংস্কৃতির বিষয়ে প্রচারকে রাজনীতিমুক্ত রাখার প্রয়োজন। মিথ্যে প্রচারের মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পথে পা না বাড়িয়ে সত্য তথ্য তুলে ধরা প্রয়োজন। দরিদ্রকে--- তোমার জন্যে ঢালাও ব্যবস্থা করা রয়েছে, না বুঝিয়ে যদি সত্যি সত্যি যেটুকু রয়েছে তার প্রচার করা হয় এবং যদি প্রচার ও সরকারের কাজের মাধ্যমে সার্থকভাবে একটু বোঝানো যায় ধনী এবং দরিদ্রের নাগরিক অ ধিকারে বৈষম্য নেই, তবে আর্থিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক প্রশাসন ভবিষ্যৎ সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণ না হবার সম্ভাবনা।

:

প্রচারের আর একটা দিক জুড়ে থাকবে জাতি এবং ধর্মভেদকে ঘিরে শিক্ষা। এমন একটা সংস্কৃতির আবহাওয়া গড়েতোলা দরকার যাতে দেশবাসী জাতি এবং ধর্ম বিষয়ে উদাসীন হতে পারে। জনসাধারণ এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের একটা সদর্থক ভূমিকা এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত মানুষ ছোট দল গড়ে অথবা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাত্রা, পথনাটক বা অন্য উপায়ে যদি ঈশ্বর বিষয়ে মানুষের অহেতুক ভক্তি ও ভীতি কমাবার প্রয়াস নেয়, ভক্তি ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে যুক্তিগ্রাহ্য প্রচার কার্য চালায় এব সেই প্রচারকার্যে যদি বিভিন্ন শ্রেণী, ধর্ম, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মানুষকে দলভুক্ত করে নিতে পারে, তরে এমন দিন আসা সম্ভব যখন 'যত মত তত পথ' আবৃত্তি করে ধর্মান্ধ, পথভ্রষ্টমানুষকে সামলাতে হবে না। ঈশ্বরবিষয়ে অনাগ্রহ পরিচিত অর্থে বিশেষ বিশেষ ধর্ম-বিষয়ে মানুষকে অনাগ্রহী করে তুলবে। ধর্মের নতুন অর্থ মানুষের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হবে। ভবিষ্যৎ ঐক্যের পথ এবং রুশোর কথামতো ধর্মীয় দেশপ্রেমের পথ সুদৃঢ় হবে।

:

বিবাহের ব্যাপারে জাতি, ধর্ম ভাষা ইত্যাদির ব্যূহ ভাঙার একটা সুপরিকল্পিত নীতি খুবই কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। সেটা সম্ভব হয় যদি যুবক-যুবতী সহজে সরলভাবে অন্য সম্প্রদায়ের বা অন্য ভাষাভাষী যুবক -যুবতীর সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পায়। সরকারি, বেসরকারি প্রচার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে এ কথা তুলে ধরা প্রয়োজন, যে কেউ অন্য সম্প্রদায়ের, অন্য জাতে, অন্য ধর্মে বা অন্য প্রদেশীয়র সঙ্গে বিবাহসূত্রে সম্পর্কিত হলে কোনোভাবেই তাকে সামাজিক অন্যায় বলা চলবে না। এক কথায় এমন একটা সাস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হবে যার মূল লক্ষ্য হবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে অবাধ মেলামেশার প্রয়োজন সম্পর্কিত শিক্ষা বিতরণ।

:

রাজনীতিবিদদের ভূমিকা

শিক্ষা-সংস্কৃতি, জনসংযোগ, গণমাধ্যম ইত্যাদি সন্ত্রাসের প্রতিকারে কাজে লাগাতে গেলে ভারতবর্ষের মতো গণতান্ত্রিকক কাঠামোয় রাজনীতিবিদ্দের বাদ দিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে কিছু করা অসম্ভব। রাজনীতিবিদ্রাই সরকার চালান কিংবা বিরোধী হিসাবে সরকারের ভুল ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করে প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করেন। শিক্ষা - সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রয়োগে কীভাবে সন্ত্রাসের মূল ধরে নাড়া দেওয়া যায় সে পথ বিশেষজ্ঞরা বাতলাতে পারেন কিন্তু রাজনীতিবিদ্দের পৃষ্টপোষকতা এবং সাগ্রহ কর্মকাণ্ড ব্যতীত সেসবের বাস্তব প্রয়োগ প্রায় অসম্ভব।

:

এ তো গেল রাজনীতিবিদ্দের সদর্থক ভূমিকা যা ভবিষ্যৎ সন্ত্রাস অঙ্কুরে বিনাশ করার সহায়ক। অন্যদিকে রাজনীতিবিদ্দের যেসব

নঞর্থক দিক আছে যার ফলশ্রুতি বিভেদবৃদ্ধিতে, তার বিলুপ্তি বিষয়ে রাজনীতিবিদ্দের সচেতন করে দেবার দায়িত্বও বিরুদ্ধবাদী রাজনীতিবিদ্দেরই। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার পৌরোহিত্যে তামিলনাড়ুতে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল সরকারি অনুমতি ব্যতিরেকে ধর্মান্তর নিষিদ্ধ। এটা কাকচক্ষুরমতো পরিষ্কার, ধর্ম নিয়ে সরকারের এই মাথাব্যথার পিছনে অ াছে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ফায়দার পাটিগণিত। জয়ললিতার এ হেন সিদ্ধান্ত বদল করবে কে ? নিশ্চয়ই ঝাণ্ডা নিয়ে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামবে না এবং কোনোদিন তেমন পরিস্থিতি ভারতবর্ষে যদি আসে তাহলে অনেক চিন্তার অবসান স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই হ য়ে যাবে। যাই হোক্, প্রতিবাদটা আজকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিকায় বিরুদ্ধ রাজনৈতিক কোনো দলই করবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সে প্রতিবাদ সত্যিই মানুষের সার্বিক মঙ্গলের কথা ভেবে হতে পারে হয়তো, হয়তো বাপাল্টা প্রচাররূপে অন্য ভাবে অন্য রাজনৈতিক ফায়দার কথা মাথায় রেখে। মোটের উপর দেশের ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে বিভেদ-বিদ্বেষ দূর করার যে-কোনো স্তরের কর্মসূচিতেই রাজনীতিবিদ্দের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

:

সন্ত্রাস প্রতিকারে সাংবিধানিক ও আইনগত দিক

সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট আইনের নিয়মিত পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় এবং দেশের নাগরিকদের স মান অধিকার ও দায়িত্ব সুনিশ্চিত করতে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সংবিধানের যে যে বিষয়গুলি সমসাময়িকতার প্রশ্নে অপ্রয়োজনীয় তা দের বাতিল করা এবং নতুন নতুন প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। যেমন, তপসিলী জাতি ও আদিবাসীর সংরক্ষণ বিষয়ে কিছু নতুন ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন। একটু খোঁজ নিলেই জানা যাবে, রাজস্থানের 'মিনা' বা পশ্চিমবঙ্গের 'নমশূদ্র' সম্প্রদায়ের মে তা কিছু কিছু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মানুষ তপসিলী জাতির জন্যে সংরক্ষিত উচ্চপদে যতটা অধিষ্ঠিত তপসিলী জাতিসমূহের বাকি স ম্প্রদায়গুলো তুলনায় অনেক পিছিয়ে। একই রকমভাবে মিশনারীদের কাছাকাছি থাকার সুবাদে অন্য বহু আদিবাসীদের তুলনায় বে বশি আলোকপ্রাপ্ত হওয়ায় সাঁওতালীরা সংরক্ষণের বাড়তি সুযোগ পেয়ে যান যেটা অন্য আদিবাসীদের মানুষ পাননা। আসলে সং রক্ষণের প্রাথমিক সুযোগ ভোগ করতে শুরু করার পর থেকে এইসব সম্প্রদায়ের মানুষ পুরো পরিবারসহ ধারাবাহিকভাবে সংর ক্ষণের সুযোগ পেতে থাকেন। মনে রাখতে হবে, তপসিল বানানোর পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা ছিল দারিদ্র্য। সুতরাং,সেই কথা মাথা য় রেখে এমন একটা সংশোধনী প্রস্তাব আনার প্রয়োজন যাতে চাকরি ক্ষেত্রে একবার যিনি সংরক্ষণের সুযোগ পেয়ে গেছেন তিনি ব া তাঁর কোনো সন্তান যেন সংরক্ষণের সুযোগ আর না পান। কারণ, একবারের সুযোগে তিনি উচ্চবর্ণের লোকদের সমান প্রতিষ্ঠা পে য়ে গেছেন। তাঁর বা তাঁর পরিবারের জন্যে সংরক্ষণের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার অর্থ তপসিলভুক্ত জাতি বা আদিবাসীদের অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সংরক্ষণের সুযোগকে বেশিমাত্রায় পৌঁছে দেওয়া। এইভাবে অবহেলিত সমাজকে সত্যি সত্যি প্রতিষ্ঠিত হবার কিছু সুযোগ দেওয়া যাবে।

:

দারিদ্র্য তপসিল বানানোর ভিত্তি ধরে নিলে অন্য ধর্মের দরিদ্র সম্প্রদায়ের মানুষকে কীভাবে সংরক্ষণের আওতায় আনা যায় সে নিয়েও একটা নিরপেক্ষ বিচার হওয়া দরকার। জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সংরক্ষণ তৃণমূল স্তরে ছড়িয়ে দিতে পারলে ভবিষ্যতের বহু কন্ট কবৃক্ষের বেড়া ওঠার পথে প্রকৃত বাধার সৃষ্টি হবে। আর একটি প্রশ্ন, সংখ্যালঘু শব্দটিকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় সংবিধানের ১৫ (১) এবং ১৫ (২) ধারা দুটিতে বলা আছে, রাষ্ট্র ধর্ম-সম্প্রদায়-জাত -লিঙ্গ-জন্মস্থানভেদে নাগরিকদের মধ্যে কোনো বৈষম্য দেখাবে না এবং সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত সব স্থানে প্রবেশের অধিকার বা সেসব স্থান ব্যবহারের অধিকার সব নাগরিক সমানভাবে পা বেন। নাগরিকদের মধ্যে যদি ভেদ না থাকেতবে আবার ৩০ (১) ধারায় ধর্মের বা ভাষার বিচারে সংখ্যালঘু বলে একটা তকমা স্থান পেল কেন? সংখ্যালঘু বলার অর্থই যেন একদলকে সতর্ক করে দেওয়া। এ দেশে তোমরা আলাদা সম্প্রদায়। অর্থাৎ তাদের মনের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার করে দেওয়া। তাদের জন্যে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই ধরনের তকমা প্রয়োগে সবন াগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের বৈষম্যহীন বা পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গির অঙ্গীকার হাজার প্রশ্নের মুখোমুখি এসে পড়ে। সংখ্যালঘু নামক বিশে ষ পরিচিতি এই শ্রেণীভুক্ত মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সম্মানহানিকর কারণ তাদের বিশেষ কোনো নিরাপত্তা দেবার পরিবর্তে সংখ্যাগরি ষ্ঠের একাংশের বিরাগভাজন করে তোলা হয়েছে যার সমর্থন ইদানীংকালের ঘটনাপ্রবাহ থেকেই মেলে।

সংবিধানে এই প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলো অখণ্ড রাষ্ট্র গড়ার পক্ষে উপযুক্ত হবে। মানুষের মনের ছোট ছোট ক্ষোভ একসময় দাবা নলের জন্ম দেয়। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করা বিপজ্জনক।

সাংবিধানের সঙ্গে সঙ্গে আইনগত দিকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। তাত্ত্বিক নিয়ম করলেই ব্যবহারিক প্রয়োগ সঠিক হয় না। আইনের অনুশাসন এ ব্যাপারে ঠিক ঠিক ব্যবহারিক প্রয়োগের পথ সুদৃঢ় করে। নিয়মভঙ্গের অপরাধে শাস্তিবিধান অত্যন্ত জরুরি। তাই রাষ্ট্রে র সার্বিক লক্ষ্যের নিকে নজর দিয়ে আইন প্রণয়ন এবং আইন জারী রাখার গুরুত্ব অপরিসীম।

:

আরক্ষা ও সামরিক নীতি

এ পর্যন্ত যা আলোচনা হল তার মূল লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসের জন্ম নেবার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করে যথাযথ প্রতিষেধক খোঁজ এবং

প্রয়োগ করা। একটা কথা মেনে নিতেই হবে, শারীরিক রোগ নির্মূল করার প্রতিষেধক আবিষ্কারের মতো বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রয়োগ কোনো সামাজিক ব্যাধির প্রতিষেধক নির্ণয়ে সম্ভব নয়। সুতরাং, হাজার চিন্তা-ভাবনা করে কোটি কোটি মানুষ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েও সন্ত্রাসের প্রতিষেধক বহু ক্ষেত্রে কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছতে অসমর্থ হতেই পারে। তাই সন্ত্রাস এসে পড়লে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে উপযুক্ত আরক্ষা ও সামরিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

:

সন্ত্রাস দমনে আরক্ষা ও সামরিক নীতি যে-কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর চোখেই হয়ে উঠবে পক্ষপাতহীন এবং মানবিক। একই সঙ্গে প্রতিকূল অবস্থার সামাল দিতে অত্যন্ত তৎপর। সন্ত্রাস দমন করতে সন্ত্রাস বলে চিহ্নিত আত্মীয়-বান্ধবদের হেনস্থা করা অথবা দমন নীতির সঙ্গে ফাউ হিসাবে এসে পড়া অকারণ অত্যাচার, অগ্নিসংযোগ এমনকী নারীর চরম অসম্মান কাগজে-কলমে নীতিবহির্ভূত হলেও বাস্তবে অনুপস্থিত নয়। এ বিষয়ে দৃষ্টিপাতে প্রশাসন উদাসীন থাকলে সেটাও নীতিরই ত্রুটি বলে মেনে নিতে হবে। সন্ত্রাস-দমননীতি প্রণয়নে যেমন সরকারের ভূমিকা থাকবে তেমনি বিভিন্ন শাখার গুণিজনদের মতামত গ্রহণ করাও যুক্তিযুক্ত। দমননীতি তাতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গঠিত বলে জনসমর্থন পাবে। দমননীতিতে সন্ত্রাসবাদী যেমন কঠোর শাস্তি পাবে তেমনি শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নীতিবহির্ভূত ব্যক্তিগত অমানবিক কাজে তাদের উপযুক্ত সাজা দেবার ব্যবস্থা থাকবে। দ্বিতীয়টা যদি মানবাধিকার কমিশনের হাতে থাকে তবে মানবাধিকার কমিশনকেই আরও শক্তপোক্তভাবে গড়া হোক।

:

উপসংহার

সবশেষে একটা কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। আপৎকালীন আরক্ষা ও সামরিক নীতি সন্ত্রাস দমনে কখনো স্বল্প মেয়াদে প্রযুক্ত হলেও, সন্ত্রাসের প্রতিকারে তা সার্থক ব্যবস্থা হতে পারে না। সন্ত্রাসের শিকড় ধরে নাড়া দিয়ে মাতৃভূমি সন্ত্রাসবীজমুক্ত রাখার ধারবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেই কাঙ্ক্ষিত পথদর্শন।

পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা

অনুরাধা দে

স্বপ্ন ও বাস্তবের পরিসর ঃ ভাষার আত্ম - পর
একটি সাংবাদিক প্রতিবেদন

(১৯৪৭) : কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পড়েছেন। পাঁচ বছৰ ধরে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিকাল হ ৈনস্টিটিউটে। এখনও গবেষণা করেন। বিষয় : ইংরেজি ভাষা শিক্ষার টানাপোড়েন।

মানুষ কি নিজের ভাষা ছাড়া ভিন্ন ভাষায় স্বপ্ন দেখে? 'অন্য' ভাষায় 'দক্ষতা' অর্জনের স্বপ্নও কি আমরা সেই ভাষাতেই দেখি? মনে হতে পারে প্রশ্নটা অদ্ভুত। কারো কারো কাছে হয়তো বা অবান্তরও হটে। প্রশ্ন হতে পারে 'নিজের ভাষা' বলতে কী বোঝায়? 'অন্য ' কি কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা আছে? সমাজভাষাবিদেরা প্রশ্ন তুলবেন, যদি একটি শিশুর বাস হয় কোনো হিন্দি অধ্যুষিত অঞ্চলে, তার বাবা তামিল ভাষি ও মা বাংলা ভাষি বাবা - মায়ের মধ্যে কথোপকথনের ভাষা কখনও হিন্দি, কখনও ইংরেজি, সঙ্গে তামিল - বাংলার টুকরো বুলি, পারিপার্শ্বিকের ভাষা হিন্দি-ইংরেজির মিশেল এবং হয়ত বা মারাঠি বা পাঞ্জাবি প্রতিবেশি/ প্রতিবেশিনীর ভাষিক অবদানে আরও বর্ণময়, সে শিশুর মনোজগতের বিন্যাস কেমন হবে? কী করে চিনবে কোন্ ভাষাটা তার আপন, কোনটাই বা 'অপর'? আরও প্রশ্ন উঠতে পারে, চেনার সত্যিই কি প্রয়োজন আছে কিছু? --- বিশেষত বহুভাষাজনিত জটিলতাকে সহজে সামলানোর সহজাত ক্ষমতা নিয়েই যখন জন্মায় একটি শিশু! সমাজ ও মনের মেলবন্ধনে সে তো প্রতিটি ভাষার আকর আহরণ করবে। দক্ষতার হেরফের, প্রয়োজনের তাগিদ নিজে থেকেই সীমায়িত করবে নিজের ভাষিক ব্যবহারের ক্ষেত্রকে। বহুভাষী মানুষের কাছে তার ভাষাজগতেরপ্রতিটি ভাষাই কি তার আপন ভাষা নয়? বহুভাষাভাষী মানুষের দেশে প্রশ্নগুলির যথার্থতা নিয়ে সমাজ - ভাষাতত্ত্বর উৎসাহী পাঠকমাত্রেই নিঃসন্দেহ। তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে মূল প্রশ্নটাই যথেষ্ট জটিল হয়ে যায়। কোনো রাষ্ট্রে ভাষিক কেন্দ্রীকরণের নীতি অনুসৃত হলে বহুভাষী মানুষ নিজেকে এমন একটি ভাষাবলয়ের মধ্যে আবিষ্কার করে যেখানে কিছু ভাষা অস্তিত্বের অঙ্গ হয়েও তার চেতনার অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না। এই বৈপরীত্যের টানাপোড়েনে গড়ে ওঠে তার প্রতিমুহূর্তের বাচনিক নির্মাণ। তার নিজস্ব ভাষিক চেতনাই নির্ধারণ করে ভাষার আপন-পর এ কোনো বাইরে থেকে লাগানো তকমা নয়। তবে ভাষিক চেতনাও অন্তসর্বস্ব নয়। মনোজগতের পরিকাঠামোনির্মণে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পরিবার, পরিস্থিতি, সময়, গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতির প্রভাব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। একটি ভাষার অন্দরে- কন্দরে বক্তার বিচরণ স্বচ্ছন্দ ওসাবলীল কিনা, সেই ভাষার শিক্ষার এবং ব্যবহারে কোনোরকম অস্বস্তি বা উদ্‌বেগ প্রকাশ পাচ্ছে কিনা এবং সবই নির্ভর করে ভাষার সঙ্গে বক্তার আর্থ - সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক এবং তার ভাষাগত মনোভাবের ওপর। 'অপর' ভাষায় তার স্বপ্ন নির্মিত হতে পারে কিনা তাও চেতনা নির্মাণেরই অঙ্গ। এই পরিপ্রেক্ষিত বিচার করলে অনুচ্ছেদের প্রথমে তোলা প্রশ্নটা হয়ত ততটা অবান্তর নয়।

প্রশ্নটা একটু অন্যভাবে রেখেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম - শহর - মফস্‌সলের বাংলা - মাধ্যম স্কুলের নবম - দশম শ্রেণির প্রায় আড়াইশ স্কুলপড়ুয়ার কাছে। এদের ভাষিক চালচিত্রের ফুল-পাতার বিন্যাস স্পষ্ট। সকলেরই প্রথম ভাষা বাংলা। স্কুলে দ্বিতীয় ভাষাহিসেবে ইংরেজির পাঠ নিয়েছে পাঁচ - ছয় বছর। তৃতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃত বা আরবির পাঠ নিয়েছে বছর দুই। স্কুলের প্রথাগত শিক্ষা মাধ্যমে হিন্দির পাঠ নেয়নি। কিন্তু হিন্দিভাষী প্রতিবেশী এবং প্রচারমাধ্যমের সংস্পর্শে তাদের ভাষাবলয়ে হিন্দির অল্পবিস্তর উপস্থিতলক্ষ করা যায়। অন্যান্য ভাষার সাহচর্য কিছুক্ষেত্রে থাকলেও তার প্রভাব নগণ্য।

খসড়া হিসেব কষে দেখি, ২৬৬ জন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ২৪০ জনের স্বপ্নের ভাষা বাংলা। তাদের সঙ্গে কথোপকথনে বুঝি তাদের আবেগ আর কল্পনার জগতে বাংলার ভূমিকা প্রশ্নাতীত। গবেষকমাত্রেই বলবেন যে এই ফলাফল প্রত্যাশিত। যেটা মনকে নাড়া দিয়েছিল তা হল এদের মধ্যে ১০ জন পড়ুয়ার দাবি, তাদের স্বপ্নরাজ্যে বাংলা - ইংরেজি দুই ভাষারই নিয়ত আনাগোনা। ১ জন সগর্বে ঘোষণা করেছিলেন যে ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখার 'সাহস' তার আছে। ৫ জন পড়ুয়ার স্বপ্নভূমিতে হিন্দি ছাড়া অন্য ভাষার প্রবেশ নিষিদ্ধ, যেখানে অন্য ৬ জন পড়ুয়া হিন্দির সঙ্গে বাংলাতে ভাগ করে নেয় স্বপ্নের চাবিকাঠি।

শেষের এই আপাত - নগণ্য ভাষিক চেতনার পরিসংখ্যান কৌতূহলী করে তুলেছিল তাদের আবেগের রাজ্যে এক উলটপুরাণের খোঁজ নিতে, যা স্বপ্নের চেয়ে বাস্তব, ঋণাত্মক এক অনুভূতি প্রশ্ন রেখেছিলাম, তাদের ঝগড়ার ভাষা কী? তার্কিকরা খুশি হবেন জেনে ২০ জন কিশোর - কিশোরীরর তর্ক, বিবাদ এবং গালমন্দের পরিসংখ্যান - ৫:১। ঝগড়া বাংলায় করলেও ইংরেজিতে গালি দেওয়ার সুবিধে বলে রায় দিয়েছেন ৩০ জন শিক্ষার্থী। মাত্র দুজন ছাত্রী হিন্দিতে ঝগড়ায় পারদর্শী--- হিন্দিভাষী প্রতিবেশীর কটূক্তিই যা

র প্রেরণা। ওপরের এইসব হিসেবনিকেশ শিক্ষার্থীদের ভাষিক প্রবণতার খণ্ডচিত্র মাত্র।

:

।। পরিপ্রেক্ষিত ।।

কিন্তু এই প্রবণতার ছবি একটি প্রশ্ন মনে এনে দেয় : যে ভাষায় মানুষ আবেগ প্রকাশ করে আর যে ভাষাকে ঘিরে আবেগ রচিত হয় , সময় ও ক্ষেত্রবিশেষে তারা কতদূর আলাদা হতে পারে? বাংলা ভাষার প্রশ্নে এই দুই মেরু মিলে যায়। কিন্তু ইংরেজি? বাংলা মাধ্যমে শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীর কাছে ইংরেজি মূলত প্রয়োজনের ভাষা - আবেগ প্রকাশের মাধ্যমে হিসেবে তা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। কিন্তু এই ইংরেজিকে ঘিরে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের স্বপ্নের শেষ নেই। আকাঙ্খাও অনন্ত। সেই আকাঙ্খারই প্রকাশ শহর ও আধাশহরের অলিতগলিতে ইংরেজি কথোপকথনে দক্ষতার প্রতিশ্রুতি শোভিত ইভনিং টিউটেরিয়ালের পোস্টার, বাংলামাধ্যম স্কুলগুলির ক্রমশ ছাত্র - শিক্ষকহীন হয়ে শুকিয়ে যাওয়া। ভাষাকেন্দ্রিক সমাজচিত্রের পট পরিবর্তনের এই ক্যানভাসকে এখন আর উপেক্ষা করা চলে না। সংবাদমাধ্যম, মিছিল জনসভা ও জনমত প্রকাশের অন্যান্য মঞ্চেও ইংরেজি দাবি সোচ্চার, অন্যথায় উদ্‌বেগ, আশঙ্কা, হীনমন্যতা। আবেগ ছাড়া কি জনমত তৈরি হয়? পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী সরকারপক্ষ নিয়োজিত পবিত্র সরকার কমিশনের পাতায় জনমতের এই তীব্রতাকে স্বীকার করে নিয়ে বলা হয়েছে :

In the Course of its visit to the Primary schools and its intensive interaction with the teachers, parents, and people interested in education, the committee was much impressed by the widespread desire for English in almost all stations of life, and in all classes and categories of people. An overwhelming majority of the parents told the committee in clear and unambiguous terms that they wanted their wards to learn English and learn in early… They just want their children are given an opportunity to learn English, “the earlier, the better,” The middle class parents say this in chorus, but even those who cannot be called ‘middleclass’ in the strict economic sense of the term, but are aspirants to become member of it sooner or later, i.e. rickshaw – pullers, rickshaw van drivers and other members of the day – labouring class, demand in unison that English must be a component in the syllabus at the primary stage.

সামাজিক শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এই প্রবণতা যে প্রকট, তা আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে স্পষ্টভাবে অনুভূত হয়েছে। জনমতের এই আবেগ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের রুজি রুটির ভাবনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ইংরেজিতে তাই স্বপ্ন দেখা কঠিন, কিন্তু চেতনায় একে অগ্রাহ্য করা সহজ নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে ইংলিশ ইন্ড্রাষ্ট্রির যে বিরাট বাজার তৈরি হয়েছে,সে বাজারই এই ভাষাকে পণ্য হিসেবে বেচেছে। সে পণ্যের বৈচিত্র বড় কম নয়। ইংরেজি সাহিত্যের সম্ভার বিপুল এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিতে লালিত লেখকলেখিকাদের অবদানে প্রতিদিন সংযোজিত ও সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। সংবাদ ও বিনোদনের মঞ্চে ইলেকট্রনিক পুঁজির প্রাচুর্য এই ভাষাকে পৃথিবীকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে কার্পণ্য করেনি। ভাষার ক্রেতাকে পণ্যমোহবদ্ধ করে তোলার কাজে এই ইন্ডাষ্ট্রির চেষ্টার ত্রুটি নেই। এই প্রকল্পে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলেছে ইংরেজির আন্তঃবলয়ের দেশগুলি: মূলত ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। ভারতে এই ইন্ডাষ্ট্রির ক্রেতা সংখ্যা আন্তর্জাতির নিরিখে কম নয় কিন্তু ভারতের জনসংখ্যার নিরিখে খুব বেশি নয়। এর অন্যতম প্রধান কারণ ভারতে বাজার অর্থনীতি বিনিয়োগ, বন্টন ও বিজ্ঞাপনে পাশ্চাত্যের মত সর্বব্যাপী নয়। দ্বিতীয়ত এদেশের আমজনতার নিয়মিত ক্রেতা হয়ে ওঠার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই। এবং তৃতীয় কারণ, ভোগ্যপণ্য হিসেবে ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের কিছু মূলগত পার্থক্য আছে। ভাষা একই সঙ্গে সংস্কৃতির অঙ্গ এবং মানুষের সহজাত বা জৈব সামর্থ্য। অন্য ভোগ্যপণ্যের মত তাকে সহজে বা বর্জন করা যায় না। তার গ্রহণ এবং সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি এবং দেহ ও মনের জটিল ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল । কিন্তু বাজার অর্থনীতিতে অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের মতোই একটি ভাষাও যে ক্রেতা - বিক্রেতার সম্পর্ক - নির্মাণে, আদানপ্রদান এবং পণ্যমোহ সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে, বিশ্বের ইংলিশ ইন্ডাষ্ট্রি তার প্রমাণ, বদ্রিয়ার বলেন, ভাষার মতোই ভোগ্যপণ্যও একটি চিহ্ন-চিহ্নিতের বলয় গড়ে তোলে। এই মোহের বৃত্তে ব্যক্তে - মানুষ তার ব্যবহার্য পণ্যের ব্যবহারিক মূল্য এবং পন্থা সম্পর্কে যতটা না সচেতন হয়ে ওঠে, ঐ পন্য সমাজের যে যে চরিত্রবৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করে, তার প্রতি আকৃষ্ট হয় বেশি। ভাষাগত প্রতীকচিহ্নের মতই ভোগ্য বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়, বন্টন, নির্বাচন এই চিহ্ন - সম্পর্কের দ্বারা সামাজিক সংযোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। পণ্যের চাহিদার মাত্রা বজায় রাখার জন্য যোগানের মাত্রা সবসময়ই চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হয়ে থাকে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে উল্লিখিত ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যে বয়ান রচনা করেছিলাম, তার বাইরে . ইংলিশ ইন্ডাষ্ট্রির প্রধান ক্রেতার ভূমিকায় ভারতীয় জনসংখ্যার যে অংশ রয়েছে তারা মূলত শহরবাসী,. ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষিত, স্বচ্ছল, মিশ্র সংস্কৃতির ধারক, তথাকথিত এলিট বা সুবিধাভোগী শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত অথবা শ্রেণি, ধর্ম, স্থান, শিক্ষা নির্বিশেষে ইংরেজি যাদের মাতৃভাষা। অনেকক্ষেত্রে ভাব ও আবেগের প্রকাশ এই ভাষাশ্রেণি ইংরেজি মাধ্যমেই বেশি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। হয়ত এদের স্বপ্নের ভাষা ইংরেজি, ঝগড়ার ভাষাও তাই। ---তবে তা অনেকাংশেই ভাষিক পটভূমি এবং পরিবেশ সাপেক্ষ। যে কোনো ভাষাকে আবেগের ভাষায় পর্যবসিত হতে হলে সেই ভাষার দক্ষতার প্রশ্নটি অনিবার্যভাবে উঠে আসে। ভাষার শব্দভাণ্ডার সেক্ষেত্রে বড়

ভূমিকা পালন করে কারণ শব্দের সঙ্গে বস্তুর কাল্পনিক সম্পর্কই চিহ্ন-চিহ্নিতের বোধ নির্মাণ করে আবেগ প্রকাশিত হতে সাহায্য করে। ইংরেজি ভাষায় স্বল্পশিক্ষিত বক্তা ভাষিক চিহ্নের অপ্রতুলতার কারণে স্বপ্নকে ভাষার অবয়ব দিতে পারে না। অপরপক্ষে প্রয়োজনের নিরিখে স্থাপিত সম্পর্ক এই ভাষাকে বক্তার দৈনন্দিন বাচনিক ক্রিয়ার কেজো কাঠামোয় সীমাবদ্ধ রাখে।

:

।। ভাষিক সাম্রাজ্যবাদ।।

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়শীল দেশগুলিতে ইংলিশ ইন্ডাষ্ট্রি মিথ হিসেবে এক ধরনের জীবন-যাপনের লোভনীয় ছবি তুলে ধরে যা নাকি শুধু ইংরেজিতে পারদর্শী হলেই লভ্য হতে পারে, ইংরেজিকে ঘিরে গড়ে ওঠা স্বপ্নের একটা মুল চাবিকাঠি। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে লিখিত মেকলের মিনিটে ইংরেজির ছত্রছায়ায় ললিত এমনই এক লিয়াজঁ গড়ে তোলার পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছিল, যারা এই প্রতিশ্রুত জীবনযাত্রার প্রতিনিধি হয়ে জনগণের অন্য অংশকে স্বপ্ন দেখাবে, লালন করবে তাদের লিপ্সা :

We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern – a class of persons Indian in blood and color, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect.

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে ব্রিটিশ লালিত এই এলিট শ্রেণির সাংস্কৃতিক উত্তরসূরী ক্রমশ সফল - সক্ষম, সপ্রতিভ, কেতাদুরস্ত, বিত্তশালী, প্রবাসমুখী জীবনধারার প্রতীক হয়ে উঠেছে। ধনী- নির্ধনের ক্রমবর্দ্ধমান শ্রেণিবৈষম্য, আর্থসামাজিক সুযোগসুবিধার ক্রমসঙ্কোচন, বেকারীত্ব, দারিদ্র্য, অপরাধপ্রবণতা, পণ্যমোহবদ্ধতা এবং জনমাধ্যমের প্রভাব আমজনতাকে ক্রমশ ক্ষিপ্ত অসহিষ্ণু করে তুলেছে। আকাঙ্খার মৃত্যু, হতাশা আর অসহিষ্ণুতাই জিইয়ে রেখেছে বহু ভাষাগত মিথকে। ভাষার শক্তিসাম্য নির্ধারণে ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে গৃহীত ভাষিক কেন্দ্রীকরণের নীতি ভারতে জনগোষ্ঠীর তৃণমূলস্তরে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত বহুভাষিকতার ঐশ্বর্য ও সম্পদকে চরম উপেক্ষা করেছে। প্রতিষ্ঠানসর্বস্ব রাষ্ট্রনীতির পরিকাঠামো স্বাভাবিকভাবেই এলিট - মুখাপেক্ষী হয়ে গড়ে উঠেছে। ইংরেজিকে ঘিরে গড়ে ওঠা স্বপ্নের উৎস তাই আমজনতার ঋণাত্মক অনুভূতি ; পাওয়ার প্রতিশ্রুতি থেকেও না-পাওয়ার যন্ত্রণা, প্রাপ্ত অংশ সম্পর্কে উদ্‌বেগ, সংশয়, অসম্পূর্ণতাবোধের জন্ম দেয়। এ ভাষা তাদের চাহিদার বিষয়, কামনার অঙ্গ, তবু অধরা। কারণ অনুসন্ধান করলে লকাঁ বলবেন ব্যক্তির চাহিদা, তার কামনা, কামনার বিষয় ও তার দুষ্প্রাপ্যতা, এ সবই তো পারিপার্শ্বিকের সৃষ্টি, 'অপরে'র নির্মাণ। যা তার কাছে সহজলভ্য, তার একান্ত নিজস্ব বলে অনুভূত, তাও সেই 'অপরে'রই সৃষ্টি।

কিন্তু ব্যক্তি-মানুষের কাছে যা আংশিক বা সম্পূর্ণ অধরা, তাই 'অপর'। 'অপর'কে আত্মস্থ করার ইচ্ছাই তার অসহিষ্ণু, প্রতিবাদী বাসনা উৎস, সংগঠিত বা অসংগঠিত জনমতের উপাদন। স্বপ্নে ও বাস্তবে এই বয়ান তার 'নিজস্ব' ভাষায় নির্মিত হয়---যে ভাষায় চিহ্ন-- চিহ্নিতের সম্পর্কের গভীরে তার বিচরণ স্বচ্ছন্দ, যেখানে 'মেটাফর' - 'মেটোনিমি'র খেলায় সে অভ্যস্ত, সাবলীল ও নিশ্চিত। ক্ষেত্রবিশেষে রণকৌশল সাজাতে সে মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয় 'অপর'-এর ভাষা, বিষ দিয়ে বিষক্ষয়ের লড়াই চলে। তার বয়ানে বিষয়বস্তু নির্মাণে আত্ম-অপরের ভেদরেখা সময়ে সময়ে অস্পষ্ট হয়ে যায়, শুধু মাধ্যম নির্বাচনে তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে।

এই লড়াইয়ে প্রত্যেকটি মানুষ একা, কারণ এই লড়াই প্রতিযোগিতামুখী, আত্মসুখই এর লক্ষ্য। ইংলিশ ইন্ডাষ্ট্রির সুদৃশ্য প্যাকেজে পরিবেশিত ভাষিক পন্যের আবেদন পৃথকভাবে প্রত্যেক ক্রেতার কাছে পৌঁছে যায়। ইঁরেজি শিক্ষার ঋপ্সপ্সপ্তুন্সনন্ধ, সংক্ষিপ্ত কোর্স, মৌখিক ইংরেজির চটজলদি পারদর্শিতা অর্জনের টিপস যে ঝকঝকে স্মার্ট, ভোগী জীবনের প্রতিশ্রুতি দেয়, তা একধারে যেমন বাড়িয়ে তোলে আকাঙ্খা, অপরদিকে গভীর করে তোলে পণ্য ও ক্রেতার মানসিক বিচ্ছিন্নতা (alienation), অপ্রাপ্তিযোগে যা পর্যবসিত হয় ক্রেতার মানসিক বিপন্নতায়। ভোগবাদী সাধনার হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতার দিক এটি। সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের অংশীদার হওয়ার নিরন্তর আকাঙ্খা এবং বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা ও নিরাপত্তাহীনতা ক্রমশ মানুষের চিন্তা ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তার ভোগবাদী সত্তা তার নিজের অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন এক বলয় তৈরি করে। এবং ঐ দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধানে তাকে নিরন্তর লড়াই করতে হয় নিজের সঙ্গে, তথা সেই সব এজেন্সির সঙ্গে যারা লিপ্সাপূরণে বাধার সৃষ্টি করেছে।

বিশিষ্ট ভাষাবিদ আর. কে. অগ্নিহোত্রী এবং এ.এল., খান্না শতাব্দীর নয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষের ছটি প্রদেশের রাজধানী এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী দিল্লিতে একটি সার্ভে করেছিলেন। নমুনা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল কলকাতা, ইটানগর, বম্বে (বর্তমান মুম্বই), হায়দ্রাবাদ, চন্ডীগড়, লক্ষ্ণৌ এবং দিল্লির স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে। তাদের সামগ্রিকভাবে ইংরেজি শিক্ষাপদ্ধতি, ইংরেজি সংক্রান্ত মনোভাব ও শিক্ষার আগ্রহ, পারিপার্শ্বিকে ইংরেজির ভাষিক অবস্থান এবং দৈনন্দিন জীবন ইংরেজির ভূমিকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থানের প্রশ্নটি ও বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যেই রাখা হয়েছিল। ফলাফল বিচার করতে বসে ঐ দুই ভাষাবিদ যে প্রবণতাটি গভীরভাবে লক্ষ্য করেছিলেন, তা তাঁদের ভাষাতেই তুলে দিচ্ছি:

Though all learners of English show substantial levels of classroom anxiety, learners coming from low income group families appear to be far more anxious. তাঁদের পর্যবেক্ষণের আরও বিশদ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন :

A negative correlation was noticed between income and parental encouragement suggesting that

the low income group puts greater pressure on its children to learn English. Similarly, a negative correlation was seen between occupation and the use of English as medium of instruction at the primary level i.e.> lower the socio – economic status of the family, the greater its children. This is a very clear index of socio-economic insecurity and it is out of sheer desperation and frustration that the lower income group claims higher levels of proficiency in English and recommends English as the medium of instruction from the early childhood.

ভাষাবাদ/ পুঁজিবাদ

সাধারণ নিয়ম এই যে ক্ষমতাশীল উচ্চবর্গীয় ভাষাই মিথ তৈরি করে। যেন তার জানা আছে আলিবাবার গুহায় প্রবেশের মন্ত্র। যে মন্ত্রে নিমেষে দূর হয়ে যেতে পারে বেকারি, দারিদ্র্য, হতাশা --- ডেকে আনতে পারে উজ্জ্বল দিন। ফিলিপসন (১৯৯২) ব্যাখ্যা করে ছেন কীভাবে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ইংরেজি একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের সময় অথবা স্বাধীনোত্তর যুগে তাদের পূর্ববর্তী উপনি বেশে তথা তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিভাবে দুর্বল দেশগুলিতে ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মিথের মালা গেঁথেছে যুক্তির গ্রন্থিে ত। এই সব দেশের অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন 'আর্থিক সাহায্যের'' পরিচয়ের যে 'মস্তিষ্ক প্রক্ষালন যন্ত্র' নিরন্তর কাজ কে র চলেছে তার হাতে অস্ত্র অনেক এবং সেগুলি সুসজ্জিত এবং সুরক্ষিত। এই প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি একটি জনগোষ্ঠীর কাছে নিরন্তর প্রম াণ করার চেষ্টা করে (persuade) যে তাদের ভাষার তুলনায় ইংরেজি অধিকতর উন্নত একটি ভাষা। কখনও প্রতিশ্রুতি (promi se) দেয় আর্থিক সাহায্যের, কাঙ্খিত পণ্যের, পরিষেবার--- আধুনিক, কার্যকরী, বাস্তবসম্মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাশিক্ষা র--- রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও সভ্যতার অগ্রগতিতে কয়েক ধাপ এগিয়ে দেবার প্রলোভন দেখায়। কখনও সে ভয় দেখায় (threa ts)---ইংরেজিকে পরিহাস বা অবজ্ঞা করলে সভ্যতার ইঁদুরদৌড়ে পিছিয়ে পড়ার ভয়, ঐ দেশের প্রবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর প্রতিশো ধ নেওয়ার ভয়। সে প্রাণপণে প্রমাণ করার চেষ্টা করে ইংরেজিই একমাত্র নিরপেক্ষ ভাষা। বহুভাষা মানেই সংঘাত, একভাষাই শ্রেয় । এ সবই আন্তর্জতিক স্তরে ভাষার ক্ষমতার রাজনীতিকে যথার্থতা দানের প্রচেষ্টা, প্রতিবাদের শাণিথ অস্ত্রকে বানানো যুক্তির ঘায়ে দুর্বল করে দেওয়ার প্রচেষ্টা। তথাকথিত 'তৃতীয় বিশ্বের' মানুষের ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 'স্বপ্ন' আর 'দুঃস্বপ্নের ভেদ এভাবেই মুছে যায়। তারা পরস্পরের সম্পূরক হয়ে ওঠে।

তবু ভাষিক ক্ষমতার এই আন্তর্জাতিক বৃত্ত অবিচ্ছিন্ন নয়। এর পাকেচক্রে অন্দরে - কন্দরে অপেক্ষাকৃত ছোটো ছোটো বৃত্তে ক্ষমতা য় বয়ান রচিত হয়। জন্ম নেয় অন্য অজস্র মিথ। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে ভাষানীতি নির্ধারিত হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে এই মিথ রচিত হয়েছে। কাগজে কলমে হিন্দি ভারতের প্রধান সরকারি ভাষা এবং ইংরেজি সরকারি ভাষা। হিন্দিকে আর স্থা ন অধিকার করতে তুলে ধরতে হয়েছে তার ঐশ্বর্য আর ক্যারিশমার আখ্যান। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিপুল পুঁজির বিনি য়োগের আশ্রয় নিয়ে প্রমাণ করতে হয়েছে তার অস্তিত্বের যাথার্থ্য। ইংরেজি সম্পর্কে নির্মিত আন্তর্জাতিক মিথ হিন্দি বিরোধীদের সহায়তায় ভারতে শক্ত জমি পেয়েছে। জাতীয় স্তরে এবং আঞ্চলিক স্তরেও এই বানিয়ে তোলা ইমেজের আখ্যান কম চমকপ্রদ নয়। এদেশে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ বিভাজনের নীতি অনুসৃত হওয়ায় প্রাদেশিক স্তরেও রাজ্যের প্রধান ভাষাকে স্বীকৃতি ও স্থায়িত্ব দিতে বিস্তৃত হয়েছে নতুন মিথের রচনা। নির্ধারিত মাপকাঠির গন্ডী পার হয়ে জাতীয় ভাষার স্বীকৃতি অর্জনের প্রতিযোগিতায় সামিল হয়েছে বিভিন্ন 'আঞ্চলিক' ভাষা। ভাষাভিত্তিক রাজ্যবিভাগের ফলে ভাষার রাজনীতিতে পরাজিত, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বিভক্ত সংখ্যালঘু ভাষিক গোষ্ঠীসমূহ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন এবং সুরক্ষার জন্য ভাষাআন্দোলনে সামিল হয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব আন্দোলনের রাজনৈতিক রূপরেখা স্পষ্ট এবং তা দীর্ঘ আর্থ-সামাজিক বঞ্চনার ফলশ্রুতি। এই প্রতিবাদী আন্দোলনগুলি তাদের ঘোষিত দাবির সপক্ষে শক্তিশালী ভাষার বিরুদ্ধ বয়ান তৈরি করেছে। দুই বিরোধী মিথের পারস্পরিক সংঘর্ষ ও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় ক্ষমতার দন্ড কখনও মেরুবদল করেছে, কখনও বিভক্ত হয়ে উভয়ের সংঘাতকে তীব্রতর করে তুলেছে।

ভাষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে আবেগ যখন দাবি ও চাহিদা প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক হাতিয়ার, তখন তাকে প্রয়োজনবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ভাষামাধ্যমের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে উত্থাপিত এ রাজ্যের জনগণের দাবি বাংলা মাধ্যমেই সোচ্চার । কেন্দ্র তথা আন্তর্জাতিক মঞ্চে উত্থাপিত হতে গেলে তার অবশ্যই সর্বজনবোধ্য ভিন্ন মাধ্যম প্রয়োজন কারণ এক্ষেত্রে মাধ্যমের চেয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিকেই ঝোঁকটা বেশি। তাই বিশ্ব জুড়ে ইংরেজিবিরোধী বয়ান বহুক্ষেত্রে ইংরেজিতেই রচিত হতে দেখি। এই প্রয়াস অধিকার লাভের প্রশ্নই বড়, মাধ্যম সেখানে গৌণ।

কিন্তু যে আবেগ সংগ্রামের জন্য নয়--- নিছকই ভালো লাগা, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ ও নান্দনিকতার জন্যে মথিত --- যার সান্নিধ্যেলালিত হয় ভাষাবোধ, ভাষাপ্রেম, ভাষার সঙ্গে গড়ে ওঠে এমন এক সখ্যতার সম্পর্ক যা শুধুই প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, যে আবেগ প্রকাশ করে কোনো বিশেষ ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্তির নিঃশঙ্ক স্বতঃস্ফুর্ত ইচ্ছা, সেই আবেগকেও কি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ক্ষমতাশালী 'অপ' ভাষা? প্রশ্ন অনেক। ইংরেজির এই পেশি প্রদর্শনের যুগেও কেন ইন্টারনেটে বাংলার মাত্রা বেড়ে চলে? কেন ভারতীয়দের লেখা ইংরেজি সাহিত্য ক্রমশ বর্দ্ধিত ও প্রসারিত হয়ে ইংরেজি ভাষার অন্তর্বলয়ের স্বীকৃতি ও সহযোগিতা লাভ করা সত্ত্বেও এ দেশের কয়েকশো কোটি জনতার কাছে অবিদিত রয়ে যায়? ইংরেজি নিয়ে এই মাতামাতি কি তবে বাংলা বিরোধিতার নামান্তর? যে ২৬৬ জন ছাত্র - ছাত্রীর মতামত গহণ করেছিলাম তাদের মধ্যে ২২৫ জন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিল তারা খুশি যে তাদের শিক্ষা

র মাধ্যম বাংলা, ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা তাদের কাঙ্খিত নয়। ২০৪ জনের মতে বাংলা ভাষার শিক্ষা ইংরেজি শিক্ষার চেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ। প্রবণতা বিচার করে বলা যায় যে ইংরেজি প্রেম তাদের মাতৃভাষার প্রতি আনুগত্যে কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। তাদের স্বপে ন্র ভাষা, ঝগড়ার ভাষা, শপথের ভাষা, প্রার্থনার ভাষা, দৈনন্দিন জীবনের চলার পথে পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাওয়া ভাষা প্রশ্নাতীতভ াবেই বাংলা। কিন্তু এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার রায়ে কি থেমে গেলে চলবে? মুদ্রার অপর পিঠটিও যে পর্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। সেই মতানৈক্যের পথ বেয়েই প্রোথিত হয় হতাশার বীজ, তৈরি হয় সমস্যার ইমারত, ক্রমাগত ইন্ধন পেয়ে যা একসময় প্রবল অ াকার ধারণ করতে পারে। তাই প্রশ্নের সংখ্যা বেড়ে চলে: কেন ঐ স্কুলপড়ুয়াদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ (৩০জন) আজীবন বাংলা মাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থায় লালিতহয়ে তারই প্রতি পোষণ করে চলেছে ঘৃনা ও বিদ্বেষ? কেনই বা তারা বাংলা ভাষা শিক্ষার চেয়ে ইংরেজি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে চায়? কেন স্কুলস্তরে হিন্দি শিক্ষার সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে চায়? কেন স্কুলস্তরে হিন্দ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কহীন১৬৪ জন শিক্ষার্থী তৃতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দিভাষা শিক্ষার দাবি তোলে? --- যেখানে অপর ৬০ জন প ড়ুয়া তৃতীয় ভাষাকে 'বোঝা' বলে রায় দেয়? এরকম কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এক নজরে দেখে নেওয়া প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গে বিগত কয়েক দশকে ভাষাশিক্ষার কর্মসূচি,তার সপক্ষে এবং বিপক্ষে রচিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষানীতিতে ইংরেজি : পক্ষ ও বিপক্ষ

যদিও পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ব্যবস্থায় প্রায় ৯টি ভাষায় পঠনপাঠনের সুযোগ রয়েছে তবু সরকারি কর্মসূচি মূলত বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিকে কেন্দ্র করেই বেশি তৎপর। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্তও মনে করা হত যে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে শিক্ষিত করার কাজে এই স্কুলগুলিই অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। অথচ ১৯৯৯-২০০০ এর মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক প্রকাশিত রিপোর্টে দেখি পশ্চিমবঙ্গে ৫২,৪২৬টি প্রাথমিক বিদ্যাপয় এবং ১১,৪৪০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। অথচ এই শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরে রয়েছে ২.৭-২.৮ মিলিয়ন শিক্ষার্থী যাদের অধিকাংশের বয়স ৫ থেকে ১৪ বছর। একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত স্কুল রয়েছে প্রায় ৩০০ টি। ১২ শতাংশ স্কুলের বাড়ি নেই। NCERT আয়োজিত ষষ্ঠ সারা ভারত শিক্ষা পর্যালোচনায় (১৯৯৮) প্রকাশ ঃ পর্যবেক্ষিত ৪৮৫৫৭টি নিম্ন বুনিয়াদী ও ২৮৬৩টি উচচ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যথাক্রমে ৮২৬৯৯ ও ৬৭১১ টি ব্ল্যাকবোর্ডের অভাবে পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে এই ধরনের সার্ভে হয়েছে কিনা তা বর্তমান লেখকের জানা নেই তবে সেই স্কুলগুলি অধিকাংশই ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি এবং অবৈতনিক নয়। তাই তার পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা - অব্যবস্থাই বহুক্ষেত্রে বাংলা মাধ্যম এবং ইংরেজি মাধ্যমের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে দিচ্ছে, যাকে আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণত ভাষাকেন্দ্রিক অগ্রাধিকার বলে ভ্রম হওযা স্বাভাবিক, শহুরে জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ, যাদের আর্থিক সঙ্গতি হয়েছে তাঁরা ইংরেজি মাধ্যমের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এটা সত্যি যে গ্রামে এই প্রবণতা প্রায় চোখেই পড়ে না। তার অন্যতম প্রধান কারণ সুযোগের অভাব। তাই গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ক্রমশ শহরমুখী হয়ে পড়ছে। ২০০২ সালের ইণ্ডিয়ান রীডারশিপ সার্ভে নগরায়নের এই উল্লেখযোগ্য চিত্র তুলে ধরেছে। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সালের মধ্যে কলকাতার জনসংখ্যা বেড়েছে ১৮ শতাংশ। গত ১০ বছরে ভারতে গড়ে ওঠা নতুন শহরের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ চারটি মাত্র প্রদেশে বিভক্ত হয়ে রয়েছে এবং এদের সর্বাধিক সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে, ১১৩টি। নগরায়নের এই ধারার সঙ্গে এলিট ভাষার চাহিদা বৃদ্ধি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শুধুমাত্র শহর সৃষ্টি নয়, শহরের ভাষা তথা সাংস্কৃতিক চরিত্র বদলও. এর অন্যতম কারণ। গত কয়েক শতক কলকাতার অবাঙালির সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ ছাড়িয়েছে। অন্য ভাষাভাষী পড়ুয়াদের কাছে ইংরেজি মাধ্যম বা বাংলা মাধ্যমে ইংরেজির অগ্রাধিকার সহজে ব্যাখ্যা করা যায়।

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গে বাংলা মাধ্যম স্কুলে ভাষা সংক্রান্ত বিবাদ - বিতর্ক মূলত দুটি বিষয়কে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে; প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষার যথার্থতা এবং ইংরেজি শিক্ষণের উপযুক্ত পদ্ধতি। প্রথম বিষয়টিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং আমজনতার ভূমিকা, মতামত আদানপ্রদান এবং মতানৈক্য বিষয়টিকে শুধুমাত্র শিক্ষার পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকতে দেয়নি। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দাবি নিয়ে জনসাধারণের যে অংশ এগিয়ে এসেছে তারা অর্থমূল্যের বিনিময়ে ইংলিশ ইণ্ডাষ্ট্রির ভোগ্যপণ্যের ক্রেতা নয়। প্রাথমিক শিক্ষার অবৈতনিক ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষার দাবি উত্থাপন করে তারা মূলত তাদের মৌলিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় শুধু মাত্র দাবি বা চাহিদা নয়, ইংরেজির সোপানে পা রাখার এই মরিয়া ভাব তাদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তাহীনতার দলিল। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, চাকরিক্ষেত্রে সুযোগের ক্রমসংকোচন এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত সমস্ত আর্থ সামাজিক নিয়মনীতি ও কার্যকলাপের প্রতি অসহায় রাগ পরিবাহিত হয়েছে ইংরেজিকেন্দ্রিক আন্দোলনে। ইংরেজি শিক্ষা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রাপ্ত সামগ্রিক শিক্ষার সঙ্গে সমার্থক হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে ইংরেজির অনুশীলনই একমাত্র কাম্য। এই আবেগের অন্তরালে চাপা পড়ে যায় শিক্ষা ও বেকারীত্ব সংক্রান্ত সমস্যার মূল সূত্রগুলো। তাই সরকার পক্ষ যখনই বিদেশি ভাষা শিক্ষার এই ক্ষেত্রটিকে সংকুচিত করতে চেয়েছে তখনই উঠেছে প্রতিবাদের ঢেউ। প্রতিকারের অভাবে অভিমানী, আতঙ্কিত শিক্ষার্থী প্রবাসী হতেও দ্বিধা করেনি।

কেন্দ্রে ১৯৬৫ - ৬৬ সালে স্থাপিত কোঠারি কমিশন ত্রিভাষা-নীতি প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজির পঠনপাঠনের বিষয়টিকে ছেড়ে দিয়েছিল রাজ্যের হাতে। পশ্চিমবঙ্গে এস.এন.লাহা সাব-কমিটির সুপারিশে ১৯৫০ সালে প্রাথমিক স্তরের সিলেবাস ঘোষণা এবং ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে হিমাংশু বিমল কমিটির দ্বারা তার পরিমার্জনার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হয়েছিল। কংগ্রেসের হাত থেকে সরকার গঠনের ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল বামপন্থী শাসক দলের হাতে। প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবিত পঞ্চম শ্রেণি থেকে ইংরে

রজি শুরু করার প্রস্তাব ষষ্ঠশ্রেণি পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হয় নতুন প্রস্তাবে।

এর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থা এবং দলের প্রচার উদ্যোগে। ১৯৭৭ সালে এস.ইউ.সি.আই., ছাত্র রাজনীতির অন্যতম প্রতিনিধি ডি.এস.ও. এবং প্রাথমিক শিক্ষক সংস্থা বি.পি.টি.এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী হলে ১৭-১৮ ই জুলাই এক বিরাট সমাবেশে জমায়েত সংগঠিত করে। তাদের কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গঠিত হয় অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস্ স্ট্রাগল্ কমিটি। তাদের দাবি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছাত্রছাত্রীকে তারা এই আন্দোলনে সামিল করতে সক্ষম হয়েছে। এরপর চলে মিটিং মিছিল, সমাবেশ। মজুমদার কমিটির সুপারিশ কাজে পরিণত করার দিন ধার্য হয় ১৯৮১ সালে শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকে,এর বিরুদ্ধে এসপ্ল্যানেডে (পূর্ব) ধরনা দেয় বহু মানুষ (৮ই জানুয়ারি, ১৯৮১)। স্মারকপত্রে যাঁরা সাক্ষর করনে তাঁদের মধ্য ছিলেন ড.সুকুমার সেন, ড. নীহাররঞ্জন রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, মনোজ বসু, ড. প্রতুল গুপ্ত, গৌরী আইয়ুব, শৈলেন দে, অমিতাভচৌধুরী প্রমুখ।

১৯৮৪ সালে নিযুক্ত উচ্চশিক্ষার মূল্যায়নে ভবতোষ দত্ত কমিটি ইংরেজিকে তৃতীয় শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে শুরু করার প্রস্তাব রাখে। এই বছরই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা সংসদ আরও কিছু ভারতীয় সংস্থা এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের পরামর্শক্রমে পাঠ্যসূচি এবং পঠনপাঠন পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। ১৯৯১ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভাগ্যজনক ফলাফল ইংরেজিকেন্দ্রিক বিতর্ককে উসকে দেয়। কলকাতা এবং জেলাস্তরে এর বিরুদ্ধে হিংস্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৯৯৩ সালে স্থাপিত অশোক মিত্র কমিশন ইংরিজি শিক্ষা শুরু বয়স পঞ্চম শ্রেণিতে নামিয়ে আনে। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের পর ১৯৯৬ সালে এস.ইউ.সি.তাই তাদের প্রাথমিক ইংরেজির দাবিতে সই সংগ্রহ করতে শুরু করে। তাদের দাবি অনুয়ায়ী সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১০ মিলিয়ন ১২ লাখ সইসমৃদ্ধ একটি স্মারকলিপি তারা ১৭ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেয়। এর প্রভাবে রাজ্যজুড়ে যে বিপুল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টিহয় তার প্রভাবে অনুষ্ঠিত বন্‌ধে জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ে। আন্দোলনের তীব্রতা সরকার পক্ষকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার পথে এগিয়ে দেয়। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র সরকারের নেতৃত্বে গঠিত ইংরেজি বিষয়ক কমিটি প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই কমিটির রিপোর্টে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হয়েছিল যে জনমতের চাপই সরকারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কারণ। ইদানীংকালেপশ্চিমবঙ্গ সরকার পুনরায় প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজি প্রচলনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু সরকারের মধ্যেই এই বিষয়কে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে মতবিরোধ এবং বিতর্ক।

প্রশ্ন : উত্তর : প্রশ্ন

পরিশেষে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। পঠনপাঠনের সামগ্রিক উন্নতি ব্যতিরেকে এবং ইংরেজি শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রশ্নটি উহ্য থেকে গেলে এই ভাষাগত সমস্যার সমাধান কি সম্ভব? অশোক মিত্র কমিশন স্বীকার করেছিলেন (১৯৯২: ১০০)---

There is a fair measure of agreement within the commission that the new method of teaching English, based on the so-called functional communicative approach, has been far from an unqualified success.

অগ্নিহোত্রী লক্ষ্য করেছিলেন সমস্ত শহরের মধ্যে কলকাতার শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে শ্রেণিগত আতঙ্ক(classroom anxiety) সবচেয়ে বেশি। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে শুধু ভাষাশিক্ষার উপযুক্ত বয়স বা পদ্ধতির দিকে নজর দিলেই চলবে না। তলিয়ে ভাবার প্রয়োজন আছে, শিক্ষার্থীর অবস্থান এবং দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যাচাই করার প্রয়োজন আছে ভারতের সব শিক্ষার্থীর জন্য সর্বত্র সর্বসম ভাষানীতি আদৌ কার্যকরী হতে পারে কিনা।

ওরে ভীরু, তোমার হাতে
সুধীর চক্রবর্তী

আমরা যখন পঞ্চাশের দশকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম তখন চোখে পড়ত অর্থানীতি বিভাগের একজন পঞ্চাশ পেরানো অধ্যাপককে। শাদা আদ্দির ধুতি, ফিন্‌লেক পাঞ্জাবি, পায়ে চকচকে নিউকাট, তেল চুকচুকে চুলে ব্রাশ করা, বেঁটেখাট মানুষ। খাঁটি ক্যালকেশিয়ান। হাতে রেজস্ট্রার নিয়ে করিডর দিয়ে হেঁটে ক্লাশে যেতেন - কোনও দিকে তাকাতেন না। ছাত্রসমাজে গুঞ্জন ছিল, ভদ্রলোক অসম্ভব কিপ্টে। কে বা কারা তাঁরা কাছে দুটাকা চাঁদা চেয়েছিল - ভাগিয়ে দিয়ে বলেছিলেন টিচারদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে স্টুডেন্টদের ফাংশান? ছিঃ?

ব্যস, তাঁর ওপর থেকে সকলের অভিনিবেশ চলে গেল। তবে সেকালটা একাল নয় বলে কেউ তাঁকে আওয়াজ দেয়নি। ভদ্রলোক ছিলেন নির্বিরোধ ও সচেতন শিক্ষক। ঘন্টা পড়লেই ক্লাশে যেতেন মন দিয়ে পড়াতেন এবং ক্লাশে ওভার স্টেকপতেন না। বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে নিরিবিলেতে (আহা, কলকাতা তখন কী শান্ত ও নির্জন) থাকতেন একটা একতলা বাড়িতে। বালিগঞ্জ-হাওড়া রুটের ট্রামে চড়ে যাতায়াত করতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, ট্রাম ভাড়া ছিল আসা-যাওয়া বারো পয়সা - তবু ছিল মান্থলি টিকিট। বড়ই বিতব্যয়ী তার মানে, ধূমপান করতেন না, সন্তানাদিও ছিল না। এমন একজন ডাল পার্সোনালিটি যাকে বলে, তাঁর সম্পের্কে কারুর কৌতূহল ছিল না, প্রত্যাশাও নয়। পক্ষান্তরে তখনকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল রত্নখচিত। কিন্তু এহেন ব্যক্তি খবর হয়ে উঠলেন মৃত্যুর পরে। ততদিনে আমিও বেশ একজন তালেবর অধ্যাপক - ওয়েবকিউটাটিউটা করি! হঠাৎ খবরের কাগজে পড়লাম ঐ কৃপন অধ্যাপক মারা গেছেন। বাড়ি এবং সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে গেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে । কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কী হল? না আহরা সেবিষয়ে কোনও খোঁজ করিনি।

ষাটের দশকের শেষের দিকে সরকারি কলেজে আমার এক সহকর্মীর কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল। ধরা যাক তাঁর নাম শশাঙ্কবাবু। আমাদের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। সাধারণ চেহরা, ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন খুব কম দামের, পায়ে কের্ডস জুতো। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পড়াতেন। আধুনিক সাহিত্য পড়াতে বললে বলতেন, না না, ওসব আলনারা পড়াবেন। কত কী জানেন। আমরা আগেকার লোক তো - তেই আর্ট ফর আর্টস্ সেক-ঐর যুগে পড়ে আছি। একদম মর্ডান নই - কী চিন্তায় কী জীবনযাপনে।

একদিন বিকেলে সস্ত্রীক গেলাম শশাঙ্কবাবুর বাসাবাড়িতে। দুই ছেলে খেলতে গেছে মাঠে। বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী। ওঁরা হাওড়ার কেন্ গ্রামের মানুষ। সেই সব গল্প বলছিলেন। হঠাৎ উঠে গেলেন এবং মিনিট কুড়ি পরে দিব্যি পরিপাটি করে ট্রে-তে করে চিঁড়ে ভাজা, হালুয়া আর ধূমায়িত চা নিয়ে টেবিলে রাখলেন। লজ্জিত মুখে বললেন, নিন খান। সাম্যন্য কিছু। মাসের শেষ তো।

আরে স্ত্রী অবাক হয়ে বললেন, এসব এত তাড়াতাড়ি আলনিই বানালেন নাকি? লাজুক হেসে বিনয়ী শশাঙ্কবাবু, যিনি নাকি একদম মডার্ন নন, বললেন, আমার গিন্নি তো সারাদিনই সবদিক সামলাচ্ছেন। আলনারা এসেছেন - উনি এখন একটু গল্প করুন। কী, চা ভাল হয়েছে তো?

সাংসারিক কাজেকর্মে একেবারে আনাড়ি এরং খানিকটা সামন্ততান্ত্রিক আবি। আমার দিকে চেয়ে স্ত্রী একটু ঠোঁট টিলে হাসলেন। এহেন নিরীহ শশাঙ্কবাবুর জীবনটি ছিল একেবারে সাদামাটা, ঘটনাহীন। এইভাবে চলে যাচ্ছিল আমাদের কলেজীয় দিনগুলো। তারপরে হঠাৎ একদিন টিফিনের সময়ে দেশা গেল অধ্যাপক কক্ষের সহকারী নারায়ণ টেবিলে আমাদের সামনে রাখল একটা করে কোয়ার্টার প্লেট - তাতে চার রকম মিষ্টি, কাজু বাদাম, বিস্কুট ও নিমকি। কী ব্যাপার? স্টাক কীউন্সিলির কেনও সভা তো নেই! কেন ও অধ্যাহক-অধ্যালিকা সন্তানদের পরীক্ষা সাফল্যের খবরও নেই, তবে? সকলকে খাবার দেওয়া হলে শশাঙ্কবাবু বললেন, একটু পরে চা দেবে নারান, কেমন?

সকলের সেৎসুক জিজ্ঞসা : কী ব্যাপার শশাঙ্কবাবু? অকেশ্যানটা কী বলুন তো? তেমন কিছু নয়, বিনীতভাবে বললেন শশাঙ্কবাবু আজ মোর শিক্ষকজীবনের পঁচশবছর পূর্ণ হল তো, তাই সামান্য একটু আয়োজন করেছি ... ছোটবেলা থেকে ভাবতাম শিক্ষক হব ... শিক্ষক তার জীবনে পেলামও তো কত ... কত ছাত্র-ছাত্রী কত সহকর্মী ... তারই সামান্য প্রত্যুপহার ...।

স্মিত মুখ আত্মতুষ্ট মানুষটাকে দেখে খুব ঈর্ষা হল। কী পবিত্র মুখাবয়ব। কী প্রাপ্তির পূর্ণতা! কলেজের সমস্ত শিক্ষাসহায়ক কর্মীরা মিষ্টি খেতে খেতে জানতে পারলেন এজন স্বপ্নবাদী শিক্ষকের আজ পঁচিশ বছর পূর্তি উৎসব।

বলাবাহুল্য সুদীর্ঘ শিক্ষকজীবনে শশাঙ্কবাবুর ঘটনার কোনও পুনরাবৃত্তি দেখিনি। তবে আমার শিক্ষকতার রজতজয়ন্তীতে শশাঙ্কবাবুর প্রায়াসের অনুসরণ করেছিলাম - তখন আশির দশক - ব্যাপারটা বহু জনই ভেবেছিলেন বাড়াবাড়ি। জানিয়েও ছিলেন কেকে কা মড় মেরে কেউ কেউ : শিক্ষকতা না ছাই, এখনও স্কেলটাই দিল না। প্রমোশন ফ্রমোশনের বালাই নেই। তার আবার পঁচশ বছর, রাখুন তো!

সবাই নিশ্চয় অমন করে ভাবেননি। কিন্তু ঐ আশির দশকেই আমাদের শহরে ছিলেন প্রধান অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। তাঁর কাছে অনেক শুনেছি সেকালের লেখা-পড়ার কষ্টের কথা। বাঁকুড়ার বেলেতোড় গ্রামে মানুষ। প্রচুর

পথ হেঁটে স্কুলে যেতেন - দারিদ্র্য অনাহার ও একবস্ত্রসার জীবন। কলকাতায় এম. এ. পড়তে এসে কতবার খেতে পাননি। 'কী করতেন? খিদে পেত না?' আমার এমন প্রশ্নের জবাবে ক্ষুদিরামবাবু হো হো করে হেসে বললেন, কুড়ি বাইশ বছরের গাঁয়ের ছেলে - খদে পাবে না? কী করতাম জানেন? সারারাত শ্যামাসংগীত গেয়ে কাটিয়ে দিতাম।

'সেবার তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্র শহরের পুরভোটে জেতে কমিশনার হয়ে প্রণাম করতে এসে বলল, বলুন স্যার আপনার জন্যে কী করতে পারি। কিছু একটা পরামর্শ দিন ভাল কাজের।

ক্ষুদিরামবাবু বললেন, আরে না না - আমার জন্যে কী আবার করবে। খাসা আছি। আর পথ ঘাট নালা নর্দমা স্ট্রিট লাইট সবই ঠিক আছে। কোনও অভিযোগ নেই। তবে সত্যিই যদি কিছু করতে চাও তো একটা সামান্য প্রস্তাব আছে বাবা।: বলন। নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।

: দ্যাখো। শিক্ষকদের জন্যে তো কেউ কিছু করে না। এই গলিতে আমরা পাঁচটি শিক্ষক পরিবার থাকি । এ রাস্তাটার তো কেনও নাম নেই, নতুন গড়ে ওঠা গলি। এর নাম দাও শিক্ষক সড়ক। পারবে?

পেরেছিল সে। আমাদের জন্যে তো কেউ কিছু করে না। আমাদের শহরের প্রান্তে একটা সাধারণ করুণ গলি, তার নাম এখন সত্যিই শিক্ষক সড়ক। পশ্চিমবাংলার আর কি কোথাও আছে শিক্ষকদের নামে রাস্তা? প্রশ্নটা শুনে একজন চুঁচুড়ানিবাসী সগর্বে বললেন, আমাদের চুঁচ্ড়ো স্টেশনের সামনে আছে শিক্ষক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের একটা স্ট্যাচু। ভাবতে পারেন এখন?

ভাবতে যে পারি না তাঁর কারণ এখনকার সমাজ শিক্ষকদের আর উদাহরণীয় ব্যক্তি বলে ভাবেন না। পথে ঘাটে যত্রতত্র এখন তাঁদের মুন্ডপাত চলে। ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস এবং নানা স্তরের শিক্ষকদের প্রকাশ্য, বা চোরাগোপ্তা টিউশ্যনী এখনকার পাবলিক একই চোখে দেখে। সেদিন এক রইস গার্জেন বললেন, 'ছেলে এইচ. এস দেবে তাই ছটা টিচার রেখেছি। যাকে বলে মশাই নেসাসারি ইভ্ল্। ছেলেটাকে তো এগ্জামে পারফর্ম করতে হবে।' কেন জানিনা এধরনের কথাবার্তা আমার কানে ঝাঁটা মারে কেননা আমিও ঐ পালকের পাখ - এখন নাহয় খাঁচা ছাড়া। কোথায় কী যেন কাঁয়া বেঁধে - টিচার রেখেছি শব্দবন্ধ শুনে রক্ষিতা রাখার আস্পর্ধা ফুটে ওঠে। সেদিন ট্রেনে একজন নিত্যযীত্রী ছোকরা নানা রকম কুইজ্ কপছল। সবাই দাঁত বার করে হাসছিল। অভস্য অশালীন দেশ এখন, রুচিবোধ ও সম্ভ্রম একেবারে লোপাট। তাই ট্রেনযীত্রীদের কেউ কেউ হকারদের সঙ্গে সমানতালে ইয়ার্কির দোহারকি করে - ভুলে যায় যে কামারায় প্রবীণ বৃদ্ধরা কিংবা নারীরা আছেন। তাই হকারকে উশ্কে দিলে সে ছড়া কেটে বলে :

আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে টিয়া -
দাদুর টাকে লেখা আছে
ম্যায়নে পেয়ার কিয়া।

তারপরই হা হা জগঝম্প সমবেত কণ্ঠে।

এসবের তো কেনও প্রবাদ হতে পারে না এখনকার দিনে। তাই সেদিনের নিত্যযাত্রী ছোকরা যখন কুইজের ছলে বললে, বলুন তো দাদাগণ দিদিগণ - আজকাল লোর্খা কেন বেশি বেশ বিক্রি হচ্ছে?

আমি ভয়ে কাঁটা হয়ে গেলাম - এইরে নিশ্চয়ই মুসলমানদের এক্ষুনি মুন্ডপাত শুরু হবে। ধর্ম-মৌলবাদ-অব্র-বোরখা। না, আমার আশংকা সত্যি হল না। বোর্খা কেন আজকাল বেশি বেশি বিক্রি হচ্ছে বলতে পারলেন না তো পাবলিক? ছেলেটা এবার চারদিক তাকিয়ে নিলে উত্তরের আশায়, তারপরে বললে, এ কুইজ্টা কঠিন। তবে শুনুন। টিউশনি বন্ধ হয়ে গেছে বলে মাস্টারেরা এখন ব্যাপক বোর্খা কিনছে।

: কেন? কেন?

: বোরখা পরে টুক করে ছাত্রছাত্রদের বাড়িতে পড়াতে ঢুকে পড়ছে। ছি ছি আমার গালে সপাং করে চাবুক লাগে।

এ রকম অসহায় মুহূর্তে আমার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে সত্যানন্দ প্রামানিক মশায়ের মুখাচ্ছবি। ষাটের দশকে ভদ্রলোক ছিলেন আমাদের জেলা শহরের নামী সরকারি স্কুলের হেডমাস্টার। শন্তিপুরের মানুষ। শার্ট প্যান্ট পরতেন - কড়াধাতের নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষক। ইংরিজি বিষয়ে এম. এ. ও - শিক্ষাতত্ত্ব প্রসঙ্গে বিদেশি, মানে খোদ লিড্সের ডিগিধারী। সারাক্ষণ স্কুলের সর্বত্র, করিডরে অফিসঘরে, ক্যান্টিনে রাউন্ড দিলেন। ভালো ছাত্রও নিয়মনিষ্ঠ শিক্ষাকদের তোয়াজ করতেন - ফাঁকিবাজ বা অলসদের স্পষ্টভাষায় জানাতন তাঁর বিতৃষ্ণা। এমন মানুষের জনপ্রিয় হওয়া কঠিন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার খুব অন্তরঙ্গতা হয়ে গিয়েছিল এবং তার কারণ একটা দুষ্প্রপ্য ইংরিজি বই। বইটার নাম ingoldsby Legends

উনিশ শতকের এই বই থেকে ইংলন্ডবাসী ডি. এল. রায় মানে আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল হাসর গানের মডেলটা নকল করেছিলেন। বইটা যাকে বলে গরু খোঁজা খুঁজছিলাম। শহরের একটা ঘরোয়া সভায় সত্যানন্দবাবুর সঙ্গে আলাপ হতে তাঁকে হঠাৎই বইটার কথা জিগ্যেস করলাম। খুব স্মিত হেসে বলেলেন, বইটা আমারই তো আছে - বিলেতে কনেছিলাম। তবে এখানে নেই, আছে আমাদের শান্তিপুরের বাড়িতে। দেব এই উইকএন্ডে৷ আসবেন আমার কোয়াটারে, রবিবার সকালে।

রবিবার সকাল নটা নাগাদ গেলাম। সাবেক বনেদি বাড়ির স্কুল, কাঠের সিঁড়ি। অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা কপলেন। শাদা হাফশার্ট শা

দা ট্রউজার - অমলিন হাসি। চেয়ারে বসতেই চোখে পড়ল সারিবদ্ধ বইয়ের আলমারি। আমার প্রার্থিত বইটা হাতে দিয়ে চা দেবার অনুমতি চেয়ে নিয়ে অন্দরে গেলেন। খাঁটি বিলিতি এটিকেট-দুরস্ত মানুষ। 'ওহে চা দিয়ে যাও' কিংবা 'এ ঘরে দু'কাপ চা পাঠাও তো' জাতীয় হাঁকার পাড়লেন না। বললাম সপ্রসংশভাবে, বিলেতে থাকার কারণেই রোধহয় আলনি এতটা ডিসিপ্লিন্‌ড্‌?

:উহু, একেবারেই না। লেশাকটাই শুধু আমার সাহেবি। আমার জীবনের আদর্শ হলেন দুজন - রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধিজী। ওঁদের মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মী আবি তো অন্তত কেনও ভারতীয়ের মধ্যে দেখিনি। ওঁদের সব লেখা আবি বারবার পড়ি। ওঁদের সম্পর্কে দেশেরও বিদেশে যত বই, সম্ভত বাংলা আর ইংরিজি ভাষায় আছে, সবই আমার সংগ্রহে আছে।

গর্বিত মানুষটি আত্মতুষ্টিতে একটু পিন ফোটাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তখনকার কালে দুর্লভ একটা বইয়ের নাম করতেই* সত্যানন্দ হেসে সাবলীলভাবে একটা আলমারি খুলে বইটা বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, বইটা নিয়ে যেতে পারেন। পড়ে ফেবৎ দেবেন কেমন?

একেবারে আমূল অপ্রতিভ হয়ে বললাম, বদলির চাকরি আপনার। এতগুলো নিয়েই বরাবর মুভ করেছি। বাকি প্রায় কুড়িটা আলমারি আছে দেশের বাড়ি শান্তিপুরে। বিটায়ার করে একেবারে ওখানে গিয়ে নিশ্চিন্ত হব। বই ছাড়া কি একজন টিচারের জীবন চলে, বলনু তো?

: আর ক' বছর চাকরি আছে?

: মেরে এনেছি। আর পাঁচ বছর।

: আটখানা আলবারি নিয়ে বরাবর মুভ করেছেন বললেন। কবার মুভ করেছেন, মানে মোট ক'বার বদলি হয়েছেন?

: আন্দাজ করুন তো!

: চার পাঁচ বার !

: উঁহু, পাললেন না। এগার বার। কেন বলুন তো? বাবা নাম দিয়েছিলেন সত্যানন্দ, বোধহয়, আনন্দমঠ পড়ে। কিন্তু সত্য মানে ট্রুথ - তার স্বরূপ জানলাম রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধী পড়ে। জানেন তো এদেশে সত্যের জন্য মূল্য দিতে হয়। আপনার প্রিয় ডি. এল. রায়ের ক'বার বদলি করেছিল? সতের বার। কেন? জেদি আর সত্যনিষ্ঠ ছিলেন বলে। সাহেবিয়ানাকে ব্যঙ্গ করেছিলেন বলে, তাই না?

: সে তো ব্রিটিশদের দমননীতি । আপনি স্বাধীনদেশেই এতবার?

সত্যানন্দ প্রামাণিক স্মিত হেসে বললেন, একে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের চেলা তায় শিক্ষক। অর্থ কিন্তু তেমন নেই আমার। সম্মান আর আত্মমর্যাদা-বোধটা বিসর্জন দিতে পারি না, পারিনি। তাই আমলাদের ইচ্ছেয় এগারবার ... হা হা হা।

২

সত্যনন্দবাবুদের মাতো সত্যসন্ধীদের এসব আখ্যান কিন্তু প্রাতৈহাসিক কালের নয়, বড়জোর চারদশক আগেকার। এখন আর এ রকম বইপড়ুয়া এবং আলমারি সমেত বদলি হওয়া হেডমাস্টার যে একজনও নেই তা হলফ করে বলা যায়। সত্যিকথা বলতে কি, স্কুল বিল্ডিংয়ের মধ্যে বসবাসকারী হেডমাস্টারই পাওয়া কঠিন। এখন বেশিরভাগ স্কুলেই হেডমাস্টার হলেন কমিউটার। ট্রেন বন্ধ হলে বা অবরোধ থাকলে সেদিন আর বিদ্যালয়ে এলেনই না - আর বামনু গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর। কলেজ বা স্কুল সন্নিহিত কোয়ার্টারে বসবাস করা খুব নিরাপদও নয় - নানান উটকো ঝামেলা এসে জোটে। আমাদের চিরঞ্জিৎ দাশগুপ্তের কথাই ধরা যাক। নিপাট বালমানুষ। ছিলেন প্রণিবিদ্যার খ্যাতমানা অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি কলেজে। কী যে দুর্মতি হল, হঠাৎ অধ্যক্ষ হবার বাসনা জাগল মনে। পোস্টিং হল মফস্‌সলের এক সরকারি কলেজে। পন্ডিত আর ধর্মভীরু মানুষ। প্রশাসনের কিছুই বুঝতেন না। অচিরে কলেজে ছাত্রদের দুটি বিবদমান রাজনৈতিক গোষ্ঠী এবং কর্মচারীদের দুটি যুযুধান সমিতি তাঁকে জব্দ করে দিল। সুযোগ সন্ধানী দু-চারজন অধ্যাপক পাঁকে পড়া হাতির দুরবস্থা থেকে পরামর্শ দিতে এগিয়ে এলেন। ভদ্রলোক স্বস্তির নিঃস্বাস ছাড়লেন কিন্তু কলেজটা কব্জা করে ফেলল অন্য ধরনের নানা স্বার্থপর মানুষ।

এইভাবে গড়িয়ে চলতে চলতে এসে গেল ভর্তির ধুন্দুমার নাটক। সিট বাড়াতে হবে - দাবিদার সকলেই। জেলা শাসক গভর্নিং বডির সভাপতি। বললেন, কিছুটা মেনে নিন। শিক্ষা অধিককর্তাকে ফোন কপতে তিনি বললেন, ট্যাক্‌টফুলি সব ম্যানেজ করুন - বুঝতেই তো পারছেন। এদিকে স্টাফ কাউন্সিল বলছে, স্টুডেন্ট-টিচার রেশিও নষ্ট করা চলবে না - একটাও বাড়তি ছাত্র আমরা অ্যালাউ করব না। ছাত্রদের বিবদমান দুটো সমিতি হঠাৎ এক হয়ে বলল : আমাদের দাবি না মানলে ঘেরাও করব। অধ্যাপক সমিতি প্রস্তাব নিল : অনির্দিষ্টকাল কলেজ বন্ধ করে দিন। বিকেলে দিকে চিরঞ্জিৎ দাশগুপ্ত একা থাকেন কোয়াটারে। ট্রাংকুইলাইজার খেয়ে বিছানায় ছটফট কপছেন এমন সময় বাগানে পদশব্দ। নাইট গার্ড নিদ্রামগ্ন, সেই সুযোগে একদল ব্যক্তি ঢুকে পড়ল দক্ষিণের শুনশান পাঁচিল টপকে। তাদের একজনের হাতে একটি বিভলবার - অন্তত চাঁদনিরাতে আধোঘুম থেকে ওঠা অধ্যাপকের তাই মনে হয়েছিল । তাদের বক্তব্য : বেশি কিচাইন করবেন না। তাবলে বউকে সাদা থান পরতে হবে। কাল সব কটা ছাত্রকে ভর্তি করে নেবেন।

পরদিন কলেজে জোর তৎপরতা। জেলা শাসকের প্রতিনিধি এস. ডি. ও, পুলিশের পক্ষে জি. এস. পি, সঙ্গে পি. ডব্লু. ডি-র এক্সিকিউটিভ উঞ্জিনিয়ার। প্রথমেই রাতারাতি নিরাপত্তার কারণে অধ্যক্ষের খোলা বারান্দা গ্রিলের জাল ঘেরা হল। তারপরে বসল পুলি

শ চৌকি। অধ্যক্ষ পেলেন দেহরক্ষী। অধ্যাপকরা কানাকানি কপলেন : ছ্যা ছ্যা, এডুকেশ্যানাল উনস্টিটিউশানে পুলিশ? একজন টি চার কাম-অ্যাকাডেমিশিয়ানের সঙ্গে বডি গার্ড?

কিন্তু সত্যিই তাই। প্রিন্সিপালের ঘরের সামনের টুলে শাদা পোশাকের দেহরক্ষী। তিনি কোয়াটারে যাবেন, দেহরক্ষী। তিনি সপ্তাহা ন্তে কলকাতা যাবেন, সঙ্গে দেহরক্ষী। দেহরক্ষী, যার বাড়ি বেলঘরিয়ার, নাম পল্টু দত্ত, বেশ মাইডিয়ার লোক। সারাদিন টুলে বসে মস্করা করে আর ছাত্রদের কাছ থেকে সিগারেট চেয়ে চান মারে। ছাত্রীদের সঙ্গে হিন্দি সিনেমার গপ্পো করে। অধ্যক্ষ যা খান পল্টুকে কও খাওয়ান। তিন মাসে পল্টু র ভুড়ি নেমে গেল। তিনমাস পরে অবশ্য দাশগুপ্ত বদলি হলেন রাইটার্সে। এলেন রায়চৌধুরী। বেশ বলিয়ে কইয়ে লোক, বুদ্ধিমান। বাবা বাছা বলে ছাত্রদের প্রথমেই পটিয়ে ফেলে প্রস্তাব দিলেন একদিন স্টাফ ভার্সাস স্টুডেন্ট ফুটব ল খেল্ তোরা। কেল্লা ফতে। জর্সি পরে সর্ট পরে ফুটবল বগলে নিয়ে অধ্যক্ষ সটান মাঠে। ছাত্ররা গদগদ হয়ে বলল, প্রিন্সিপ্যাল হ্য ায় তো এইসা।

অধ্যক্ষ পায়চৌধুরী তাঁর সল্টলেকের বাড়িতে ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের মাঝে মাঝে ডেকে এনে বিরাট ফুল প্লেটে কাটলেট ফ্রাই ি মষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করতে লাগলেন। ছাত্রফ্রন্ট ঠান্ডা। এবারে কলেজের বন মহোৎসবে শক্ষামন্ত্রীকে এনে তাক লাগিয়ে দিলেন। দু ষ্টু লোকে বলতে লাগল, এই সুযোগে বেটা করল কি জানেন? মিনিস্টারের কাছে তদ্বির জানিয়ে রাখল যাতে ক্যালকাটায় পোস্টিং হয়। বহুৎ জাঁহাবাজ।

কিন্তু দেহরক্ষী পল্টু থেকে গেল। একজন অধ্যাপক বুঝি বলেছিলেন, আগের প্রিন্সিপ্যালের ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। সেই সিচ্যুয়েশনও তো নেই। আলনি কেন বডি গার্ড রাখছেন? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসব কি মানায়?

রায়চৌধুরী বললেন, আছে লখন থাক না। ক্ষতি কি পানটা সিগারেটটা এনে দেবে। বাজারটা বয়ে দেয়। ট্রেনে যখন যাই তখন আ গে লাফিয়ে উঠে সিট রাখে। মাঝে মাঝে রান্নাও করে ভাল। দাসগুপতি অ্যাডবিনিস্ট্রেশনের বারোটা বাজালেও এই কাজের কাজ করে গেছে।

:

:

৩

অমর্ত্য সেনের মা অমিতা সেন ক্ষিতিমোহন সেনের কন্যা। তাঁর শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত কাটল শান্তিনিকেতনের ভূমিত্রীর লাবণ্য মাখা সুন্দরের সঙ্গ নিং গুরুদেবের সান্নিধ্য পেয়েছেন। সেকালের শান্তিনিকেতনের নানা টুকরো স্মৃতি ঝলসে ওঠে এই আশ্রমিক প্র ক্তনের কলমে। সেইরকম এক ঝলক :

তখন আমাদের আশ্রম ছিল যথার্থই আশ্রমের মতো। কি সাধাসেধে জীবনযাত্রা, এখনকার কেউ ভাবতেই পারবে না। সমস্ত কাজক র্ম নিজেদেরই কপতে হত। সমস্ত গুরুপল্লীতে দুটো মাত্র কুয়ো। সেখান থেকে নিজেরাই জল আনতাম। আমরা যেখানে থাকতাম সে খানে পাশাপাশি নটি বাড়ি। বলা হত, 'রবীন্দ্রনাথের নবরত্নের বাড়ি'। বাসিন্দারা হলেন - নন্দলাল বসু, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, প্রমদা রঞ্জন, জগদানন্দ রায়, শব্দকোষের হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার বাব ক্ষিতিমোহন সেন, নেপালচন্দ্র রায়, গোঁসাইজী, আর ছিল মোহরেরা। সমস্ত বাড়িই কিন্তু মাটির দেওয়াল, খড়ের চালের।

তিবিশের দশকে শান্তিনিকেতনের গুরুকুলের এই বর্ণনা এখন সরই অলীক। নতুন প্রজন্মের পাঠকদের জন্য শুধু অমিতা সেন-কথি ত নামাবলিতে উল্লিখিত দুটি নামের ব্যাখ্যান দরকার। গোঁসাইজী বলতে তিনি বোঝাচ্ছেন নিতাই বিনোদ গোস্বামীকে আর মোহর অর্থে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিবরণটি এখানে হাজির করবার কারণ হল, গুরুদেবের নবরত্নদের মতো বিশ্রুত ও পরিতিষ্ঠিত ি শক্ষকদের সরল জীবনধারার সামান্য আভাস দেওয়া। এখনকার বিশ্বভারতীতে গেলে অধ্যাপকদের প্রাসাদপ্রতিম হর্ম্যবিলাস, তার স্থাপত্যের নন্দনতত্ত্ব, তার, উদ্যানচর্চা আর গ্যাজেটশোভিত রান্নাঘর দেখবার বস্তু বলে বিবেচিত হতে পারে। তাতে দোষ নেই - যে যুগের য মন্ত্র। তবে টোকা-মাথায়-দেওয়া সাইকেল আরোহী শিক্ষক যে নেই তা নয়, তবে তাঁদের কৃপন বলে কিঞ্চিৎ বদনাম হর্ম্যি বলাসীরাই দিয়ে থাকেন।

পরিশ্নটা কিন্তু বাড়ি গাড়ির নয়, অ্যাটিটিউডের, বললেন একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। নামকরা মানুষ থাকেন এখন শান্তিনিকেতনে । মাঝে যান কলকাতার ডাকে নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করতে, সেমিনারে। ঐ নগরীতেই তাঁর নামী অধ্যাপনার পর্ব কেটেছে। ি ফরে চল্ মাটির টানে-জাতীয় আহ্বান তাঁকে শান্তিনিকেতনে টেনেছে শেষ বয়সে। নগরায়ণ ক্লান্ত, মানুষটি চেয়েছিলেন প্রকৃতির শ্য ামল শুশ্রূষা। হা হতোস্মি, শান্তিনিকেতন এখন প্রাসাদপুরী, কলকাতা দুঃস্বপ্নের নগরী। কোথায় যে যান অধ্যাপক! আমাকে বললেন একান্তে : আমাদের জীবনের বারোআনাই দেখেছি লেখাপড়া জিনিসটা ছিল মধ্যবিত্তের কব্জায়। এখন তো সব বডলোকদের বা চ্ছায় ভর্তি। গাড়িতে করে আজকাল কত কত ছাত্রছাত্রী কলেজ য়ুনিভার্সিটিতে আসে, মানে বাব-মা বা ড্রাইভার ড্রপ করে দিয়ে য়ায় আবার কাউকে বিকালে নিয়েও যায়। আমাদের সময় কি বড়লোক সহপাঠী ছিল না? কলকাতার আর বাইরের সব বনেদী বড়ে লাক। হাতিবাগানের, ভবানীপুরের, এলগিন রোডের, বেহালার, উত্তরপাড়ার, ভূকৈলাশের। তারা তো সব বাসে ট্রামেই আসত। অধ্যাপকেরাও তাই ... ও হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ে গেল। গতমাসে কলকাতার একটা মেয়ে কলেজে (নাম বলব না) গিয়েছিলাম

বক্তৃতা দিতে। অনুষ্ঠানের পর ভাবছি অধ্যক্ষ বোধহয় ট্যাক্সি ডাকবেন আমাকে পৌছেদিতে। ও মা, অবাক কান্ড পাঁচদন অধ্যাপিকার একসঙ্গে ঝুলোঝুলি, 'স্যার আমার গাড়িতে চলুন। একটা লিফ্ট দিই আপনাকে ।' ইনক্রেডিব্‌ল্। ভাবতে পার অধ্যাপকদের সচছলতা আজ কোন্ পর্যায়ে পৌঁচেছে। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, আবি মাত্র তিন হাজার টাকা পেনশন পাই। কী করে যে চালাই। এটা ঠিকই যে পঞ্চাশের দশকে আমার ছাত্র জীবনে জানতাম না অধ্যাপকদের বেতনক্রম কত। কে লেকচারার, কে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কে প্রফেসর বুঝতাম না। স্কুল জীবনে তো শিক্ষক বলতে কেনও সুবেশ, প্রসাধিত বা রোজ ক্ষৌরিকরা ফিটফাট ব্যক্তিদের বুঝতাম না। শিক্ষকদের জীবনপ্রসঙ্গে আমরা শুনতাম বা পড়তাম, 'তিনি অতঃপর দারিদ্রময় কিন্তু আদর্শবান শিক্ষকের ব্রত গ্রহণ করিলেন।' সেই ব্রতবীরদের আমার বাবা দেখেছেন, আমার দাদারা দেখেছেন, আমরাও দেখেছি। সাদা টুইলের শার্ট বা পাঞ্জাবি, মলিন ধুতি, সস্তা জুতো, একটি জীর্ণ রংচটা ছাতা। কিন্তু কী দাপট! একটুও দীনতা নেই আচরণে। ক্লাসের মধ্যে পয়েল বেঙ্গল টাইগার। পড়া না পারলে রাম ধোলাই। ভাল রেজাল্টকপলে সে কী আনন্দের হাসি! সেই সঙ্গে ছিল জাতীয়তাবাদের কৌশলী প্রচার, ইংরেদদের তাঁবেদারদের এড়িয়ে। কানাইলাল ক্ষুদিরামের গল্প, বিদ্যাসাগর জননী ভগবতী দেরীর কথা, তাপসী বাবেয়া, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল, বিংবা হাজি মহম্মদ মহসিনের দানশীলতা, গোবরবাবুর শরীরচর্চার বিবরণ। মোহবাগানে জয়ে পরাধীন দেশের মাস্টার মশাইয়ের চোখে জল - কারণ বিজিত দল সায়েবদের। স্কুলের প্রাইজ হবে তারজন্য একমাস ধরে গানের মহড়া দিচ্ছি অনিল স্যারের কাছে : 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান'। হার্মোনিয়াম বাজাতে বাজাতে অনিল স্যার বললেন, এই ফাঁকে তোদের আরেকটা গান তুলে দেব - 'সর্ব খব্যতারে দহে তব ক্রোধদাহ'। জানিস গানয়া কার লেখা? শুভ কর্মপথের মতো এটাও রবীন্দ্রনাথের। বিপ্লবী যতীন দাস অনশনে যখন মারা গেলেন তখন এই লেখা। শোন্, আজ নাহয় কাল দেশ স্বাধীন হবেই - তোরা হবি সব নতুি স্বাধীন দেশের যুবশক্তি। তোদের গাইতে হবে, তোমার পতাকা যারে দাও শক্‌তি।

সেই শক্‌তি আর ভক্‌তিতে আজ কি হঠাৎ টান পড়ে গেল? মহান দুঃখ সইবার সেই প্রার্থিত সাহস কি উদ্ধৃত্ত রইল না স্বাধীন দেশে? সচছলতা কে না চায়? বেতনক্রমের পুনর্বিন্যাস তো হবেই। সেটা সব্যস্তরেই হচ্ছে, সব জীবিকাতেই। কাজেই শিক্ষকদেরও ভদ্রস্থ বেতন হওয়া কিছু আশর্চ্য নয়, ন্যোয়ও নয়। কিন্তু গত ক'বছরে সব রকমের শিক্ষকদের সম্পর্কে আস্তে আস্তে যে সমাজের বেশ কিছু মানুষ ক্ষিপতি, অসূয়াগ্রস্ত, অসহিষ্ণু হয়ে উঠল এর কারণ কি? শুধুই টিউশনী থেকে পাওয়া উদ্ধৃত্ত উপচিত অর্থের দেখনদারি? কই, সাবাই তো টিউশ্যনি করেন না। তা হলে?

তবে কি অ্যাটিটিউডে কেনও গোলমাল হল? শিক্ষাদানের পদ্ধতির মধ্যেই ঘুন? নাকি শিক্ষকদের মতিগতি গেছে পাল্‌টে? ছাত্রসম্প্রদায়ের বাস্তব বুদ্ধি, সুবিধাবাদ আর পলায়নী মনোভাবও কি কিছুটা দায়ী? প্রশ্নটা করা সহজ কিন্তু উত্তরটা তার জটিল। সদ্য শিক্ষকহয়েছে এমন একজন তরুণ আমাকে বলল, স্যার হুগলীর গ্রামের সয স্কুলে আমি গত সাত মাস মাস পড়াচ্ছি সেখানে স্টাফরুমে বসা যায় না। শিক্ষদের সম্পর্কে ধারণা পাল্‌টে যায়। যাঁদের সঙ্গে কাজ করি তাঁরা বেশিরভাগই স্থানীয় বা আশপাশের নানা জায়গা থেকে আসেন বাসে বা সাইকেলে। অনেকেই সময়মত আদেন না। এলে, আলোচনা করেন কোন্ কোল্ড স্টোরেদে কে কতটা আলন রেখেছেন। আলনর দর এবারে কি বাড়বে? দুশ্চিন্তা সেটাই।

অব্যাপারেষু ব্যাপারম বলে একটা কথা আছ, কিছু কিছু শিক্ষকদের জীবনে সেটা একন সত্যি হয়ে উঠেছে। শিক্ষদেদের প্রধান কাজ ক্লাসে শিক্ষাদান। আগেকার শিক্ষকরা বেশিরভাগ তাই কপতেন। সবাই কিন্তু ভাল পড়াতেন না। কেউ কেউ শেক্ষকতা ছাড়াও যুক্ত থাতেন কোনও গ্রন্থাগারে বা খেলার মাঠে। কারুর নেশা ছিল ব্যায়াম করা ও করোনো, কারুর ছিল জিমন্যাস্টিকস্-এ প্রবণতা। বয়স্কদের জন্য নাইট স্কুল কিংবা স্কাউট আন্দোলনে শিক্ষকদের পাওয়া যেত। কারুর কারুর সংগঠন ছিল দরিদ্র ভান্ডার স্থাপন, মড়া পোড়ানো, রাত জেগে রাগির সেবা কিংবা সাইকেল চেলে ছাত্রদের নিয়ে কেনও দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ। শিক্ষকাদের অনেকে থাকতেন চিরকুমারী হয়ে, কেউ কেউ করতেন মহিলা সমিতি। বিধবাদের সেলাই স্কুল চালানো কিংবা নারী সদাজে শিক্ষা বিস্তার ও প্রগতি আন্দোলনে কেনক শিক্ষকা আগে দেখা যেত। এখন কম দেখা যায়। বালবাহুল্য এখানে আমরা শিক্ষক বলতে সবরকমের ক্যাটগ্র বোঝাচ্ছি - প্রাইমারি, সেকেন্ডরি ও কলেজস্তরের।

এখন মানে গত দু'দশকে সব স্তরের শিক্ষকদের বেতন যেমন বেড়েছে তেমনই সরকার বেতন ও ভাতা দানের দায়িতবি নেওয়ায় িশক্ষকদের মধ্যে আত্মতৃপ্ত একরকম সচছলতা এসেছে। হয়তো কমে গেছে দায়বদ্ধতা ও আত্মদামের সদিচ্ছা - যেন অনেকটাই নির্লিপ্ত তাঁরা, উদাসীন ও আত্ম-সর্বস্ব। সবাই নয় নিশ্চয়ই, কিন্তু অনেকে। শিক্ষকের স্বাধীনচিত্ততার বদলে পরানুগ্রহের জন্য লোভাতুর সত্তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সস্তা জনাদরের লোভে ছাত্রদের মানোহরণের জন্য অনেকটাই নীচে নেমে যাচ্ছেন কেউ কেউ। প্রত্যক্ষ রাজনীতি করে অনেকে নেতা বনে নানা অসম সুযোগ সুবিধা ভোগ কপছেন। আধিপত্যবাদ বেড়েছে, নিদেদের দলাদলিতে শিক্ষার্থীদের জড়ানো হচ্ছে, অন্যতর কাজের অজুহাতে ক্লাস কামাই করা এখন জলভাত। আবার বলি সব শিক্ষক নন, অনেকেই নন এমন, কিন্তু বেশ কজনই একন এরকম। ফলে বদনাম হচ্ছ সামগ্রিকভাবে শিক্ষকশ্রেণীর। তাঁদের বাক্তিগত বিশ্বাসযোগ্যতা কমে গেছে, তাঁদের সচছলতাকে সমাজ ান্দেহের চোখে দেখে, তাঁদের আচরণ ও ভাষা অনেককে আহত করে। ক্লাসে না পড়িয়ে সবাই বাড়িতে টিউশ্যনি করে প্রচুর পয়সা কামাচ্ছেন এ-অপবাদ খুব আপাত স্তরের, হয়তো সার্বিক নয়, কেননা শতকরা আশিভাগ শিক্ষকই টিউশ্যনি করেন না এবং সেই আশিভাগ অর্থাৎ গরিষ্ঠ শিক্ষকরাই মন দিয়ে ক্লাশ নেন। অথচ বদনামের বাগ নিতে হয় তাঁদেরও। বেশির

ভাগ কলেজেই যে একন বেলা দুটো-আড়াইটার পরে শিক্ষার্থীরা থাকে না সেকথা তাঁরা কাউকে জানাতে পারেন না। প্রশ্ন ওঠে প ড়াবেন কাকে ? আদর্শবান শিক্ষকীখন চোখের সামনে দেখেন পরীক্ষার হলে অন্য কলেজের পরীক্ষার্থীরা (কারণ এখন হোম সেন্ট ার নেই) টোকাটুকি করপছে এবং ছাত্র সংসদ তাদের স্পষ্ট মদত দিচ্ছে তখন আদর্শ কেন্ কাজে লাগে? পরীক্ষার হলে অসদুপায় গ্র হণকারীদের হাতে নাতে ধরে ফেলার অপরাধে শিক্ষকের প্রহৃত হবার ঘটনা কি আমরা মাঝে মাঝে খবরের কাগজে পড়িনা? সমা জ তার কী প্রতিকার করেছে? ফাঁকিবাজ অসৎ শিক্ষকদের চিহ্নিত করে কোনও শিক্ষক সমিতি বা সংগঠন কি নিন্দা প্রসাতাব নিতে পারে? এসব দিক থেকে বাবলে মনে হয়, হঠাৎ সম্প্রতি সব শিক্ষকদের একযোগে যে কাঠগড়ায় তুলে দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপা র তাঁদের অসহায়তার প্রতিকার কি ? সমাজের সব কিছু ঠিক আছে, সবাই সৎ ও আদর্শনিষ্ঠ কেবল শিক্ষকরাই চোর দায়ে ধরা পড়লেন?

শিক্ষকদের চোখ দিয়ে মাঝে মাঝে অনেক জিনিস দেখতে পাই, তার কারণ আমার কিছু কিছু ছাত্রছাত্রী এখন শিক্ষকতা করে। প্রথ মেই খবিরুদ্দিনের কথা বলি। সে তার গ্রমের কাছাকাছি একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। স্কুলের পরিচয় একটা মাদার গাছের তলায় ভাঙা কুঁড়ে ঘর ও দাওয়া। তাতে ঘর ও দাওয়ায় চারটি শ্রেণী পড়ে, সাকুল্যে দুশো আড়াইশো ছাত্র। শংকিত হয়ে বলি, কোথায় ব সে তোমার ছাত্ররা?

খবির বলে, তার আগ স্কুলের নাম শুনে নিন। নাম হল শকুনতলা ইস্কুল। গ্রামের সবাই তাই বলে।

: শকুনন্তলা স্কুল? কেন এমন নাম?

: শকুন তলা স্যার। মানে, গ্রামেরএকেবারে প্রান্তে নদীর ধারে মাদার গাছে থাকে বেশ কটা শকুন, তাই শকুন তলা। তারা সমস্ত জ য়গাটা হেগে নোংরা করে রাখে। তার নিচে ঘরের মধ্যে দুজন টিচার পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে বসে ক্লাস ওয়ান আর টু-কে পড়ায়। এক ঘরে পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশোজন তো বটেই কিংবা একেকদিন তার বেশি। বাইরে শকুন তলায় ক্লাস থ্রি আর ফোর।

: ঝড় জল রোদে?

: হ্যাঁ, যতক্ষণ সম্ভব। যতটা সম্ভব। নইলে ছুটি দিয়ে দিতে হয় সেদিনের মতো। এবারে ছাত্রদের কথা ব্ল। বেশিরভাগই আসে না, ধ র আনতে হয়। ফসল রোওয়া বা কাটার সময় তারা বেশিরভাগ মুনিষ খাটে। ক্লাস ফোরে হয়তো বললাম : 'ভাগ কর ১৬ () ২০ ০০'। ছাত্র খাতায় লিখে নিয়ে আনল ভয়ে আকার গ অর্থাৎ ভাগ শব্দটা। ভাগ চিহ্ন গুণ চিহ্ন কিছুই চেনে না।

: পাশ করল কী করে?

: পাশ করেনি তো! তুলে দিয়েছি উচুঁ ক্লাসে - ক খ গ মূল্যায়ন কেউ বোঝে না। তারপরে ক্লাস ফোরে বিশেষত মোয়েরা ডাগর হ লে খুব বেমানান দেখালে প্রমোশন দিয়ে অন্য স্কুলে ভর্তি হত বলি ক্লাস ফাইভে। চলে যায়। আমরা তো বাঁচি।

মুকুলিকা স্কুল সার্ভিস কমিশনের মোহরছাপ পেয়ে গত বছর শহিদ কানাই লাল উচচবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেয়েছে। মিস্টির প্যাকে ট নিয়ে এসে প্রণাম করে আশীর্বাদ চাইল। তারপরে আবার এল প্রায় পাঁচ মাস পরে পুজোর শেষে বিজয়া করবে। বললাম : চেহা রা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। স্কুলে খুব ধকল নাকি?

: স্যার স্কুলের চাকরি এত কষ্টের জানতাম না।

:

: কেন?

: স্যার, কত যে স্টুডেন্ট। জানেন তো এখন গ্রামাঞ্চলে হেয়েদের লেখাপড়ার খুব ধউম পড়ে গেছে। একটা ঘরে একই সঙ্গে এইট আর নাইনের ক্লাশ হচ্ছে, ভাবুন। আমি পড়াচ্ছি ইতিহাস ক্লাস নাইনে, করবীদি পড়াচ্ছেন বাংলা ক্লাস এইটে। দুজনেই তারস্বরে চেঁচাচ্ছি। তারমধ্যে মেয়েদের কথাবার্তা-বকুনি। স্কুল তেকে যখন ফিরি - শ্রান্ত ক্লান্ত, গলা বসে যায়।

অমর্ত্য সেন প্রথমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে যে সব প্রতিবেদন পেশ করেছেন তাতে ভদ্র পঞ্চজনের চোখ গোলা গোলা হয়ে গেছে। আ মার মতো যারা গ্রামে গ্রামান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছি গত তিন চার দশক তাদের ঝুলিতে যে কত বেড়াল! আমার মুক্তমন উদারমনস্ক প্রাক্ত নছাত্র সাহেবালি মন্ডল নদিয়ার এক মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে মাধ্যবিক স্কুলে পড়ায় - নিন্দু মুসলিম যুক্ত চৈতন্য সম্পর্কে সে স্বপ্ন দে খে - বাউল ফকিরদের গান সংগ্রহ করে সে আমাকে এনে দেয়। তার স্কুল পরিবেশেই অনেকে তকে সন্দেহের চোখে দেখে। নিপাট মুসলিম গ্রাম। চারশো ছাত্র পড়ে। প্রধানশিক্ষক বাদে তারা মোট সাতজন - সবাই মুসলিম। স্টাফরুমে তাকে স্পষ্ট বলা হয়েছে, তো মার আচার আচরণ পালটাও। তুমি রোজ নামাজ পড়? এবার রোজা রেখেছিলে? রাখোনি? তাহলে আর লেখাপড়া শিখে তোমা র কী লাভ হল?

সত্যিকারের ভাল মানুষ সুব্রতা দা, মানে আমাদের শহরের সুব্রত বাগচী প্রধান প্রাথমিক শিক্ষক। স্থানীয় ডোমপাড়া জি. এস এফ. স্কুলে হেড মাস্টারি করছেন বহুদিন। জি. এস. এফ. মানে গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড ফ্রি প্রাইমারি স্কুল। মাইনে পান নিয়মমত, তবে ছাত্রছা ত্রীদের লেখাপড়ায় মতিগতি কম। অনুন্নত এলাকা। সঙ্গে আছেন একজন সহকারী শিক্ষক, এক দিদিমণি। একটা বারান্দাঅলা দুঘ রের পাকাবাড়ি। দুখানা ঘরে চারটে ক্লাস। মাস্টারমশাইয়ের বসার জায়গা ঐ খোল বারান্দা, অবশ্য ছাদ আছে। ঐ খানেই আছে একটা আলমারি। পাড়ার লোকই বরাবর রক্ষা করে চেয়ার টেবিল আলমারি। পাড়ার কেউ কেউ শিক্ষকদের সম্ভ্রম করে, অনেকে

ই তো প্রাক্তন ছাত্র - ড্রপ আউট অবশ্য। বলে, 'মাস্টারমশাই অসুবিধে হলে বলবেন। সবাই তো সমান নয়। কেউ কেউ শুনিয়ে শুনিয়েই বলে, 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি - দুই মাস্টার আর এক দিদিমণি। আছে বাল। আসছে যাচ্ছে, আড্ডা মারছে, একটু আধটু পড়াচ্ছে - ব্যস, মাস গেলে মোট টাকা।'

সুব্রতাদারা বিব্রত হন, অপমামিত বোধ করেন - বয়স হয়েছে তিনজনেরই - সয়ে যান। ভাবেন, কবে যে রিটায়ার করে বাঁচবেন! এভাতেই চলছিল, হঠাৎ একদিন সুব্রতদা দেখলেন স্কুলের বারান্দায় পয়েছে নোংরা কত কি আর গাঁজার কলকে। ঝাঁট দিয়ে তবে স্কুল শুরু হল। প্রধান শিক্ষক হলেন ঝাড়ুদার। তবু শিক্ষকতার মহান বৃত্তির কথা তো ভুললে চলবে না। অচিরে এভাবে একদিন ঝাঁট দিতে হল মদের পাঁইট, মাংস মাখানো শালপাতা, বিড়ি দেশলাই কাঠি। আলমারিটার পাল্লা ভাঙা। পাড়ার লোকদের দ্বারস্থ হতে হল, তারা প্রাক্তন ছাত্র, কিন্তু মিনমিন করে বলল, মাস্টারমশাই আমাদের আজকাল কিছু করবার নেই। নিরুপায়। ওরা উঠ্তি মাতস্বন। কিছু বললে বোমাবাজি করবে কিংবা আপনাদের খিস্তি দেবে। সত্যি কথা বলতে কি, এ ছাতার ইস্কুল রেখে লাভটাই বা কী? চাচা আপন প্রাণ বাঁচা - হতাশ সুব্রতদা স্কুলবোর্ড অফিসে তদ্বির করে বছর খানেকের নাজেহাল চেষ্টায় বদলি হলেন শহরের একেবারে প্রান্তবর্তী এক স্কুলে। আমাকে দুঃখ করে বললেন, ডোমপাড়া ইস্কুলটা বলতে গেলে তো নিজে হাতেই গড়ে তুলেছিলাম, তাই মায়া লাগে। নিজের পোঁতা নিজেই তুলে ফেললে কেমন লাগে বল তো? মানুষেরই দরদ নেই। শিক্ষকদের ওপর ভরসা নেই। এহ পায়ে-মারি শক্ষার কী যে হবে!

: কী বললেন? পায়ে মারি শিক্ষা?

হ্যাঁ, ম্লান হেসে সুব্রতদা বললেন আমরা নিজেরা এই শব্দটা বানিয়েছি। প্রইমারি নয়, পায়ে মারি। খুব ছোটবেলায় এমন করে পায়ে মারতে হবে যাতে ছেলেমেয়েগুলো আর উঠে দাঁড়াতে না পারে।

শিক্ষাজগৎই যে কেবল পায়ে মারে তা তো নয়, প্রবেশ পবিস্থিতিও আঘাত হানে। সুব্রতদাকে ডোমপাড়ার নব্য মাস্তানরা যেমন স্কুলছাড়া কপল তেমনই অকরুণ আচরণ অন্যত্রও দেখেছি। যেমন ধর্মদার কাছে কাকপলসা গ্রামে দেখেছিলাম অদ্ভুত এক দৃশ্য। ওখানকার প্রাইমারি স্কুলের হেড মাস্টার বিপুলচন্দ্র বিশ্বাস, আমার পুরোনো ছাত্র। তার গ্রামে গিয়েছিলাম একজন বাউলের সন্ধানে। খবর পেয়ে বিপুল এসে নিয়ে গেল খাতির করে তার বাড়ি। দুপুরে খেতেও হল। তারপরে বললাম, তোমাদের স্কুলটা দেখাবে না? লজ্জিত হেসে বলল, গাঁয়ের ইস্কুল - কীই বা দেখবেন? তুব চলুন। আপনি একজন শিক্ষক, তায় আমার সাক্ষতৎ শিক্ষগুরু - দেখে যান কেমন প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করি আমরা।

বিপুলদের স্কুল ঘরটা পাকা, খানিকটা মাঠও আখে, তবে দুটি ঘর বড়ই জীর্ণ। ছাত্রদের চাপ আছে, কিন্তু অভিবাবকরা উদাসীন। বিপুল পাশের গ্রামের ছেলে কিন্তু বহু চেষ্টা করেও স্কুলঘর সংস্কার করার জন্যে একপয়সা চাঁদা তুলতে পারেনি। সদরের ডি-আই অফিস আর সাব ইনসপেকটরদের এত দুর্গম গ্রামদেশ সম্পর্কে নেকনজর থাকবার কথা নয়। শিক্ষকদের প্রধান লক্ষ্য চাষবাস। নাম কা ওয়াস্তে একবার হাজিরা দিয়ে তাঁরা যান জমিতে জল দেবার জন্যে ডিপ টিউবওয়েল অপারেটরদের তোয়াজ করতে। তারপর মর্জিমতো ক্লাশ নেন। বিপুল একা কি করবে? একজন শিক্ষক অঞ্চল সদস্য - তাঁকে কিছু বলা তো অসম্ভব, মিটিং আর সংগঠনে সদাব্যপ্ত। তবু বিপুল আমাকে নিয়ে যায় তার জীবিকাস্থলে। শ্রীহীন, ছাড়া ছাড়া কেমন যেন পরিবেশ। ছাত্ররা চারদিকে ভ্রম্যমান। বিপুলকে দেখে তাড়াতাড়ি ঘরে আর দাওয়ায় তারা বসে পড়ে। প্রচন্ড কলকোলাহল। স্যাররা নেই আপাতত। বিপুলকে বললাম, দুখানা মাত্র ঘর, তার এক খানায় তালা দেওয়া কেন?

বিষণ্ণ কণ্ঠে বিপুল বলল, গ্রামের একদল শক্তিশালী মানুষ অধিকার নিয়ে তালা মেরে দিয়েছে। চাবি ওদের কাছেই। ঘরের মধ্যে স্যার উঁকি দিন - তাহলে বুঝবেন।

ঘরের একটি জানালার পাল্লা খোলা ছিল। প্রায়ান্ধকার ঘরে উঁক দিয়ে চোখে পড়ল মেঝেতে গাঁথা মস্ত একখানা উনুন। কী ব্যাপার? এত বড় উনুন কেন?

: গ্রামে আজকাল অষ্টমপ্রহর হরেকৃষ্ণনাম আর কেইসঙ্গে অন্ন মচ্ছব প্রায়ই হয়। এই ঘরে ঐ ঢাউস উনুন সেই প্রয়োজনে স্থায়ীভাব

তৈরি করা হয়েছে। বিদ্যাদানের চেয়ে হরিনাম অনেক জরুরি নয় কি? আসলে স্যার গ্যমের পরিবেশ এখন অন্যরকম। আমরা শিক্ষকরা যেন চোর দায়ে ধরা পড়েছি।

এমন হতাশ নিরুদ্যম বিষণ্ণ মানোভাব সারা দেশের শিক্ষাব্রতীদের তিলে তিলে ক্ষয় করে দিচ্ছে হয়তো। আমার একজন অনুরাগী পাঠক চাকরি করে হুগলীর একটা গ্রামে। তার নাম সুজন ভট্ট। সুজনের বাড়ি বৈদ্যবাটি। সেখান থেকে খুব সকালে সাইকেলে কবে পৌঁছায় স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেন চেলে শ্যাওড়াফুলি পৌঁছে আরেকটা ট্রেন ধরে তারকেশ্বর লাইনে তার কর্মস্থলে পৌঁছয়। হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে সে লাইফ সায়েন্সের টিচার। অতান্ত কর্মনিষ্ঠ এবং সফল শিক্ষক। ফাঁকি দেবার কোনও প্রবণতাই তার নেই। বৈদ্যবাটিতে তার সাবেক বাড়ি। বাড়ির সদস্যরা বেশিরভাগ বয়স্ক ও অসুস্থ, তার নিজের সন্তান পড়ে স্থানীয় ভাল একটা স্কুলে। কাজেই বৈদ্যবাটি থেকে পরিতিদিন তাকে কর্মস্থানে যেতে হয়। ভোর সাড়ে চারটে বাড়িতে শুরু হয় তার তৎপরতা। প্রতিক্ষণই তাকে ঘড়ির কাঁচার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই চালাতে হয়। এইভাবে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দুটো ট্রেন চেপে তারপরে বাস থেকে নেমে যখন হেঁটে

স্কুলের মেটে রাস্তা ধরে তখন গ্রামে একটা বটগাছতলায় কিছু ব্যক্তি তাকে প্রশ্নবানে বিদ্ধ করে। এ সব ব্যক্তির শিক্ষা সংস্কৃতির সঙ্গ কোনও যোগ নেই, তবে অঞ্চল রাজনীতির স্বঘোষিত মুরুবিব। অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত, চল্লিশ পেরনো বয়স। পরনে লুঙ্গি আর টি-শার্ট, পায়ে রবারের সস্তা চটি। বটগাছ তলায় একটা বাঁশের বড় মাচায় বসে তারা সারাক্ষণই লেঠুগিরি করে। স্কুলমুখী এস্ত সুজন ভট্টদের তারা থামিয়ে জিগ্যেস করে : কি মাস্টার এলে? তারপরে কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখে বলে, হুঁ। সময় মতোই এসেছে। ভালো। রোজ তাই আসবা!

রাগে হাড়পিত্তি জ্বলে যায় সুজনদের, নিদের ভাগ্যকে দোষে, তবু হাসিমুখে চেয়ে থাকে মুরুবিবদের দিকে। এরা স্কুলের কেউ নয় কিন্তু আঞ্চলিকভাবে ক্ষমতাশালী - পুলিশ এদের দোস্ত। মাঠে ঘাটে গ্রামে যে গণধোলাইয়ে হত্যার খবরআসে তার প্রধান হননকারী এরাই - পরে গা ঢাকা দেয়। তাই শিক্ষকদের খবরদারি তারা করতেই পারে। সুজনদের তারা প্রায়ই হেসে বলে, শোনো মাস্টার, মন দিয়ে পড়াবা। একদম ফাঁকি দেবা না। বুঝলে? মনে রাখবা, এই গ্রাম থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করছ।

একজন বুঝি বলে ফেলেছিল, আপনাদের টাকা কেন বলছেন? আমাদের মাইনে তো সরকার দেয়।

তাদের একজন মাচা থেকে নেমে এসে শিক্ষকের নাকের ডগায় তর্জনী উঁচিয়ে বলেছিল, চোপ্। একটাও কথা বলবা না। টাকা সরকারের কি তোমার বাবার সেটা আমরা বুঝবো। চাকরি করতে এসেছ চাকবি করবা। ব্যস। নইলে ...

একটু রুখে যুবক শিক্ষকটি বলেছিল : নইলে? নইলে কী?

: নইলে ঐ পা দুটো খোঁড়া করে দেব। চিরকালের মতো।

সবাই বলবেন এসব ব্যতিক্রম। আবি তর্ক কবর না। কন্তি সারাদেশে শিক্ষক্ষেত্রে কতরকম যে মাস্তানী হচ্ছে তার খবর রাখা মুস্কিল। শিক্ষকদের অপমান করা এখন একটা ব্যাপক রেওয়াজ। নানাভাবে তার প্রকাশ চোখে বড়ে। ট্রেনের কামরায়, ক্যান্টিনে, বাসে, নেতাদের ভাষণে কান পাতলে বহুতর শিক্ষক বিদূষণ দেখি - যার কোনও প্রতিবাদ দেখিনা, প্রচ্ছন্ন সমর্থনই দেখি সাধারণত। অথচ আমার মনে পড়ে কত ত্যাগী বা ব্রত শিক্ষকশিক্ষিকাদের শিক্ষাদানের আন্তরিকতা - ক্লাশে এবং ক্লাশের বাইরে। সুজন ভট্টদের মতো নিষ্ঠাবান শিক্ষকদের যেমন অপমান ও অনাদর সয়ে কাজ করতে হয় তেমনই অন্যধরনের বহু শিক্ষকের নীরব উদ্যম সমাজে স্বীকৃতি বা সম্মান পায় না। এমন একজন মানুষ বন্দীপুরের কানাবাবু। চাকরি থেকে অবসর নিয়েও শিক্ষকতা ছাড়েন নি। তাঁর বাড়ির অনতিদূরের পতিতাপল্লীর সন্তানদের রোজ বাড়ি এনে পড়াতে বসেন। তাঁর স্ত্রী আর ছেলে এতে বিরক্ত হন। তাই পতিতাপল্লীর কাছেই একটা ঘর ভাড়া নিয়েছেন। সেখানেই পড়ান এবং স্বপাকে রেঁধে মাঝে মাঝে বাড়ি যান - প্রতিবেশীরাও সন্দেহ করে তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ।

আমি অন্তত ভুলতে পারিনা, বরং কৃতজ্ঞ বোধ করি, জানা অজানা কত শিক্ষাব্রতীদের কথা ভেবে। এমন দুপাঁচজনকে চিনি যাঁরা লেখাপড়া শেখান পথশিশুদের, হরিজন বস্তিতে কিংবা আদিবাসীদের গ্রামে। কোনও উপকরণ নেই, ক্লাশরুম নেই, কিন্তু উদ্যম আছে, দরদ আছে, আছে স্বপ্ন। অন্তত চারজন মুসলিম যুবককে জানি যংারা মৌলবাদী মোল্লাদের খপ্পর থেকে ধর্মের পাঠ না- নিয়ে আধুনিক শিক্ষার যুক্তিবাদের দিকে টানছেন স্ব-সম্প্রদায়ী যুবকদের। নসরৎগঞ্জের আম্বিয়া বেগমকে জানি, যিনি তাঁর অন্দর মহলে সারা দুপুর পাঠ দেন অন্তঃপুরবাসিনী মুসলিম তউ ঝিদের এবং মনে পড়ে শ্রীপদ প্রামাণিক মশাইকে। তাঁর কথা আলাদা করে বলবার মতো।

মানুষটি এখন আর বেঁচে নেই কিন্তু সারাজীবন ভাবি আশর্চ্যভাবে বেঁচে ছিলেন, যা খুব কম মানুষই পারে। সবচেয়ে বড় কথা, কারার সম্পর্কে শ্রীপদ বাবুর কোনও অভিযোগ ছিলনা। জন্মেছিলেন প্রামাণিক বংশে, এক অনামা গ্রামে। সেখানে শিক্ষার বিকিরন তেমন ছিল না। নিতান্ত নিজস্ব মেধায় পাশ করেছিলেন ম্যাট্রিক। গ্রাম্য যাত্রা, বাউল গান, ফকিরি তত্ত্ব এই সবে নেশা ছিল। দারিদ্যের কারণে ম্যাট্রিকের পর কলেজে পড়তে পাননি। একজন মুরুবিবর অনুগ্রহে পেয়েছিলেন প্রাথমিক শিক্ষাকের সামান্য চাকরি। তেমন কেনও তড় উচচাশা ছিল না। সাধারণ ঘরে বিয়ে করেছিলেন, গোটা চার-পাঁচ সন্তান হয়েছিল। তিন ছেলে দুই মেয়ে। দুখানা খড়-ছাওয়া মেটে ঘর, একটু বারান্দা, উঠোন - সামনে অবারিত এক নদী। গ্রামের পাঠশালায় সামান্য বেতনে শিক্ষাকতার ব্রত। সম্মান প্রতিষ্ঠা কিছুই নেই - সবাই বলতে গেলে করুণাই করত। কিন্তু দুরন্ত ছিল তাঁর পাঠস্পৃহা। বড়ছেলে দূরের শহরে গিয়ে কলেজে পড়ত। তার বইপত্র পড়ে আই. এ. পাশ কপলেন প্রাইভেটে - ছোট্ট গ্রামে একটু চাঞ্চল্য ঘটল। একইভাবে বি. এ. পাশ কপলে অনেকে নড়েচড়ে বসল। ছিরিপদ মাস্টারের তবে তো এলেম আছে। ছোটখাট শান্ত মুখচোরা মানুষটার মধ্যে এতটা জেদ আছে কেউ জানত না।

শ্রীপদ-র নেশা ছিল কিন্তু অন্য কাজে - যেটা বড় একটা কেউ জানত না। মাঠে মাঠে কোথায় যেন চলে যেতেন। লোকে ভাবত ঘুরনবাই - ঘরে মন টেকেনা। আসলে চলে যেতেন গহীন সব গাঁয়ে ফকিরদের সঙ্গ করতে। ফকিরিতন্ত্র খুব গোপন সাধনা - তাঁরা কাউকে কিছু

:

:

জানান না। দমের কাজে নিবিষ্ট থেকে মাঝে মাঝে জিকির দেন। আত্মাতার একেবারে ভেতরে গিয়ে তাঁদের 'ফাঁনা' হয়ে যেতে হয়

এবং সেই ফানা অবস্থায় স্থায়ী অবস্থান বা 'বাঁকা-ই' তাঁদের লক্ষ্য। শ্রীপদ তাঁদের সঙ্গে থেকে, পদসেবা করে, নানাভাবে আস্থাভাজ ন হন। তাঁদের কাছ থেকে, একটা জাব্‌দা খাতায় লিখে নিতে থাকেন নানা ফকিরি গান - বুঝে নেন গূঢ় মর্মার্থ। এদিকে গ্রামে তাঁর সেই একই পরিচয় - ছিরিপদ মাস্টার। লোকে বলে, মানুষটার হল ঘুরন বাই আর বইয়ের নেশা। বড়ছেলে বি. এ. পাশ করে চা করি করতে চলে গেল। শ্রীপদ কিছু নোটপত্র জোগাড় করে বই ঘেঁটে ইসলাবি ইতিহাসে এম. এ. পাশ করে গেলেন প্রাইভেটে। স বাই বলল, মাসচার এবার সদরে গিয়ে ডি. আই অফিসে জানাও। এত জ্ঞানী পন্ডিত তুমি, তোমার কি ঐ গাছতলায় বসে প্রাইমারি মাস্টারি করা চলে? তুমি হাইস্কুলে হাসতে হাসতে কাজ পাবে। শ্রীপদ মিটিমিটি হাসেন। বলতে পারেন না যে ফকিরিতত্ত্বের দুর্লভ পরশমণি তংার দখলে - আর কত গান।

এই গানের সূত্রেই শ্রীপদ প্রামাণিকে র সঙ্গে আমার আলাপ শেওড়াতলার অম্বুবাচীর মেলায়। অম্বুবাচীতে বৃষ্টি হবেই। সারাদিন উ লঝরন জলের পর বিকেলের দিকে আকাশ সবে একটু ধরেছে, তখন পৌঁছলাম রানাবন্দ পেরিয়ে শেওড়াতলায় আহাদ ফকিরের সাধনপীঠে। এই শেওড়াতলা, তাই নানা বর্গের বাউল ফকিররা আসেন। বাংলাদেশ থেকেও বড্যার পেরিয়ে চলে আসেন উদাসীন সাধকরা, তাঁদের কেনও পাশপোট ভিসা লাগেনা - কণ্ঠের গানই তাঁদের পারানির কড়ি। 'ফকিরদের আসর আর তাতে ছিরিপদ মাস্টার থাকবেন না তাই কি হয়?' বললেন একজন উদ্যোক্তা, 'এসে পড়বেন সন্ধের মধ্যে। সম্বৎসরই আসেন। জানেন যে গান শু রু হবে রাত আটটা থেকে চোপর রাত।' উদ্যোক্তার কণ্ঠে সম্ভ্রম ভরা ভঙ্গিতে আরও জানা গেল শ্রীপদ খুব হাঁটতে পারেন। ফকিরি গানের খোঁজে সব কাঁহা কাঁহা গাঁয়েগঞ্জে ঘোরেন। আশর্চ্য যে, এতদিন এত বাউল ফকিরের সঙ্গ করেও শুধু শ্রীপদবাবুর বাঁশি শু নেছি, চোখে দেখিনি। কারণ উনি তো মেলামচ্ছবে বড় একটা যান না, খুব ভীড় বড্ড কোলাহল সেখানে। কিন্তু একজন বলেছিলে ন, আহাদ ফকিরের থানে অম্বুবাচীতে তিনি যাবেনই - সিদ্ধপীঠ বলে কথা।

সত্যিই সেখানে দেখা মিলল। বিনয়নম্র আচরণ, খুব লাজুক, মুখচোরা। মধ্যরাতে গানের আসরেরর একপাশে বসে একটা খাতা খু লে চর্টের আলো ফেলে গান মেলাচ্ছিলেন বোধহয়। আগেই আলাপ হয়েছিল সন্ধেবেলা, তাই সরতে সরতে তাঁর পাশে এসে বে স বললাম, যে গানটা হচ্ছে সেইটা খাতায় আছে কিনা দেখছেন তো?

হ্যাঁ, সঠিক বলেছেন, তারিফচোখে আমার দিকে চেয়ে শ্রীপদ বললেন, এ-গানা জালালুদ্দিনের, সবাই বলে জালালা। নাম শুনেছে ন?

: না। কোথাকার মানুষ? এদিককার?

: না না, পূববাংলার। ময়মনসিং নেত্রকোনায় অনেক বড় বড় মুসলিম সাধক, পীর ফকির আলি আউলিয়া জন্মেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন মহান এই জালাল খাঁ। ওদেশে তিন খন্ডে বেরিয়েছে 'জালাল গীতিকা'। সংগ্রহ করা কঠিন। খবর পেয়েছিলাম আহাদের ে মলায় এবার ওপারের একজন বড় গাহক আসবেন। তিনিই এখন গাইছেন জালালের গান। দেখছি গানটা আমার আছে। এ-গান টা পেয়েছিলাম করিমপুরের কাছে গোরড়াঙ্গা গাঁয়ে মোসলেম ফকিরের কাছ থেকে - ওপার থেকে শিখে এসেছিল।

এরপরে শ্রীপদ মাস্টারের সঙ্গে আলাপ জমতে দেরি হয়নি। পরের দিন সকালে মুড়ি খেতে খেতে অনেক কথা হল। সগর্বে সাইড ব ্যাগ খুলে দেখালেন তাঁর অমূল্য সঞ্চয় - কত যে গান। পাশে পাশে তার ভাষ্য লেখা। ওগুলি ফকিরি ব্যাদা। বললাম, আমাকে দে বেন? চোখেমুখে কৌতুকের হাসি খেলে গেল। বললেন, ট্যানটালাসের গল্প জানেন তো? আপনার দশা হবে সেইরকম। গান আর গান, কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারবেন না। ফকিরি গান কি সোজা? উসলামি তত্ত্ব জানেন? মারফতি সাধনা বোঝেন? লা-মাকান জানে ন?

: না, ভাসা ভাসা জানি।

: ফকিরি তন্ত্রে বাসা ভাসা বলে কিছু নেই। একেবারে ডুবজলে অতল ঝাঁপ। আমি গত কুড়ি বছরেই থাই পাইনি। শিক্ষা কি অত সোজা? শিক্ষক পাওয়া এরক রকম ভাগ্যে বলতে পারেন।

গ্রামের প্রাইমারি শিক্ষকের সামনে অধোবদন একজন এম. এ, পি. এইচ. ডি।

পাঠক, শিক্ষাসংক্রান্ত বলেই কিনা কে জানে, এই লেখাটা বড্ড গোমরামুখো হয়ে যাচ্ছে, তাই একটু হাল্‌কা করি। প্রায় পঁয়ত্রিশ ব ছর ধরে কলেজে মাস্টারি করে যেমন আশর্চ্য সব অভিজ্ঞতা হয়েছে তেমনই শুনেছিও অনেক। প্রথমে ওখানে শোনা দুটো ঘটনা বি ল। প্রথমটা আমাকে বলেছিলেন একজন শিক্ষক। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। গল্পের মতো করে বলি।

প্রমথেশ মান্না একজন ঠিকেদার। কলকাতার ছোটমাপের উন্তাষ্ট্রিতে সাপ্লাইয়ের কাজ করে তংার হাতে খড়ি। ইঞ্জনিয়ারদের ঘুষ দি য়ে সরকারি কাজ পাওয়া তার দ্বিতীয় ধাপ। বিদ্যুৎ পর্ষদ্‌ সারাদেশে বিস্তৃত হচ্ছে তাই গ্রামে গঞ্জে টানা হচ্ছে লাইন। তাতে নানা খ ুচরো কলকব্জা লাগে। কেরানি, অ্যাকাউনাটস ক্লার্ক ও সাব অ্যাসিসচ্যান্ট ইঞ্জিনিয়াদের সঙ্গে বখরা করে প্রমথেশ এবার পাখা মে ল দেয়। অফিস খোলে, সুশ্রী কন্যা রাখে রিসেপশনে, কমপিউটার বসায়, ঠান্ডা ঘর বানায় কিছু দালাল ও মস্তান পোষে। অসম্ভব দু ঃসাহসী এবং নির্বিকার রকমের অসৎ বলে তার ব্যবসা রমরমিয়ে ওঠে। এটা তো এখন সবাই জানেন যে, কলকাতা যত গায়ে গত রে বাড়ছে, ততই বাড়ছে ফড়ে, দালাল, মস্তান, কাটমানি খাবার ঠিকেদার। তাদের তালে নিজের লয়কে বেঁধে হাওড়ার ঘুষুড়ির সত ন্তান প্রমথেশ প্রথমে শালকিয়ায় একটা বাড়ি করে এবং দুটো গাড়ি। একটা গাড়ি উঞ্জিনিয়ারদের ও তাদের বউদের পরিষেবায় সা

রাদিন ও সন্ধেয় নিয়োজিত থাকে। বিল পাশ ও পেমেন্ট অসুবিধে হয় না। কোম্পানী বড় হতে থাকে। যোধপুর পার্কে আরেকটা বড় ফ্যাট কিনে প্রমথেশ মান্না ক্যালকেসিয়ান বনে যান। ক্লাব কালচার, রোটারিয়ান ও আসব বানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রমথেশের একটিই কন্যা - সুচন্দানা। গড়িয়ে গড়িয়ে হাওড়া গার্লস থেকে গ্রাজুয়েট হয়েছিল। এরপরে আমার বন্ধু সত্যব্রত-র কাছে প্রাইভেট এম. এ-র তালিম নিতে থাকে। তখনও প্রইভেট টিউশ্যনির ওপর পাবলিকের বিষদৃষ্টি পড়েনি। সত্যব্রত (নামটা বদলে দিয়েছে) কেনও একাট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়, বাংলা অধ্যাপক, বাজারে টিউটর হিসাবে নির্ভরযোগ্য। তার কাছে অগা বগারা পড়ে প্রাইভেট প্রি. লি পাশ
করে, তারপরে ফাইনাল এম. এ। সত্যব্রত-র নোটস্ কথা বলে, তাই তার কাছে পড়া মানে সিওর সাকসেস। প্রমথেস মান্নার অ্যামবাসাডর সত্যব্রতকে তার বিজয়গড় কলোনির ফ্ল্যাট থেকে তুলে আনে যোধপুর পার্কে - পৌঁছেও দেয়। চকচকে নোটে পুরো দু'হাজার টাকা বেতন লেতে তার কেনও দিন দিগদারি হয়নি।

ঐ আখ্যান তার প্রত্যাশিত পথেই এগোতে থাকে, অর্থাৎ সুচন্দা প্রাইভেটে এম. এ পাশ করে যায়। কিন্তু তার বাই জাগে ড ক্টরেট হবে। তার বালি প্রমথেশ মান্নার পক্ষে অসাধ্য বলে কিছু নেই - তাই সরাসরি একদিন রাতে নেমন্তন্ন করে সত্যব্রতকে প্রস্তাবটা দেন। সত্য সিউরে ওঠে। 'ড. সুচন্দনা মান্না' লেখা একটা কলিতে নেমপ্লেট তার বিবেককে ঝাঁকি দেয়। মন বলে এ অসম্ভব এ অসম্ভব। ডিনারটা মাটি হয় - হাজার পঞ্চাশ টাকা, চাই কি এক লাখ পাওয়া কেঁচে যায়। সে ভয়ে পালিয়ে আসে পালিয়ে আসে - কী সর্বনাশ, প্রমথেশ মান্নার করলার থাবা নাটবল্টু আর প্রমোটারের জগৎ থেকে সরে এবারে পি. এইচ. ডি পাড়তে চায়?

এক সপ্তাহ পরে আবার ডিনার এবং মান্না-র সগর্ব ঘোষণা : মাস্টারমশাই, ব্যবস্থা হয়ে গেছে। অমূক ইউনিভার্সিটির লেকচারারের বেকার ছেলেটাকে আমার কোম্পানিতে নিয়ে নিচ্ছি - বুঝলেন কিছু? ঐ লেকচারার সুচন্দার থিসিসটা লিখে ডক্টরেট পাইয়ে দেবেন। আপনার সততা নিয়ে আপনি থাকুন।

এ কাহিনীর পরিণাম অবস্য বেশ স্বস্তিকর - কারণ সুচন্দনার ডক্টরেটের স্বপ্ন অচিরে ফেটে যায় এবং প্রমথেস মোটা টাকা দিয়ে একজন এন. আর. আই কিনে তার ঘড়ে কন্যাকে ঝুলিয়ে দেন। ঐ অধ্যাপক পুত্রের বেকারত্ব ঘোচেনা এই যা ট্রাজেডি।

কিন্তু ডক্টরেট জোগাড় করা যে এখন জ্ঞানলাভের চেয়ে অন্য ধান্দায় জরুরি তার একটি সুন্দর উপাখ্যান আমাকে বলেছিলেন সহকর্মী অদ্রিশ রায় বর্মন। বসিক ও বিদ্বন - জ্ঞানপিপাসু। তাঁর কাছে একদিন দুই প্রাক্তন ছাত্র এসে হাজির - সুনীল ও প্রকাশ। দুজনেই কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বি. এ অনার্স ও এম. এ পাশ করে দুটো গঞ্জ এলাকার স্কুলে পড়ায়। তাদের দুজনের হঠাৎ একসঙ্গে জ্ঞানস্পৃহা জেগে উঠেছে তাই ডক্টরেট না করলেই হয়। অতএব শরণ নিতে অদ্রিশ বাবুর কাছে এসে হাজির। 'আপনিই ভরসা স্যার - আপনার তো ব্যাপক যোগাযোগ।' সব শুনে অদ্রিশ বললেন, তোমাদের এই ডক্টরেট লেলে কী সুবিধা হবে?

সুনীল বেশ বলিয়ে কইয়ে ছেলে বরাবর। বলল, আলনি আমাদের স্যার - আপনাকে গোপন করে লাভ নেই- ডাক্তারেরকাছে যেমন রোগ লুকোতে নেই। সরাসরি বলছি, স্যার, আমরা হেডমাস্টার হতে চাই। তাই পি. এইচ. ডি হচ্ছে মাস্ট। এবারে বলুন কী করতে হবে।

: মেজ সেজ যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের পি এইচ. ডি হলেই চলবে তো? আচ্ছা আমি একটা চিঠি লিখে চিচ্ছি অমার প্রাক্তন সহকর্মী এখন ... বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। কিছু একটা করবেন নিশ্চয়ই।

হৃষ্টচত্তে চিঠি নিয়ে তারা নাচতে চলে গেল। তারপরে দেখা করল মাস চারেক পরে। 'রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে, আপনার বন্ধু খুব সামায্য করেছেন স্যার।' অদ্রিশ খুব খুশি। সামান্য ছাত্রকৃত্য কার গেল। গবেষণার বিষয়টি বেশ চমকপ্রদ : দুই জেলার ভাষা - ধরা যাক বাঁকুড়া ও বীরভূম। সুনীল আর প্রকাশের সঙ্গে একদিন পথে দেখা। তারা সোৎসাহে জানাল, টেপরেকর্ডার নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরছে - সজীব ভাস্বর চলতি নমুনা সংগ্রহে খুব রোমাঞ্চকর।

বছর দুয়েক পরে অদ্রিশের কাছে আবার আবির্ভার যুগল মূর্তির। সঙ্গে মিষ্টির বড় প্যাকেট - সাফল্যের প্রতীক। মুখে লক্ষ্যভেদের হাসি। অদ্রিশ কৌতূহলবশত জিগ্যেস করল, তোমরা জেলার সীমানা কী ভাবে ধরলে? অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বাউন্ডারি না লিঙ্গুইস্টিক বাউন্ডারি?

: ওসব তো আমরা কিছু জানি না স্যার। এখনকার বাঁকুড়া বা বীরভূম বলতে যেটা বোঝায় সেটাই সীমানা ভেবেছি আমরা। ভাষাগত সীমানা কখোনো আলাদা বুঝি? জানিনা তো?

: তোমরা ঠিক কী করলে?

: চেপরেকর্ডারে নানা রকম আঞ্চলিক শব্দ, তার উচ্চারণ, প্রবাদ প্রবচন, গান, ছড়া এইসব সংগ্রহ করে সাজিয়ে দিয়েছি, স্যার যেমন যেমন বলেছেন।

বাঃ বেশ অদ্রিশ বললেন, তো ভাষাতত্ত্বের প্রধান তিনটে অংশ হল ফনোলজি বা ধবনিতত্ত্ব, মরফোলজি বা রূপতত্ত্ব অর সেমানটিক্স বা শব্দার্থতত্ত্ব - তোমাদের কাজটা ঠিক এর কোন্ দিকে?

সুনীল আর প্রকাশ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ভীতকণ্ঠে বলল, আমরা যাচ্ছি স্যার।

পশ্চিমবঙ্গের দুটি বিদ্যালয়ে তারা অবশ্য এখন দুজন প্রতিষ্ঠিত প্রধান শিক্ষক। হাইলি কোয়ালিফায়েড হয়ে যাওয়া মন্দ কথা নয় -

তবে তাতে কাঠকড় পোড়াতে হয়। অন্যের মুখে শোনা ঘটনার চেয়ে নিজের অভিজ্ঞতা বলা ভাল। নববইয়ের দশকের গোড়ার ক থা। তখন কাজ করছি এক সরকারি কলেজে, তার অফিসার-ইন-চার্জ আমারই প্রাক্তন ছাত্র ব্রজেন দেন। একদেন বিনীতভাবে সে বলল, স্যার তেতলার ঘরে একটা স্পেশাল পরীক্ষা হচ্ছে, আপনাকে অল্পক্ষণের জন্যে একটু ইনভিজিলেশ্যন দিয়ে দিতে হবে। এই ধরুন এক ঘন্টা। ওল্ড সিলেবাসের পাশ কোর্স বি. এ। এবারেই ক্যান্ডিডেটদের লাস্ট চান্স। গত দুবার ওরা ফেল করেছে। একটু য ান স্যার। কাল ইংরিজি হয়েছে, আজ বাংলা।

গেলাম। জনা তিরিশের পরীক্ষার্থী-পরীক্ষার্থীণী। বয়স তিরিশ থেকে পঁয়তিরিশের কোঠায়। ক্লান্ত হতাশ মুখ। সঙ্গে বইখাতা। প্রশ্ন পত্র দেবার আগে বললুম, বইখাতা সব টেবিলে রাখুন।

একজন পরীক্ষার্থী বললেন, স্যার এবারেই আমাদের শেষ সুযোগ। আমরা প্রায় সবাই জুনিয়ার হাইস্কুলে টিচারি করি। বি. এ পা শ না করলে আমাদের চাকরি থকবে না। না টুকলে আমরা পাশ করব না - দয়া করুন স্যার। গতকাল ইংরিজি পরীক্ষাতেও স্যার ি যনি ছিলেন তিনি আমাদের রিকোয়েস্ট বাইরে চলে গিয়েছিলেন।

আমি দিশেহারা হয়ে বললাম, কী বলছেন আপনারা? আপনারা শিক্ষকতা করেন? চাকরি পেলেন কী করে? এখন এইভাবে কোয়া লিফায়েড হবেন? টুকে? - একটু থেমে পরিহাসের সুরে বললাম, কিন্তু টুকেও তো আপনারা পাশ করতে পারবেন না - কী টুকবেন জানেন? বরং আমি ঘরে থাকলে বলে দিতে পারব কোন্‌টা টুকবেন, কতটা টুকবেন তাই না?

হ্যাঁ স্যার। তাহলে থাকুন স্যার - সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। আমি লজ্জা ঘৃণায় আত্মগ্লানিতে ঘর তেকে বেরিয়ে এলাম।

গত মাসে বোলপুর হয়ে পালিতপুর যাচ্ছিলাম। পথে একজায়গায় বাসের টায়ার ফাটলো। কন্ডাকটার বলল, নেবে যান গো সবাই - এখন অন্তত আধঘন্টা লাগবে টায়ার বদলাতে। চা সিগারেট খান সব। সামনের একটা দোকানে একজন হাঁকছিল, গরম চপ আ র গরম চা - আসুন সব।

চপে কামড় মেরে বোকা। গরম খুবই কিন্তু আলুর চপ নয়, লাল কুমড়ো চটকে চপ। জঘন্য। কেউ কেউ ঝাঁঝিয়ে উঠল, এ কি? কুম ড়োর চপ কেন? আলু কই? চতুর দোকানদার বলল, আলুর চপ তো বলিনি - বলেছি গরম চপ। আলু ছটাকা কেজি আর ডুঁই কু মড়ো দেড়টাকা বুঝলেন?

বীরভূমের অনুন্নত গরীব গ্রাম। অবাক আরেকটু বাকি ছিল - দেশজ মঙ্করার আরো একটু নমুনা চোখে পড়ল। সামনের দোকানে ে লখা সর্বমঙ্গলা স্টোর্স। পানের দোকানের গায়ে পোস্টার মারা রয়েছে : পান করুন শিক্ষক বিড়ি, ছাত্র বিড়ি।

বহুতর বিড়ির বিজ্ঞাপন ও নাম দেখেছি। কিন্তু শিক্ষক বিড়ি ও ছাত্র বিড়ি? এক দোকানেই? জিগ্যেস করলাম : দুটো বিড়ি কি আল াদা? কান এঁটো করা হাসি হেসে গ্রামীণ দোকানী বলল, আজ্ঞ হ্যাঁ, দুটোই আমার নিজের হাতে তৈরি। ছাত্র বিটি একটু তেজি মশ লার, শিক্ষক বিড়ির তেজ কম। দেখছেন তো, মাস্টারদের আর সেই তেজ কই?

সপাং করে মুখে পড়ল আরেক চাবুক।